নারী আন্দোলনের ৩০ বছর





স্টুডেন্ট ওয়েজ
৯, বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৩৭৮

প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ ওহিদ উল্লাহ্
ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ
বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
কাইয়ুম চৌধুরী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
উদয়ন প্রেস

মুদ্রাকর ঃ
সালেহ্ আহমদ খান
শেলী প্রেস
৮/২, ওয়াইজঘাট রোড, ঢাকা—১

দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে মরণপণ সংগ্রাম করে যাঁরা এই নাট্য আন্দোলনকে আঁধার থেকে আলোয় এনেছেন, চিনিয়ে দিয়েছেন নতুন পথ, সেই সব স্রষ্টা ও পথ দ্রষ্টাদের হাতে তুলে দিলাম বিগত দিনের এই খতিয়ান।

অতীতের দলিল আজকের কালে

কেন এই ত্রিশ বছর? এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় চৌষট্টি সালের সারা বাংলা নাট্য সম্মেলনের কথা। সেদিন আমরা যেমন সবাই বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম, আমরা কোথায় ছিলাম কোথায় আছি তেমনি আর একটি কথাও উপলব্ধি করেছিলাম, আমাদের লুপ্তপ্রায় সম্পদকে কেমন করে রক্ষা করা যায়, তাকে আসছে কালের সামনে কি ভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। এই প্রশ্নটা গভীরভাবে ছিল সম্মেলনে। আমি সেই প্রশ্নটা সামনে রেখে, সেই হারিয়ে যাওয়া সম্পদকে এই গ্রন্থে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি মাত্র। সেই সঙ্গে অনেক মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। এই দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে কতো সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, কতো ঘাত প্রতি-ঘাতকে এড়িয়ে নিত্য নতুনভাবে এই শতবর্ষের আলোকে জ্বালিয়ে রেখেছেন কতো না শিল্পী। শত সহস্র বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করে এই নাট্য শিল্পকে জাগিয়ে রেখেছেন যাঁরা, তাঁরা কতো না মহান। তাই তাঁদেরকেও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রেখেছি। এতেই কি সম্পূর্ণ বলা হয়েছে? না। যথার্থভাবে এর নাম দেওয়া উচিৎ ছিল নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছরের রূপ ও রেখা। এতো পরিশ্রম করে একটা আউট লাইন করা হলো মাত্র। এর পর সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা হবে আর একদিন। কে লিখবে জানি না, শুধু এইটুকু জানি এই খসড়ারও প্রয়োজন ছিল। আমি নিষ্ঠার সঙ্গে তা শেষ করেছি। সাহিত্য হয়নি তাও জানি। যা হয়েছে তা হচ্ছে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে জড়ো করে রাখার চেষ্টা মাত্র। এইটুকু করতেও দ্বিধা ছিল মনে, শেষে নাট্যকার বন্ধু স্বপন সেনগুপ্ত সে দ্বিধা ভেঙ্গে দিলেন। এরপর শুরু হলো কাজ, সেই কাজে যাঁরা সাহায্য করলেন, তাদের মধ্যে সাংবাদিক বন্ধু অসীম ঘোষ, জগন্নাথ ভট্টাচার্য, ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, অশোক

ঘোষ, প্রবীর সেন, সত্যপ্রিয় বড়ুয়া, মানবেন্দ্র পাল, বাবুল দত্ত ও তারাধন ঘোষ। এঁদের সবাইকে প্রথমেই জানাই আমার অন্তরের ভালবাসা।

যেসব পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, বসুমতী, সত্যযুগ, স্বাধীনতা, গণশক্তি, বহুরূপী, পরিচয়, লোকনাট্য, গণনাট্য, নাট্য প্রসঙ্গ, থিয়েটার, পাদপ্রদীপ, এপিক থিয়েটার ও বহু দলের স্যুভেনির।

এইসব পত্র-পত্রিকা ও স্যুভেনির থেকে নিয়ে অনেক শ্রদ্ধেয় শিল্পীদের লেখা পুনর্মুদ্রন করে তৎকালীন বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরেছি। সেই সব গুণী শিল্পীদের জানাই আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা। তাঁরা যদি সেদিন না লিখে রাখতেন ঐ সব লেখা, যদি না উল্লেখ করতে পারতাম, তাহলে সেই সময়ের পরিবেশ বোঝানো খুবই কঠিন হয়ে পড়ত। আর একটা কথা, বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীর পরিচয় পরে আসার দরুণ অনিচ্ছাসত্বেও 'শহরতলী'তে দিতে হয়েছে, এর জন্যে আমি দুঃখিত। এখনও অনেক তথ্য ও তত্ত্ব আসছে কিন্তু এতে আর দেওয়া সম্ভব হলো না। চেষ্টা করব দ্বিতীয় খণ্ড করার। ইচ্ছে তো অনেকই আছে, কতটুকু সম্ভব হবে কে জানে। সব শেষে এই কথাই বলি, এই দীর্ঘ ত্রিশ বছরের নতুন নাট্য আন্দোলনকে যদি সামান্যও চিত্রিত করে থাকতে পারি তবেই এ চেষ্টা সার্থক বলে মনে করব। অলমিতি

সূচীপত্র

নাট্য আন্দোলনের পটভূমি ১, ন্যাশন্যাল থিয়েটার/নীলদর্পণ ৪, গণনাট্য আন্দোলনের জয়যাত্রা/নবান্ন ৬, প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব ও দুঃখীর ইমান ৮, নব সংস্কৃতি ও গণনাট্য প্রসঙ্গে ১১, নূতন ধরনের নাটক : 'নবান্নে'র সাহায্য ২১, গণনাট্য সঙ্ঘের নবান্ন ২২, নাট্যকলা : নবান্ন ২৩, নবান্ন ২৭, ভারতের মর্মবাণী ২৬, মন্বন্তর ও সাহিত্য ২৮, ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৯, গণনাট্য সঙ্ঘ/বাস্তুভিটা ৩৩, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন ৩৮, গণনাট্য সঙ্ঘ/নয়নপুর ৪৪, গণনাট্য সঙ্ঘ/জনান্তিক সঙ্কেত ৪৬, নাট্য আন্দোলনে বহুরূপী ৪৭, গণনাট্য সঙ্ঘ/ভাঙা বন্দর ৪৮, বহুরূপী নাট্য উৎসব ৪৮, নাট্য আন্দোলনে/উত্তর সারথি ৪৯, নাট্যচক্র/নীলদর্পণ ৫২, নাট্য আন্দোলনে অশনিচক্র ৫৩, গণনাট্য সঙ্ঘ/দলিল ৫৫, গণনাট্য আন্দোলনে নাটকের সমস্যা ৫৮, নাটকের কণ্ঠরোধ ৬১, ১৮৭৬ সালের আইন ৬১, ১৫ই আগষ্ট ও শিশিরকুমার ৬৪, লিটল থিয়েটার গ্রুপ ৬৮, সমন্বয় ৬৮, গণনাট্য সঙ্ঘ/আজকাল ৭০, গণনাট্য আন্দোলনে/রাহুমুক্ত ৭১।

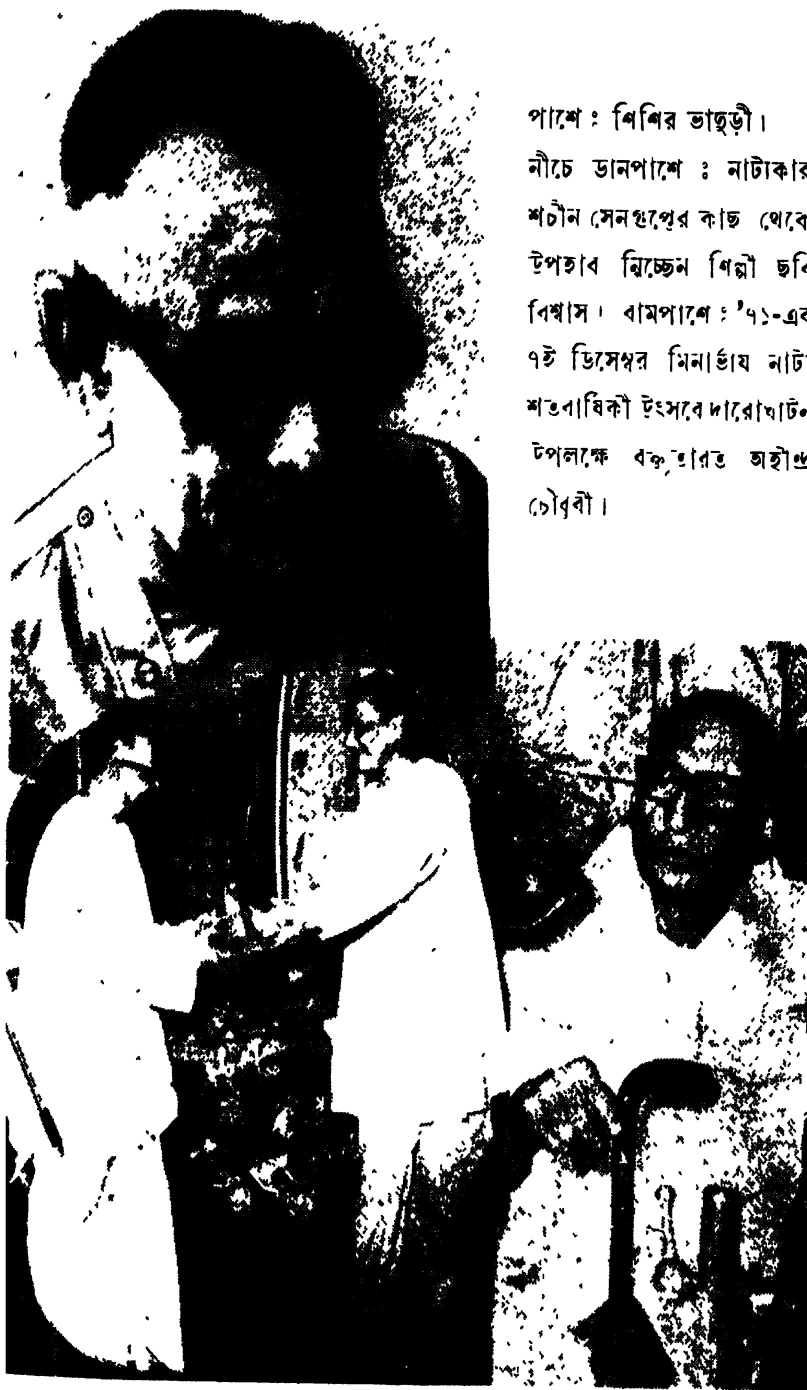
বহুরূপীর 'রক্তকরবী'/নবনাট্যের যাত্রা শুরু ৭২, বহুরূপী ও রক্তকরবী ৭৯, থিয়েটার সেণ্টার/মুখোশ ৮৯, নবনাট্য আন্দোলন/রূপকার ৯৪, গণনাট্য সঙ্ঘ/হরিপদ মাস্টার ৯৮, গণনাট্য আন্দোলন/পোস্টার নাটিকা ৯৯, পাদপ্রদীপ/নান্দী ১০০, ব্রাইট থিয়েটার ১০৫, লোক ও নাটক থেকে লোক মঞ্চ ১০৭, ক্যালকাটা মেরী মেকার্স ক্লাব ১১০, বৃন্দম শিল্পী সঙ্ঘ ১১১, লিটল থিয়েটার গ্রুপের নাট্য উৎসব ১১২, গণনাট্য থেকে নবনাট্যের শরিক হলেন শৌভনিক ১১৬, পাদপ্রদীপের আলোয় শৌভনিক প্রযোজিত "এবং ইন্দ্রজিৎ" ১১৯, গণনাট্য শাখা থেকে অনুশীলন সম্প্রদায় ১২২, লোকতীর্থ ১২৩, নবনাট্য আন্দোলন/ অন্বেষা ১২৪, আমাদের সেই গজাদা : খাস মানুষটি ১২৬, যেন ভুলে না যাই, ১৩০, গণনাট্যের পথ ধরে নবনাট্যের পথ বেয়ে/গন্ধর্ব ১৩১, নবনাট্য আন্দোলনের পরিণতি : নবনাট্য সূচনা ১৩৬, নবনাট্য আন্দোলনে/অভ্যুদয় ১৩৯, নাট্য আন্দোলনে বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ ১৪২, নাট্য-সাহিত্য সম্মেলনে আলোচনা ১৪৪, চতুরঙ্গ ১৪৭, নটরাজ কলাকেন্দ্র ১৫০, নাট্য আন্দোলনে থিয়েটার ইউনিট ১৫১, নবনাট্যের

থরিক ক্যালকাটা থিয়েটার ১৫২, লোকরঙ্গ ১৫৫, অহীন্দ্রম্ ১৫৫, প্রয়াসী ১৫৭, নাট্য আন্দোলনে সংবাদপত্র ১৫৯, গণনাট্য থেকে নবনাট্য আন্দোলনে/নান্দীকার ১৬৩, নবনাট্য আন্দোলনে চতুর্মুখ ১৭০, এপিক থিয়েটার ১৭২, গণনাট্য আন্দোলনে সীমান্তিক শাখা ১৭২, পুলিশের কারসাজীতে "অমর ভিয়েৎনাম" নাটকের অভিনয় বন্ধ ১৮৩, অভিনয় বাতিল ১৮৬, নট-নাট্যম ১৮৬, তুর্যম ১৮৭, সপ্তর্ষি ১৮৮, নাটকের কণ্ঠরোধ—নাট্য সংকটে জনমত ১৮৯, সারা বাংলা নাট্যানুষ্ঠান বিল আলোচনা সম্মেলন—আহ্বায়ক এবং প্রস্তুতি পরিষদ সদস্য ১৮৯, নবনাট্য আন্দোলনে "যুগান্তর" ২২০, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ থেকে চলাচল ২২২, নবনাট্য থেকে গণনাট্যের পথে পথিক ২২২, চতুর্মুখ থেকে মুকুর ২২৩, জলি ক্লাব ২২৫, ইউরেকা ২২৬, নাট্য আন্দোলন ও সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন ২২৬, রঙ্গশ্রী ২৩৮, অনুশীলন সম্প্রদায় থেকে গ্রীণ এ্যামেচার গ্রুপ ২৪০, এ্যাবসার্ড নাটক/বঙ্গীয় নাট্য সংসদ ২৪১, ইউনেস্কো আর তাঁর গণ্ডার ২৪২, এ্যাবসার্ড নাটক ২৪৮, গণনাট্য আন্দোলনে/কলাকার ২৫২, গন্ধর্ব থেকে/শতায়ন ২৫৪।

নাট্য আন্দোলনের দীপ্ত পদক্ষেপ/কল্লোল ২৫৬, গণনাট্যের আদর্শে শিল্পীমন ২৫৮, মুক্তধারা ২৬১, অভ্যুদয় থেকে প্রতিভা ২৬২, রূপচক্র ২৬৩, মঞ্চপ্রভা ২৬৩, বহুমুখী ২৬৬, নাট্যকার পরিষদ ২৬৭, শৌভনিক থেকে আই-টি-এ ২৬৯, নাটমহল ২৬০, নাটক করলে ট্যাক্স দিতে হবে ২৭০, নাট্য আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা ২৭৫, মৌসুমী ২৮১, নাট্য আন্দোলনে মাস থিয়েটার্স ২৮৩, স্পন্দন ২৮৫, রাজাসাজা ২৮৫, জাতীয় নাট্যশালা ও রবীন্দ্র সদনের দরজা খোলা ২৮৭, বিক্ষোভ : প্রতিবাদ/সংকট ২৮৯, গন্ধর্ব থেকে নক্ষত্র ২৯০, সৃজনী ২৯৪, নান্দীকার থেকে থিয়েটার ওয়ার্কশপ ২৯৫, উত্তর দরবারী ২৯৬, ঘরোয়া ২৯৭, নবরঙ্গ ২৯৮, সুদর্শনম ২৯৯, অনুভব ৩০০, সৌভ্রাত্রিক ৩০১, নাটক বাঁচাও আন্দোলন ৩০১, ঋতুরাজ নাট্য সংস্থা ৩০৮, নাট্য আন্দোলন/রাইফেল ৩১০, সংস্কৃতি ৩১০, লিট্‌ল থিয়েটার থেকে লোকায়ন ৩১১, এই মুহূর্তের নাট্যচর্চা ৩১৩, নাট্যকারের ধর্ম ৩১৪, নাট্য পরিচালকের কার্য্যক্রম ৩১৮, প্রযোজিত নাটকে অভিনেতার ভূমিকা ৩২৪, শৌভনিক থেকে এন. বি. এণ্টার প্রাইজ ৩২৬, ইউথ থিয়েটার গ্রুপ ৩২৮, অঙ্গদ ৩২৮, আনন্দ সঙ্ঘ ৩২৯, উদয় সঙ্ঘ ৩৩০, নাটুকে দল থেকে পিপলস্ আর্ট থিয়েটার ৩৩০, শিল্পী যাযাবর ৩৩১, নাটকে ট্যাক্স আসে

আর যায়, আবার এসেছে ৩৩২, গণনাট্য থেকে ভারতীয় গণসংস্কৃতি সঙ্ঘ ৩৩৪, লিট্‌ল থিয়েটার থেকে/এপিক ৩৩৫, লিট্‌ল থিয়েটার থেকে/পিপ্‌লস্ থিয়েটার ৩৩৮, সারস্বতী ৩৩৮, মঞ্চরথ ৩৪০, শতবর্ষের আলোয় পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী ৩৪০, শুভম্ ৩৪৩, আবার নাট্যকর/তীব্র প্রতিবাদ ৩৪৫, ছন্নছাড়া নাট্যগোষ্ঠী ৩৪৭, মঞ্চের দাবীতে নাট্য সংগ্রাম সমিতি ৩৪৮, দরবেশ ৩৫০, রূপ ও রঙ্গ ৩৫১।

৭২-এ আবার নাটকের কণ্ঠরোধ ৩৫১, নাটক অনুষ্ঠানে পুলিশী বাধা ৩৫২, গণনাট্যের উপর হামলা ৩৫৩, গণনাট্য সঙ্ঘের জেলা অফিস তছনছ ৩৫৩, ৭২-এ এসে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ৩৪৫, নাট্য পত্রিকার কণ্ঠরোধ ও সাংস্কৃতিক জগতের উপর হামলা ৩৫৫, অভিনয়ের উপর হামলা ৩৫৭, গৌরচন্দ্রিকা ৩৫৭, নাট্য আন্দোলনে শহরতলী ৩৬৪, নাট্য মন্দির (উত্তর পাড়া, হুগলী) ৩৬৮, অরুণ আর্ট সেণ্টার (মুর্শিদাবাদ) ৩৬৬, কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার (কাঁচড়াপাড়া) ৩৬৭, নবীন সঙ্ঘ (ব্যাণ্ডেল, হুগলী) ৩৬৯, জাগৃতি (আতপুর, ২৪ পরগণা) ৩৭০, গণনাট্যের আদর্শে/সংগঠনী (বেলঘরিয়া) ৩৭১, কৃষ্টি সংসদ (দক্ষিণ জগদ্দল, ২৪ পরগণা) ৩৭৩, সংস্কৃতি (আমতা, হাওড়া) ৩৭৩, যাত্রিক (নৈহাটী) ৩৭৪, স্টুডেণ্টস থিয়েটার (হালিসহর) ৩৭৬, মঞ্চদীপ (আন্দুল মৌড়ি) ৩৭৭, সমকালীন (ইছাপুর) ৩৭৮, ফোকাস্ (বর্ধমান) ৩৭৮, গুড্‌লাক্ ড্রামাটিক ক্লাব (তমলুক) ৩৭৯, প্রতিরূপ (পলতা) ৩৮০, শৈলূষিক (রহড়া) ৩৮১, শিল্পায়ণ (ইছাপুর) ৩৮২, ভিয়াস (ঘাটেশ্বর) ৩৮২, সপ্তস্বরা (চিত্তরঞ্জনী) ৩৮৪, শিশির শ্রীনাট্যম (বরানগর) ৩৮৪, রূপান্তর (নৈহাটি) ৩৮৫, অনামী (রঘুনাথগঞ্জ) ৩৮৫, বলাকা (হাওড়া) ৩৮৭, বরিষা সংস্কৃতি পরিষদ ৩৮৮, বলাকা শিল্পী গোষ্ঠী ৩৮৯, শিল্পীলোক (ভাটপাড়া) ৩৮৯, রানার গ্রুপ (দুর্গাপুর) ৩৯ , বর্ধমান নটরাজ ইউনিট ৩৯১, এনাগো (দমদম) ৩৯২, বীক্ষণ (বজবজ) ৩৯৩, দিশাহারা ৩৯৩, কল্লোল (চুঁচুড়া, হুগলী) ৩৯৪, ব্যতিক্রম (বেহালা) ৩৯৫, উদ্যোগী (হুগলী) ৩৯৬, ক্যারেকটারস্ (হাওড়া) ৩৯৭, নাট্য সংস্থা (বেহালা) ৩৯৭, চেনামুখ (টালিগঞ্জ) ৩৯৮, অর্পণ (হাওড়া, সালকিয়া) ৩৯৯, কার্ণিক (শিলিগুড়ি) ৩৯৯, নাট্য আন্দোলনে কুলটির কয়েকটি নাট্য সম্প্রদায় ৪০০, ইয়ংমেন্‌স্ কালচারাল এসোসিয়েশন (নৈহাটি) ৪০১, নাট্য আন্দোলনে ইস্ক্রা/নতুন সংযোজন ৪০৩।



পাশে : শিশির ভাদুড়ী।
নীচে ডানপাশে : নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের কাছ থেকে উপহার নিচ্ছেন শিল্পী ছবি বিশ্বাস। বামপাশে : '৭১-এর ৭ই ডিসেম্বর মিনার্ভায় নাট্য শতবার্ষিকী উৎসবের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে বক্তৃতারত অহীন্দ্র চৌধুরী।



সোমেন নন্দীর বাড়ীতে সারা বাংলা নাট্যসম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সভার একটি দৃশ্য।

নাট্য আন্দোলনের পটভূমি

১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর একটি অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা। যে সন্ধ্যায় আমরা, যারা দিন আনি, দিন খাই, অতি সাধারণভাবে যারা জীবন কাটাই, যারা জাতীয় শিল্প সংস্কৃতিকে বুক দিয়ে রক্ষা করি, সেই সাধারণ মানুষ প্রথম নাটক দেখার দরজা খোলা পেল। বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হলো। ইংরেজী থিয়েটার ও বাঙালী সৌখীন জমিদার বাড়ীর অন্দর মহল থেকে নাটক বেরিয়ে এলো জনগণের মধ্যে। তারপর কত সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। কত নাট্য শিল্পী এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে জীবন উৎসর্গ করলেন। কত অভিনেতা নিজের কথা না ভেবেই দুর্যোগকে সাথী করে মঞ্চকে আঁকড়ে রইলেন। কারণ তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন যে, নাটক হচ্ছে জাতির দর্পণ, আর সেই দর্পণকে বুক দিয়ে রক্ষা করতে হবে। তাই শত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও মরণপণ সংগ্রাম করে গেছেন কত জানা অজানা শিল্পীরা। আজ বারবার মনে পড়ে সেই জাতীয় ঐতিহ্য সৃষ্টির কথা। বিচার করতে ইচ্ছে করে, যে ভিতের ওপর এই শতবর্ষের অট্টালিকা গাঁথা হয়েছে, সেই ভিতটা পলকা না শক্ত? বাড়ীটা হঠাৎ ধ্বসে য'বে, না এরই ওপর আরো ইঁট গাথা যেতে পারে। তাইতো দেখি সেদিন থেকে আজ অবধি কত হাজার হাজার শিল্পী একটা একটা করে ইঁট গেঁথে বসিয়েছেন, এই নাট্য তাজমহলটিতে। যার ওপর আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আগামীকাল যাকে আরো সুন্দর ভাবে গড়ে তুলবো এই প্রতিজ্ঞায়।

সেই প্রবাহমান কালের অপেক্ষায় আমরা আছি—ছিল আমাদের অতীত, যার উপর ভরসা করে এই নাট্য তাজমহলটিকে নিখুঁত শিল্পের দ্বারা দাঁড় করিয়েছেন আমাদের পূর্বসূরীরা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি দিয়ে এই নাট্য তাজমহলটিকে গাঁথা হলো? আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ দিয়ে। যে নাটক আজও হয়ে আছে জাতির দর্পণ। সেই 'নীলদর্পণ' প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার ফলে ভারতবর্ষ, শিল্পোন্নত ইংলণ্ডের কাঁচামালের উৎপাদনের ক্ষেত্র ও পণ্য বিক্রয়ের বাজাররূপে অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করে। আর সে জন্য

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কাঁচামাল লুণ্ঠনের জন্যে ধীরে ধীরে ভারতকে তাদের স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করে। আর এই উপনিবেশ ব্যবস্থায় ইংরেজ দস্যুরা শোষণের নতুন কায়দা আবিষ্কার করে। সেই সুযোগেই বাংলার সমস্ত গোষ্ঠী লুণ্ঠনের এক নতুন পথের সন্ধান পেয়ে গেল। ইংরেজ, বাঙ্গালী জমিদার গোষ্ঠী আর নীলকরের দল চাষীর লাল রক্ত শুষে নীল করে দিল; আর এই নীল থেকে একচেটিয়া মুনাফার পাহাড় গড়ে তুললো। নীলকর সাহেবরা মোটা টাকা দিয়ে জমিদারদের কাছ থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য জমি ভাড়া করে নীলের চাষ আরম্ভ করল। আর অগ্রিম কিছু দাদন দিয়ে চাষীদের বাধ্য করল ক্রীতদাস হতে। এই সব জঘন্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে যদি কোন চাষী আপত্তি জানাত, তার ব্যবস্থা ছিল লাঠি, গুলি আর জেল। এই চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ নীল না দিতে পারলে তাদের উপর চালানো হতো অমানুষিক নির্যাতন, জরিমানা আর আজীবন দাসত্ব।

নীলকরদের হাতে থাকত পাইক, বরকন্দাজ, কয়েদখানা, নানাপ্রকার শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থা। যে সব চাষী এই জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠবার চেষ্টা করত সেই সব চাষীদের গুলি করে হত্যা করবার জন্যে অসংখ্য বন্দুক আমদানী করা হয়। এক কথায় বলা যায়—নীলকর দস্যুরাই ছিল বাংলার আসল শাসক ও মালিক।

এইভাবে চলতে লাগল বাংলার নিরীহ চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের ও সামন্ত প্রভুদের পৈশাচিক তাণ্ডব। নীলকরদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে সোনার বাংলা ছারখার হয়ে গেল!

চিরবিদ্রোহী বাংলার চাষী কিন্তু এই অত্যাচার নীরবে মেনে নিলো না। দেশকে বাঁচানোর জন্যে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসনের শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য জীবন পণ সংগ্রাম শুরু করলো।

ইংরেজরা যখন দেখল শুধুমাত্র অত্যাচার করেই মুনাফা লোটা সম্ভব নয়, তখন তারা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট দেখিয়ে দিল; সেখানে নাকি ন্যায় বিচার হয়। সেদিন জনসাধারণ নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে পারল, সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট ঐ কোর্টে বিচারের নামে প্রহসন-ই হয়, বিচার হয় না। তখন তারা বৃথা সময় নষ্ট না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সশস্ত্র বিপ্লবের পথে। ঐ পথই যে সশস্ত্র রাজশক্তির হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ, সেটা তারা সেদিন বোঝবার চেষ্টা করেছিল।

দীনবন্ধু মিত্রের শিল্পী-মনকে এই পীড়ন, নিষ্পেষণ ও নির্যাতনের রূপ ব্যাকুল করে তুলেছিল, আর তাই তাঁর দরদী মন নিয়ে এই মহৎ জীবন কাব্যকে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। আর সেই সংগেই বাস্তব জীবন ভিত্তির উপর সাহিত্য রচনার ভিতর দিয়ে বাংলা সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ হলো নীলদর্পণের মধ্য দিয়েই। ভদ্র সমাজে যাদের সুখ দুঃখের কথা এতদিন অপাংক্তেয় ছিল গল্পে-উপন্যাসে, নাটকে যাদের প্রবেশের দরজা এতদিন বন্ধ ছিল, দীনবন্ধু মিত্রই সেই সব সর্বহারা মানুষদের মঞ্চে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তাঁদের জীবনসত্যকে তুলে ধরা'র জন্যে।

এই 'নীলদর্পণ' দিয়েই বাংলাদেশে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি (১৮৭২) হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রমুখরা কলকাতায় ন্যাশন্যাল থিয়েটার স্থাপন করে সর্বপ্রথম জনসাধারণের কাছে টিকিট বিক্রি করে যে নাটক অভিনয় করেছিলেন তা হলো 'নীলদর্পণ'। এর আগে কলকাতায় যে সব নাটক অভিনয় হতো তাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না, ধনী ও উচ্চশ্রেণীর পেটোয়া কর্মচারীরাই নাটক দেখতে পাবতেন। তাই 'নীলদর্পণ' শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকে নিয়েই প্রথম নাটক নয়, এ নাটক বৃহত্তর জনসাধারণের নাটক হয়ে আছে। তাই আচার্য গিরিশচন্দ্র, দীনবন্ধুকে "বাংলার রঙ্গালয়ের স্রষ্টা" বলে অভিহিত করেছেন।

'নীলদর্পণ' নাটক যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁদের প্রতিমুহূর্তে পুলিশের লাঞ্ছনা আর অপমানের আশঙ্কা নিয়েই তা করতে হত। তবু কিন্তু শিল্পীরা অভিনয় বন্ধ করেননি। কথিত আছে একদা বিদ্যাসাগর মশাই 'নীলদর্পণ' অভিনয় দেখতে দেখতে রোগ সাহেবের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফীর মাথায় চটি জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন। সে জুতো আসলে আঘাত করেছিল নীলকরদের বর্বরতার বিরুদ্ধে। বিদ্যাসাগর মশাই সেদিন তাঁর তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের বিরুদ্ধে। এমনিভাবে যখন দেশ শুদ্ধ মানুষ ঘৃণায় ফেটে পড়ছে তখন সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কিত হয়ে ১৯০৮ সালে ইংরেজ বিদ্বেষী ও রাজদ্রোহী এই অজুহাতে 'নীলদর্পণের' অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেন।

সংস্কৃতির উপর সাম্রাজ্যবাদ-এর বর্বরোচিত আক্রমণের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। লক্ষ্ণৌতে যখন 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয় হচ্ছিল, তখন একদল ইংরেজ টমি নগ্ন তলোয়ার হাতে করে মঞ্চ আক্রমণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে বিনোদিনী দাসী লিখেছিলেন—রোগ সাহেবের ক্ষেত্রমণির উপর অত্যাচারের দৃশ্যে

সাহেবরা নিজেদের নগ্নমূর্তি দেখে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে একজন সাহেব দৌড়ে ষ্টেজের উপর উঠে তোরাপ্‌কে মারতে আরম্ভ করে।

'নীলদর্পণের' অভিনয় নিয়ে এমন অনেক ঘটনা আছে যা বলতে আরম্ভ করলে অনেক বলা যায়। এহেন বিদ্রোহী নাটকের জন্যে ইতিহাসে অনেক প্রখ্যাতনামা, ও স্বনামধন্য ব্যক্তিদের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের হাতে জীবন বিপন্ন করতে হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন লং সাহেব, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি এবং আরো অনেকে।

একদিন রাত্রে 'নীলদর্পণ' লিখতে লিখতে দীনবন্ধু মেঘনা নদী পার হচ্ছিলেন হঠাৎ নদীর উত্তালরূপ দেখা দিল। নৌকায় জল উঠতে আরম্ভ করল। সেদিন সেই গভীর রাত্রে দীনবন্ধু নিজের জীবন বিপন্ন করেও ঐ পাণ্ডুলিপিটা মাথার উপর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আর সেই যত্নে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিই পরবর্তীকালে একটা বিদ্রোহের সৃষ্টি করল। সেদিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে একটা জলন্ত ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল যে-ঘৃণা আজ আমাদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, সাম্রাজ্যবাদ আজও ভারতকে নতুন নতুন কৌশলে শোষণ করছে, তাই 'নীলদর্পণ' আজও বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে এবং আগামী দিনে আরো হাজার হাজার 'নীলদর্পণে'র সৃষ্টি হবে! আজকের নাট্যকারদের কাছে 'নীলদর্পণ' হয়ে থাক নাটক লেখার আদর্শ!

'নীলদর্পণ' আলোচনায় সমস্ত ঘটনা তন্ন-তন্ন করে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটা সার কথায় আসা গেল, যে নাট্যকার শ্রেণী শত্রুর হাতে নির্যাতিত হন না বা মৃত্যুবরণ করেন না, সে নাট্যকার জাত নাট্যকার নয়।

ন্যাশন্যাল থিয়েটার / নীলদর্পণ

*গিরিশচন্দ্র দলত্যাগ করিলেন। এদিকে "নীলদর্পণের" রিহার্সাল চলিতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্প্রদায়ের General Master হইলেন, কিন্তু প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাড়ীর উঠানটি মাসিক ৪০'০০ টাকায় ভাড়া করিয়া তথায় ষ্টেজ তৈয়ারী করিবার জন্য আব্দুল মিঞাকে নিযুক্ত করা হইল। ধর্মদাসবাবু ষ্টেজ নির্মাণের তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু তিনি সে সময়ে কলুটোলায় স্কুলে মাস্টারী করাতে তাঁহাকে সমস্ত দিন স্কুলে থাকিতে হইত, কাজেই ষ্টেজের কার্য

কিছুই হইত না। সুতরাং অমৃতবাবু তাঁহার হইয়া স্কুলে মাস্টারী করিতেন এবং তাঁহাকে সমস্ত দিন ষ্টেজের কার্য করিবার জন্য অবসর দিতেন। এইরূপে রিহার্স্যাল দেওয়া শেষ হইলে ৭ই ডিসেম্বর, শনিবার, ১৮৭২ খৃঃ (বাঙলা ১২৭৯ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ) সান্যালদের বাড়ীতে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের 'নীলদর্পণের' বৈতনিক অভিনয় হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ রঙ্গালয়ের অভিনয়ের যে আদি উদ্দেশ্য ছিল তাহার পরিবর্তন হইল।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতাগণ :—

উড্‌সাহেব, গোলক বসু, সাবিত্রী ও একজন রাইয়ত	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী
নবীন মাধব	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিন্দুমাধব	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সাধুচরণ, পদীময়রাণী ও ম্যাজিস্ট্রেট	মহেন্দ্রলাল বসু
রাইচরণ, ভোরাপ, গোপ ও মোক্তার	মতিলাল সুর
গোপীনাথ দেওয়ান	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রোগসাহেব	অবিনাশ চন্দ্র কর
আমীন, পণ্ডিত মশাই ও কবিরাজ	শশীভূষণ দাস
খালাসী	গোলকনাথ চট্টোপাধ্যায়
লাঠিয়াল	পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
নবীন মাধবের মোক্তার, আদুরী ও একজন রাইয়ত	গোপালচন্দ্র দাস
রাখাল	যদুনাথ ভট্টাচার্য
সৈরিন্ধ্রী	অমৃতলাল বসু
সরলতা	ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
রেবতী	তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়
ক্ষেত্রমনি	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল)
ষ্টেজের অধ্যক্ষ (ইহারাই পরে ষ্টার থিয়েটারের বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন।)	ধর্মদাস সুর ও যোগেন্দ্রনাথ মিত্র

পরামর্শদাতা (President)	বেণীমাধব মিত্র
সম্পাদক (Secretary)	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সজ্জাকর (Dresser)	কার্তিকচন্দ্র পাল

ঐক্যতান বাদকগণ :—

হারমোনিয়াম বাদক	কালিদাস সান্যাল
বেহালা	নিমাই, ওস্তাদজী, গৌরদাস বাবাজী ও বাগবাজার বসু পাড়ার সুপ্রসিদ্ধ রাজাবাবু
ঢোল বাদক	শ্যামপুকুরের বিখ্যাত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

নীলদর্পণ অভিনয়ের পর মনোমোহন বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত বসু, রবীন্দ্রমোহন মৈত্র, বনফুল, প্রমথ বিশী, যোগেশ চৌধুরী, মনোজ বসু, মহেন্দ্র গুপ্ত, অয়স্কান্ত বক্সী প্রমুখ নাট্যকারদের কত শত নাটক বাংলা মঞ্চকে তথা নাট্য শিল্পকে সঞ্জীবিত রেখেছিল দীর্ঘ একশোবছর ধরে, কত না শিল্পী এই সব নাটকে অভিনয় করেছেন। তাঁদেরই মধ্যে নাম করা যায় ধর্মদাস সুর মঞ্চাধ্যক্ষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), শিশির ভাদুড়ী, মহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, বিনোদিনী দাসী, সুন্দরী, সুকুমারী, কাপ্তেন মোনা, দেবকণ্ঠ বাগচি (সুরকার), অমর দত্ত, দানিবাবু, অপরেশ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, সন্তোষ সিংহ, রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সরযুবালা, নিভাননী, প্রভাদেবী, কঙ্কাবতী, হরিমতী, ব্ল্যাকী, রাণীবালা, ছবি বিশ্বাস প্রমুখ শিল্পীরা একশো বছর ধরে নানান চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু চল্লিশের কোঠায় এসে কি যেন ঘটে গেল ; যার ফলে সব ওলট পালট হয়ে গেল। //

---

* ১৩২৮ সালে "ধর, মজুমদার এণ্ড কোং" হইতে প্রকাশিত 'নীলদর্পণ' নাটক পুস্তিকা হইতে সংগৃহীত।

গণনাট্যের জয়যাত্রা /নবান্ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে এমন সময় মঞ্চে এলো দারুন সংকট। এদিকে নানান সমস্যায় জর্জরিত দর্শক মন বিচলিত হয়ে পড়ল। মঞ্চে কিন্তু চলতে লাগল সেই একঘেঁয়ে বড়লোকের ড্রইংরুমের কাহিনী নিয়ে যত নাটক। যে জীবনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কো'ন আত্মিক যোগ নেই, নেই কোন হৃদয়ের সম্পর্ক, দর্শক কেন তাঁকে দিনের পর দিন দেখবে? কেনইবা তাঁকে আঁকড়ে থাকবে। তাই দর্শকের মন হয়ে উঠল ভারাক্রান্ত। ঐ একঘেঁয়ে প্রেমের প্যান্-প্যানানির হাত থেকে মানুষ বাঁচতে চাইল, চাইল মুক্ত। শিল্পী আর দর্শকের সঙ্গে যে আত্মিক যোগ আছে তার জলন্ত প্রমাণ পাওয়া গেল সেদিন, প্রতিটি মঞ্চে আবার নতুন করে পুরনো নাটক মঞ্চস্থ করে কোন প্রকারে মঞ্চকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে। নতুন কিছু দিতে না পেরে শিল্পীরা হয়ে পডলেন হতাশ. সেদিনকার এই অবক্ষয়ের হাত থেকে মঞ্চকে রক্ষা করতে পারলেন না তৎকালীন শিল্পী ও নাট্যকাররা যার ফলে মঞ্চে ভাঙ্গন ধরল, এলো হতাশা।

এদিকে ১৯৪২-এর আন্দোলন চলছে, যুদ্ধের পরে দেশে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এসেছে, গ্রাম-শহরের মানুষ হ অন্ন, হা অন্ন করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের নেতৃত্বে প্রথমে বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' তারপর 'জবানবন্দী' নাটকের আবির্ভাব হলো। গণনাটকের মধ্যে দিয়ে সত্যিকারের গণজীবনকে দেখতে পেলাম। সেই প্রথম মঞ্চে না খেতে পাওয়া মানুষের আর্ত চিৎকার। আর মুষ্টিমেয় ধনীক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার সোচ্চার হলো। এই ছোট নাটকটি বাংলা দেশের সহরে গ্রামে সর্বত্র অভিনয় হতে লাগল। আর এই ছোট্ট গণনাটকের মধ্য দিয়েই সত্যিকারের গণনাট্য সঙ্ঘ জন্ম নিল। ঐ ছোট্ট নাটক থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ঐ না খেতে পাওয়া মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে শুরু করল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'।

শুরু হলো বাংলা রঙ্গমঞ্চে সত্যিকারের নবান্ন। পৌষের নতুন ধান গ্রামের মানুষের মনে আনে যেমন আনন্দের বন্যা, মঞ্চে নবান্নও ঠিক তেমনি ভাবেই দর্শক মনকে ভরিয়ে তুলল। যে বীজ নীলদর্পণে রোপন করা হয়েছিল, তিরাত্তর বছর পরে সেই গাছে ফল দিয়েছে দেখে দেশের অগণিত মানুষ আনন্দে মেতে উঠলো। আর বড়লোকের ড্রইং রুম নয় আমরা দেখতে চাই খেটে খাওয়া অগণিত জনসাধারণের প্রতিনিধিদের ঐ মঞ্চে। যাদের এতদিন

টাইপ ক্যারেক্টার করে রাখা হত, যারা মঞ্চে শোভিত হত বাবুদের চাকর বাকরের চরিত্রে তারাই মঞ্চে এলো নিজেদের কথা বলার জন্যে। তাদেরও যে কিছু কথা আছে, তাদেরও যে কিছু বলার থাকতে পারে, তাদেরও যে প্রাণ আছে এবং তারাও যে দুঃখ পেলে প্রাণ ভরে কাঁদে, আনন্দে প্রাণ খুলে হাসে এই সত্যটা প্রথমেই 'নবান্ন' নাটকে দেখলুম। শিল্পের ক্ষেত্রে সত্য শিব সুন্দরের নতুন রূপ দেখতে পেলাম। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের শিল্পী নাট্যকাররাও পুরাতনকে আঁকড়ে থাকতে পারল না, আর পারল না বলেই তাঁরাও নতুনভাবে ভাবতে শুরু করলেন। নাটকের রীতিও পাল্টাতে শুরু করল। আর হতাশা নয়—সময়ের তালে তাল দিতে হবে। যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, একথা ঘোষণ করলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী শ্রীরঙ্গম মঞ্চে, তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান'-এর মধ্যে দিয়ে। আবার সাধারণ মানুষ তার ঐতিহ্যকে ফিরে পেলেন পেশাদার রঙ্গমঞ্চে। 'দুঃখীর ইমান' প্রসঙ্গে তাই কিছু বলা প্রয়োজন।

প্রাক্ স্বাধীনতা ও দুঃখীর ইমান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজা সবে মাত্র থামতে শুরু করেছে, ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেখা দিয়েছে সারা বাংলা জুড়ে। বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক দেশগুলো নতুন নতুন কায়দায় শোষণের জাল বিস্তার করতে লাগল। অপর দিকে শ্রমিকশ্রেণী ও সংগ্রামী জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষের মোকাবিলার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রসর হচ্ছিল, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলির সংশোধনবাদী চিন্তাধারা আর কার্যকলাপ সেদিনের সেই অপূর্ব গণ আন্দোলনকে পেছু-টানার ফলে আন্দোলন আর বেশি দূর এগোতে পারল না। সেদিন সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে দেশকে মুক্ত করার পথে অগণিত বিপ্লবী জনসাধারণ যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাতে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকশ্রেণীর দালালরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। দিকে দিকে আন্দোলন আর ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে একটা নতুন উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। এসব দেখে সাম্রাজ্যবাদ আর সামন্ততন্ত্রের দালালরা সুযোগ বুঝে সংগে সংগে তাদের বুলি পাল্টে ফেললো। তারাও ঘোষণা করল, সমাজতন্ত্রই হচ্ছে বাঁচার একমাত্র পথ। তবে ভারতীয় সমাজতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের এই সনাতন সভ্যতার দেশে শ্রেণী-সংঘর্ষের কোন স্থান নেই। আমরা বড়লোক, গরীবলোক কোন এক আধ্যাত্মিক উপায়ে একত্র হয়ে এক নতুন সমাজ

গড়ে তুলব। তার আগে ১৯৩৪ সালে যুক্তপ্রদেশের কয়েকজন প্রধান জমিদারকে গান্ধীজী বলেছিলেন যে, তাদের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করলে তিনি তাদের পক্ষে লড়বেন। "আমি যে রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখি, সেখানে রাজাও থাকবে, ভিখিরীও থাকবে।"

১৯৪৩-৪৬ সালের মধ্যে গ্রামে গ্রামে না খেতে পাওয়া কৃষকরা ধানের গোলা লুঠ করেছেন। ভুখা-মিছিলে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছেন। হাজার হাজার কৃষকরা নতুন করে সংগ্রাম করেছেন।

শিল্পী-সাহিত্যিকরাও কিন্তু চোখ বুজে বসে থাকে নি। তাইতো আমরা দেখতে পাই ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ 'নবান্নে'র মধ্য দিয়ে বাংলা অপেশাদারী নাট্য আন্দোলনে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করল। সেই সময়ে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চেও যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল তা হচ্ছে শিশির ভাদুড়ীর নেতৃত্বে তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমানে'র মাধ্যমে। পঁচাশি বছর আগে এমনি ডিসেম্বর মাসে তবে ১২ই নয় ৭ই, যেদিন কলকাতার জনগণের প্রথম নাটক দেখার অধিকার জন্মাল, 'নীলদর্পণে'র মধ্য দিয়ে পঁচাশি বছর পরে সেই পেশাদারী মঞ্চে আবার সংগ্রামী মানুষেরা এসে জমায়েত হলো। বড়লোকেদের প্রেমের কচ্‌কচানি সরিয়ে দিয়ে খেটে খাওয়া মানুষদের মঞ্চে দেখতে পেলাম। নতুন জীবনের নতুন প্রশ্ন আমাদের সামনে হাজির হলো!

তুলসীদা তাঁর 'দুঃখীর ইমান' বই সম্পর্কে বলেছেন, 'ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম পরিণতি মন্বন্তরের দিনে এই চিরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাতর দল, যাঁরা ধনলোভীর লোভের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছেন, তাঁদের ছবি আঁকতেই এই নাটকের সৃষ্টি। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য এই নাটকটি উৎসর্গ করেছি তাঁদেরই হাতে।' তুলসীদা'র লেখনীর মধ্যে আর একটা প্রশ্ন হাজির করেছেন নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী। একদিন মহলার সময়ে তিনি তুলসীদাকে প্রশ্ন করেন, "নাটকটি আপনি ইনস্‌পায়ার্ড হয়ে লিখেছিলেন? না, সব কিছু চিন্তা করে প্ল্যান করে লিখেছিলেন?"—প্রশ্নটা এসেছিল তাঁর সু-সমালোচক মন থেকে। তুলসীদা উত্তর দিয়েছিলেন, "চিন্তা ও প্ল্যান করেছি, যে অবস্থায় যাদের দেখে, পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাঁদের অনেকেই এই হতভাগ্য দেশ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। যাঁরা আজও বেঁচে আছেন, তাঁরা রাত্রির সাধনা করে প্রভাতকে বরণ করে আনবেন, এই আশায় উন্মুখ হয়ে দিগন্তে চেয়ে আছি, কবে এই মেকী সভ্যতার দম্ভ দূর হবে, কবে শাসন সংস্করণের নামে হৃদয়হীন শোষণের অবসান হবে?" শেষের এই প্রশ্নটা ছিল তুলসীদার হৃদয়গ্রাহী প্রশ্ন, তাইতো তিনি নাটকের পাত্র-পাত্রীদের সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন। থানায় গিয়ে ধর্মদাস

বলছেন, "এই যে দারোগাবাবু, আপনার এই যে চেহারা, জামাকাপড় এতো আমাদেরই রক্ত নিংড়ে তৈরী হয়েছে।" তাই তো তিনি না খেতে পাওয়া মানুষদের দিয়ে বলাতে পেরেছেন, 'ঠাকুর যে আমাদের খাওয়াবে, তাহলে আমরা সারাদিন খাটি অথচ আমরা কেন খেতে পাইনা?'

অবশ্য নাটক যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে অনেকে অনেক প্রশ্ন আনতে পারেন। আসলে তৎকালীন রাজনীতির প্রভাব নাট্যকারকে বাধ্য করেছে ঐ অবস্থাতেই শেষ করতে। তিনি ছিলেন স্রষ্টা। খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি ছিল তাঁর দরদী মন আর বুকভরা ভালোবাসা। তাই তো 'দুঃখীর ইমান' দারিদ্র পিষ্ট কৃষক সমস্যার জীবন্ত নাটক হয়ে উঠেছে, সার্থক শিল্প হয়ে উঠেছে। বাংলার না খেতে পাওয়া মানুষের জীবনকাব্য হয়ে উঠেছে "দুঃখীর ইমান"।

দীনবন্ধু মিত্র যে প্রদীপ জ্বেলেছিলেন, বাংলা রঙ্গ জগতের নাট্যকার শিল্পীরা সেই আলোর পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছেন। এতদিনে তারা দেখতে পেলেন ভোরের আলো। আর সেই ক্ষীণ আলো সামনে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। বাংলার বিপ্লবী জনসাধারণ জানালেন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর ভালবাসা, দিকে দিকে সহরে গ্রামে অনেক নতুন নতুন নাট্য গোষ্ঠীর আবির্ভাব হলো। জনসাধারণের শ্রদ্ধা আর ভালবাসাকে পাথেয় করে শিল্পীরা নতুন নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলেন। তারপর দেখা গেল নতুন যুগের সূচনা। আজ আমরা গর্বিত, আমরা সেই অনুশীলনী যুগেই বাস করছি যে যুগে নতুন কিছু বলা হয়েছে, নতুন কিছু করবার চেষ্টা হয়েছে।

তাই আজ ভাবতে ইচ্ছে করছে আমরা কোথায় আছি বা কোথায় চলেছি। দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে এই বিশাল ল্যাবরেটারীতে রিসার্চ করে আমরা কি পেলাম? এই কঠিন প্রশ্নটা সামনে রেখে আমি শুধু তুলে ধরতে চাইছি আমাদের সম্পদকে। বিচারের ভার মহান জনগণের, যাঁরা নাট্যকে যুগে যুগে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁরাই তাঁদের ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিচার করে ঠিক করবেন, কি রাখবেন আর কোনটাই বা ইতিহাসের ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করবেন। আমার কাজ, য সৃষ্টি হয়েছে তা মহান জনগণের সামনে হাজির করা। কালের বিচারে কে ঠিক আর কে মুছে যাবে আজ আমি বলতে পারি না। তবে এটুকু জানি যে সমুদ্রে আমরা পাড়ি দিয়েছি, একদিন না একদিন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে আমরা নিশ্চয়ই পারব। কালের স্রোতে ভেসে যাবে কিছু খড়কুটো। আর যা সাচ্চা, যা আমাদের প্রথম পদক্ষেপকে অনুসরণ করে আজকের সত্যকে তুলে ধরবে, সেই মহৎ শিল্পকে সক্রে

নিয়েই আমরা আমাদের লক্ষ্যে নিশ্চয়ই পৌছব। গণনাট্য আন্দোলনের শুরুর কথা বলতে গিয়ে সুধীদার একটি লেখা য ১৯৭২ সালে যাত্রিকের স্মারক পুস্তিকায় (স্যুভেনিরে) প্রকাশিত হয়েছিল আমি সেই লেখাটি ছেপে দিলাম।

নব সংস্কৃতি ও গণনাট্য প্রসঙ্গে

সুধী প্রধান

নব সাংস্কৃতিক আন্দোলন যাকে আমার বিবেচনায় সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলা উচিত তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আমার রাজনৈতিক জীবনের জন্য ঘটে। ১৯২০-৩০ দশকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবমন্ত্রের যে প্রভাব ছিল তারই প্রভাবে সামান্য আমি ৬ বছর বিনা বিচারে বন্দী থাকি এবং বন্দী জীবনে পড়াশুনা করে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হই। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে মার্কসবাদী সাংবাদিকতা, শ্রমিক আন্দোলন করতে করতে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত হই। প্রকৃতপক্ষে আমার যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি এই আন্দোলন সংগঠনে কেটেছে। তাই আজ দলীয় রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়লেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সম্পর্ক রয়ে গেছে—কারণ যৌবনের স্মৃতিগুলির প্রতি মমতা থাকাই সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক।

নিজের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই জন্য দিতে হ'ল যে অভিনেতা নাট্যকার বা সুরকার রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কোন কল্পনাই কোন কালে ছিল না। তার প্রথম কারণ স্কুলে পড়ার সময় যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিই তখন জানতাম—মৃত্যু ছাড়া আমার আর পাওয়ার কিছু নেই। দ্বিতীয় কারণ এই যে কলকাতার মনমোহন থিয়েটারের মালিক মনমোহন পাঁড়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়ার সুবাদে থিয়েটারের পিছনের যে দৃশ্য আমার অল্প বয়সে দেখেছি তাতে শিল্পী জীবন আমার কাম্য হতে পারেনি। জেল থেকে ফিরে ডাক্তারী পড়ার সময় আমার এক বন্ধুর চেষ্টায় গ্রামোফোন কোম্পানীতে গিয়ে নজরুল ইসলামের কাছে গান গেয়েছিলাম। তিনি আমাকে Twin record-এ গাইবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনকার দিনের গরাণহাটার নিষিদ্ধ পল্লীর মধ্যে ছিল গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল রুম যেখানে ঐ একদিন গিয়েই অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। তাই গান ও অভিনয়ের প্রাথমিক পরিচয় নিয়েও শিল্পী জীবন-যাপনের অভিলাষ কোনদিন জাগার সুযোগ হয়নি। তাই বলতে আমার লজ্জা বা দ্বিধা নেই যে আমি সংস্কৃতি আন্দোলনে মার্কসবাদী বোধ নিয়েই এসেছি এবং যা কিছু করেছি তার আলোচনা মার্কসবাদের দৃষ্টি ভঙ্গিতেই করা হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি আন্দোলন যেমন ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ফল তেমনি বিংশ শতাব্দীর নব সংস্কৃতি আন্দোলন ও গণনাট্য আন্দোলন রুশ বিপ্লবের প্রভাব জনিত। রুশ বিপ্লবের সাফল্য, ১৯ ১ সালে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সংকট, ফ্যাশিজমের উত্থান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সারা দুনিয়ার বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে নূতন চিন্তার উদয় হয় এবং ম্যাক্সিম গোর্কি, রম্যাঁ রলাঁ, আঁদ্রে জিদ, মালরো প্রভৃতির চেষ্টায় প্যারিসে বিশ্ব লেখক সম্মেলন হয়—যার থেকে নানা শাখা তৈরীর প্রশ্ন আসে। লীগ অব আমেরিকান রাইটার্স, লীগ অব লেফ্‌ট রাইটার্স ইন চায়না, ভারতে প্রগতি-লেখক সঙ্ঘ প্রভৃতি এই ঘটনার পর উল্লেখযোগ্য। স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৩৫ সালের ২০শে আগষ্ট কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশন্যালের ৭ম কংগ্রেসে জর্জি ডিমিট্রভের ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গড়ার নীতি গৃহীত হয়। এই নীতির মধ্যে ছিল ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য গঠনের প্রস্তাব এবং বুদ্ধিজীবি যুব, মহিলা প্রভৃতি সংগঠন গড়া ও উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণফ্রণ্ট গড়ার নির্দেশ। শেষ এই নির্দেশটিকে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে বলছি।

১৯৩৬ সালে ইষ্টারের ছুটিতে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের পাশাপাশি মুনসী প্রেমচন্দ্রের সভাপতিত্বে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। ইতিমধ্যে অর্থাৎ ১৯৩৫ সালেই প্রগতিলেখক সঙ্ঘের একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ এবং শরৎচন্দ্র বাণী পাঠিয়েছিলেন—এবং বাংলার প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। হীরেনবাবু এই প্রচেষ্টার প্রথম দিন থেকেই ছিলেন এবং তাঁর এই বিষয়ে যত রচনা পড়েছি তাতে তখনকার দিনের বাংলার উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্যিক উক্ত অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন এমন কথা জানা যায় না। তবে ১৯'৭ ৩৮ সালে যখন প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় হয়—তখন বাংলাদেশের অনেক লেখক ছিলেন, আমি জানি, কারণ, দর্শক হিসাবে নিয়মিত যোগ দিয়েছি এবং আমার সম্পর্কও হীরেনবাবুদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—তাহ'ল ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ইস্তাহার। আমার বিবেচনায় ভারতের সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি আন্দোলনে এই ইস্তাহারটিরও গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এর পর থেকে ভারতের বিভিন্ন

প্রদেশে যে সংস্কৃতি আন্দোলন গড়ে ওঠে এই ইস্তাহারটি তার দিগ্‌নির্দেশক ছিল। এর প্রধান কারণ হ'ল—শিল্পকলা সাহিত্য বিচারে এতকাল ভারতবর্ষের প্রধান মানদণ্ড ছিল—রসবিচার বা রসনিষ্পত্তির বিচার। কিন্তু এই ঘোষণায় দৃঢ়ভাবে বলা হ'ল "ভারতের নবীন সাহিত্যকে বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা-ক্ষুধা, দারিদ্র, সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতি বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।"

প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ইস্তাহারের এই অংশটির ভাবধারা নিয়ে রাজনৈতিক কর্মীদের চেষ্টায় ভারতের প্রদেশে প্রদেশে সংগঠন গড়ে তোলা হয়—এবং সেই সংগঠনের মারফৎ পুরাতন সাহিত্যাদর্শ প্রভাবিত মহলের সঙ্গে মতাদর্শ গত তর্ক বিতর্ক চলতে থাকে—তেমনি তরুণ লেখক, সাংবাদিক ও ছাত্রদের দ্বারা নূতন ধরণের শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করার জন্য সাহিত্যপত্র, নাটকাভিনয়, গানের দল গঠনের চেষ্টা হয়। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথমদিককার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন বিলাত প্রবাসী-ভারতীয় ছাত্র, তাঁদের সঙ্গে ভারতের কিছু তরুণ লেখকও ছিলেন এবং তাঁরা দেশে ফিরে বড়দের মধ্যে বোধ করি প্রথম যাকে পেয়েছিলেন তিনি প্রেমচন্দ-হিন্দি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ-লেখক। প্রথম সর্ব ভারতীয় সম্মেলনে সরোজিনী নাইডু ও হসরৎ মোহানী উপস্থিত ছিলেন। এবং জওহরলাল নেহেরুও নিজের নাম দিয়ে ইংরাজী মুখপত্রে লিখেওছিলেন। অর্থাৎ কংগ্রেসের বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে তরুণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবিদের সমবেত চেষ্টায় প্রাথমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে।

কিন্তু এই আন্দোলন নিছক রাজনীতির মধ্যে রাখার জন্য নয়—যাদের জন্য এই আন্দোলন, তাদের বনেদী অংশ যদি দূরে থাকে—তাহলে নূতন যারা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আসবে তাদের প্রভাবিত করার জন্য আন্দোলন এবং তাই হতে লাগলো। কথাটা এই কারণে বলতে হ'ল যে বনেদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যারা সৃষ্টিশীল কাজ করেছেন এবং এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন তারা নানা কারণে পরিবর্তিত হতে পারেন না বা চানও না। আর তারুণ্যের ধর্মই হচ্ছে নূতনকে গ্রহণ করার আগ্রহ। তাই দেখা গেল সমাজ

তান্ত্রিক আন্দোলন-পুষ্ট ছাত্র, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত আন্দোলন থেকে নূতন সংস্কৃতি আন্দোলনের লোক বেরিয়ে আসছে। আজকের ভারতের বহু খ্যাতনামা প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক, কবি, গীতিকার, নাট্যকার, সুরকার, মঞ্চ শিল্পী প্রভৃতি এই আন্দোলনের ভাবাদর্শে প্রথম জীবন শুরু করেছিলেন।

মূলতঃ প্রগতিলেখক আন্দোলনের প্রভাবে সৃষ্ট গণনাট্য আন্দোলনের সূচনা প্রথমে বাংলার বাইরে দেখা যায়। ১৯৪০ সালে বাঙ্গালোরে ও বোম্বাই-এ জননাট্য সঙ্ঘের উৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়, বস্তুতঃ বাংলা দেশে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ উঠে গিয়ে যখন ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ হ'ল (১৯৪২ সাল)—তখন দেখা গেল তার একটি শাখার নাম গণনাট্য সঙ্ঘ। ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশনের পাশে পাশে সর্বভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের অধিবেশন হ'ল—এবং বাংলা দেশের প্রজা ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের গণনাট্য শাখাকে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শাখা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হ'ল।

ইতিমধ্যে এদেশে ও বিদেশে অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় ইউরোপের ফ্যাশিজমের অগ্রগতি, ভারতে স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রথমে গান্ধী-সুভাষের বিরোধ, কংগ্রেস সোসালিষ্ট ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে বিরোধ, জহরলালের সঙ্গে ও সুভাষপন্থী কংগ্রেসী ও কমিউনিষ্টদের বিরোধ এই সকল ব্যক্তি ও তাঁদের প্রভাবিত সংগঠনগুলির প্রতি আকৃষ্ট বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেও সংক্রামিত হতে থাকে। সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সংগঠনে চিড় ধরতে শুরু করে এবং সোভিয়েট-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিতে কমিউনিষ্ট প্রভাবিত জাতীয়বাদী সংস্কৃতিবিদরা প্রথমে বিভ্রান্ত, পরে জাতীয়বাদী আন্দোলনের দোমনা আদর্শে আকৃষ্ট হতে থাকেন। দোমনা এই অর্থে বলছি যে, যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলেও গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রধান দল—সর্ব ভারতীয় সংগ্রামের পরিবর্তে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পথ নিলেন এবং গান্ধীজীর প্রভাবের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় সংগ্রামের চেষ্টায় সুভাষবাবু সফল হলেন না। আর কমিউনিষ্টদের সর্বভারতীয় সংগঠন না থাকায় তারা স্থানীয় এবং আংশিক (Local and partial) সংগ্রামের দ্বারা কোন কোন জায়গায় সংগ্রাম করলেও সারা ভারতে তার প্রভাব বিশেষ কিছু হয়নি। এমন কি বাংলাতে সুভাষ বাবুর সঙ্গে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক কংগ্রেস, (প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় কংগ্রেস বাংলা দেশের সুভাষ প্রভাবিত কংগ্রেস কমিটিকে

অবৈধ ঘোষণা করে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে একটি এ্যাডহক কংগ্রেস কমিটি গঠন করে থাকে বামপন্থীমহলকে কি কংগ্রেস বলতো) গঠনে কমিউনিষ্টরা অংশ নিলেও সেই প্রচেষ্টা বেশী সাফল্যলাভ করেনি। সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক সৃষ্টি করলেন কিন্তু তাতেও সংগ্রামকে বিস্তৃত করতে পারেননি। প্রকৃত পক্ষে তিনি গোপনে দেশ ত্যাগ করার আগে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আপোষ চেষ্টা করে বিফল হন এবং তাতেই তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাইরে চলে যান।

এই রকম একটা অবস্থায় অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে যে ধরণের জাতীয় যুক্তফ্রন্ট আদর্শের ভিত্তিতে নূতন সাংস্কৃতিক আন্দোলন সৃষ্টি হচ্ছিল তাতে ভাঙন ধরে এবং মাঝারি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরা বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধকালীন দমনমূলক ব্যবস্থা দেখে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন।

১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪১ সালের ভারতীয় পরিস্থিতিতে বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে যে সকল ক্রিয়াকলাপ হয়েছিল তার আমি প্রত্যক্ষ দর্শকই কেবল নই—আমার কিছু অংশও ছিল। ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত সারা ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশে যে সকল সাহিত্যিক বিশেষভাবে যোগ দেন তাদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতি ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু যে ভাষণ দেন তাতে প্রগতি বলতে তার মতে সাহিত্যে যৌন বিষয়ক বিবরণ প্রকাশের অধিকার বোঝান। সমর সেনের প্রবন্ধের নাম ছিল Indepedence of decadence অর্থাৎ সাহিত্যে অবক্ষয়বাদের স্বপক্ষে....ইত্যাদি। অবশ্য মুলকরাজ আনন্দ প্রধানতঃ পূর্বোক্ত ইস্তাহারের ভাবাদর্শে যে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশের বনেদী সাহিত্য জগতে তার প্রতিফলন বড় একটা দেখা যায় না। Statesman পত্রিকা এই সম্মেলনকে সরাসরি কমিউ-নিষ্টদের কুকীর্তি বলে ঘোষণা করে এবং শনিবারের চিঠির গোষ্ঠী সজনীকান্ত দাসের নেতৃত্বে বলে যে সাহিত্যে গতি আছে কিন্তু প্রগতি বলে কিছু নেই। আর বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেনের উক্তি উল্লেখ করে জানায়, আসলে প্রগতি-সাহিত্য বিকৃত রুচির সাহিত্য অথবা কুলি মজুর ক্ষেপাবার সাহিত্য।

আমার বিবেচনায় এই ধরনের সমালোচনায় যে লাভ হয়েছিল তা এই যে আমার মত যারা তখন সবেমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে, মার্কসবাদী মত ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য নিয়ে তারা চিন্তা করার সুযোগ পেল এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম যাজন নিজ সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গঠন করেছিলেন—তাদের সাহিত্য কীর্তিকে মার্কসবাদের আলোকে বিচার করতে

শুরু করলো। এই ব্যাপারে সে যুগের 'অগ্রণী' পত্রিকা এবং 'অনামী চক্র' নামে একটি আড্ডার কিছু ভূমিকা আছে। খ্যাতনামা সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ওখানে বিখ্যাত সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র প্রভৃতি কাজ করেন। বিনয় ঘোষও ওখানে মাসে মাসে লিখতেন। এবং আমি ছোট ছোট বামপন্থী পত্র পত্রিকায় লিখতাম। অধ্যাপক গোপাল হালদার এবং আমার আরো কয়েকজন নামকরা জেল ফেরত বন্ধু তাঁদের মধ্যে অতীন বসু'র নাম অবশ্য করতে হবে—'নব পর্যায় ভারত' বলে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা চালাচ্ছেন—যার সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে বিনয় ঘোষও ছিলেন। এঁরা তখন সমাজতান্ত্রিক বটে কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির লোক নয়। অতীন বসুর অনুরোধে ঐ কাগজের পূজা সংখ্যায় (১৯৩৯) 'আধুনিক ইংরাজী সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে তৎকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করি যাতে ইউরোপের অবক্ষয়বাদী সাহিত্যকে কারা এদেশে আধুনিক বলে চালাবার চেষ্টা করে ও প্রগতির নাম ধারণ করছে তাদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করি। সজনীবাবু এই রচনা পড়ে তৎকালীন তাঁর সম্পাদিত 'অলকা' কাগজে পূজা সংখ্যায় 'শ্রেষ্ঠ রচনা থেকে উদ্ধৃত' এই শিরোনামা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকারের রচনার পর উক্ত অংশটি মুদ্রিত করেন। আমার সামান্যই সমালোচনা ছিল কিন্তু আমার বন্ধু বিনয় ঘোষ তারপর কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে বুদ্ধদেব বসুর যৌনবাদী, বিষ্ণু দে'র ইলিয়ট নির্ভর এবং সমর সেনের অবক্ষয়বাদী রচনার তীব্র সমালোচনা করেন। 'অগ্রণী' কাগজে অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরী এবং সরোজ দত্ত (বর্তমানে নকশাল নেতা বলে খ্যাত এবং গুজব যে তাকে নাকি মেরে ফেলা হয়েছে, বিনা বিচারে যে কোন মানুষকে মারা অন্যায় এবং সরোজের মত লোককে মারা তো নিশ্চয়) বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেনের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখেন। বিনয়বাবু এছাড়াও ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত একটি কবিতা সংকলন গ্রন্থও তার আলোচনার বিষয়বস্তু করেন। বিনয়বাবুর রচনা তখনকার দিনের তরুণ মার্কসবাদী মহলে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করে এবং বয়স্কদের মধ্যে যারা মার্কসবাদ সম্পর্কে আগ্রহান্বিত তাদের মধ্যে চিন্তার উদ্রেক করে। কমিউনিষ্টরা রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া বলেছে এই যে অভিযোগ চালু আছে তার ভিত্তি বিনয়বাবুর লেখায় শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৯৪৯ সালে ভবানী সেনের লেখায়।



সারা বাংলা নাট্যসম্মেলন উপলক্ষে বিজন ভট্টাচার্যকে কিরণ মৈত্র এবং সতু সেন ও তাপস সেন সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন।



উপরে : সারা বাংলা নাট্যসম্মেলনে বক্তৃ ভারত দেবনারায়ণ গুপ্ত ও জহর রায়।
নীচে : সবিতাব্রত দত্ত কালী সরকারকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন।

যাই হোক—তরুণদের তরফে একটু বাড়াবাড়ি হলেও সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, বিচার পদ্ধতি এবং সংগঠন কাদের নিয়ে করা উচিত এই নিয়ে এই যুগেই আমাদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার আমি আর হীরেনবাবু ছাড়া প্রকাশ্য দলগত সম্পর্ক আর কারো ছিল না এবং পরে গোপাল হালদার ও শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায় ছিলেন যারা প্রধানতঃ তরুণদের পক্ষেই ছিলেন। গোপালবাবু শনিবারের চিঠির অন্যতম উদ্যোক্তা—কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে আমারই মত বন্দী ছিলেন এবং জেলে বসে আমাদের মত সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে জেল থেকে বেরিয়েই গণ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। কাজেই বুদ্ধদেব বাবুদের তুলনায় তিনি সমাজতন্ত্রে অনুপ্রাণিত তরুণদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কেবল সাহিত্যের যোগ্যতা বিচার করে নয় মতাদর্শের টানেও বটে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার সঙ্গে হীরেন বাবুর সম্পর্কও ভাল ছিল এবং তাঁর আন্তরিকতায় আমার কোন সন্দেহ জাগেনি তবু হীরেনবাবুর বুদ্ধদেব, সমর সেন প্রভৃতির প্রতি সহনশীলতা আমারও পছন্দ ছিল না। কিন্তু দলের খাতিরে দুজনেই চেষ্টা করেছি সকলকে একত্র রাখতে অথচ আ'দর্শগত সংগ্রামও চালিয়ে যেতে। পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল এই সাহিত্যিকদের নিয়ে কখনো শ্রীসত্যেন মজুমদারের বাসায়, কখনো শ্রীগোপাল হালদারের বাসায় বা কখনো অধ্যাপক শ্রীসুরেন গোস্বামীর বাসায় আমরা আলোচনা বৈঠক করতাম। আবার অপর দিকে বিনয় ঘোষ প্রভৃতির বাসায় 'অনামী' চক্রের বৈঠক বসত যাতে বয়স্কদের ডাকা হ'ত না। শ্রীসুবোধ ঘোষের ছোটগল্প 'ফসিল' 'অগ্রনী' কাগজে প্রকাশিত হয় এবং আমরা তরুণরা তাই নিয়ে সুবোধবাবুর পক্ষে যথেষ্ট প্রচার চালাই। সুবোধবাবুকে নিয়ে হীরেনবাবু ও তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ হয় এবং তা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে সুবোধবাবু আমাদের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন। সুবোধবাবুর 'তিল তর্পন' উপন্যাসে এই বিরোধের কিছু আভাষ আছে। সুবোধবাবু হীরেনবাবুর বিরোধিতাকে একেবারে কমিউনিষ্ট বিরোধিতার পর্যায়ে নিয়ে যান।

এই ঘটনাগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার সমসাময়িক ঘটনা। প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম দিককার যে ঘটনাগুলি বাংলা দেশে ঘটেছে এবং বাংলা সাহিত্যে আলোচিত হয়েছে সংক্ষেপে এই হল তার বিবরণ।

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নিয়েই আমরা শুরু করি। তবে একটা কথা বলে রাখা ভাল, একটা বিরাট কিছু আলোচনা বা সমালোচনা করা এখুনি সম্ভব নয়। শুধুমাত্র সেই যুগকে ধরে রাখবার চেষ্টা করাই আমার কাজ। আমি সেটুকু সফল ভাবে করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। সেই চেষ্টাই আমি নিষ্ঠার সঙ্গে করবার চেষ্টা করব। যাতে 'নবান্ন'র যুগটা আমাদের চোখের সামনে থাকে তাই যতটা সম্ভব ধরে রাখার চেষ্টা করছি।

নবান্নের প্রথম অভিনয় খুব সম্ভবত ২৪শে অক্টোবর, শ্রীরঙ্গমে। মোট সাত-দিন অভিনয়ের ঘোষণা। এর পরে শ্রীরঙ্গম আর ভাড়া পাওয়া যায় নি—কর্তৃপক্ষ ভাড়া দিতে রাজী হন নি। তখন রেলওয়ে ম্যান্‌সন্ ইন্‌স্টিট্যুট্, শ্রী ও কালিকা থিয়েটারের প্রত্যেক হল্-এ সাত দিন করে 'নবান্ন' অভিনীত হয়।

শ্রীরঙ্গমে তিন দিন অভিনয়েব সময় নবান্নের প্রথম (এবং হয়তো একমাত্র) সুভেনির ছাপা হয়।

নবান্ন প্রযোজনায় যাঁরা বিভিন্ন ভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁদের নাম :

পরিচালনা—শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য

উপদেষ্টা—মনোবঞ্জন ভট্টাচার্য

আবহ সঙ্গীত পরিচালক—গৌর ঘোষ

সহযোগিতা করেছেন—সুজিৎ নাথ, অর্ধেন্দু ঘোষ, বিজয় দে, ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী, শৈলেন দাস, চণ্ডী ঘোষ, কমল মিত্র, সুশীল বিশ্বাস, বরদা গুপ্ত, সুনীল গুপ্ত, শান্তি মিত্র, ননীগোপাল চৌধুরী, লক্ষণ দাশ।

মঞ্চাধ্যক্ষ—চিত্ত ব্যানার্জি

সহযোগী—অরুণ দাশগুপ্ত

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ

(ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের নাট্য-বিভাগ)

৪৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সভাপতি—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

সম্পাদক—চিত্ত ব্যানার্জি

চতুর্থ কভারে 'গত শ্রাবণ মাস থেকে ..হিরণকুমার সান্যাল ও গোপাল হালদার কর্তৃক সম্পাদিত সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র' পরিচয়-এর বিজ্ঞাপন। তখন পরিচয়ের দাম প্রতি সংখ্যা ছ' আনা।

প্রথম পাতায় 'বাংলায় গণনাট্য আন্দোলনের আবির্ভাব' এই শিরোনামায় উদ্যোক্তাদের বক্তব্য :

বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে বিরাট সংকট. রাজনীতির ক্ষেত্র জুড়ে প্রকাণ্ড হতাশা, সামাজিক জীবনে ভাঙনের অতিকায় প্রেতচ্ছায়া—এমনি সময় আত্ম-প্রকাশ করলো গণনাট্য সঙ্ঘ একদল আশাবাদী তরুণ-তরুণীর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। বাংলার নাট্যশালাগুলো দর্শকদের সত্যিকার চাহিদা মেটাতে পাচ্ছে না, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘা খেয়ে খেয়ে অসন্তোষে বিষিয়ে উঠেছে মানুষের মন. এই সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েই গণনাট্য আন্দোলন নতুন সত্তায় সম্পদশালী হয়ে গড়ে উঠতে প্রয়াস পেলো। সে দিক দিয়ে এই আবির্ভাব ঐতিহাসিক।

এই সঙ্ঘের কাজ হল যেমনি একদিকে স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলা তেমনি অন্যদিকে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলা জনগণের ব্যাপ্তির মধ্যে টেনে এনে। এই গণ সংযোগের সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুন ভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। মানুষকে বৈপ্লবিক প্রাণশক্তিতে বলীয়ান করে তুলতে সংস্কৃতির দান অনস্বীকার্য। তাই এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ অবিচলিত দেশপ্রেম নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

// ১৯৪৩ সালের মে মাসে বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' ও বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি' সর্বপ্রথম এই সঙ্ঘের উদ্যোগে মঞ্চস্থ করা হয়। তার কয়েক মাস পরে বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' নাটিকা দুটি অভিনীত হল। একাধিকবার হাজার হাজার বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত ও কৃষক-মজুরদের সামনে এই নাটকগুলি সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রদর্শিত হয়েছে, শুধু কলকাতায় নয়, বাংলার জেলায় জেলায়—এমন কি বাংলার বাইরেও। 'জবানবন্দী' নাটিকার হিন্দী ও গুজরাটি অনুবাদ অন্যান্য প্রদেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার মর্মন্তুদ ছবি দর্শকের মনের সুপ্ত দেশপ্রেম ও মনুষ্যত্বকে যে নাড়া দিয়েছে তার স্বাক্ষর হল তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মধ্যে।

'১৯৪৩ সালের মে মাস—১৯৪৪ সালের অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ। মাঝখান দিয়ে কেটে গিয়েছে সতের মাস। এই সময়ের মধ্যে ক্ষীণপ্রাণ আন্দোলন নতুন নতুন শিল্পী, কর্মী ও দরদীদের আগমনে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। জেলায় জেলায় সংগঠন বেড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। সমস্ত শিল্পী ও

কর্মীর প্রতি এই সঙ্ঘের আবেদন রইলো—তারা দলে দলে যোগদান করে এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী আরও স্বাস্থ্যবান করে তুলুন। সংস্কৃতি জগতে নতুন চিন্তাধারার যে বীজ বোনা হল সুদূর ভবিষ্যতে তা ফলে ফুলে ঐশ্বর্যময়ী হয়ে উঠবে এটা শুধু আত্মবিশ্বাস নয় বাস্তব সত্য।'

নবান্নের চরিত্রলিপি

প্রধান সমাদ্দার (আমিনপুরের বৃদ্ধ চাষী)	বিজন ভট্টাচার্য
কুঞ্জ সমাদ্দার (প্রধানের ভাইপো)	সুধী প্রধান
নিরঞ্জন সমাদ্দার (কুঞ্জর সহোদর)	জলদ চট্টোপাধ্যায়
মাখন (কুঞ্জর ছেলে)	মণিকা ভট্টাচার্য
দয়াল মণ্ডল (প্রতিবেশী)	শম্ভু মিত্র
হারু দত্ত (স্থানীয় জোতদার)	গঙ্গাপদ বসু
কালীধন ধাড়া (চাল ব্যবসায়ী)	চারুপ্রকাশ ঘোষ
রাজীব (কালীধনের সরকার)	সজল রায়চৌধুরী
চন্দর (জনৈক চাষী)	রঞ্জিৎ বসু
যুধিষ্ঠির (আন্দোলনকারী)	নীহার দাসগুপ্ত
ফটোগ্রাফারদ্বয় (সংবাদপত্রের প্রতিনিধি)	অমল ভট্টাচার্য
	রবি মজুমদার
প্রথম ভদ্রলোক (চাল খরিদ্দার)	মনোরঞ্জন বড়াল
বড়কর্তা (বড়কর্তা)	চিত্ত হোড়
বৃদ্ধ ভিখিরী —	গোপাল হালদার
ডোম —	শম্ভু ভট্টাচার্য
দারোগা —	বিমলেন্দু ঘোষ
ডাক্তার —	সমর রায়চৌধুরী
দিগম্বর —	অজিত মিত্র
বরকত (চাষী)	গঙ্গাপদ বসু
ফকির —	সত্যজীবন ভট্টাচার্য
পঞ্চাননী (প্রধানের স্ত্রী)	মণিকুন্তলা সেন
রাধিকা (কুঞ্জের স্ত্রী)	শোভা সেন
বিনোদিনী (নিরঞ্জনের স্ত্রী)	তৃপ্তি ভাদুড়ী

খুকীর মা — কল্যাণী কুমারমঙ্গলম
ভিখিরিনী — বিভা সেন
বাংলার ম্যাডোনা — ললিতা বিশ্বাস

ভদ্রলোক, নির্মলবাবু, টাউট, ভিখিরী, হারু দত্তর শালা, কনষ্টেবল, রোগী, ভৃত্য, চন্দরের মেয়ে, কৃষক, নিরন্নের দল, জনতা ইত্যাদি।

নূতন ধরণের নাটক : 'নবান্নে'র সাহায্য

গত ২৪শে অক্টোবর শ্রীরঙ্গমে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। প্রেক্ষাগৃহটি বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী ও গুণী ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। এতকাল আমরা রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকের পেশাদারী অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু গণনাট্য সঙ্ঘ এক নূতন জিনিসের আমদানি করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই পেশাদার অভিনেতা বা অভিনেত্রী নহেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুগের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন তরুণ তরুণীরা এই অভিনয় করিয়াছেন। আগষ্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পটভূমিকায় এই নাটকের গল্পাংশ রচিত এবং সমাজের যাহারা একেবারে নীচের তলায় বাঙ্গলার সেই দুঃস্থ কৃষকদের জীবন ইহার মধ্যে প্রতিফলিত। ইহা সত্যসত্যই গণজীবনের প্রতিচ্ছবি। যতদূর সম্ভব গণনাট্য সঙ্ঘ 'নবান্ন'কে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীগ্রস্ত বাঙ্গলার যে দৃশ্য ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন। এই ধরণের নাটক কেবল নূতনতর আর্ট হিসাবেই প্রশংসনীয় নহে, দুঃস্থ ও নিপীড়িত মনুষ্যত্বের প্রতি ইহা যে বেদনা জাগ্রত করে তাহার মূল্য অনেক। একদা মুকুন্দ দাস যে ধরণের 'স্বদেশীযাত্রা' প্রবর্তন করিয়া বাঙ্গলা দেশে যাত্রার মধ্য দিয়া স্বদেশী ভাবধারার ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন গণনাট্য সঙ্ঘের 'নবান্ন' কিম্বা ইহার আগে 'জবানবন্দী' অভিনয়েও সেই ধরণের কল্যাণকর প্রচারকার্যের সহায়তা করিতেছে। তবে ইহার আবেদন আরও দূরপ্রসারী—লক্ষ লক্ষ মূক জনসাধারণের শোষিত জীবনের ইহা বেদনার বার্তা। আমরা নাট্যকার ও অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহাদের অভিনয় সত্য-সত্যই উপভোগ্য এবং উচ্চশ্রেণীর হইয়াছিল।

যুগান্তর ২৭শে অক্টোবর ১৯৪৪

গণনাট্য সঙ্ঘের নবান্ন

ভারতীয় গণনাট্য-সঙ্ঘ কর্তৃক অভিনীত 'জবানবন্দী' নাটিকা কিছুকাল পূর্বে কলিকাতায় ও কলিকাতার বাইরে দর্শকগণকে চমৎকৃত করে। গত মঙ্গলবার শ্রীরঙ্গম মঞ্চে এই নাট্য সঙ্ঘের নতুন নাটক নবান্ন-এর উদ্বোধন হইয়াছে। নাটকটি রচনা করিয়াছেন শ্রীবিজন ভট্টাচার্য। অভিনয় দেখিয়া বলিতে কুণ্ঠা নাই যে, গণনাট্য সঙ্ঘের কৃতিত্ব উজ্জ্বলতর হইয়াছে। প্রযোজনা, পরিচালনা ও অভিনয় সমস্ত দিক দিয়াই নবান্ন অভিনব। জবানবন্দী বাংলার নাট্যধারাকে নূতন পথে চালনা করার ইঙ্গিত শুধু দিয়াছিল; নবান্নে সেই ধারা আরও অগ্রসর হইয়াছে। গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা এই যে আমাদের দেশের উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত জনজীবনকে ইহারা নাট্যরূপ দিতেছেন। গত তিন বৎসর ধরিয়া বাংলার কৃষক সাধারণের উপর দিয়া যে ঝড় ঝাপ্টা যাইতেছে নবান্ন তাহারই আলেখ্য। অতি পরিচিত উচ্চ শ্রেণী বা মধ্যবিত্তের পরিবর্তে এই স্তরের জনগণ সম্বন্ধে নাটক লেখা ও অভিনয় করা যে কি দুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বহু চরিত্র সমন্বিত এই সুদীর্ঘ নাটকটি যেরূপ কুশলতার সহিত অভিনীত হইয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বড় হইতে ছোট প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র অভিনয়ে সমান ভালো চলিয়াছে। পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রীদের তুলনায় ইহাদের অভিনয় কোনও অংশে ন্যূন মনে হয় না; বরং নূতন দৃষ্টি ও মনন ক্ষমতার গুণে কোনও কোনও বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। নবান্ন -এ কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকার অভিনয় অপূর্ব হইয়াছে। চাউল ব্যবসায়ী রূপে চারুপ্রকাশ ঘোষ, কুচক্রী জোতদারের ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসু, কৃষক পরিবারের কর্তার ভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্য ও গ্রামের এক বয়োজ্যেষ্ঠ কৃষকরূপে শম্ভু মিত্র অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। প্রথম তিনটি চরিত্রকে অভিনেতারা এক একটা 'টাইপ' হিসাবে একেবারে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। শম্ভু মিত্রের অভিনয়ের স্বাভাবিকতা অনবদ্য। কুঞ্জের ভূমিকায় সুধী প্রধানের অভিনয় প্রশংসনীয়। অভিনয়ের দিক দিয়া বলিতে গেলে প্রশংসা অন্যান্য অনেকেরই প্রাপ্য। পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্র এ নাটকে অপ্রধান। তবু বিভিন্ন গ্রাম্য নারীর ভূমিকায় শোভা সেন, কল্যাণী কুমারমঙ্গলম ও তৃপ্তি ভাদুড়ী চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। বিভা সেনের ক্ষুদ্র পরিসর অভিনয়টুকু এবং শিশু ভূমিকা দুইটিতে মণিকা ভট্টাচার্যের নৈপুণ্যও প্রশংসনীয়।

প্রথম দৃশ্যের সংযোজনা খুব চমকপ্রদ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কতকগুলি দৃশ্য-

সজ্জার এবং সামান্য দু'এক জায়গায় অভিনয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল। পরবর্তী প্রদর্শনে তাহার সংশোধন হইলে অভিনয়ের উৎকর্ষ আরও বৃদ্ধি পাইবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭শে অক্টোবর ১৯৪৪

নাট্যকলা : নবান্ন

সম্প্রতি ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বাংলা শাখা কর্তৃক কলকাতার 'শ্রীরঙ্গম" রঙ্গালয়ে শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্যের "নবান্ন" নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। এ নাটকখানা ও গণনাট্য সঙ্ঘের এ সার্থক অভিনয় বিশেষ আলোচনার যোগ্য। বারান্তরে আমরা তা করব আশা করছি।

নাটক হিসাবে 'নবান্ন'কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না। এতে গল্পের অখণ্ডতার চেয়ে ঘটনার ব্যাপ্তি এবং নাটকীয় আবেগের একাগ্রতার চেয়ে বৈচিত্র্যই বেশি লক্ষ্যণীয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট বিশৃঙ্খলার পর থেকে বাংলার চাষী ও গ্রাম্যজীবনের আওতায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী থেকে শুরু করে যতগুলি মর্মান্তিক বিপ্লব ঘটে গেছে, সেগুলি, আর সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত জীবনের সংবাদ-পত্রীয় মন্বন্তরবিলাস, ব্যবসাদারী চাল ও নারী রপ্তানীর হৃদয়-হীনতা, কিংবা সরকারী চিকিৎসা রিলিফের অক্ষম প্রহসন—এতগুলি ব্যাপার এই একটি নাটকে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা পরম্পরার এই প্রকাণ্ড তালিকা, যাকে গত দু'বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায়, একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্য-রসাশ্রিত করে তোলা যুগান্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। সেই প্রতিভার পরিচয় আজও পাওয়া যায়নি। তবে, বিজনবাবু নতুন ধরণের নাটক রচনার চেষ্টা করে বাঙলা-সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন, এ-কথা স্বীকার করতে হবে।

'নবান্ন' নাটকের গুরুতর ত্রুটিগুলি অভিনয়ের গুণে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে। এই অভিনয়ের বিশেষত্ব এই যে, এর সার্থকতার মূলে রয়েছে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিভা নয়, সমগ্র মণ্ডলীর উৎসাহিত উদ্যম। বাংলাদেশের অনেক লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে আজ যে নতুন প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়, গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে আজ সেই প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে বাংলা রঙ্গমঞ্চে—তাই সাহিত্যের মত সেখানেও অনেক বেশি মূল্যবান বর্তমানের সামান্য সার্থকতার চেয়ে ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার আশাপ্রদ ইঙ্গিত।

গণনাট্য সঙ্ঘ ছাড়াও কলকাতার রঙ্গমঞ্চে কয়েকটি সৌখীন দল নানা নাটক অভিনয় করেছেন। তাঁদের সকলের অভিনয় দেখবার সুযোগ আমাদের ঘটেনি। কিন্তু এই সৌখীন দলগুলির অভিনয় অবজ্ঞেয় নয়। বাংলা দেশে যাঁরা অভিনয় উৎকর্ষ দেখিয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা এরূপ সৌখীন দলেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। পরে অনেক কৃতী অভিনেতা আবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন। অভিনয় কলা ও 'রঙ্গমঞ্চ' দুই-ই এভাবে সৌখীন দলের চেষ্টায় বারে বারে সুপুষ্ট হয়েছে। নতুন শক্তি ও প্রতিভার প্রয়োজন কখনো কমেনি। এখন তো তা আরও বেড়েছে। কারণ, যাঁরা আজ বাংলা রঙ্গমঞ্চের নেতৃস্থানীয় তাঁরা সকলেই প্রায় শ্রেয়ত্বের পারে গিয়ে ঠেকেছেন। এজন্য আমরা সৌখীন দলের নাট্যাভিনয়ে উপস্থিত না থাকতে পারলে দুঃখিতই হই। উল্লেখযোগ্য এই যে, এসব নানা দল এখন প্রায়ই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনীত নাটক অভিনয় করে না, নিজেদের জন্য অনুরূপ নাটক বেছে নেয়। সব সময় তাতে যে ভাল হয় তা নয়। কিন্তু এতে নাটক ও নাট্যকলার, মোটের উপর উন্নতির সুযোগ বেশি দেখা দেয়।

(পরিচয়, কার্ত্তিক ১৩৫১। পরিচয়-এর সংস্কৃতি বিভাগে এই লেখাটি অস্বাক্ষরিতভাবে বেরিয়েছিল। এটির লেখক হিরণকুমার সান্যাল।

নবান্ন

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক অভিনয় করে গণনাট্য সঙ্ঘ এক নতুন চমক লাগিয়েছিলেন। 'নবান্ন' বিজনেরই পরবর্তী নাটক, বিষয়বস্তু প্রায় একই। সুতরাং যাঁরা 'জবানবন্দী' দেখেছেন, তাঁর 'নবান্ন' থেকে নূতনত্বের চমক পাবেন না। কিন্তু পাবেন আর এক ধরণের চমক। বিস্তৃতি ও বলিষ্ঠতায় গণনাট্য সঙ্ঘের দ্রুত উন্নতি সত্যই চমকপ্রদ।

'নবান্ন' পড়ে মনেই হয়না এর মঞ্চোপযোগিতা থাকতে পারে। এ নাটককে রূপ দেবার সাহস ও সফলতা গণনাট্য সঙ্ঘের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, এমন আদর্শবাদী রূপতপস্বী সমবায় কোনও ব্যবসাদারী থিয়েটারের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ছোট বড় বহু সংখ্যক ভূমিকা সমান ভাবে প্রাণ দিয়ে অভিনয়

করতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা জানেন মাত্র জনসেবাই এর লক্ষ্য—নিজেদের প্রতিষ্ঠা নয়।

বাংলার বিগত দুর্যোগ 'নবান্নের' পটভূমিকা। দুর্যোগ এখনো কাটেনি, কিন্তু আমাদের ক্লান্ত মন ভুলে যাবার সুযোগ খুঁজছে। 'নবান্ন' চায়, বাংলা যেন না ভোলে, ক্লান্তি যেন না আসে। তাই বাংলার চোখের সামনে 'নবান্ন' বার বার ধরে দেখাবে বিগত দুর্যোগকে। দুর্যোগের কারণ অনেক, কতক বাইরের, কতক ভেতরের। যার ওপর আমাদের হাত নেই, তার কথা এখন ছেড়ে দিয়ে—আমাদের নিজেদের কতখানি দোষ ছিল, তার হিসেব করতে ভাবনা এনে দেয় 'নবান্ন'। দুর্যোগ আবার আসবে কিনা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এলেও, আমরা যেন গতবারের মতই একেবারে অপ্রস্তুত না থাকি, এই হল 'নবান্নের' আসল বলবার কথা।

'জবানবন্দী', 'নবান্ন' এদের নাটকত্বের বিচার অন্য নাটকের সূত্রে চলবে না। এরা এক নতুন সৃষ্টি। এদের কানুন তৈরী হবে পরে। এদের পাঠক দর্শক সমালোচক কারো মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে হয় ন'। গোড়া থেকেই বাঙালী এদের নিজের বলে চিনে নিয়েছে। সেইখানেই ত' গণনাট্য সঙ্ঘের সাহস ও শক্তি, আর নতুন নিয়ে পরীক্ষা করবার সুযোগ। গণনাট্য সংঘের দায়িত্বও সেইখানে। 'জবানবন্দী'র পরে 'নবান্নে' সে দায়িত্ববোধের পরিচয় দর্শক যথেষ্ট পেয়েছেন।

রসপরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজমনকে সাময়িক সমস্যার প্রতি মনোযোগী করে তোলবার শিক্ষা পরিবেশন গণনাট্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিকটতম উদ্দেশ্য পিপ্‌ল্‌স্‌ রিলিফ কমিটির প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ। বাংলায় অনাহার মৃত্যু চোখের ওপর ঘটছে না বলে বন্ধ হয়নি। এখন আবার মহামারীর পালা। রিলিফের কাজ বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হবার সময় এখনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতে। গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয় এখনও তাই ক্ষুধার্ত পীড়াগ্রস্ত বাংলার আর্তনাদ। সঙ্ঘ দেশবাসীর কাছ থেকে কামনা করেন, ধনীর কাছ থেকে ধন, শিল্পীর কাছ থেকে শিল্পজ্ঞান, সমালোচকের কাছ থেকে উপদেশ। আশার কথা, সাধারণ ভাবে সঙ্ঘ তা পাচ্ছেন।

বিজন ভট্টাচার্য নাট্যকার-অভিমানে নাটক লেখেন নি। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নমুনা নিয়ে এক একটি চরিত্রের মুখে তাদের কথা সহজ ভাবে বলিয়েছেন। প্রতিকুল সমাজব্যবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে কারো মনে

স্বস্তি নেই, যে যার কোলে ঝোল টানবার জন্যে ব্যস্ত। মূলধনীর ধনবৃদ্ধির লোভ, মধ্যবর্তী দালালের আত্মরক্ষায় হিতাহিত জ্ঞানলোপ, নিম্ন মধ্যবিত্তের অসহায় অবস্থার ফলে হৃদয়হীনতা, আর সকলের চাপে নিষ্পেষিত ভূমিজ চাষী। এই অব্যবস্থিত সমাজ বাইরের সামান্য আঘাতে টালমাটাল ত হবেই।

কিন্তু, ধ্বংস যত বড়ই হোক, প্রাণের অঙ্কুর তার ফাটলের মাঝখান দিয়ে আবার গজিয়ে ওঠে। মানুষের আত্মপ্রত্যয় আর দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য সহস্র ঘা খেয়েও মরে যায় না, 'নবান্ন' শেষ পর্যন্ত এই আশার বাণী শুনিয়ে যায়। সমাজের কাঠামোকে শক্ত করতে গেলে জ্ঞাতসারে সমবেত চেষ্টার যে প্রয়োজন, নিরক্ষর চাষীর কাছেও তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, চাষীরা "গাঁতায় খাটতে" লেগে যায়।

অভিনয় শক্তি সকলের সমান থাকে না, শিক্ষার সুযোগও সকলের সমান হয় নি, কাজেই ব্যক্তি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা এঁদের করব না। সকলেই সমান আন্তরিকতার সঙ্গে, উদ্দেশ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যে অভিনয় করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। একটি অনাড়ম্বর অথচ সুষ্টু পৃষ্ঠপটের সম্মুখে অভিনয় এঁদের তাই এত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এতগুলি ছোট বড় ভূমিকাকে এরূপ নিপুণভাবে একসূত্রে গেঁথে তোলা উচ্চশ্রেণীর পরিচালনাশক্তির পরিচয় দেয়, এবং আবহধ্বনি ও সুর তার অঙ্গ।

জনযুদ্ধ ৮ই নবেম্বর, '৪৪

ভারতের মর্মবাণী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

...সংস্কৃতির কোন বিশিষ্ট রূপ ও ধারাকে সংস্কারের মত রূপান্তরহীন করে রাখলে তার কোন ভবিষ্যৎ থাকে না, তার মৃত্যু অনিবার্য। লোক-কলাকে বাঁচাবার ও লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে তাকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্য তখনই সফল হতে পারে, যদি জনগণের জীবনের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা যায়, তাদেরই জীবন্ত আনন্দ-বেদনা আশা-নিরাশা সঙ্কট ও সমস্যা রূপায়িত হয়। গণনাট্য সঙ্ঘ এটা উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা তাই শুধু দেশের সামনে লোক-কলার কতগুলি নমুনা ধরে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাননি—

জাগ্রতির এই সম্পদকে রক্ষা করা চাই। জানালে সেটা অরণ্যে রোদন হ'ত মাত্র। নিজেরাই তাঁরা কাজটা আরম্ভ করেছেন—দেশের সামনে শুধু আদর্শটা নয়, উপায়টাও ধরে দিয়েছেন। সকলের মন তাই নাড়া খেয়েছে, সাড়া মিলেছে।

এই কার্যে ব্রতী তরুণ ও অ্যামেচার অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়ে গড়া এই বাহিনীটির বয়স এক বছরও পূর্ণ হয়নি। এঁদের এই অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্য কোথা থেকে এল? কি এঁদের অভিনয় সাফল্যের মর্মকথা? এর একটিমাত্র জবাব জানি—এঁরা শুধু শিল্প-প্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আর্টের জন্য আর্টের ধোঁয়ায় এঁদের চোখ কটকট করে না, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের দ্বিধাও নেই, দুর্বলতাও নেই। এই প্রসঙ্গে গণ-নাট্যসঙ্ঘের বাংলা শাখার এমনি অল্পবয়সী অ্যামেচার অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রদর্শিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'র কথা স্মরণীয়। এ দুটি নাটক নাট্য-জগতে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কারো তা অজানা নয়। 'নবান্ন' অভিনয়েব জন্য আজ চেষ্টা করেও ষ্টেজ ভাড়া পাওয়া যায় না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তারা ভয় পেয়ে গেলেন। অথচ এঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কোন ইচ্ছাই গণনাট্যসঙ্ঘের নেই—এঁরা ব্যবসায়ী নন, লাভের টাকা শিল্পী বা পরিচালক কারো পকেটে যায় না। বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য বাংলা শাখা বোম্বাই ও পাঞ্জাবে সফর দিয়ে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছিল, 'নবান্ন' অভিনয়ের কয়েক হাজার টাকা বাংলার মহামারীর চিকিৎসায় লেগেছে।

রঙ্গালয়ের পরিচালকদের তবু এত আতঙ্ক কেন? সোজাসুজি প্রতিযোগিতার ভয় এঁদের নেই—এঁদের ভয় দর্শক সাধারণের রুচির পরিবর্তনে। কিন্তু সস্তা নাটক ও সস্তা অভিনয় দিয়ে দর্শককে ভুলাতে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের কর্তারাই বা চাইবেন কেন? আর, তাঁরা যদিই বা মুনাফার লোভে তা চান, রঙ্গমঞ্চের শিল্পীরা কেন তাতে সায় দেবেন? তাঁরা কি নূতনতর সৃষ্টিতে ও সৃষ্টির তাগিদে সাড়া দিতে পারবেন না—এতই জড়তা প্রাপ্ত হয়েছেন?

এই আতঙ্ক ও প্রতিকূলতার প্রতিরোধের মধ্যেও গণ-নাট্যসঙ্ঘের আন্দোলনের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেখতে পাই। দেশ এঁদের আন্দোলনকে সমর্থন ও গ্রহণ করেছে—সারা দেশে এঁদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে।

কথা-শিল্পী হিসাবে ভারতীয় গণ-নাট্যসঙ্ঘের কাছে একটি ব্যক্তিগত ঋণের

কথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা পাওয়ার ঋণ নয়, ওটা শুধু আমাকে নয় সকলকেই ওঁরা পরিবেশন করেছেন, সেজন্য ব্যক্তিগত ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজন ছিল। সাহিত্যিক হিসাবে আমার একটি ভীরুতা সম্বন্ধে এঁরা আমাকে সচেতন করেছেন। পাঠক সাধারণকে একটু বেশীরকম ভোঁতা ও একগুঁয়ে মনে করার প্রতিক্রিয়া অনেক লেখকের রচনাতেই কতকগুলি অনাবশ্যক সার্থকতা হয়ে দেখা দেয় নানা ভাবে, সমস্ত রচনাটিকে প্রভাবান্বিত করে। লেখকের ভীরুতাই এজন্য দায়ী। সঙ্ঘের অভিনব প্রচেষ্টাকে সাধারণ দর্শক যে রকম উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তাতে আমি উপলব্ধি করেছি যে আমরাই. লেখক ও শিল্পীরাই, পাঠক ও দর্শক সাধারণের ঘাড়ে অযথা দোষ চাপাই, তাঁদের কতকগুলি সঙ্কীর্ণতা ও বিরোধীতা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই। আসলে তারা আমাদের সবরকম সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত, আমরাই তাঁদের এই উদারতা স্বীকার করতে ভয় পাই। আমি বিশ্বাস করি নিজের এই দুর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে।

পরিচয় চৈত্র—১৩৫১

মন্বন্তর ও সাহিত্য

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্রে নূতন আবেগ এবং নূতন সুর যোজনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। এই মন্বন্তরকে অবলম্বন করেই সে সুর, সে আবেগ পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ব্যাকরণ অনুযায়ী হয়ত এখনও আদর্শ নাটক হয় নাই, কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে যে প্রচণ্ড অবরুদ্ধ আবেগ সে সত্যই অতুলনীয়। এই সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত অভিনয়-প্রতিভার কথাও প্রসঙ্গক্রমে আমি উল্লেখ করছি। নাটকের ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্যের আগমন বিপুল প্রত্যাশার সঞ্চার করেছে।

এইখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই মন্বন্তরের জন্য দায়-দায়িত্ব ১৩৫০-এর অথবা তার পরবর্তীকালের রচনায় বাংলার সাহিত্যিকেরা চিরাচরিত প্রথায় অন্ধের মত অসহায়ভাবে বেচারা ভগবানের উপর চাপিয়ে দেন নাই। বাংলার সাহিত্য জীবনে এটি নব-ভাবোপলব্ধির একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত।

পরিচয়, চৈত্র—১৩৫১

ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অসাম্যের আদর্শে গড়া বর্তমান সমাজের ক্ষয়, ক্ষতি, শোষণ, বঞ্চনা ও অনৈক্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সংগ্রামী শপথ নিয়ে ১৯৪৬ এর ২২শে শ্রাবণের স্মরণীয় দিনে বহরমপুরে ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের জন্ম হয়। শিল্পের মাধ্যমে বিশ্বজনগণের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং সামগ্রিক সংগ্রাম ও সাধনার পথে সাম্য ও স্থায়াদর্শের ভিত্তিতে গঠিত সমাজ ব্যবস্থায় পৌছানোর প্রাথমিক সর্তের আদর্শে—মানুষের বোধ ও চেতনাকে জাগ্রত করা, অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রতিরোধ করাই হলো ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের জন্মলগ্নের প্রতিজ্ঞা।

পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বাতাবরণ বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও জীবন সচেতন এই শিল্পী গোষ্ঠীর ভূমিকাটিও ক্রমশঃ প্রখর এবং শাণিত হয়ে ওঠে। সংগ্রামের রক্তের আগুন ছুঁয়ে ছেচল্লিশের ক্রান্তিশিল্পী সঙ্ঘ বর্তমানে সংগ্রামী মেহনতি মানুষের প্রত্যেকটি লড়াইয়ের সাথী,—লড়াইয়ের স্বাক্ষর তার প্রতিটি শিল্পকর্মে—পদক্ষেপে।

সময়ের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অতীতের দিকে তাকাতে হয়। তাকালে দেখা যায়, ক্রান্তিশিল্পী সঙ্ঘের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন আপোসহীন লাগাতর সংগ্রামের ইতিহাস। কায়েমী স্বার্থের ভেদনীতির মূল উপড়ে ফেলার আপ্রাণ প্রয়াস তার প্রতিটি শিল্প ভাবনায় এবং প্রযোজনায়।

৪৬-এ অরুণ দাসগুপ্তের গীতি আলেখ্য "বাইশে শ্রাবণ" নিয়ে সঙ্ঘের যাত্রা সুরু। পরবর্তী অধ্যায়ে রক্তাক্ত জাতীয় জাগরণের পটভূমিকায় কবি অতীন মজুমদারের "জাগরণ" নাট্যগীতি নবচেতনার দুয়ার খুলে বাংলার ঘরে ঘরে এক নূতন জীবনবেদ প্রযোজিত করলো। সঙ্ঘের পরবর্তী স্মরণীয় প্রযোজনা অমর শহীদ রাজনারায়ণ-কে নিয়ে রচিত সলিল সেনের নাটক "জাতিস্মর"। তখনকার শ্রীরঙ্গম বর্তমান বিশ্বরূপা মঞ্চে নাটকটি পরিবেশিত হয়।

সময় ও স্থানাভাবের জন্য বর্তমান আলোচনা দীর্ঘায়িত করা গেল না। আমরা শুধু উল্লেখযোগ্য কিছু নাট্য প্রযোজনার এবং সংগ্রামী ভূমিকার কথাই এখানে বলবো।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ৪৭-এর ভাঙা বাংলার ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের সংগ্রামী ভূমিকার কথা। বাস্তহারা ছিন্নমূল রক্তের সোদর ভাইবোনের করুণ আর্তনাদ আর মানবিকতার চরম অপমানের সেই দিনগুলিতে ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ ভুলে

নিলো এক কঠোর কর্তব্যের ভার। পূর্ববাঙলার অবলুপ্ত প্রায় সংস্কৃতির বাণী গণসমক্ষে তুলে ধরলো। এখনো কানে ভাসে মহুয়া পালায় হুমরা বাইদ্যার সকরুণ আর্তি : কইওনা এমুন কথা, না কহিও তুমি।

ছাইড়্যা যাইতে মন চলেনা—সোনার বাড়ি জমি ॥

মহুয়া গীতিনাট্যটি সংকলন করেছিলেন শ্রীসুখময় চক্রবর্ত্তী। মঞ্চস্থ হয় ৪৯-এ কোলকাতার সুভাষ ইনস্টিটিউট-এ। তারপর পশ্চিম বাংলার বহু অঞ্চলে। ডঃ মেঘনাদ সাহার পৃষ্ঠপোষকতায় ইস্ট বেঙ্গল রিলিফ কমিটির প্রযোজনায় মহুয়ার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়েছিলো মনে পড়ে। ১৯৫১ তে স্বাধীনতা পরবর্ত্তী বাংলার সমাজ চিত্র সলিল সেনের "দর্পণ" নাটকটি প্রযোজিত হয়। বাংলা, বিহার ও আসামের বিভিন্ন গ্রাম সহরে এই নাটকের অসামান্য অভিনয় সাফল্য-ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের ভবিষ্যতে-কে চিহ্নিত করে। আর এরই পরে অবিস্মরণীয় সার্থক নাটক সলিল সেনের "নূতন ইহুদি"—নব নাট্য আন্দোলনে এক স্বকীয়তার স্বাক্ষর। এতে অভিনয় করেছিলেন—সর্বশ্রী কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, দেবী নিয়োগী, শ্যাম লাহা, নেপাল নাগ—প্রভৃতি শিল্পীরা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে অনেকগুলি মুখ—যাঁরা তখন ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের সাথে ছিলেন। সর্বশ্রী তুলসী লাহিড়ী, কালী সরকার, রসরাজ চক্রবর্ত্তী, বলীন সোম, সবিতাব্রত দত্ত, অপরেশ লাহিড়ী, বাঁশরী লাহিড়ী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, পীযুষ বসু, বুদ্ধদেব রায়, স্মৃতি বসু, মীরা চক্রবর্ত্তী এবং আরো অনেকের নাম মনে পড়ছে।

১৯৫৩ তে শরৎচন্দ্রের "মহেশ" গল্পের সার্থক নাট্যরূপ দিলেন অতীন মজুমদার। প্রযোজনায় ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ। প্রথম অভিনয় হয় শ্রীরঙ্গমে। ঐ সালে যশস্বী নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর বিখ্যাত নাটক "বাংলার মাটি" পরিবেশিত হলো। আর এই নাটকে নতুন মুখ সবিতাব্রত দত্ত (নটকা) প্রথম অভিনয়েই দর্শক সমাজে চিহ্নিত হলেন। পার্ক সার্কাস ময়দানে ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের সম্মেলনে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

১৯৫৪-তে অমল মজুমদার-এর "সংঘাত" নাটক, ৫৫—৫৬ তে সলিল সেনের "মৌ-চোর" নাটক অভিনীত হলো "সাজঘর" এর পরিচালনায়, ক্রান্তিশিল্পী সঙ্ঘের প্রযোজনায়। তারপর সলিল সেনের আরো দুটি নাটক 'সওয়াল' ও "জীবন যাত্রা" প্রযোজিত হলো।

এরপর রাজনৈতিক সংঘাত ক্রমে তীব্রতর। সীমান্তের প্রশ্নে চীন ভারত বিরোধ, ৬২ পটভূমিকায় নতুন নাটক নতুন চিন্তা নিয়ে এলেন ত্রিদিব লাহিড়ী। তাঁর "একুশে ফেব্রুয়ারী"—জাগ্রত জনমতের সহৃদয় সমর্থনে ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘকে উদ্বোধিত করলো। সহর এবং সহরতলীতে এ নাটকের বেশ কিছু অভিনয় হয়। অভিনয় করেন—বাবু সেন, দীনেশ দত্ত, হাবুল দাস, ত্রিদিব লাহিড়ী এবং আরও কয়েকজন।

৬৩'তে প্রস্তাবিত পশ্চিম বঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিল-এর প্রতিবাদে ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ নীরব দর্শক হয়ে থাকেনি। তার সংঘশক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো সক্রিয় প্রতিরোধে। অগণতান্ত্রিক ঐ বিল ফিরে গেলো প্রবল প্রতিরোধে। প্রবীন নাট্যকার মন্মথ রায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই আন্দোলনে।

ঐ বছর ৯ই আগষ্ট আর্টসেণ্টার হলে প্রথম মঞ্চস্থ হলো সলিল সেনের "ডাউন ট্রেন" আর ত্রিদিব লাহিড়ীর "ক্ষয়" নাটক।

৬৪ তে মঞ্চস্থ হলো, নাট্যকার মন্মথ রায়ের "অমৃত অতীত" মিনার্ভা মঞ্চে। ঐ সালেই নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নয়া শিবির" ঢাকুরিয়া এণ্ডুজ স্কুল মঞ্চে অভিনীত হলো।

স্থায়ী মঞ্চ গঠনের প্রয়াসে দক্ষিণ কোলকাতার অঙ্ক এসোশিয়েশন হ'ল "শিশির মঞ্চ"-এ ধারাবাহিক অনুষ্ঠান চালানো হলো। ঐ মঞ্চে মন্মথ রায়ের "অমৃত অতীত" এবং আধুনিক কবিতার সঙ্গীতরূপ নিয়মিত পরিবেশিত হতো।

'৬৬-র ৯ই মে শিল্পীগোষ্ঠী জাতীয় নাট্যশালার দাবীতে যে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে—এবং যে মিছিলের ওপর সরকারী জুলুম লাঠিবাজী হয়ে নেমে আসে—তার অন্যতম শরিক ছিলো ক্রান্তি শিল্পী সংঘ। ঐ সালে পৌর কর-এর বিরুদ্ধে যে নাট্যসংকট প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হয় ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ ও ছিল তার সাথে।

'৬৬-র জুন মাসে মুক্তাঙ্গন পুড়ে গেলে—নতুন করে গঠন করার প্রয়োজনে ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ সর্বরকম সাহায্যের জন্তে এগিয়ে যায়। জুলাই মাসে "ভিয়েৎনাম সুহৃদ সমিতি" গঠন করে শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের ময়দানে সমাবেশ ঘটায়।

'৬৭-তে ত্রিদিব লাহিড়ীর নাটক "বিচার কর" এবং সাগর চক্রবর্তীর "আউনি বাউনী" প্রযোজিত হয়। ঐ বছর ৯ই মে রবীন্দ্র জন্মোৎসব

উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে।

'৬৮-তে সাঁত্রের অনুসরণে "আরেক শিবিরে ভোর"—নাট্যকার সাগর চক্রবর্তীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়।

'৬৯-এ তারাপদ লাহিড়ীর সাড়া জাগানো নাটক "লাল শপথ" গ্রাম শহরে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ভূমিহীন কৃষকের সংগ্রামকে তীব্রতর হতে সাহায্য করে।

'৭০-এ ত্রিদিব লাহিড়ীব "জোট বাঁধো" অভিনীত হয়। ঐ বৎসর কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত সাগর চক্রবর্তীর পূর্ণাঙ্গ নাটক "এই নবান্নে ধানের ডাকে" বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ঐ বৎসরেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পটভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেতা দেবী নিয়োগীর "সংগ্রাম" প্রযোজিত হয়।

,৭১-এ সাগ রচক্রবর্তীর কৃষক জীবনেব দিন পাঁচালীর নাটক "মাটির ডাক" অভিনীত হয়। ঐ বৎসর শেষেব দিকে স্বাধীন বাংলাব পটভূমিকায় ২৫শে মার্চকে কেন্দ্র করে রচিত সাগর চক্রবর্তীর নাটক 'পদক্ষেপ" সময়োপযোগী সাডা জাগানো নাটক। পরে ঐ নাটকটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন ত্রিদিব লাহিডী। ঐ নাটক মহাজাতি সদন মঞ্চে অভিনীত হয়।

৭২-এ, নির্বাচনের পূর্বাহ্নে ক্রান্তি শিল্পী সংঘ জন সমক্ষে উপস্থিত হলেন হরিপদ দাসের রাজনৈতিক তরজা আর সাগর চক্রবর্তীর "রক্তের ডাক" নাটক নিয়ে।

নাট্য আন্দোলনে ক্রান্তি শিল্পী সংঘ উপলক্ষ্যকে কখনোই আয়োজনে ভারাক্রান্ত করে তোলেনা। জীবন, সমাজ, সময় সচেতনতাই এই সংঘের মূল লক্ষ্যের বস্তুত্ব করে। শ্রেণীহীণ সমাজ রচনায় নিঃশর্ত দায়ভার শিল্পীরা গ্রহণ করেছেন! তাঁদের আগামী নাটক গুলির মধ্যে—

সাগর চক্রবর্তীর—লখিন্দর। আগামী কালের জন্য। শিল্পী।

ত্রিদিব লাহিড়ীর—সূর্য কতো কাছে। চলো মিছিলে। একদিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য, প্রথম থেকে ক্রান্তি শিল্পী সংঘের কণ্ঠ শিল্পীরা জাতির এবং দেশের বিভিন্ন প্রগতিশীল আহ্বানে সাড়া দিতে অভ্যস্ত। তাঁদের পাথেয় দেশের সংগ্রামী মেহনতি মানুষের ভালোবাসা আর বিপ্লবী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শুভেচ্ছা।

গণনাট্য সঙ্ঘ/বাস্তুভিটা

১৯৪৮-৪৭ সাল নাগাদ গণনাট্য-সঙ্ঘের মঞ্চ থেকে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। উদ্বাস্তু জীবনের পটভূমিকায় রচিত এই নাটক। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যখন লোকবিনিময় চলছিল ঠিক সেই সময়ের পটভূমিকায় লেখা "বাস্তুভিটা"।

মহেন্দ্র মাস্টারের দোদুল্যমানতা—আপন ভিটে থেকে চলে যাবে কি যাবে না। স্ত্রী কন্যার ইচ্ছে এখান থেকে চলে যাই। কিন্তু যাবে কোথায়? গরীব লোকের তো যাবার কোথাও ঠাই নেই। তাই মহেন্দ্র মাস্টারের অন্য কোন দেশে যাবার ইচ্ছেও নেই। নানা ধরণের কুচক্রীদের চক্রান্তকে উপেক্ষা করেই শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে এসে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মহেন্দ্র মাস্টার। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে বিভিন্ন চরিত্রে নেমেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, কালী সরকার, স[illegible] রায়, গঙ্গাপদ বসু, প্রীতি রায়, অম বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, অমিতাভ ঘোষ, মণী গুপ্ত, মমতাজ আমেদ, শান্তি মুখার্জী, নকুলেশ্বর চক্রবর্তী, স্বরাজ বসু, অসিত চক্রবর্তী, সুভাষ চক্রবর্তী, অজিত মিত্র সুনীল ঘোষ, সজল রায়চৌধুরী।

১৯৫১ সাল, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের মুখপত্র ধীরেন রায় সম্পাদিত লোকনাট্য পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় গণ-নাট্যআন্দোলনের সাংগঠনিক নীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা থেকে বেশ কিছু অংশ পুনর্মুদ্রণ করা হল।

"বর্তমানে গণনাট্য সংঘের প্রধান সমস্যা—তাহার সাংগঠনিক নীতি ও তার সঠিক রূপ। গত এক বৎসরে লড়াই-এর মধ্য দিয়ে গণনাট্যের আদর্শগত নীতি মোটামুটি স্পষ্ট হ'য়ে এলেও আন্দোলন নীতি অনুযায়ী এগিয়ে যায় নি এবং তার হাতিয়ার নাটক, গান ইত্যাদি সংগ্রামী জনগণের নিজস্ব সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মত জোরালো হ'য়ে ওঠেনি, সেজন্য আদর্শগত নীতি সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা সত্বেও আন্দোলনে এসেছে শৈথিল্য, বৈপ্লবিক নীতি অনুসারে আন্দোলন সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে না। তার প্রধান কারণ—গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পটভূমিকায় গণনাট্য আন্দোলনের কি আদর্শ হবে, তার ভূমিকা কি হবে—তা ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাংগঠনিক নীতি গ্রহণ করে সেইরূপ সংগঠন গড়ে তোলা। তবেই সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্য

দিয়ে আদর্শগত নীতি মূর্ত হ'য়ে ওঠে, আর তা মুখের বুলি না হয়ে, স্বচ্ছ ও জীবন্ত হয়; সম্ভব হয় গণনাট্য আন্দোলনকে সংগ্রামী জনগণের অংশ হিসাবে গড়ে তোলা, সাংস্কৃতিক হাতিয়ার দিয়ে বৈপ্লবিক শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সার্থক শিল্প সৃষ্টি করা। সেজন্য প্রধানতঃ গণনাট্য সংঘের লড়াই হ'ল আদর্শগত নীতির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সংগঠনকে ঢেলে গড়বার। প্রথমেই তাই দরকার সর্বভারতীয় সম্মেলনে গৃহীত গণনাট্য আন্দোলনের আদর্শগত নীতির মূল বক্তব্য কি জানা। এবার সম্মেলনে প্রতিনিধিরা দুইদিনব্যাপী আলোচনার পর মূল আদর্শগত নীতি মুক্তকণ্ঠে ও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন।

....আজ সারা দুনিয়াটা গত মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এবং মহাযুদ্ধ সাঙ্গ হবার পর পরিষ্কার দু'টি শিবিরে ভাগ হ'য়ে গেছে।....

আর বিশদভাবেই দেখান হয়েছে গণতান্ত্রিক, ফ্যাসিষ্ট্‌ ও সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী শিবিরের দুর্বার শক্তি ও অপ্রতিহত অগ্রগতি এবং অন্যদিকে বিপর্যস্ত শঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদী, গণতন্ত্র বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের ফ্যাসিষ্ট্‌ দমন নীতি ও কুৎসিত ষড়যন্ত্র দিয়ে নিজের মুমূর্ষু অবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। শেষোক্ত শিবিরের নেতৃত্ব করছে সমস্ত হাতিয়ার যুগিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

গণনাট্য সংঘ ঘোষণা করেছে গণনাট্য সংঘ গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরের দলভুক্ত—সংগ্রামী মজদুর, কৃষক ও অন্যান্য সংগ্রামী শ্রমজীবি ও বুদ্ধিজীবীদের যে গণতন্ত্রের লড়াই—সাম্যবাদের লড়াই তারই একধর্মী। গণনাট্য সংঘ আন্দোলনকে এই আদর্শে গড়তে শপথ নিয়েছে—

১। সচেতন ও বিরামহীন ভাবে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বিভিন্ন সংগ্রামী জনগণের লড়াই ও দৈনন্দিন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে।

২। সাংস্কৃতিক জগতে যে হামলা চলেছে, আর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ চালানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে গড়ে তুলবে প্রতিরোধ আন্দোলন। পেশাদারী শোষিত শিল্পী, ও সাহিত্যিকদের জীবনে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট এসেছে ও তাদের শিল্পকে যে প্রতিক্রিয়ার স্বার্থে ক্রয় করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শিল্পী ও লেখকদের এনে দাঁড় করাবে গণতান্ত্রিক মোর্চার আন্দোলনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে।

এই আদর্শগত নীতি থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে আসে গণনাট্য আন্দোলনের

সাংগঠনিক নীতির মূল তত্ত্ব। সাংগঠনিক নীতি ও কাঠামো ঠিক করতে হ'লে পরিষ্কার ভাবে বোঝা দরকার গণনাট্য আন্দোলনের দুইটি ভূমিকা।

(ক) প্রধানতঃ গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠবে বিভিন্ন গণআন্দোলনের মধ্যে।

(খ) এ আন্দোলনকে ভিত্তি করে গণনাট্য সংঘের স্বতন্ত্র সংগঠন থাকবে এবং সক্ষম ও সচেতন নেতৃত্ব তৈরী করতে হবে।

ক—গণনাট্য আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন করার জন্য এবং শ্রেণী সংগ্রামে সচেতন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য—আদর্শগত নীতি অনুসারে প্রাথমিক ও মূল কর্তব্য হবে—বিভিন্ন সংগ্রামী, মজদুর, কৃষক, ছাত্র, যুবক ও মধ্যবিত্তের সংগঠিত আন্দোলনের মধ্যে গণনাট্য সংঘ গড়ে তোলা। তাই বর্তমান গণনাট্য সংঘের সমস্ত শক্তি সচেতন ভাবে নিয়োগ করতে হবে এই কাজে। গত এক বৎসরের লড়াই-এর মধ্য দিয়ে যখন এইটি উপলব্ধি করা হয়, তখনো যে প্রচেষ্টা হয়নি তা' নয়, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ না' থাকায় বহু গলদ থেকে যায়। যেমন গণনাট্য সংঘের দপ্তরে বসে ঠিক করা হ'ল, মজুর বস্তিতে বা কারখানায় বা গ্রামে কোন্ কোন্ সভ্য যাবেন। ভাবপ্রবণতার জন্য মাথায় ছিল না' যে বর্তমান দিনে কোন সংগ্রামী গণ-সংগঠনে যাওয়া বা কোথায় যাওয়া জরুরী ও সম্ভব এ ভাবে ঠিক করা যায় না। বিশেষ করে—গণনাট্য আন্দোলন অন্যান্য সংগ্রামী গণ-আন্দোলনের মধ্যে গড়ে তোলার কি নীতি হবে, পারস্পরিক কি সম্বন্ধ হবে, যে গড়তে যাচ্ছে তার সঠিক কর্তব্য কি—সে সম্বন্ধে ধারণা ঘোলাটে থাকায় আদর্শগত নীতি মুখে আওড়ালেও কার্য্যতঃ আমরা কিছুই এগুতে পারিনি। আন্দোলন যে অবস্থায় ছিল, প্রায় সেখানেই রয়ে গেছে তাই প্রাথমিক কর্তব্য এই ভুলগুলিকে শোধবানো।

(১) গণনাট্য যখন জঙ্গী মজুর, কৃষক ও যুব আন্দোলনের মধ্যে গড়া হবে, তা গড়ে উঠবে সংগঠিত গণ আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে; সে আন্দোলনের—দৈনন্দিন লড়াই-এর অংশ হিসাবে—সাংস্কৃতিক হাতিয়ার দিয়ে গণ-আন্দোলনটিকে এগিয়ে নেবে, সংগ্রামী আন্দোলনের চারপাশে যারা রয়েছে তাদের আন্দোলনের কর্মসূচী ও লক্ষ্যে বিশ্বাসী করে তুলে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পরিধি বিস্তার করবে। আর তেমনি গণনাট্য অংশটিও সংগ্রামশীল, শ্রেণী সচেতন ও জোরালো হয়ে উঠবে। প্রত্যেকটি কর্মী হবে সংগ্রামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক সৈনিক, আর হ'তে হবে বৃহত্তর লড়াই-এরও সৈনিক। অন্যদিকে

গণনাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব কেবলমাত্র গণনাট্য কর্মীদের উপরই সীমাবদ্ধ থাকবে না, স্বভাবতঃই তা সংগঠিত গণ-সংগঠনেরও নেতৃত্বে গড়ে উঠবে।

(২) যারা আজকের গণনাট্য সংঘ থেকে গণ সংগঠনে যাচ্ছেন—তারা সাময়িক ভাবে শিক্ষক হিসাবে বা বাইরের একজন লোক হিসাবে গেলে চলবে না। সেই গণ আন্দোলনেরই একজন হয়ে যেতে হবে।

(৩) এই ভিত্তিতে যখন গণনাট্য সংঘের কর্মীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন, একই সঙ্গে প্রয়োজন বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মী ও নেতৃত্বের সঙ্গে গণনাট্য আন্দোলনের নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করে তাঁদের সচেতন করা, তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় গণআন্দোলনের মধ্যে গণনাট্য গড়ে তোলার সিদ্ধান্তগুলি পাকা করা।

এই মূল নীতিকে ভিত্তি করে সাংগঠনিক কর্তব্য ও পদ্ধতি ঠিক করার পূর্বে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে—গণনাট্য সংঘ আজ কি স্তরে আছে। তবেই সঠিক কাঠামো তৈরী করা সম্ভব। আজকের অবস্থা হ'ল কয়েকজন মধ্যবিত্ত শিল্পী ও শিল্পপ্রতিভা গত ৭ বৎসরের আন্দোলনের ভিত্তিতে গণনাট্যে জড় হয়েছে। আন্দোলনের গলদ ও বিভ্রান্তির জন্ত অনেকেই আজ সক্ষম নন নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে আন্দোলন গড়তে, আন্দোলনও বিস্তার করেনি গণআন্দোলনে যাতে সভ্যদের সেখানে সহজেই পাঠানো যায় বা অনেকের সুযোগ সুবিধাও নেই গণআন্দোলনে যাবার। সুতরাং কয়েকজনকে বাদ দিয়ে প্রায় সবাইকে ইচ্ছা থাকা সত্বেও গণনাট্যের বাইরে চলে যেতে হয়। এই অবস্থার কথা মনে রেখে আজকে প্রধানতঃ সক্ষম নেতৃস্থানীয় কর্মীদের যুক্ত হ'তে হবে গণআন্দোলনে। কিন্তু বাকী সভ্যরা মধ্যবিত্ত স্কোয়াডগুলি আঞ্চলিক শাখা হিসাবে চালাতে থাকবেন —কোন নাটক বা গানের বিভাগীয় ভিত্তিতে নয়। তবে যদি এতে এই স্কোয়াডের শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়, ছোট হয় বা বাকী কর্মীরা চালাতে না পারেন, তাকে মেনে নিতেই হবে। সুতরাং গণনাট্য আন্দোলনের রূপ হবে প্রধানতঃ বিভিন্ন গণ আন্দোলনের মধ্যে (মুখ্যতঃ মজুর ও কৃষকদের মধ্যে) আর কিছু মধ্যবিত্তদের আঞ্চলিক শাখা (গণ-আন্দোলনগুলির); বাইরে কিন্তু মধ্যবিত্তদের যে শাখা থাকছে তা গণনাট্য আন্দোলনের প্রধান অংশ হিসাবে থাকছে না। বিভিন্ন গণআন্দোলনের শাখাগুলি হবে প্রধান এবং যত প্রসারিত সংগঠিত হবে— ততই গণনাট্য সংঘের গুণগত পরিবর্তন হবে এবং শ্রেণীসচেতন গণশিল্পীর নেতৃত্ব

এগিয়ে আসবে। ক্রমশঃ আঞ্চলিক শাখাগুলি বিভিন্ন গণ আন্দোলনের গণনাট্য শাখাগুলিতে মিশে যাবে। সাংগঠনিক এই নীতি অবলম্বন করে গণনাট্য সংঘের স্বতন্ত্র কাঠামো কি রকম হবে এবং তার পদ্ধতি কি হবে—আলোচনা করার পূর্বে জানা দরকার—গণনাট্য সংঘের স্বতন্ত্র ফ্রন্ট হিসাবে থাকার প্রয়োজন আছে কি না ? তবেই প্রশ্ন ওঠে থাকবে কি করে মূল নীতিকে লক্ষ্যে রেখে।

বিভিন্ন গণ আন্দোলনের মধ্য থেকে তার অংশ হিসাবে গণনাট্য গড়ে উঠলেও গণনাট্য আন্দোলনের স্বতন্ত্র সংগঠনের প্রয়োজন আছে। কারণ শিল্পগত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য যাঁরা সাংস্কৃতিক হাতিয়ার নিয়ে লড়ছেন—তাঁরা যাতে সংগঠিত ও সচেতন সৈনিক হয়ে লড়তে পারেন—সাংস্কৃতিক হাতিয়ার সঠিক ও তীক্ষ্ণ হতে পারে—এবং শত্রুপক্ষের হাতিয়ারকে সক্রিয়ভাবে বানচাল করা যেতে পারে তার জন্য প্রয়োজন আলাদা সংগঠন। আর প্রয়োজন গণ-আন্দোলনকে ভিত্তি করে গণনাট্য আন্দোলনকে গড়ে তোলার ও পরিচালিত করার জন্য সক্ষম ও সচেতন নেতৃত্বের জন্য।

বিপ্লবী শক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নূতন সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কর্মীর সম্ভাবনা সৃষ্টি করে সত্য, কিন্তু আপনাথেকে সেই শক্তি সংহত ভাবে বিপ্লবের অংশ ও হাতিয়ার হিসাবে পরিণত হ'তে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্য থেকে শ্রেণী সংগ্রামে সচেতন সংহত ফ্রন্ট গড়ে তোলা ও নেতৃত্ব গড়ে তোলা, যাতে প্রতিটি দিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গণনাট্য আন্দোলন নিজস্ব কর্মসূচীও লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে"।

[ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় প্রচার পত্র থেকে গৃহীত]

ঐ সংখ্যায় এলাহাবাদ সম্মেলনের রিপোর্টটাও ছেপে দেওয়া হল। সেই সঙ্গে কিছু অভিনন্দনও ছাপা হল।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের
সর্বভারতীয় সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন

এবারকার এলাহাবাদ সম্মেলন গণ-নাট্য আন্দোলনের জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা, কারণ এ সম্মেলন বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গণ-নাট্য আন্দোলনের আদর্শ এবং এই আদর্শকে সঠিক রূপায়ণের উপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো স্থির করেছে। এতদিনকার আপোষের মোহজাল ভেঙে দিয়ে সংগ্রামের দৃপ্ত ঘোষণার মধ্যেই এলাহাবাদ সম্মেলন গণ-নাট্যআন্দোলনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ ফেব্রুয়ারী—এই দীর্ঘ ছয় দিন ব্যাপী অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় দুই শত প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত হয়েছিলেন। একমাত্র দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধিরা মাদ্রাজ সরকারের চরম দমন নীতির ফলে এসে উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁদের প্রেরিত বাণীর মধ্য দিয়ে সংগ্রামে সহযোগিতার আহ্বান তাঁরা জানিয়েছেন।

প্রথম দিন সম্মেলন শুরু হ'ল খোলা অধিবেশনে। সভাপতিমণ্ডলীর নির্বাচন থেকেই বোঝা গেল প্রতিনিধিরা এসেছেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে—গণ-নাট্য আন্দোলনকে বিপ্লবী জনগণের সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার নির্দেশ দিতে। তাই নির্বাচিত হলেন মহারাষ্ট্রের মজুর কবি ও নাট্যকার আন্নাভাও শাঠে, নির্বাচিত হলেন কৃষক কবি ও গীতকার দশরথলাল, যাঁর দুর্বার কণ্ঠকে নীরব করে দেবার জন্য বিহার সরকার দলশুদ্ধ তাঁকে জেলে পুরেছে, আর নির্বাচিত হলেন এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, খ্যাতনামা সমালোচক পি, সি, গুপ্ত।

অধিবেশনের শুরুতেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন এবং তাঁদের নামে শপথ গ্রহণ করা হ'ল। সাধারণ সম্পাদক এই সম্মেলনের পটভূমিকা এবং দায়িত্বের কথা তুলে বলেন যে, আজ শুধু মৌখিক প্রস্তাব গ্রহণেই কর্তব্য শেষ হবে না, যে প্রতিজ্ঞা নেওয়া হ'ল তাকে সফল পরিণত করাই হবে শহীদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

পাঁচ তারিখ প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রাদেশিক বিবরণী পেশ করা হয় এবং তার ভিত্তিতে আলোচনা হয়। প্রত্যেকটি বিবরণী থেকেই সভ্যদের সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের ভুল ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতনতায়। গত এক বছর

গণনাট্য সংঘকে যে মৃত্যুপণ লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে (সংগঠনের ভেতরে ও বাইরে), তার অভিজ্ঞতার আলোতেই অতীতের ভ্রান্তি, বর্ত্তমানের দুর্বলতা ও ভবিষ্যত পথের নিশানা পরিষ্কার হয়ে গেছে সভ্যদের কাছে। সমস্ত বিবরণী থেকেই এই কথাগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের আমেদাবাদ সম্মেলনের আপোষনীতির ব্যর্থতার ফলেই প্রত্যেক প্রদেশে হতাশা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ডিক্‌সন লেন হত্যাকাণ্ডের আঘাতে নূতন কর্মপন্থা নির্ধারণের চেতনা আসে। দেখা যায়, যে দমন নীতির শুরু হ'ল কলকাতায় ডিক্‌সন লেনে তারই জের চলল বিভিন্ন প্রদেশে নানা ভাবে। গণনাট্য সংঘ এই ভাঙনের মুখে নবগঠিত হবার উপায় চিন্তা করতে লাগল। বাস্তব অবস্থার চাপে আপোষের জাল গেল ছিঁড়ে—নূতন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শুরু হ'ল প্রদেশব্যাপী আঞ্চলিক সম্মেলন। আদর্শ নীতির দিক থেকে সংগ্রামী কর্ম্মপন্থা ঘোষণা করলেও এই সম্মেলন সাংগঠনিক দিকে নামমাত্র সংস্কার ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি।

তাই এলাহাবাদ সম্মেলনের দায়িত্ব হল, যেমন এক দিকে সর্বসম্মত নীতি ঘোষণা করা তেমনি অন্য দিকে এই নীতি অনুযায়ী সাংগঠনিক কাঠামো স্থির করা।

গণনাট্য সংঘের বর্ত্তমান অগ্নিপরীক্ষার সামনে পড়ে আরও অনেক পুরানো সভ্য হয়তো ছেড়ে চলে যাবেন। গণনাট্য সংঘ যখন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনগণের মধ্যে স্থান করে নিতে বদ্ধপরিকর, তখন এইসব মুখোশধারী দরদীদের সরে পড়াই স্বাভাবিক। এইসব রসশোষক পরগাছা নির্মূল হ'লেই গণ-নাট্য সংঘের মঙ্গল।

সন্ধ্যায় খোলা অধিবেশনে ভারতীয় গণ-নাট্য সংঘের অফিস সম্পাদক ও দিল্লী শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ মুখার্জীর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান, লেখক ও শিল্পীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বাণী পড় হয়। প্রফেসর গুপ্ত সভাপতির ভাষণে বলেন—"ভারতে জনগণের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করার সমস্যা আজ গণতান্ত্রিক সমাজে নির্মাণ করার করণীয় কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। সংস্কৃতি আজ গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে আলাদা হয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। গণনাট্য যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আজ এগিয়ে যেতে দৃঢ় মনস্থ, তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, গণনাট্য আন্দোলনের সম্মুখে উজ্জ্বল ও মহান ভবিষ্যৎ।"

'খোলা অধিবেশনের পর প্রায় দেড় হাজার দর্শকের সামনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আসাম, বাংলা ও মহারাষ্ট্র শাখার বিভিন্ন গণ-সঙ্গীত ও দিল্লী শাখার কয়েকটি পাঞ্জাবীগানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার পরবর্তী অবস্থা ফুটে ওঠে। বোম্বে শাখ, 'যাদু কী কুরশী' নামক নাটকে বোম্বে সরকারের নিরাপত্তা আইনকে নির্মম ব্যঙ্গ করে।

'ছ'ই ফেব্রুয়ারীর প্রতিনিধি সম্মেলনে তিনটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

প্রথমটির মর্মকথা হ'ল যে, কৃষক মজুর ও নিম্নমধ্যবিত্তের নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে পা মিলিয়ে, সরকারের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করতে গণনাট্য সংঘ শপথ গ্রহণ করছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সমস্ত সরকারী আক্রমণের বিরুদ্ধে অদম্য শক্তিতে সংগ্রাম করার প্রতিজ্ঞা নেয়।

তৃতীয় প্রস্তাবে বিশ্বের সর্বত্র প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীদের, প্রতিক্রিয়াশীল-দের দমনের বিরুদ্ধে লড়াইকে পূর্ণ সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা জ্ঞাপন করে।

সন্ধ্যায় খোলা অধিবেশনে এই প্রস্তাবগুলির উপর বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা করেন।

রাত্রের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, রেল শ্রমিকদের উপর লিখিত দিল্লী শাখার নাটক 'কাটেওয়ালা' (সিগন্যাল ম্যান), মহারাষ্ট্রের 'কোলার' ও 'ভাল্লারী' নৃত্য ও অন্যান্য প্রদেশের গণসঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়।

সাত তারিখের প্রতিনিধি অধিবেশনে, সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের আর্থিক অবস্থার বিবরণ পেশ করেন। আগামী বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটের ৪০০০ টাকার জন্য প্রত্যেক প্রদেশ অংশ ভাগ করে নেন এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য স্থির হয় যে, নূতন শাখার এফিলিয়েশন ফি ২০ টাকা এবং সংযুক্ত (এফিলিয়েটেড) শাখার সভ্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত চাঁদার শতকরা ২৫ ভাগ কেন্দ্রীয় অফিসে জমা দিতে হবে। 'ধরতী কে লাল' সংক্রান্ত রিপোর্ট অনতিবিলম্বে আলোচনার জন্য প্রত্যেক শাখায় পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ঐদিন প্রতিনিধিদের মধ্যাহ্ন অধিবেশনে খসরা কমিটির তরফ থেকে এক আদর্শ নীতির (মেনিফেষ্টো) খসরা পেশ করা হয়। প্রতিনিধি ও দর্শকদের সচেতন ও বলিষ্ঠ আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে আসে যে, গণনাট্য সংঘ কোন

বিশেষ দলের সম্পত্তি নয় বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানও নয়—এই সংঘ সংগ্রামী জনগণের পক্ষে তাদের অংশ হিসাবে তাদের মধ্য থেকে যেমন একদিকে গণ-নাট্য আন্দোলন গড়ে তুলবে, তেমনি অন্য দিকে লড়াই চালাবে সংস্কৃতির উপর, শিল্পী সাহিত্যিকদের উপর যে হাম্‌লা চলেছে তার বিরুদ্ধে। আর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাইরের শিল্পী ও লেখকদের ঐক্যবদ্ধ করবে—সংগ্রামী জনগণের সঙ্গে এনে দাঁড় করাবে। এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য থেকে গড়ে উঠবে সাংস্কৃতিক সৈন্যবাহিনী, জন্ম নেবে শ্রেণী সচেতন শিল্পী ও সৃষ্টি হবে গণতান্ত্রিক শিল্প।—প্রস্তাবিত আদর্শ নীতিটি মূলত গৃহীত হলেও কয়েকটি সর্বসম্মত বিষয় যোগ করে, সুস্পষ্ট ও সরল ভাষায় পুনরায় লিখতে খসরা কমিটির উপর ভার দেওয়া হয়।

সন্ধ্যায় খোলা অধিবেশনে অখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও প্রগতিশীল লেখক সংঘের প্রতিনিধিরা সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান। অখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের তরফ থেকে প্রেরিত সুদীর্ঘ অভিনন্দন বাণী পাঠ করা হয়। এই সর্বপ্রথম বিভিন্ন সংগ্রামী সংগঠন থেকে গণনাট্য সংঘ অভিনন্দন পেল—সূচনা হ'ল বৃহত্তর সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গে মিলিত পদক্ষেপের আহ্বান—গণনাট্যের নূতন আদর্শনীতির প্রতিষ্ঠার প্রথম বনিয়াদ।

এই রাত্রের অনুষ্ঠানে বাংলা শাখার কৃষকের জমির লড়াইয়ের উপর নাটক 'নয়ানপুর', আসাম শাখার ব্যঙ্গগীতি 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গল কাব্য,' এলাহাবাদ শাখার প্রেস মজুরের জীবন ও লড়াইয়ের উপর মূক অভিনয় 'আমরা আলো চাই' দেখান হয়। 'মাউন্ট ব্যাটেন মঙ্গলকাব্য' শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে হাততালির ঘন ঘন আওয়াজ আসতে লাগল। হারাধনের একটি ছেলের মত জনৈক কংগ্রেস ভক্ত শুধু উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও যখন তিনি থামলেন না তখন দর্শকদের সম্মতিক্রমেই তাঁকে স্বেচ্ছাসেবকরা জোর করে মণ্ডপ থেকে বের করে দিলে। তারপর গান গাইতে উঠলেন অমর শেখ তাঁর বিপ্লবী কণ্ঠে, সারা রঙ্গালয় মুখরিত হয়ে উঠল 'গণনাট্য সংঘ জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে।

৮ই ফেব্রুয়ারী ভোর থেকে শহরের অবস্থা থমথমে হয়ে উঠল। কাগজে কাগজে মিথ্যা কুৎসায় ভরে গেল। কংগ্রেস ও পুলিশ মহলে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। এদিকে গণনাট্য সংঘের প্রতিনিধিরাও হয়ে উঠলেন আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্পষ্ট

হয়ে উঠল গণনাট্যের লড়াই কাদের বিপক্ষে আর কাদের পক্ষে। প্রতিনিধিদের অধিবেশনে সে দিনই সবচেয়ে জরুরী প্রস্তাব আলোচিত হ'ল—সাংগঠনিক প্রস্তাব। আদর্শগত নীতি যতই সংগ্রামশীল হক না কেন এই আদর্শে শিক্ষা লাভ করতে হলে, আন্দোলনকে এই আদর্শে গড়তে হলে চাই এই আদর্শ অনুযায়ী সংগঠন। এই সমালোচনার ভিত্তিতে সাধারণ সম্পাদক সাংগঠনিক খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে তিনটি বিষয় লক্ষ্যণীয় :—

প্রথমতঃ গণনাট্য সংঘ বিভিন্ন সংগ্রামী শ্রেণীর মধ্যে গড়ে তুলতে হবে তাদের আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে।

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু গণনাট্য কেবলমাত্র একটি অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাবার সংকল্প গ্রহণ করল, সুতরাং মনে রাখতে হবে এটা সংঘের পরিবর্তনের অবস্থা।

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন আন্দোলনের অংশ হিসাবে গণনাট্য গড়ে উঠলেও গণনাট্যের স্বাধীন সংগঠন ও তার নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে এর মধ্য থেকেই।

এই প্রস্তাবটি বিস্তৃত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তারপর হল কার্য্যকরী সমিতির নির্বাচন :—

সভাপতি—আন্না ভাও শাঠে ; সহ সভাপতি—শ্যামলাল (দিল্লী), নরহরি কবিরাজ (বাংলা) ; সাধারণ সম্পাদক—নিরঞ্জন সেন ; যুগ্ম সম্পাদক—গভংকর (বোম্বে) নেমী চাঁদ জৈন (যুক্তপ্রদেশ) ; কোষাধ্যক্ষ—আর রামারাও (বোম্বে)।

সন্ধ্যায় শেষ খোলা অধিবেশনে সম্বর্দ্ধনা কমিটির সম্পাদক এলাহাবাদের জনসাধারণকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। সভাপতি আন্না ভাও শাঠে সম্মেলনের মূল সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে বক্তৃতা করেন ও সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সহযোগীর অভিনন্দন

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনকে আমরা আন্তরিক সৌভ্রাত্রমূলক অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণকারী এক সংস্কৃতিমূলক পত্রিকার পক্ষ থেকে জনগণের স্বার্থে নিয়োজিত আপনাদের প্রচেষ্টাতে আমরা প্রশংসা ও সশ্রদ্ধ মূল্য আরোপ করি। আমরা জানি প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জনগণের স্বাধিকার ঘোষণার সংগ্রামে কি মহান বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ভূমিকা আপনাদের।

মেহনতী মানুষের লড়াইকে জোরদার করতে আপনাদের কর্মপ্রচেষ্টা শুধু ভারতবর্ষের নয়, শান্তি ও স্বাধীনতাকামী সমগ্র দুনিয়ার জনগণের কাছে এক ঐতিহাসিক অবদান।

প্রগতিমূলক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে আমরা একসাথে প্রতিরোধ গড়ছি।

আমরা আপনাদের সম্মেলনের সর্বতোভাবে সাফল্য কামনা করি।

আর আপনাদের ভাবধারা আমাদের প্রেরণা দিতে ও দিকনির্দেশ করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

তাই সম্মেলন কর্মসূচী এবং গণনাট্য সংঘের কার্য বিবরণী প্রেরণ করতে আমরা ঐকান্তিক অনুরোধ জানাচ্ছি। —স্যামুয়েল সিলেন

সম্পাদক, "ম্যাসেস্ এণ্ড মেন্ স্ট্রীম"

নিউইয়র্ক।

বুলগেরিয়ার শিল্পী সংঘ সম্মেলনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং ভারতীয় জাতির মুক্তি ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের সাফল্য কামনা করছে।

—বুলগেরিয়ার শিল্পীসঙ্ঘ

ভারতে নূতন এক গণসংস্কৃতির জন্মদান করা, তার গৌরবময় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন এবং ভারতের জনগণের মহৎ সম্ভাবনা মুক্তি পেতে পারে এমন এক নূতন শিল্প-রীতি সৃষ্টি করার মহান দায়িত্ব বহন করছে আপনাদের সংঘ, তাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। —জ্যাক্ লিণ্ডসে

আপনাদের বাৎসরিক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ভারতবর্ষে গণসংস্কৃতি গড়তে আপনাদের যে বলিষ্ঠ প্রয়াস, সেটা শুধু ভারতীয় জনগণের নয়, সারা দুনিয়ায় যারা গণনাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাদের কাছেও মূল্যবান। —পেগী ম্যাকুলভার

কার্যকরী সম্পাদক "নিউ থিয়েটার" গ্রেট ব্রিটেন।

ভারতের তথা পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ কবলিত জাতির জীবন মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি।

—কারগ্লাভেভ্

পরিচালক, "সোফিয়া জাতীয় নাট্যশালা," বুলগেরিয়া।

* আরও যে সব সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে অভিনন্দন বাণী পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে—'ব্রিটিশ ইকুইটি কাউন্সিল'—'অখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন'—'অখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'—ও 'প্রগতিশীল লেখক সংঘের' নাম উল্লেখযোগ্য।

গণনাট্য সঙ্ঘ / নয়নপুর

১৯৪৮ সাল। সদ্য স্বাধীনতা পাবার পর পুলিশের গুলিতে যারা সর্বপ্রথম প্রাণ দিল সেই ডোঙ্গাজোড়াগ্রামের কৃষক সংগ্রামীদের নিয়ে লেখা অনিল ঘোষের নয়নপুর। অবশ্য সেই সময়ে তেলেঙ্গনা, বরাকলাপুর ও নাচলের কৃষকরাও গ্রামের অত্যাচারী সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ে নেমে পড়েছিলেন। আর পুলিশও গ্রামের সামন্তপ্রভুদের রক্ষা করবার জন্যে অসংখ্য কৃষককে হত্যা করেছিল, এরই প্রতিচ্ছবি বলা যায় নয়নপুর।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ চব্বিশপরগণা শাখা এই নাটক ডোঙ্গাজোড়া গ্রামেই প্রথম অভিনয় করে। সেদিন পুলিশ কিন্তু সেই গ্রামে নাটক বন্ধ করতেও এসেছিল, বন্ধ করতে পারেনি। কারণ পুলিশ যখন এসে পড়ল তখন অভিনয় প্রায় শেষ হতে চলেছে। সেদিন নয়নপুরে যারা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে ছিলেন, অনিল ঘোষ, বিনয় রায়, দিপালী, রাধাকান্ত দত্ত, অমিয় ভট্টাচার্য। নায়েবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সুনীল ভট্টাচার্য। পরের দিন নায়েব যখন

রাস্তায় বেরিয়েছে গ্রামের লোকজন তাঁকে ঘিরে ফেলেছে মারবে বলে, অপরাধ সে অত্যাচারী নায়েবের চরিত্রে অভিনয় করেছিল। এত সুন্দর যে কৃষকরা ধরে নিয়েছিল ঐ নায়েবই অত্যাচারী। পরবর্তীকালে এই নাটক ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সেন্ট্রাল স্কোয়াড নিয়মিত অভিনয় করেন। একটি শোয়ের কথা বলি তাহলে। ঘটনাটি ঘটেছিল বড়াকমলাপুরে, মঞ্চ তৈরী হয়েছিল একটি বাড়ীর দাওয়াতে-মাটি ফেলে মঞ্চ বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তাতেই গাছ কেটে এনে একটা মঞ্চের আকারে দাঁড় করিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

আলো, হ্যাজাক লাইট, দর্শক, খেটে খাওয়া সংগ্রামী কৃষক, দু-একশো নয় তা চার পাঁচ হাজার হবে, প্রতিটি দর্শকের হাতে ছিল গাছকাটা মোটা মোটা লাঠি। অভিনয় আরম্ভ হল জমিদারের পোষা গুণ্ডারা তৈরী হয়ে এলো সব ভেঙ্গে দেবে বলে। দর্শক ও উঠে পাল্টা আরম্ভ করল, ফলে গুণ্ডার দল পালাতে পথ পেল না, নাটক একটু থেমে গিয়েছিল বটে আবার আরম্ভ হল। সেদিন যারা আসতে পারেনি পরের দিন আবার অভিনয় করার জন্যে অনুরোধ জানাল, আরো প্রচুর দর্শকের সমাগম হল। কৃষকের বেঁচে থাকার সংগ্রামের এই নাটক যে কত রাত্রি অভিনয় হয়েছে তার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। কিছু বৈচিত্র্যময় ঘটনা শুধু তুলে ধরলুম মাত্র। সেন্ট্রাল স্কোয়াডে যারা অভিনয় করতেন— কালী বন্দোপাধ্যায়, সজল রায়চৌধুরী, সাধনা রায়চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী, মমতাজ আমেদ, ঘণ্টুদা, সুনীল দত্ত। আর যারা অভিনয় করেছিলেন তৎকালীন শিল্পীদের নাম আমার মনে না থাকার দরুণ দিতে পারলুম না। মঞ্চ সজ্জায় ছিল মমতাজ আমেদ ও সুনীল দত্ত।

১৯৫৯ সালের গণনাট্য সংঘ তার আদর্শ-নিষ্ঠাকে বোঝাতে হলে একটু পেছনে যেতে হবে। ৪৮ সালে এই সংঘের কার্য্যালয় ডিক্সন লেনে হত্যালীলা চালানো হয়েছিল। গণনাট্য সংঘের দুজন কর্মীকে গুলি করে মারা হল। চারুপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতে যে হত্যালীলায় সুশীল, ভবমাধবের মৃত্যু বরণ করতে হল, সেই বীভৎস দৃশ্যকে কোন দিন ও ভোলা যায় না। ভোলা যাবে না।

১৯৪৯ সালে লোকনাট্য পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় একটি শহীদ দিবসের বিবরণ বেরিয়েছিল আমি তা ছেপে দিলুম।

শহীদ-দিবস

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী সারা ভারতে গণ-নাট্য সঙ্ঘের প্রতিটি শাখা ডিক্সন লেন হত্যাকাণ্ডে নিহত শিল্পীদের স্মরণে শহীদ দিবস পালন করে। এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য গতানুগতিক ধারায় শোকসভা করার নয়, এর বৈশিষ্ট্য ছিল ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কার্য্যকারণ অনুসন্ধান করে ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা এবং ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতির দিক নির্ণয়।

আলোচনার ভেতর দিয়ে প্রত্যেকটি সঙ্ঘের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ডিক্সন লেনের ঘটনা কেবলমাত্র গণনাট্য সঙ্ঘের উপর আক্রমণ নয়—এ আক্রমণ পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির উপর। সরকারের নিরপেক্ষতার যে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, অতর্কিত আক্রমণে সে ভ্রান্তি গেল টুটে। এই ঘটনায়ই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ভারতীয় সরকার শুধু ভারতীয় গণতান্ত্রিক শক্তিরই বিরোধী নয়, পৃথিবীর যে কোন প্রগতিশীল শক্তিরই সে শত্রু। গণনাট্য সঙ্ঘের আপোষ নীতির এখানেই পড়ল ছেদ—নূতন কর্ম্মসূচীর তাগিদ অনুভব করল সবাই।

শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে কর্ত্তব্যের পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে তাকে অবিচলিত নিষ্ঠায় পালন করার মধ্যেই তাঁদের স্মৃতি রক্ষা হবে। কিন্তু গণনাট্য সঙ্ঘের একার পক্ষে এই সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভবপর নয়। সম্ভব করার একমাত্র পথ, গণনাট্য আন্দোলনকে দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মূল উৎপাটন করার পথে এগিয়ে যাওয়া।"

গণনাট্য সঙ্ঘ/জনান্তিক সংকেত

নয়নপুরের পর ১৯৫৯ সাল। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের মঞ্চ থেকে আরও কয়েকটি নাটক অভিনয় হল, সলিল চৌধুরীর 'জনান্তিক' সাহিত্যিক জীবনের সুখ দুঃখকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের দুরবস্থাকে তুলে ধরা হল। পরে সলিল চৌধুরীর 'সংকেত' নাটকটি অভিনীত হয়। একটি মধ্যবিত্ত সংসারকে কেন্দ্র করে, লেখা। সেই সময়ে রাজনৈতিক বন্দীদের জেল থেকে মুক্তির জন্যে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি বিশেষে সবাই চেষ্টা করছিল, এমনি একটি মধ্যবিত্ত চরিত্র যার বড় হবার ইচ্ছে প্রবল। নিজের সংসারকে সুখে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তাই বাইরের আন্দোলন তাকে স্পর্শ করতে পারেনা। কিন্তু এমন এক

সময় এলো যখন এই বাইরের সংগ্রামকে নিজের সংগ্রাম বলেই তিনি ঘোষণা করলেন।

এই নাটকটি সেই সময়ে বিভিন্ন শো পুলিশ থেকে বন্ধ করে দিয়েছে, আমার বেশ মনে আছে। শ্রীরঙ্গমে টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে, আমরা বিকালে শো করতে গিয়েছি দেখি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে লাইন করে, হলের কর্তৃপক্ষ বললেন এ নাটক শো হবে না। সেদিন দর্শকের সঙ্গে একই সঙ্গে মিছিল করে আমরা ফিরে এসেছিলাম। তারপর নাটকের নাম পাল্টে 'প্রতিধ্বনি' নাম হ'ল—এখানে ওখানে দু'একটা শো হল, পুলিশ অনুমান করল এটা সেই সংকেত ছাপা হয়নি তো। তাই পুলিশের ধরতে একটু দেরী হল। রামমোহন লাইব্রেরীতে শো হবে, পুলিশ রামমোহন লাইব্রেরীটিকে সন্ধ্যের আগেই ঘিরে ফেলল। হলে কি হবে, পুলিশ কর্তৃপক্ষত সংকেত নাটকের শো বন্ধ করেছে। 'প্রতিধ্বনি' তো বন্ধ হয়নি। দর্শক ও শিল্পীরা একসঙ্গে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তাই শো আরম্ভ হয়ে গেল, আমরা তো ভেবেছিলুম পুলিশ মঞ্চে উঠে এসেই শো বন্ধ করে দেবে। অবশ্য তার জন্যেও আমরা প্রস্তুত ছিলুম, কারণ আমাদের সামনে ইতিহাসের একটি ঘটনা মনে ছিল তো। 'নীল-দর্পণ' নাটকও তো পুলিশ গিয়ে জোর করে শো বন্ধ করে দিয়েছিল কিনা। অবশ্য শেষ অবধি আমরা শো'টা শেষ করতে পেরেছিলাম পুলিশ ঠিক ভেতরে আর এলো না। আইনত ওটা তো বন্ধ করা যায় না। তাই পুলিশ রাইফেলের সঙ্গীন দেখিয়ে বন্ধ করতে চেয়েছিল! তার পরেও এ নাটকের অনেক শো হয়েছে। এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, করুণা ব্যানার্জী, ইন্দিরা কবিরাজ, বীরেশ মুখোপাধ্যায় জয়ন্ত ভট্টাচার্য, উমাপ্রসাদ মৈত্র। মঞ্চ সজ্জায় সুনীল দত্ত ও সন্তোষ দত্ত।

নাট্য আন্দোলনে / বহুরূপী

১৯৪৯ সালের অক্টোবর বন্দী মুক্তি তহবিলের জন্য একটি চারিটি শো সংগঠিত হয়েছিল। রেলওয়ে ম্যানসন ইনষ্টিটিউটে তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' নিয়ে এলেন বহুরূপী, একথা বলা যায় বহুরূপী এই নাটক নিয়েই বাংলা দেশের জনগণের সামনে প্রথম হাজির হয়েছিলেন। অবশ্য বহুরূপী 'নবান্ন' নাটকও করেছেন এর আগে গণনাট্যের প্রথম যুগে শম্ভু মিত্র নবান্নতে

অভিনয় ও পরিচালনা করেছেন। পরবর্তীকালে বহুরূপীর মধ্যে দিয়েই তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় আমরা পেয়েছি।

যে প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ শুরু করেছিল, বহুরূপী সেই প্রগতিশীল নাট্য ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন নিজস্ব বৈশিষ্ট নিয়েই।

কাল প্রবাহমান, সেই কালের গতির সঙ্গে মানুষও এগিয়ে চলেছে। এমনি একজন নতুন যুগের পথিক যাকে বলা যায় নতুন পথের পথিক, সেই পথিক পথ দেখাতে এলেন আর তার চলার তালে তালে আমরা দেখতে পেলাম নানান সমস্যা। কোলিয়ারীর খেটে খাওয়া মানুষের সমস্যা—নিষ্পেষণ, নির্যাতন। যারা খেটে খায় তারা যে কি অজ্ঞতার অন্ধকারে বাস করে, দিনে দিনে তারা নীরবে সয়ে যায় কত অন্যায় তারই প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন নতুন যুগের পথিক অসীম যিনি এই অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে নতুন পথের সন্ধান দিলেন সেই নায়ক। একটি সেটে নাটকটি রচিত হয়েছে বহুরূপীর অভিনয়ে যাদের আমরা প্রথম দেখলাম, শম্ভু মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, কালি সরকার, তুলসী লাহিড়ী, অমর গাঙ্গুলী, সবিতাব্রত দত্ত, শোভেন মজুমদার ও তৃপ্তি মিত্র।

গণনাট্য সংঙ্ঘ/ভাঙ্গা বন্দর

১৯৫০ সাল, এই সময়ে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে উৎপল দত্ত, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক এলেন। দেশে রাজনৈতিক নানান উত্থান পতন চলেছে, গণনাট্য সঙ্ঘের মধ্যেও কিছু ভাঙ্গা-গড়া চলেছে। সেই ভাঙ্গা হাটে নিয়ে এলেন পানুপাল-'ভাঙ্গা বন্দর'। উদ্বাস্তু জীবনের কাহিনী, কাহিনীটা ঠিক আমার মনে নেই। তবে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাদের নাম কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতি রায়, (পরে বন্দ্যোপাধ্যায়) উমানাথ ভট্টাচার্য, সমীরণ দত্ত, বারীন বোস, ঋত্বিক ঘটক, মমতাজ আমেদ, অমল কর, শোভা সেন। এই প্রথম গণনাট্য মঞ্চে আলো দিয়ে ভরিয়ে দিলেন তাপস সেন, মঞ্চ সজ্জায় ছিল সুনীল দত্ত! এরপরে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' উৎপল দত্ত প্রযোজনা করলেন এবং প্রমথ বিশীর গভর্মেন্ট ইন্‌সপেক্টারও অভিনয় করিয়ে ছিলেন উৎপল দত্ত-ই।

বহুরূপীর নাট্য উৎসব

১৯৫০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বহুরূপী নাট্য উৎসব হল নিউএম্পায়ার মঞ্চে। উৎসবে তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' উল্লেখযোগ্য নাটক। যে নাটক আজও মন থেকে মুছে যায় নি। আগামী কালও থাকবে সেই মহৎ নাটক ছেঁড়াতার।

ছেঁড়াতার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে ১৯৫০ সালে ভবানীপুর স্মাটা গ্রাউণ্ডে শান্তি সংস্কৃতি উৎসব হয়েছিল। সেখানে ছেঁড়াতারে তাহাকের দৃশ্যটি অভিনীত হয়। সেই উৎসবের উত্তোক্তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। প্রায় চার হাজার দর্শক কদিনে বহু নাটক দেখার পরে ছেঁড়াতারের ঐ দৃশ্যটি দেখলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সে যেন একটা জীবন্ত কাব্য। আমার বেশ মনে আছে এই চার হাজার দর্শক এক সঙ্গে একবার নয় দুবার নয়, তেরোবার করতালির দ্বারা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আর অভিনন্দন জানিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র যিনি এই নাটক পরিচালনা করেছেন ও রহিমের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তাঁকে। ছেঁড়াতার এতো জীবন্ত নাটক যে আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে গাঁথা আছে। এই নাটকটি চীনদেশে অভিনীত হয়। এছাড়া উর্দু, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্র ভাষাতেও অনূদিত ও অভিনীত হয়েছে। নবান্ন যেমন একটা আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছে ছেঁড়াতার তেমনি মানুষের জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছে। যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, শান্তি দাস, শম্ভু মিত্র, তুলসী লাহিড়ী, গঙ্গাপদ বসু, কুমার রায়, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, দেবতোষ ঘোষ, মঃ ইসরাইল, অরুণ মুখার্জী, অমর গাঙ্গুলী, অনিল ব্যানার্জী, সবিতাব্রত দত্ত, শোভন মজুমদার, বলাই গুপ্ত, পারিজাত বসু, নির্মল চ্যাটার্জী, কালিপ্রসাদ ঘোষ ও তৃপ্তি মিত্র। এই উৎসবে আরো দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' শ্রীসঞ্জীব এর 'উলুখসড়া'। উৎসবে আলোক সম্পাতে ছিলেন তাপস সেন।

নাট্য আন্দোলনে / উত্তর সারথি

১৯৫১ সালে গণনাট্য সঙ্ঘ ছাড়াও ঐ সময়ে আরো কিছু নাট্য সংগঠনকে দেখা গেল, যারা প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের অংশীদার বলা যায়। তাদেরই মধ্যে উত্তর সারথী একটা দল, যারা সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' ২১শে জুন কালিকা রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় করলেন। পরবর্তীকালে এই দলের নামকরণ হয় সাজঘর।

নাটকে যারা অভিনয় করেছিলেন সুশীল মজুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, সুনীল দাসগুপ্ত, বলীন সোম, গৌতম মুখোপাধ্যায়,

নেপাল নাগ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী নিয়োগী, রসরাজ চক্রবর্তী, সেন্তু চট্টোপাধ্যায়, কালী চক্রবর্তী, কানাই সিমলাই, রথীন বসু, নবেন্দু পাল, সুশীল চক্রবর্তী, অমর চৌধুরী, বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুশীল ঘোষ, সাধন ঘোষ, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, আলো দাসগুপ্ত। এই নাটক পরে রঙমহলে ১৯৫২ সালে জুলাই মাসে মঞ্চস্থ হয়। পরে বহু জায়গাতে এই নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকের মাধ্যমে এমন অনেক শিল্পী এসেছেন যাঁরা আজকে মর্যাদার সঙ্গে অভিনয় করছেন এবং জনসাধারণ তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছে।

সলিল সেন এর পরে নাটক লিখে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। যেমন 'মৌচোর'। সুন্দর বন অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে এই নাটক। 'ডাউন ট্রেন', পরবর্তী কালে বিশ্বরূপা মঞ্চে নিয়মিত ভাবে অভিনয় হয়েছে 'সন্ন্যাসী', একাংক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। 'দর্পণক্রান্তি' শিল্পীসঙ্ঘে মঞ্চ থেকে প্রশংসা অর্জন করেছে। 'ফাঁদ' হাসির নাটক।

১৯৫১ সালে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় নাট্যলোক পাক্ষিক পত্রিকায় নতুন ইহুদী প্রযোজনার ওপর একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই লেখাটি এখানে ছাপা হলো।

আর একখানি নাটক 'নতুন ইহুদী'। —শচীন সেনগুপ্ত

অচিন্তনীয় থাকত না। এ-কথা খুবই সত্য কথা। মানুষ ত' এই জন্যই সমাজ গড়া প্রয়োজন মনে করেছিল। আর সমাজ ভাঙবার মতই ত আত্মশাসনের তাগিদের অভাব, নাট্যকার এই উচ্ছৃঙ্খলতারও রূপ একটি দুর্বল লোকের চরিত্র দিয়ে নিপুণভাবে ফুটিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।—যেমন বুঝিয়ে দিয়েছেন স্নেহ মমতাও মানুষের কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে দুর্বলতারই সামিল হয়ে তাকে দিয়ে এমন কাজ করায়, যার লজ্জা পরিশেষে তারই কাছে দুঃসহ গ্লানি হয়ে ওঠে, জীবনের প্রতি বিষাদ এনে দেয়, সূক্ষ্ম এই সব মনস্তত্বের প্রতি বিবর্তন তরুণ নাট্যকার কোথাও অযথা বাগাড়ম্বর না করে ঘটনাবিন্যাসের সাহায্যেই যে ব্যক্ত করতে পেরেছেন, তাই হচ্ছে নাট্যরচনায় তাঁর কৃতিত্বের নিদর্শন। অবশ্য সকল দুর্বলতা তিনিও একেবারে জয় করতে পারেন নি। সে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে মহেন্দ্র আর রেলকুলী ভিমুয়ার শেষের দিকের সংলাপের ভিতর দিয়ে। মোহন যখন রং কারখানার নিয়োগপত্র ছিঁড়ে ফেলে দিল, তখন থেকে সে আর কোন

দিক দিয়েই মহেন্দ্রর চেয়ে ছোট রইল না। কিন্তু মহেন্দ্র শেষের দিকে তার চেয়ে বড় হয়ে উঠলো। শেষ সংকল্প যা সে করলো, তা যদি নিজের অভিজ্ঞতার ফলে তার ভেতর থেকেই উদ্বুদ্ধ হতো, তাহলে ভাববার অবকাশ থাকত না যে, সে ভেঙে পড়েছিল বলেই মহেন্দ্র তাকে প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিল। এমন কথা ভাববার অবকাশও নাট্যকার দিয়েছেন। বাস্তুহারাদের বিক্ষোভ প্রদর্শনকে যাঁরা রাজনীতির খেলা বলেন, এতে করে তাঁদেরই উক্তির স্বপক্ষে একটা যুক্তির যোগান দেওয়া হচ্ছে বলে আমি মনে করি। এ-নাটকে মহেন্দ্রর অতটা স্থান নেই। নাট্যকারের আরো দুর্বলতা পেয়েছে যতীন্দ্র পরের অংশটির অতি-বিস্তারে। কিছু সংক্ষিপ্ত হলে ভালো হতো। নাট্যকারের হয়তো ভয় ছিল দর্শকরা ভুল বুঝে পরীর চরিত্রটির উপর অবিচার করবেন, সে ভয় অমূলক। কেননা অনেক আগেই চরিত্রটি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। নাটকের গোড়ার দিকে নাট্যকার যে প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, শেষের দিকটাতেও যদি তার ব্যতিক্রম না দেখতাম তাহলে আরো খুশী হতাম। নাটকখানির অভিনয়ও হয়েছে চমৎকার। গৃহকর্তাব ভূমিকাটি কানু বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। দুঃখীর ইমানের যে অভিনয়ে তিনি সকলের অভিনন্দন পেয়েছেন, এ অভিনয়ে তারও চেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ত্রুটি হয়েছে তাঁর ভাষণে। ঢাকার কথার ঢং তিনি এখনো আয়ত্ত করতে পারেননি। এ ত্রুটি তাঁকে শোধরাতে হবে। মায়ের ভূমিকায় বাণী গাঙ্গুলী তরুণী হয়েও প্রৌঢ়া মায়ের যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, তা শ্রদ্ধা আদায় করে নেয়, তিনি নিজে উদ্বাস্তু। নিখুঁত অভিনয় করেছেন বোকা ছেলের অভিনয়ে ভানু বন্দ্যো। উদ্বাস্তু পরিবারটির ওপর যত ঝড়-ঝাপ্টা এসেছে, সবই নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন, হিরো বলতে এই নাটকে যদি কিছু থাকে, তাহলে তিনিই তাই। তাঁর দায়িত্ব তিনি সাফল্যের সঙ্গে বহন করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিষ্ট, যতীন, তিমু, ঠিকে বামুন, সকলেই সু-অভিনয় করেছেন। মহেন্দ্রের কণ্ঠটি মধুর, একটু নীচু হলেও অভ্যাসে উন্নত হবে, অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবার প্রচুর সম্ভাবনা তাঁর আছে। খ্যাতনামা চিত্র-পরিচালক সুশীল মজুমদার মৌলভী সাহেবকে মধুর করে তুলেছেন, আর সর্ব্বজনপ্রিয় শ্যাম লাহা গুণ্ডা সর্দারকেও যথোচিত রূপায়িত করেছেন, নাটকে নানা টাইপ রয়েছে, কিন্তু একটিও নিন্দনীয় হয়নি। টিম গঠন যেমন সুন্দর হয়েছে, তেমনই সুন্দর হয়েছে টিম-ওয়ার্ক। অতি-অভিনয়ের অভ্যাস অনেকেরই ছিল, কিন্তু পরিচালক কাউকে তা করতে দেননি।

তাই দর্শকরা কোথাও শক্ না পেয়ে নাটকের বেদনা উপলব্ধি করতে পেরে বিষয়টির গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন বলেই মনে হলো। সেই জন্যই বলি নাটক ও অভিনয় সার্থক হয়েছে। 'নতুন ইহুদী' সার্থক সৃষ্টি সন্দেহ নেই, কিন্তু নাটকে আমরা কতগুলো ত্রুটি লক্ষ্য করেছি, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার সময় স্থান নির্বাচন অনেক জায়গায় অসংলগ্ন। বিবাহ বাড়ীর সংগে নাটকের মূল কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই, গৃহকর্তাকে সামনে টেনে নিয়ে নাটুকেপনা সৃষ্টি করা হয়েছে, যে গ্র্যাচুয়িটির টাকার আশায় তিনি দিন গুনছিলেন তার উল্লেখ কেবল প্রথম ও শেষ দৃশ্যে আছে। তাতে তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে— অথচ এই সূত্রটিকে অবলম্বন করেই তার অন্তর্দ্বন্দ্ব আরো পরিস্ফুট হতে পারতো।

নাট্যচক্র—নীলদর্পণ

১৯৫০ সাল। ১৭ই আগষ্ট বাংলা রঙ্গ জগতে আবার ফিরে এলো দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ। একদিন যাঁরা গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত, সেই সুযোগ্য শিল্পী-নাট্যকার সংগঠক—বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, দিগিন বন্দোপাধ্যায়, জ্ঞান মজুমদারের প্রচেষ্টায় জন্ম হল নাট্যচক্রের। এঁদের প্রথম নাটক নীলদর্পণকে নবরূপে আমরা প্রথম দেখতে পেলাম ই বি আর ম্যানসন ইনস্টিটিউট মঞ্চে। পরবর্তীকালে এই নাটক সপ্তাহে তিনদিন মঞ্চস্থ করেছেন এঁরা কালিকায়।

১৯৫৩ সালে ভবানীপুর স্মাটা গ্রাউণ্ডে শান্তি সংস্কৃতি উৎসবে চার হাজার দর্শকের মধ্যে এই 'নীলদর্পণ' নাটকটির অভিনয় করে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন এঁরা। নবরূপে নীলদর্পণ অভিনয়ের কয়েকটি মুহূর্তকে আজও আমরা ভুলতে পারিনি। তোরাপের ভূমিকায় বিজনদা'র চোখের মধ্যে দিয়ে যে আগুন জ্বলত, তাঁর চাহনির মধ্যে দিয়ে যে ধিক্কার ধ্বনিত হত, আমরা ভুলিনি, ভুলবনা। ক্ষেত্রমণি,—গীতা সোম পরে সেন—সাবিত্রী, শোভা সেন, সত্য রায়—উড সাহেব। মুকুল চক্রবর্তী—রোগসাহেব, আরতি মৈত্র—আদুরী, সুধী প্রধান—নবীন মাধব, আর গোপী দেওয়ানরূপী গঙ্গাপদ বসুকে আমরা ভুলিনি, কোন দিন ভুলতেও পারব না। আরো যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন ঋত্বিক ঘটক, বারীন বসু, নরেন্দ্র সেন, দিগিন

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চক্রবর্তী, মণি মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, নিপুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতা মুখোপাধ্যায়, মাধবী রায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বলিন সোম। . নাটকটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। সহকারী পরিচালনায় ছিলেন মৃণাল সেন। আলোয় তাপস সেন এই প্রথম বাংলা দেশে আলোর মায়াজাল সৃষ্টিতে নতুন দিক দেখিয়েছেন।)

নাট্য আন্দোলনে অশনিচক্র

১৯৫০-৫১ সাল। নবনাট্য আন্দোলনে আর একটি নাম সংযোজন হল অশনি-চক্র। এঁরা প্রথমে মঞ্চস্থ করেন দিগিন বন্দোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' নাটকটি। পরিচালনা করেন মমতাজ আহমেদ খাঁ। অশনিচক্র উদ্বাস্তু জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার পরেই দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর শ্রমিক জীবনের পট ভূমিকায় 'মশাল' নাটক নিয়ে রঙ্গ জগতে নতুন করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই মশাল ৪০ রাত্রি অভিনয় হয়েছিল। গ্রুপ থিয়েটার হিসাবে এঁরা সেই সময়েই পরিচিতি লাভ করেছিল। বিভিন্ন সময়ে যারা অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে ছিলেন সাধন সরকার, সত্য রায়, অশ্রু ভট্টাচার্য, বীণা বসু, আরতি মৈত্র, কল্যাণী সেন, চিত্ত চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অবনী দত্ত। 'মশাল' নাটক থেকেই এঁদের গ্রুপের নির্দেশনার ভার গ্রহণ করেন নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। এরপর অশনিচক্র দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'তরঙ্গ' নাটক মঞ্চস্থ করেন। ১৮৭৬ সালের বৃটিশের আইন অনুসারে এই নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় এই বিখ্যাত নাটকটি নাট্য অনুরাগীদের আন্দোলনের ফলে যখন মুক্ত হল, তখনই অশনি-চক্র সেই বিখ্যাত নাটকটি অভিনয় করে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করলেন।

এই নাটকে অশনিচক্রের সঙ্গে যাঁরা অতিথি শিল্পী হিসাবে অভিনয় করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন চারুপ্রকাশ ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও নিবেদিতা দাস। এরপর এঁরা রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' কিরণ মৈত্রের

'নাটক নয়' বীরু মুখোপাধ্যায়-এর ঢেউ, 'গোল টেবিল', যে নাটকের জন্যে দিগিনদার চাকরি চলে গিয়েছিল সেই নাটকও সার্থকভাবে অভিনয় করেন।

১৯৫১ সাল, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নাট্যোলোক পাক্ষিক পত্রিকায় ১লা নভেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয়।

নাট্যকারদের প্রতি

এদেশে নাট্যকারগণ বিজ্ঞ মহলে প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয়-সাহিত্য-সমাজে নিন্দিত, পত্র-পত্রিকায় প্রত্যাখ্যাত, প্রকাশক মহলে উপেক্ষিত তথাপি বাংলার নাট্যকারগণ নাটক লিখে এসেছেন এবং লিখেছেনও। লিখেছেন তাঁরা ভেতরের তাগিদে, অনুভূতির তাড়নায় নাটক না লিখে তাঁরা থাকতে পারেন না ; নাট্যরচনায়ই তাঁরা সাহিত্য সাধনার সার্থকতা খোঁজেন, নাটকের চরিত্রগুলিই তাঁদের জীবন-সঙ্গী হয়ে ওঠে, হাসি-কান্না, মান-অভিমান, বিক্ষোভ-বিলাপ, বিতর্ক-রসালাপ সবই হয় তাঁদের এই নাটকীয় চরিত্রগুলির সঙ্গে। সুতরাং যাঁরা ভাবেন, শুধু অর্থ প্রাপ্তির জন্যই নাট্যকারগণ নাটক লিখে থাকেন তাঁরা সৃষ্টির প্রেরণাকে অস্বীকার করেন, জাত নাট্যকারদের মূল্য নির্ধারণে তাঁরা ভুল করেন। বাংলা দেশে নাট্যকারের অভাব নেই। অভাব দৃষ্টিভঙ্গির। যাঁরা এতকাল ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক অথবা একান্ত ব্যক্তিগত জীবনসত্বার মধ্যে নাটকের উপাদান খুঁজেছেন, তাঁরা যদি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ফিরিয়ে বাস্তবের দিকে দৃকপাত করেন তবে অনায়াসেই তাঁরা দেখতে পাবেন যে, এদেশেও একটা নতুন আদর্শ সংঘাতের আলোড়ন দেখা দিয়েছে। আধা বুর্জোয়া আধা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা আর এগুতে না পেরে একটা রূপান্তরের পথ খুঁজছে। এই পথের নিশানা যাঁরা দেবে তাঁরাই হবে আজকের দিনে নাটকের যথার্থ হিরো। সামাজিক মর্যাদা বিচারে এদের স্থান এখন যতই নীচে হোক না কেন, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সীজার, সম্রাট অশোক কি তৈমুর চেঙ্গিজ খাঁ-র চেয়ে নাটকীয় উপাদানের দিক দিয়ে এরা কোন অংশেই তুচ্ছ বা দুর্বল নয়। যারা এতকাল ছিল অবহেলিত উপেক্ষিত, তারাইতো বুনিয়াদ গড়ে তুলছে নতুন সমাজের। সুতরাং তাদের জীবনালেখ্য কেবল ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ঈর্ষা বা সুখদুঃখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা ; যথার্থরূপে জীবন রূপায়ণ হলে এক বৃহত্তর সামাজিক সংঘাতেরই রূপ তাঁর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে। এই সত্যকে উপলব্ধি করে সম্প্রতি কোন

কোন নাট্যকার নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন; কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। বহু সৌখিন প্রগতিশীল নাট্য-সম্প্রদায় আজ এমন নাটক অভিনয় করতে চান যার মধ্যে বর্তমান সামাজিক বাস্তব রয়েছে; অথচ বাজারে এ ধরণের প্রকাশিত নাটকের অভাব অত্যন্ত বেশী। পেশাদার নাট্যশালায় অভিনীত না হলে কোন নাটক প্রকাশে প্রকাশকগণও সাধারণতই কুণ্ঠিত। এই সমস্যার খানিকটা সমাধান হতে পারে বিভিন্ন প্রগতিশীল নাট্যসম্প্রদায়ের কাছে যদি অভিনয়ের জন্যে নতুন ভাল নাটকের পাণ্ডুলিপি পৌঁছে দেওয়া যায়। তা ছাড়া প্রগতিশীল নাটক প্রকাশের জন্যে সমবায় পদ্ধতিতে একটা প্রকাশনীর ব্যবস্থা করতে পারলেও নবনাট্য আন্দোলনকে অনেক খানি সাহায্য করা সম্ভব। পাণ্ডুলিপি পৌঁছে দিতে অপারগ হলেও নতুন ভাল নাটকের খবর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণে "নাট্যলোক" প্রস্তুত।

নাটকের আসরে পাণ্ডুলিপি পাঠ করে যে সকল নাটক যুগোপযোগী বলে নাটকবোদ্ধারা মনে করবেন সে-সব নাটকের পরিচিতি নাট্যলোক প্রকাশ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে খবর পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। নাট্যকারদের সহযোগিতা পেলে 'নাট্যলোক' অচিরেই এই ধরণের নাটকের আসর বসাবার ব্যবস্থা করবে।

গণনাট্য সঙ্ঘ / দলিল

১৯৫১-৫২ সাল হবে। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ তখন বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেণ্ট্রাল স্কোয়ার্ড নামে একটি স্কোয়ার্ড ছিল। ঋত্বিক ঘটক তার নতুন নামকরণ করলেন অনুশীলন শাখা। এই শাখার প্রথম নাটক হল 'দলিল'। দলিল সম্পর্কে ঋত্বিক ঘটকের একটা ভূমিকা ছিল, আমি সেই লেখাটির অংশ এখানে ছেপে দিলুম।

সম্পূর্ণাঙ্গ নাটক বলতে যা বোঝায়, 'দলিল' একেবারেই তা নয়। পদ্মার স্রোতের মতই বাস্তুচ্যুত বাঙ্গালীর ধারা চলেছে এগিয়ে এক অলঙ্ঘ্য পরিণতির দিকে। একদিকে রয়েছে চরম প্রতিকূল অবস্থা, আর একদিকে বলিষ্ঠ দৃঢ় ইচ্ছা-শক্তি। এই দুই এ মিলে আজকে বাস্তবকে সৃষ্টি করেছে। তারই ঘাত প্রতিঘাত চলেছে ঘটনা থেকে ঘটনায় স্রোতের ঢেউয়ের, মত ছাপিয়ে ছাপিয়ে। তিনটি প্রবাহে সেই মূল সুরটিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সেই জন্ত নাটকের মধ্যে যে একাত্মবোধ থাকা দরকার, এখানে তা নেই। পর পর বয়ে যাওয়া স্রোতে তা সম্ভবও নয়। মানুষগুলো শিকড় উপড়ে এসে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে, আর তারই মধ্যে নিষ্ঠুর সমাজ আর বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্ব তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছে। ওরা যেন একেবারে দিশেহারা। ক্রমে আশা নিভে যায়, যার থেকে বড় মৃত্যু আর নেই। মানুষগুলো ভেতর থেকে পচে আসছে, পিছনের কথাই বার বার মনে পড়ে, সামনে বুঝি কিছু দেখা যায় না। তারই মধ্যে থেকে থেকে এক একটা চমক আসে, যার থেকে বেরিয়ে আসে ভবিষ্যৎ দৃঢ়তার দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। জনতার ওপর যে আস্থা তলে তলে শিথিল হয়ে আসছিল, তা আবার জোরদার হয়। বর্তমানে এ বাস্তব একটা মহাকাব্য একমাত্র ঐ রকম একটা বিরাট কোন পটভূমিতেই এর খানিকটা ধরা যায়। অতখানি ব্যাপ্তিকে পরিপ্রেক্ষিতে আনা যায়। দু'ঘণ্টার নাটকে এতবড় মহান জিনিষকে স্থান দেওয়া মুস্কিল; যে নাটকে কালই প্রধান পাত্র, নায়ক,—তাতে এই অসুবিধে শিল্পীকে অধীর করে তোলে। তাই এখানে চেষ্টা করা হয়েছে একটি মাত্র পরিবারকে আশ্রয় করে সমগ্র দ্বিধাবিভক্ত বাংলার প্রাণের কথাটিকে ধরার। বাস্তুহারাদের জীবনের প্রধান পর্যায়গুলোকে সঙ্কুচিত করে তাই এই পরিবারটির চারিদিকে আবর্তিত করানো হয়েছে। আশা এই যে প্রকাণ্ড পদ্মার বুকে প্রতিকূল হাওয়ায় ক্ষ্যাপামি জাগলে যেমন প্রত্যেকটি ঢেউয়েতে তার ছাপ পড়ে, তেমনি একটি মাত্র প্রান্তকে ধরে গোটা আন্দোলনটাকে দেখানো যায়। কতদূর সফল হয়েছি, দর্শকদের বিচারাধীন এ-নাটক আমি 'শেষ' করতে পারিনি। এর বুঝি শেষ নেই, আজও সে পরিণতি আসেনি। একদিন আসবে, এ নাটকের নায়ক জনতা একদিন তা আনবে। সেই ভবিষ্যৎ পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত আজকের প্রতিটি মিছিলে। তার আসার প্রতি মোড়ের চিহ্ন নিয়েই 'দলিল', যে দলিল আজও লেখা হচ্ছে। এর শেষ পাতাটি লিখবে মহালেখক জনতা, তার জন্তই সে জায়গা আমি ছেড়ে গেলাম।

ভাঙা বাংলার প্রতিরোধই আমার শেষ বক্তব্য। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বাংলা আজ চীৎকার করে উঠেছে—বাঙালী এক, তার ঐতিহ্য এক, তার ভাষা এক, সংস্কৃতি এক, বহুযুগ অতীত থেকে বহুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সে এক। মাঝের এই বিশ্বাসঘাতক কালনেমির লঙ্কা ভাগ, ধুয়ে মুছে কোথায় চলে যাবে,

মীরজাফরদেরকে ইতিহাস সহ্য করবে না। এ ঘোষণা বার বার করার দরকার আছে বলে মনে করেছিলাম, সেইটেই আমার শেষ কথা।

বাংলাকে ভালবাসি, আমাদের ওপর এ অত্যাচারকে ঘৃণা করি ; আমাদের দুর্দশায় রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে,—তাই এই নাটক লিখেছি। নাটকীয় রূপরীতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারিনি তবু না লিখে পারলাম না। আমার জনতাকে ভালবাসা দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছি। তাই ক্ষমা আমি চাইব না। কিন্তু এই কথা বলব, আমার থেকে শেখের হাতে পড়লে এই বাস্তব প্রচণ্ড ভৈরব শিল্পের জন্ম দিতে পারত। সারা বাংলার এ যুগের প্রধানতম দাবীর এটা একটা।"

'দলিল' নাটকের প্রথম রজনীতে অতিথি শিল্পী হিসাবে তৃপ্তি মিত্র অভিনয় করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা হলেন—ঋত্বিক ঘটক, পারিজাত বসু, মমতাজ আহমেদ খাঁ, কিরণ ধর, উৎপল দত্ত, সমীরণ দত্ত, শান্তনু ঘোষ, পূর্ণেন্দু পাল, উমানাথ ভট্টাচার্য, নির্মল সর্বজ্ঞ, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, অপর্ণা দেবী, নীরেন ভট্টাচার্য, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, শোভা সেন, ভারতী সেন, গীতা মুখোপাধ্যায়, মমতা চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোক সম্পাতে ছিলেন তাপস সেন। মঞ্চ সজ্জায় সুনীল দত্ত ও রূপসজ্জায় ছিলেন শক্তি সেন। নির্দেশনায় ঋত্বিক ঘটক। এই নাটকটি ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বোম্বাই সম্মেলনে বাংলা দেশ থেকে দেখানোর সুযোগ হয় এবং সেখানে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এছাড়া অনুশীলন শাখা রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' অভিনয় করেন উৎপল দত্তর পরিচালনায় এবং সে প্রযোজনাও যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনুশীলন শাখা উমানাথ ভট্টাচার্যের 'জুলিয়স ফুচিক' নামে একটি নাটকও অভিনয় করেন। এই সময় উৎপল দত্ত ও ঋত্বিক ঘটক গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে চলে গেছেন নানা কারণে।

১৯৫২ সাল। এই সময়ে সলিল চৌধুরীর সম্পাদনায় 'গণনাট্য' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন সুরপতি নন্দী ও সমীরণ দত্ত যুগ্মভাবে। এই পত্রিকায় তৎকালীন নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে অনেক সংবাদই থাকত। সেই সময়কার 'গণনাট্য' পত্রিকায় ছাপা সমসাময়িক ঠিক অবস্থাটা বোঝাবার জন্তে গণনাট্য আন্দোলনে নাটকের সমস্তা নামে একটি প্রবন্ধ উৎপল দত্ত লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধটি হুবহু এখানে ছাপা হলো।

গণনাট্য আন্দোলনে নাটকের সমস্যা

উৎপল দত্ত

গণনাট্য আন্দোলনের দুটি বিশিষ্ট চরিত্র আছে যার একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে ধরা যায় না। আন্দোলনের সুস্পষ্ট রূপ নির্ণয় ক'রতে হ'লে দুটি দিক সম্বন্ধেই জানতে হবে।

প্রথম হ'ল, গণনাট্যের দর্শক ও দ্বিতীয় তার নাটক বা বিষয়বস্তু। দেশের সংগ্রামরত সাধারণ মানুষ—মজুর, কৃষক, বুদ্ধিজীবি প্রভৃতির কাছে আমাদের পৌঁছতে হবে। দেশের সুদূরতম পল্লী অঞ্চলেও আমাদের পৌঁছতে হবে। কিন্তু আন্দোলন কি ততদূর পৌঁছতে পেরেছে? আমাদের সকল দর্শকের কাছে কি আমরা আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছি? বোধ হয় তা পারিনি। এর কারণ হ'ল নাটকের অভাব। এই অভাবের অভিযোগ আজ গণনাট্য আন্দোলনের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা থেকে আসতে শুরু করেছে। 'ভাল নাটক চাই', 'উপযুক্ত নাটক চাই', এই আওয়াজ চতুর্দিকে শোনা যাচ্ছে। কথাটা কি সত্যিই যে নাটক নেই? এই প্রশ্নই হল গণনাট্য আন্দোলনের চরিত্রের দ্বিতীয় প্রশ্ন। অতএব এই প্রশ্নেই আসা যাক।

কথাটা এক অর্থে সত্যি, ভাল নাটক নেই। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি ফুটিয়ে তোলা ভাল সুন্দর নাটক ক'খানাই বা আছে? এই অর্থে সত্যিই নাটকের অভাব আছে। কিন্তু এর আরও একটি দিক আছে। আমাদের দেশের অতীত ঐতিহ্যের গৌরবময় কাহিনী অবলম্বনে রচিত বহু ক্ল্যাসিকাল নাটক আছে, যেগুলিকে নতুন করে ঢেলে, ছেঁচে প্রস্তুত করা যায়। এইদিক দিয়ে বিচার করলে নাটকের অভাব আদৌ স্বীকার করা যায় না।

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই যে আজও দেশের অধিকাংশের শত্রু হ'ল ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, নারী সমাজের পরাধীনতা, সামন্ততান্ত্রিকতা প্রভৃতি। মধ্যযুগীয় দাসত্বের বেড়াজালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আজও ক্রন্দনরত। আমাদের সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে এই অবস্থায় আমরা মুষ্টিমেয় জঘন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যক্তির মুক্তির জন্য প্রয়াস করছি, না সমষ্টির সুখ-শান্তির জন্য লড়াই চালাচ্ছি?

গণনাট্য আন্দোলনের মঞ্চ থেকে যদি কোনও প্রযোজক ইবসেনের 'এনিমি অব দি পীপল' করতে চান, তিনি কি তা করতে পারেন? কিংবা 'দেবী মাই',

'আর নয়' বা 'নাগপাশের' মতো নগণ্য নাটক কি করে গণনাট্যের মঞ্চে স্থান পায়? অথচ নারী সমাজের দাসত্বের বিরুদ্ধে রচিত শরৎচন্দ্রের কোন নাটক মঞ্চস্থ করার কথা আমরা চিন্তা করি না। কি ক'রেই বা এ সম্ভব হ'ল যে হিন্দু কোড বিলের ওপর কোন নাটক করা হ'ল না (প্রতিক্রিয়াশীলদের তরফ থেকে অবিশ্যি তা হয়েছে) অথচ শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা' যা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড আক্রমণ তা মঞ্চস্থ করা হয় না (অবিশ্যি নাটকটির শেষাংশ আশানুরূপ নয়)। কেন এমন হয় যে তুচ্ছ সমস্যা নিয়ে আমরা ভীষণ মাথা ঘামাতে থাকি অথচ দেশের বৃহত্তর সমস্যাগুলি আমাদের নাট্যকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না? দেশের বিরাট গ্রামাঞ্চল অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়ে গেল।

বনফুলের বিখ্যাত 'শ্রীমধুসূদন' বা 'বিদ্যাসাগর'কে আমরা বাদ দিতে পারি না। কিংবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধুনা প্রকাশিত 'রামমোহন'কেও বাদ দেওয়া যায় না। আমাদের নাট্যকারগণ এই সব নাটকগুলি থেকে যথেষ্ট মালমশলা পেতে পারেন। ধর্মের অনুশাসনের নির্বুদ্ধিতাকে উদ্ঘাটিত করা রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক আমরা করতে পারি! রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' বা 'তাসের দেশ' আমরা করতে পারি। অথচ আমাদের নাট্যকারদের কখনও এই দিকে দৃষ্টি দিতে বলা হয় না। তারা 'নবান্নের' প্রধান সমাদ্দারের চরিত্রের হাজার রকম অনুকরণ করতে ব্যস্ত। তারা এতই আত্মকেন্দ্রিক যে বাস্তবের প্রতি বিমুখ হয়ে Fourth Dimensional মঞ্চ প্রয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা চালাতেই ব্যস্ত। ইদানীং গণনাট্য মঞ্চে ভূত প্রেতের যে অপূর্ব সমাবেশ করা হয়েছে তা সত্যিই হাস্যকর। প্রগতি নাট্য আন্দোলনের এই অবনতি ভীষণ পীড়াদায়ক।

সুতরাং আমাদের ক্ল্যাসিক নাটকগুলিকে পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবন করা যদি আমাদের কর্তব্য বলে মেনে নিতে পারি তবে 'নাটকের অভাব' এই যুক্তি সম্পূর্ণ অচল। বরং গণনাট্য আন্দোলনের এই দিকটা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতাই তাতে পরিলক্ষিত হয়। গিরিশ ঘোষ এবং ক্ষীরোদ প্রসাদের বিরাট রচনা-ভাণ্ডারকে সত্যিকার গণনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রয়োগ করা যায়— সে সম্বন্ধে আমার মনে হয়, কোনও গবেষণাই করা হয়নি। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক বা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রতি শুধুমাত্র উন্নাসিক মনোভাব দেখালে চলবে না। কারণ একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ঐ নাটকগুলি এখনও জনপ্রিয়। আমাদের দেশের বিরাট ইতিহাসের পটভূমিকায় গড়ে ওঠা

বিশেষ কতকগুলি ভাবপ্রবণতা অবলম্বনে নাটকগুলির সৃষ্টি। সেই কোমল অনুভূতিতে কি ভাবে তারা সাড়া জাগায় তা আমাদের এঁদের কাছ থেকে শিখতে হবে। এবং কোনও কোনও পেশাদারীর হাতে এই অনভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করতে হবে। আমাদের গৌরবময় ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকগুলিকে এই পেশাদারী বিকৃতির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। 'কারাগার' নাটকের বৈপ্লবিক বিষয়বস্তুকে আমরা কেন পুনরায় যৌথ-অভিনয়ের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করতে পারব না? 'ভীষ্মে'র রূপক অবলম্বনে ভীরু ও মহৎদের সংগ্রাম কাহিনী আমরা কেন রূপায়িত করব না?

পুরাণের অসংখ্য কাহিনী যেখানে ব্রাহ্মণ আধিপাত্যের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত-দের সংগ্রামের বর্ণনা রয়েছে—মহাভারতের জতুগৃহদাহের গল্প, একলব্য, শম্বুক, উদ্দালক, কর্ণের কাহিনী—এই সমস্ত বিষয়বস্তুকে কেন আমরা বর্তমান দিনের নাটকের বিষয়বস্তুতে পরিণত করি না? সাম্রাজ্যবাদীর কৌশলের বিরুদ্ধে গিরিশ ঘোষের 'সিরাজদৌল্লা'র মতো শক্তিশালী আর কোনও নাটক আছে বলে ভাবা যায় না—এমন কি বাংলা দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রথম যুগের ঘটনা সম্বলিত নাটকগুলিও অপূর্ব। এই নাটকগুলিতে কোনও মৌলিক ভুল বরং একটা মৃতপ্রায় থিয়েটারগোষ্ঠীর বিষাক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ঘুণে ধরা মঞ্চ-প্রয়োগ কৌশলই এই বিকৃতির জন্য দায়ী।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি বিষয়ের অবতারণা করতে পারি। তা হল গণনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ও আনুষ্ঠানিক কর্মসূচীর সঙ্গে গবেষণা ও অধ্যয়নের সম্পর্কের প্রশ্ন। শুধু ক্ল্যাসিকাল নাটক পুনরুদ্ধার করার কথা বললেই ফুরোবে না।

অনেক কিছুর সমন্বয় সাধনের উপর তা নির্ভর করে। যেমন: অভিনয়ের থিয়োরী, মঞ্চ-পরিকল্পনা, দৃশ্যসজ্জা, রূপসজ্জা, আলোক-সম্পাত, আবহ সংগীত প্রভৃতি। শুধু নাটক করব বললেই করা যায় না। সামগ্রিক একটি শিল্প সৃষ্টি করতে হলে তার সর্বাঙ্গীন সমন্বয় করতে হবে। তবেই আমরা সার্থক নাটক সৃষ্টির পথে এগোতে পারব। গণনাট্য আন্দোলনের নাটকের অভাব এইভাবে আমরা দূর করতে পারি—অন্ততঃ ঐতিহাসিক নাটকগুলির পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যে দিয়ে এই সমস্যার একটা দিকের সমস্যার সমাধান করা যায়।"

নাটকের কণ্ঠরোধ ॥

১৯৫২ সাল। গণনাট্য আন্দোলন যেমন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, লালবাজারের পুলিশ কর্তৃপক্ষও তত বেশী উঠে পড়ে লেগেছে নাটকের কণ্ঠরোধ করার জন্য। এই সময়ে লালবাজার থেকে গণনাট্য অফিস—৪৬, ধর্মতলা স্ট্রীটে একখানা চিঠি এলো, কতকগুলো পাণ্ডুলিপির নাম দিয়ে সে গুলো চেয়ে পাঠাল।

নাটকের নাম :—

রক্তকরবী, তুলসী লাহিড়ী, ছাগল, সংকেত ইত্যাদি এছাড়া নানা ভাবে শো বন্ধ করে দেবার জন্যে ওরা উঠে পড়ে লাগলেন।

নাটকের উপর এই ধরণের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নাট্য পত্রিকায় লেখা-লেখিও হয়েছে তখন। অরুণ রায় ও সজল রায় চৌধুরী সম্পাদিত 'থিয়েটার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হত। সেই পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা তখন অনেক নাট্যকার শিল্পীদের আলোর নীচে এনে হাজির করেছেন। যেমন সুনীল দত্ত তাদের মধ্যে একজন। 'লুঠতরাজ' নামে একটি শ্রমিক জীবনের নাটক প্রকাশিত হল থিয়েটার পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে। ব্যাকস্টেজের শিল্পী থিয়েটার পত্রিকার মাধ্যমে এলো ফ্রন্ট স্টেজে আলোর সামনে। এই থিয়েটার পত্রিকাতে নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলের বিরুদ্ধে একটি সম্পাদকীয় লেখা হল। সেই সম্পাদকীয়টা আমি ছেপে দিলাম।

১৮৭৬ সালের আইন

১৮৭৬ সালের 'ভারত সংস্কারক' লিখেছিলেন—"গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের ডাইরেক্টর বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস এবং ম্যানেজার বাবু অমৃতলাল বসুর সামান্য পরিশ্রমের সহিত একমাস মেয়াদ হইয়াছে। যেরূপ বিচার হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় দোষ প্রমাণ হউক না হউক, দণ্ড দেওয়াই উদ্দেশ্য।"

১৮৭৬ সাল বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। সম্রাট এডওয়ার্ড তখন প্রিন্স অব ওয়েলস—কলকাতায় দর্শন দিতে এসেছেন। ১৮৭৬ সালের জানুয়ারীর গোড়ার দিকে হাইকোর্টের নামজাদা উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাসমারোহে যুবরাজকে নিজের বাড়ীতে আনয়ন করলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র

করে সারা কলকাতায় আন্দোলন শুরু হয়। সংবাদপত্রে বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার একটি প্রহসন অভিনয় করলেন "গজানন্দ ও যুবরাজ।" ১৯শে ফেব্রুয়ারী পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এই প্রহসনটির প্রথম অভিনয় হ'ল। দ্বিতীয় অভিনয়ের পর রাজভক্ত প্রজাকে ব্যঙ্গ করার অপরাধে পুলিশ অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিল। ২৬শে ফেব্রুয়ারী 'হনুমান চরিত্র' নামে প্রহসনটির পুনরাভিনয় হয়। 'হনুমান চরিত্র' পুলিশের আদেশে বন্ধ হবার পর পুলিশকে ব্যঙ্গ করে 'The Police of Pig and Sheep' নামে আর একটি প্রহসন অভিনীত হ'ল—১লা মার্চ তারিখে। নাট্যশালাকে সংযত করবার জন্য বড়লাট নর্থব্রুক ২৯শে ফেব্রুয়ারী এক অর্ডিন্যান্স জারি করলেন। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। অর্ডিন্যান্স জারি করেই সরকারের সাধ মিটবে কেন? ৪ঠা মার্চ তারিখে 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতাভিনয় চলছে। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সাহেব সদলবলে অভিনয়ের মধ্যেই উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, বেলবাবু প্রমুখ আটজন কর্মকর্তা ও অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করলেন। ৬ই মার্চ ম্যাজিস্ট্রেট ডিকেন্সের এজলাসে বাংলার কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী ও শিল্পকর্মীর বিচার শুরু হয়। ৮ই মার্চ ম্যাজিস্ট্রেটের উপরিউক্ত রায় প্রকাশিত হয়। অবশ্য হাইকোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রায় বাতিল করে আসামীদের মুক্তি দিলেন।

কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮৭৬ সনের মার্চ মাসে Dramatic Performance Control Bill (নাট্য অনুষ্ঠান কণ্ট্রোল বিল) নামে যে বিলটি কাউন্সিলে পেশ করা হয়েছিল, বৎসরের শেষের দিকে তা পাশ হয়ে গেল। ১৮৭৬ সনের ১৪ই ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকা লিখলেন "........আমরা শাসনের প্রবাহে নির্জীব হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সমুদয় কার্য্যের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এই আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবাসীরা এরূপ স্থানে গমন করিবে যেখানে আর ইংরাজ শাসনের ভ্রূকুটি তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।"

আজ ১৯৫২ সাল। ইংরেজ নাকি বিদায় নিয়েছে! আমাদের জাতীয় সরকার নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেছেন। চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নাকি আমাদের জন্মগত অধিকার! আমাদের নাট্যশালাগুলি কিংবা কোন

নাট্য প্রতিষ্ঠান যদি বেয়াড়াপনা করে, সেন্সাসের কড়া চাবুকেও যদি ঠাণ্ডা করা না যায়, ওষুধ আছে ১৮৭৬ সালের কুখ্যাত বিলাতী আইন। নাট্যশালার কোন্ নাটক প্রদর্শিত হবে তার শেষ রায় দেবেন নাট্যশিল্প কর্মীরা বা নাট্যানুরাগী জনসাধারণ নয়, নাটক বাছাই করবেন লালবাজারের পুলিশ অফিসার। হতভাগ্য বাংলা দেশ! আরও ভাগ্যহীন বাংলার নাট্যকারবৃন্দ! বহু বিনীদ্র রজনী ও বহু বৎসরের আয়াসসাধ্য সাধনার ফলে যে নাটকের সৃষ্টি হ'ল সেন্সরের একটি কলমের খোঁচায় তা ব্যর্থ রচনা বলে পরিত্যক্ত হতে পারে। কোন্ নাটক প্রযোজিত হবে—তার বিচার নাট্যাচার্যেরা করবেন না, পুলিশকর্তা ও সেন্সর বোর্ডের অনুমতিই নাট্য প্রযোজনার মাপকাঠি। যদি কোন ধৃষ্টতা দেখা যায়, হাতে আছে অমোঘ অস্ত্র—১৮৭৬ সনের ব্রিটিশ আইন।

বাংলার নাট্যানুরাগী জনসাধারণ, নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ, পরিচালক, প্রযোজক, নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও নাট্যরসিক সাধারণ দর্শক এই অপমানকর নীতির বিরোধিতা করবেন না? নিরাপত্তার নাগপাশ থেকে নাটক ও অভিনয়কে মুক্ত করবার জন্য—মঞ্চ জগতের স্বাধীনতার জন্য বাংলার পেশাদার ও সৌখীন সমস্ত শিল্পী, সাহিত্যিক ও নাট্যানুরাগীদের মিলিত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠবে না? ১৮৭৬ সালের আইন প্রত্যাহারের জন্য শিল্পী, সাহিত্যিক ও গণতান্ত্রিক জনসাধারণ সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তুলুন। এই আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে গণনাট্য সঙ্ঘ, বহুরূপী, নাট্যচক্র, উত্তর সারথী প্রমুখ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির উদ্যোগ গ্রহণ করার মহান দায়িত্ব রয়েছে।

শ্রীরঙ্গম মঞ্চে একটি অনুষ্ঠান

এই সংখ্যাতেই ছাপা আর একটি লেখা এখানে ছেপে দেওয়া দরকার মনে করছি। সেটাও খুবই উল্লেখযোগ্য।

সেই সময়ের জনসাধারণের মনের ভাবনা ও শিল্পীদের মনের অবস্থাটা বোঝাবার জন্তে আমি এই লেখাটি চাপলাম।

১৫ই আগষ্ট ও শিশিরকুমার

*[১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট সারা কলকাতায় "স্বাধীনতা"র উৎসব চলেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে এবং স্বতন্ত্রভাবে জনসাধারণের বিরাট অংশ এই উৎসবে যোগ দিয়েছে। থিয়েটার ও সিনেমা গৃহগুলি এই উৎসবের মারফত তাদের মুনাফা অর্জ্জন করছে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের পরিচালনায় "শ্রীরঙ্গম" মঞ্চও সেদিন "দুঃখীর ইমান" দেখান। কিন্তু শুধু অভিনয় ছাড়াও সেদিন সেই বাংলা মঞ্চে আর একটি অভূতপর্ব ঘটনা ঘটে—যা সেদিন যেমন তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তারপর বছরের পর ততোধিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে।

সেদিন অভিনয়ের প্রারম্ভে পূর্বঘোষিত ব্যবস্থামত শিশিরকুমার একটি অভিভাষণ দেন। শিশিরকুমার জানতেন প্রেক্ষাগৃহের বাইরে জনতা উল্লাস করছেন এবং তাদের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে পার্থক্য টানার কোন ব্যবস্থা করাই সম্ভব নয়। তবু নিশ্চিত বিশ্বাসে বলে গেলেন: এ স্বাধীনতা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। অস্ত্র এখনো মাউণ্টব্যাটনের হাতে। অহিংস আন্দোলনে এই ক্ষমতা লাভ হয়নি। ইংরাজ যখন দেখল—ভারতের জনতা ব্যাপকভাবে যে কোন উপায়ে (নৌবিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলন!) ক্ষমতা দখলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—তখন তারা পিছু হটেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি ভিয়েৎনাম ও ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা উল্লেখ করেন। মঞ্চ সম্পর্কে তিনি বলেন বাংলা দেশের মঞ্চ থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সাহায্য করা হয়েছে এবং তার জন্যই সেন্সার প্রথা এতো কঠোর। কাজেই তিনি দাবী করেন যে সমস্ত নাটকের উপর বাধা নিষেধ আছে তা তুলে নেওয়া হোক এবং পুলিশ দারোগার হাত থেকে নাট্য সাহিত্য বিচারের ভার নেওয়া হোক।

শিশিরকুমারের এই বক্তৃতায় সেদিন দর্শক উল্লাস প্রকাশ না করলেও

আপত্তি করেনি। এবং তারপর বছরের পর বছর শিশিরকুমার নিজের মঞ্চ থেকে ১৫ই আগষ্ট এই সব কথা বলে থাকেন। গত বছর তিনি বলেন যে তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন বলবেন—এ "স্বাধীনতা" ভুয়া স্বাধীনতা। ইতিমধ্যে তাঁর দর্শক এবং তিনি আরো অগ্রসর হয়েছেন—এবারের ১৫ই আগষ্ট তার প্রমাণ।]

১৫ই আগষ্টের অভিভাষণ দেওয়ার আগে শিশিরকুমার "বন্দেমাতরম্" গানটি পুরো শোনেন শ্রীহেমচন্দ্র সেনের মুখ থেকে। হেমবাবুর বয়স ৮০ বছরের কাছাকাছি। ১৯০৫ সালের আন্দোলনের যুগে ইনি স্বদেশী গান গাইতেন এবং অনেক তরুণের মত শিশিরকুমারেরও মনে দেশপ্রেম জাগাতেন। এর পর কত সুকণ্ঠের তিনি কত দেশপ্রেমিক গান শুনেছেন এবং ভাল বলেছেন—কিন্তু এই দিনটি হেমবাবুর গান তাঁর শোনা চাই। তাই প্রতি বৎসর হেমবাবু আসেন এবং তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী কণ্ঠে গানটি গান।

এবার তাঁর গানের শেষে শিশিরকুমার বলতে আরম্ভ করলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি—অনুষ্ঠানটি আরম্ভ করার কিছু আগে তাঁর বিশেষ বন্ধু বললেন: 'আজ কি বলবে ভেবেছ?" উত্তর "কিছুই ভাবিনি।" ওঁদের মাঝখানে ছিলেন —ওঁদের থেকে অন্ততঃ ২০ বছরের ছোট আর একজন। তিনি একটু আবেগের সঙ্গে বললেন: "কেন, আপনি বলতে পারেন—সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ছাড়"। বলতে বলতে ভিয়েৎনাম মালয়, কোরিয়া প্রভৃতিতে সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের কথা বললেন। বক্তার মুখে আবেগের ছাপ এসেছিল—শিল্পী শিশিরকুমার পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন ও একটুখানি স্থির হয়ে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতে হতে বললেন: "আজ বাংলার দুর্দশাই আমার মনকে ভারাক্রান্ত করছে।"

তাই প্রথমেই বললেন: "আজ দুঃখের দিন—স্বাধীনতা দিবস নয়। স্বাধীনতা কোথায়? দেশ বিভক্ত হয়েছে, এক বাঙ্গালী, এক পাঞ্জাবী আর দুই রাষ্ট্রে। এবং এই দুই রাষ্ট্রের মানুষ আজ "স্বাধীন" রাষ্ট্রের মানুষ হিসাবে শুধু দেশ বিভাগের জন্যে কি যন্ত্রণাই ভোগ করছে! আমি ১৯৪৭ সালে যেমন বলেছিলাম তেমনি আজও বলছি আমরা আইনতঃ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের প্রজা —স্বাধীন দেশের লোক নই। রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং নেহেরু যত বাণীই দিন এবং কংগ্রেস বছরের পর বছর এই দিনে যত অর্থের অপব্যয় করুক—একথা আজ সকলের কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। সম্প্রতি আর একটি ঘটনায় আমাদের "স্বাধীনতার" রূপ বোঝা গেছে। আমাদের দেশে আমেরিকার

লোক এসে যদি অপরাধ করে তাহলে তাদের নাকি এদেশের আইনে বিচার করা চলবে না। একে কি স্বাধীন দেশের আইন বলে? এ বিষয়ে বরং চীন সাফল্যলাভ করেছে।

"আইনের প্রসঙ্গে মঞ্চের কথা মনে পড়ে। ইংরাজদের আমলে পুলিশ দারোগার উপর নাটক বিচারের ভার ছিল—আজ পাঁচ বছর "স্বাধীনতার" পর সেই আইন পুরা মাত্রায় বজায় আছে কেন?

"ইংরাজের আমলে কালা: ধলায় মামলা বাধলে সুবিচার সম্ভব ছিল না—কিন্তু কালায় কালায় মামলা হ'লে দুই পক্ষ সমান অর্থ ব্যয় করতে পারলে সুবিচার পাওয়ার আশা ছিল। কিন্তু কংগ্রেসী শাসনে সে সম্ভাবনাও লোপ পেতে বসেছে—শাসক পক্ষের প্রয়োজনে প্রভাবান্বিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা গেছে।

"সাধারণ লোকের খাদ্যের কথা বিচার করুন। দেশে আজ দুর্ভিক্ষের অবস্থা—রেশনের চালে পাথর খেয়ে খেয়ে রেশন এলাকার লোকেরা পেটের রোগে মরণাপন্ন। ফলে দেশের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে। মানুষ যদি মানুষের মত খেতে এবং বাস করতে না পারে তবে কিসের স্বাধীনতা?

"এর পর শিক্ষার কথা বলা যেতে পারে। আমি নিজে শিক্ষক ছিলাম। আপনাদের মধ্যে নিশ্চয় কেউ কেউ শিক্ষক উপস্থিত আছেন। আপনারা বলুন এই যে সব কমিটি, কোড হচ্ছে, প্ল্যান হচ্ছে—এর মধ্যে শিক্ষার উন্নতির কোন্ ব্যবস্থা আছে—যার ফলে সুস্থ জীবন, ছবি, গান, শিল্পের সৌন্দর্য ও সুষমার প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হবে? এই সব ব্যবস্থা আসলে তামাসা—আত্মীয়স্বজন পোষণের ব্যবস্থা এবং শিক্ষার নামে নতুন আমলাতন্ত্র সৃষ্টির চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

"এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার কথা মনে পড়ে। আমরা যাতে বাংলা ভুলে যাই তার ব্যবস্থা হচ্ছে। হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা করার মধ্য দিয়ে এই চেষ্টা চলছে। বলা হয় সুভাষচন্দ্র থাকলে তিনি নাকি এই ব্যবস্থা সমর্থন করতেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তিনি কখনো সমর্থন করতেন না। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নাকি এই ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনি যা বলবেন তাই করতে হবে কেন? হিন্দি কি ইংরাজী বা ফরাসী ভাষার মত উচ্চ স্তরের ভাষা যাকে রাষ্ট্র ভাষা করা যেতে পারে? অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ভাষাকে সারা ভারতের ভাষা করানোর চেষ্টা কি জবরদস্তি নয়?

"প্রায়ই শুনতে পাই আমাদের দেশের মঞ্চ উন্নত হচ্ছে না কেন? কিন্তু

এমনি সামাজিক অবস্থায় কোন জিনিষের উন্নতি কি সম্ভব? আমাদের দেশের বর্তমান সাহিত্য বা শিল্পকলার কি খুব উন্নতি হচ্ছে—যে তার তুলনায় মঞ্চ খুব পেছিয়ে আছে? আমাদের দেশে আজ মঞ্চের বয়স ৮০ বছর। কিন্তু ব্রিটেনের ইতিহাস অন্ততঃ ছশো বছরের। কিন্তু সেখানে আজ মঞ্চের নিদারুণ দুর্দশা কেন? আমাদের মত মানুষের চেষ্টা সামান্য হতে পারে—কিন্তু জাতির সামগ্রিক চেষ্টার সামনে তো সে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এই ব্যবস্থায় তা কি সম্ভব?

"এই সব বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় বাংলার আজ বড় দুর্দিন। আজ আমাদের উপর একটি প্রাণহীন ও আত্মতুষ্টিপরায়ণ শাসন বজায় রয়েছে। এই শাসকগোষ্ঠী প্রকাশ্যে বলছে যে এরা আরো ২৫ বছর শাসনের আশা রাখে। অন্ততঃ আর ৫ বছর ধরে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত এরা টিঁকে থাকবে—এমন আশঙ্কা সাধারণ লোকে করে।

"আমাদের মত ভদ্রশ্রেণীর লোকদের একটি কথা আজ বিশেষ করে মনে করা দরকার যে আমরা জাতির আসল লোক নই। আরো যে শতকরা ৮০ জন লোক আছে—যারা গরীব ও কৃষক—তাদের উপর এই শোষণের চাপ সব থেকে বেশী। কিন্তু তাদের ওরা এখনো মোহগ্রস্ত রেখেছে। দোষ অবশ্য গরীবের নয়। মুনি ঋষিদের যুগ অজ্ঞ রাখার ব্যবস্থা করেনি—যাতে করে তারা যেন তাদের প্রকৃত শত্রুকে না চিনতে পারে। কংগ্রেস যে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দিয়েছে বলে গর্ব করে তার মুখে রয়েছে সাধারণ লোকদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার উপর তাদের ভরসা। কিন্তু কেবল তাতেও সে সম্পূর্ণ নির্ভর করেনি—বহুক্ষেত্রে পয়সা দিয়ে ভোট ক্রয় করেছে। এর উপর আছে বাংলার কয়েকটি নামকরা দৈনিক পত্র—যারা নিজেদের গায়ে আঘাত পড়লে মাঝে মাঝে বেসুরো কথা বললেও আসলে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর জয়ঢাক। কাজেই জনসাধারণ আজ সত্যকথা জানতে পারে না।

"এই 'ভুয়া স্বাধীনতায়' বাংলার সব থেকে বেশী ক্ষতি হয়েছে। তাই আমি আপনাদের প্রশ্ন করি—আপনারা আর কতকাল সহ্য করবেন? আপনারা কি ওদের ঐ ২৫ বছর বা আরো ৫ বছর গদিতে থাকতে দেবেন—না দিনের পর দিন আন্দোলন করে ওদের গদি থেকে সরাবেন? বাংলার তরুণদের কাছেও আমার বলার আছে।

"তরুণরা সত্য প্রচার করবে, সত্যের জন্য পুরুষোচিত গুণ অর্জন করবে, দেশকে ভালবেসে দেশের মঙ্গলের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত হবে—আর

দল বেঁধে কখনো কোন অন্যায় কাজ করবে না—এই আশা আমি তাদের কাছে রাখি।"

[শিশিরকুমার বাংলায় বলেন এবং দ্রুত বলেন—কাজেই সব সময়ে তাঁর সমস্ত কথাগুলি টোকা যায়নি। কিন্তু যতদূর সম্ভব তাঁর কথা রাখা হয়েছে।]

লিটল থিয়েটার গ্রুপ

১৯৫৩ সালেই ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, বহুরূপী ছাড়াও লিটল থিয়েটার গ্রুপের নতুন পদক্ষেপ দেখা গেল। তাঁরা বিদেশী নাটক ইংরেজী ভাষায় অভিনয় করতেন এই প্রথম তারা বাংলা ভাষায় বিদেশী নাটক অভিনয় আরম্ভ করলেন, তাদের প্রথম নাটক কনস্টানটন্ সিমনসের এ রাশিয়ান কোশ্চেন-এর বাংলা অনুবাদ। অনুবাদক সাংবাদিক সরোজ কুমার দত্ত। ৬ই ডিসেম্বর আই টি এ প্যাভিলিয়ন মঞ্চে অভিনয় করলেন। সাংবাদিক আমাদের অভিভূত করেছিল। তখনকার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের দৈন্য যেমন আমাদের হতাশা এনে দিয়েছিল, সাংবাদিক ঠিক যেন এক ঝলক সূর্য ক্ষণিকের মতো উত্তাপময় হয়ে উঠেছিল সেই সন্ধ্যায়। এতে অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, প্রেমাশীষ সেন, সত্য বন্দোপাধ্যায়, হারাধন বন্দোপাধ্যায়, প্রতাপ রায়, শৈলেন সেন, মানসী দাসগুপ্তা, অলকা সেন ও অনুরাধা রায়।

সমন্বয়

১৯৫৩ সালে বরানগরে 'সমন্বয়' নামে একটা নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা হয় যার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা প্রভাত গৌতম। তাঁর সহযোগী ছিলেন ধীরেন নিয়োগী, মনোরঞ্জন সোম, মৃগেন লাহিড়ী, যামিনী লাহিড়ী প্রভৃতি।

'সিরাজদ্দৌলা' সমন্বয়ের প্রথম অভিনীত নাটক। অভিনয় করেছিলো পার্ক ইনস্টিটিউটে। সেই নাটকের কুশীলবদের মধ্যে ছিলেন ধীরেন নিয়োগী, মৃগেন লাহিড়ী, মনোরঞ্জন সোম, বিশ্বভূষণ লাহিড়ী, ৺কমলা অধিকারী, বেলা সরকার, আভা মণ্ডল প্রভৃতি। তারপর এই দলের প্রযোজনায় পরপর অভিনীত হয় পতিব্রতা, গৃহপ্রবেশ, ছায়ানট, প্রতিচ্ছবি, কেদার রায়, অভিনেত্রী, গ্রন্থি, ধস, নাটক পরিচালনা করার কৃতিত্ব প্রভাত গৌতমের।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, কোলকাতার অন্যতম বিখ্যাত নাট্যদল 'অনামী' যে নাটক করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সেই 'প্রতিচ্ছবি' নাটকের প্রথম প্রযোজনার কৃতিত্ব 'সমন্বয়' দলের। প্রভাত গৌতম সম্পাদিত ও নির্দেশিত ঐ নাটক গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং নাটকের অভিনেত্রী লতিকা বসু শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন প্রভাত গৌতম, নীলোৎপল দে (বর্তমানে 'অনামী'র নির্দেশক অভিনেতা), শ্যামল লাহিড়ী, লতিকা বসু প্রভৃতি।

'সমন্বয়' এখনও প্রযোজনা করে চলেছেন। যাঁরা দলে আছেন তাদের মধ্যে মৃগেন লাহিড়ী, প্রভাত গৌতম, প্রাণতোষ চ্যাটার্জী, কৃষ্ণেন্দু আওন, অসীম সেনশর্ম, রুনু ঘোষ, অশোক চ্যাটার্জী, মীরা গৌতম ও ভারতী গৌতম অন্যতম।

১৯৭৩ সালে ৪ঠা মে ব্রজেন্দ্র স্মৃতি সংঘ রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' রঙমহল মঞ্চে অভিনয় করেন। নাট্যরূপ ও পরিচালনাতে ছিলেন বিদ্যুৎ গোস্বামী। এ প্রসঙ্গে ১২ই মে ১৯৭৩ সালে যুগান্তর পত্রিকায় একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয় সেটা এখানে দেওয়া হল।

"ব্রজেন্দ্র স্মৃতি সঙ্ঘের 'শেষের কবিতা'—গত ৪ঠা মে 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চে ব্রজেন্দ্র স্মৃতি সঙ্ঘ রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের নাট্যরূপ, তাঁদের অষ্টম সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষ্যে মঞ্চস্থ করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন অমিত রায়ের ভূমিকায় মঞ্চে সম্পূর্ণ নবাগত সমর চৌধুরী, মিসিরূপে নমিতা চ্যাটার্জী ও অবনীশের ভূমিকায় অরুণ মৈত্র। অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়ও প্রশংসার যোগ্য। নাটকের রূপদান ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শ্রীবিদ্যুৎ গোস্বামী। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসকে নাটকে রূপায়িত করা খুব সহজ কাজ নয়, তাই নাট্যরূপ যে একেবারে ত্রুটিহীন হয়েছে তা বলা যায় না। তবে, এই সমস্ত ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও নাটকখানির অভিনয় যে সমগ্রভাবে উপভোগ্য হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

গণনাট্য সঙ্ঘ / আজকাল

১৯৫৩ সালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ উত্তর কলিকাতা শাখা ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। একটি মধ্যবিত্ত পরিবার কি ভাবে ভেঙ্গে ছারখার হয়ে যায়, কি ভাবে দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানুষ বাঁচবার চেষ্টা করে, সামান্য একটু সুখের সন্ধান পেলেই তার পেছনে ছুটে যায়, কখনো বিশ্বাস হারায়, আবার কখনো বা অনেক কিছু হারিয়ে যা পায়, তারি মধ্যে খুঁজে পায় বিশ্বাসের ভিত্তিমূল। 'আজকাল' কত রাত্রি যে অভিনীত হয়েছে তার হিসেব পাওয়া যায় না। নাটকটির রচনা কাল ১৯৫১ সাল। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শান্তি ভট্টাচার্য, গৌরীশংকর মুখোপাধ্যায়, মণি মজুমদার, দিব্য ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্য শান্তি মুখোপাধ্যায়, রবীন গঙ্গোপাধ্যায়, বাসুদেব ভট্টাচার্য, নারায়ণ গুহ, অমিয় সেন, শোভা মজুমদার ও অনীতা চক্রবর্তী। পরিচালনায় ভানু চট্টোপাধ্যায়।

এই নাটকটি ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১ সালে রঙমহলে অভিনীত হয়েছিল। তাতে উত্তমকুমার, রমেশ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন শীল, তপন মুখোপাধ্যায়, শম্ভু বন্দোপাধ্যায়, ভূপেন হালদার, শংকর বন্দোপাধ্যায়, রঞ্জন বসাক, বাসুদেব পাল, বিদ্যুৎ বোস, শ্যামলী চক্রবর্তী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও ভানু চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় ১৯৫৩ সালে লেখেন 'কানাগলি'। স্টার রঙ্গমঞ্চে ৭ই জুন ১৯৫৫ সালে কৃষ্টি ও সৃষ্টির প্রযোজনায় নাটকটি অভিনীত হয়। এমন মানুষ পথে ঘাটে বাস করে, যাদের ঘর নেই, সংসার নেই, এমন কি এই অন্ধকার গলিটাও যাদের নেই, তাদেরই জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব এই নাটকে স্থান পেয়েছে।

প্রথম অভিনয়ে যাঁরা ছিলেন তারা হলেন, উত্তমকুমার, স্মৃতি কমল কুণ্ড, রমেশ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন হালদার, শম্ভু বন্দোপাধ্যায়, নির্মল চক্রবর্তী, শৈলেন শীল, তপন মুখোপাধ্যায়, নন্দ মুখোপাধ্যায়, গোরা মিত্র, বীরেন কুণ্ডু, শম্ভু নন্দী, বাণী গাঙ্গুলী, মেনকা দত্ত, বেলা সরকার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনায় ভানু চট্টোপাধ্যায় ও শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। এরপরে ভানু বাবু মসিজীবি, লাল মাটি, বোন, প্রস্তাবনা, জীবন মৃত্যু নাটক লেখেন। রমানাথ সেনগুপ্ত, শান্তি মুখার্জী, দিব্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, তরুণ চন্দ্র, কানু মণ্ডল, অমিয় সেনগুপ্ত, সীমা দাস, শঙ্করী বিশ্বাস, কল্যানী সেনগুপ্ত, অতুল ভট্টাচার্য, নারায়ণ গুহ রায় প্রভৃতি ছিলেন অভিনয়ে। রূপসজ্জা শক্তিসেন। পরিচালনায় টিপু দাসগুপ্ত।

গণনাট্য আন্দোলনে / রাহুমুক্ত

১৯৫৪ সাল ২০শে আগষ্ট ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের নতুন পদক্ষেপ শুরু হল। আরো বেশী মাটির কাছাকাছি যেতে হবে, আরো বেশী জনতার মাঝে যেতে হবে। তাই দক্ষিণ কলিকাতা শাখা বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'রাহুমুক্ত' যাত্রা দিয়ে শুরু করল নতুন পথের যাত্রা। যে সময়ে যাত্রা পাড়ায় সেই মান্ধাতা আমলের পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়েই পালা গাওয়া হত। যে জনসাধারণ এই যাত্রাপালাকে বুক দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই জনগণের লাগছিল একঘেঁয়ে। কারণ হয়তো ঐ একটাই। দিনে দিনে সংঘাত সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সেই জনতার রূপ পাল্টাচ্ছে, কিন্তু যাত্রাপাড়া যেখানে ছিল সেই-খানেই রয়ে গেল। সেই একঘেঁয়ে পুরনো আঙ্গিক আর বক্তব্যর বাইরে যেতে পারল না যাত্রাপাড়ার শিল্পীরা। পারল না বলেই তারা সেই একই জায়গায় রয়ে গেল। বাংলা দেশের বিপ্লবী জনগণ সেই পুরনো বস্তাপচা কাহিনী আর দেখতে চাইল না। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ সেই মুহূর্তেই আনল রাহুমুক্ত। জনগণ তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। রাহুমুক্ত সম্বন্ধে একটা কথাই বলা যায় একটি রূপক আঙ্গিকের মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে এই নাটকে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই যাত্রাকে অন্তরঙ্গতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে, এটাই রাহুমুক্তর বৈশিষ্ট্য। বনগাঁও কৃষক সম্মেলনে হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে এই যাত্রা অভিনয় হবার পরে দলে দলে কৃষকেরা শিল্পীদের অভিনন্দিত করেছিল। বরা কমলাপুরের সুদূর গ্রামে গরুর গাড়ি করে গিয়ে এই যাত্রা অভিনয়ের কথাও ভোলবার নয়। বিভিন্ন সময়ে এতে যারা অভিনয় করেছেন: জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, হীরেণ সেনগুপ্ত, অমর মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীর চৌধুরী, রাধা চক্রবর্তী, শিশির সেন, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ঘোষ, ধীরেন দাসগুপ্ত, মণিমোহন, ধীরেশ আচার্য, অতুল ভট্টাচার্য, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, অজিত নাথ বন্দোপাধ্যায়, বীরেশ মুখোপাধ্যায়, বীরু মুখোপাধ্যায়, পরিতোষ সান্যাল, পৃথ্বীশ রায় চৌধুরী, উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা মজুমদার, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ চক্রবর্তী, পার্থ বসু, সবিতাব্রত দত্ত, মণ্টু ঘোষ, সাধনা রায় চৌধুরী, কল্পনা রায়, শেফালী ব্যানার্জি, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, সুমিত্রা ঘোষ, নিবেদিতা দাস, সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়, রেবা রায়চৌধুরী। নাটকটি নির্দেশনা করেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।

বহুরূপীর 'রক্তকরবী' / নব নাট্যের যাত্রা শুরু

১৯৫৫ সাল, বাংলা দেশের প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলন জনগণের মনে তখন একটা স্থায়ী আসন পেতে ফেলেছে। আর তাকে আলাদা করে ভাবা যায় না। আর তাকে এক ঘরে করে রাখারও কোন সম্ভাবনা নেই। পেশাদারী মঞ্চ কিন্তু সেই আবর্ত থেকে বেরুতে পারছে না। অন্যধারে বহুরূপী রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', শান্তি বসুর ইবসেনের 'দশ চক্র', রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' বাংলা থেকে দিল্লী পর্য্যন্ত একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে ফেলেছে। এবং এই রক্তকরবী অভিনয় করেই বহুরূপী প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসবে বাংলার হয়ে শ্রেষ্ঠ সম্মান নিয়ে এসেছে। ১০ই মে ১৯৫৪ সাল রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী প্রথম মঞ্চস্থ হল রেলওয়ে ম্যানসন ইন্সটিটিউট হলে। শচীন সেনগুপ্ত বহুরূপীর প্রথম পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'যাত্রা শুরু' করেই বহুরূপী দেখতে পেয়েছে তার মাথার ওপরকার আকাশ ঘন মেঘে কালো হয়ে উঠছে। অপ্রীতির তুফান তার ছোট্ট তরীখানাকে আঘাতে আঘাতে নিরন্তর কাঁপিয়ে দিচ্ছে, তীরে দাঁড়িয়ে শিবাকুল অমঙ্গল ধ্বনি তুলছে। শিশু বহুরূপী চেয়ে চেয়ে সবই দেখেছে। শঙ্কায় সংশয়ে তার বুক অবিরত দুর দুর করেছে। কিন্তু বহুরূপী দিশা হারায়নি, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়নি। তার আত্মপ্রত্যয়ী কর্ণধার শক্ত মুঠোয় হাল ধরে অকম্প বসে রয়েছে। তার মাল্লারা ভয়ে কেঁপে কখনো পাল টেনে নামায়নি। বিপদ কাটিয়ে বিঘ্ন অতিক্রম করে বিদ্রূপকে লজ্জা দিয়ে বহুরূপী এগিয়েই চলেছে। সুফলও পেয়েছে সে। সারা ভারত তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছে সাবাস বহুরূপী, সাবাস। সার্থক তোমার সাধনা। কী এই সাধনা? সাধনা সত্য সন্ধানের, সাধনা সুন্দরকে রূপ দেবার, সাধনা নাট্য অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষকে সত্যাশ্রয়ী হবার, সুন্দরতর জীবন যাপনের প্রেরণা দেব।"

রক্তকরবী প্রসঙ্গে শম্ভুদা বলেছেন "বহুরূপী"র ঐ সংখ্যাতেই, আমাদের রক্তকরবী ভাল লাগে। যেমন অনেকেরই লাগে! অনেক বারই আমার মনে হয়েছে যে ওটা অভিনয় করি। আবার প্রত্যেক বারই মনে হয়েছে যে আমরা পারব না। আমাদের পক্ষে এ কাজ কঠিন, তারপর একদিন খালেদ চৌধুরী বহুরূপীতে এলেন এবং রয়ে গেলেন। লোকটির অস্বাভাবিক ক্ষমতা, আঁকতে পারেন, যে কোন বাজনা বাজাতে পারেন, গান শেখাতে পারেন, আর যতো

নতুন নতুন জিনিষ উদ্ভাবন করতে পারেন। তাঁকে পেয়ে আবার আমাদের মাথায় রক্তকরবীর চিন্তা পেয়ে বসল।

"পড়া হোল সকলে মিলে। একদিন না, বেশ কয়েকদিন। সকলেরই ভাল লাগে, রোজই ভাল লাগে। তারপর হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল রক্তকরবী করবো, সকলের মনে হচ্ছিল করা যাক, না করলে ভাল লাগছে না।" বহুরূপীর শিল্পীদের যেমন মনে হয়েছিল না করলে ভাল লাগছেনা, আমাদেরও কিন্তু মনে হয়েছিল মঞ্চে এই মহৎ নাটক না দেখলে ভাল লাগছে না। শম্ভুদা আমাদের সেই সাধ মিটিয়েছেন এ জন্যে শম্ভুদা এবং বহুরূপীর শিল্পীদের জানাই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। রক্তকরবীর প্রথম অভিনয় নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটয়ে দেখলাম। মনে হল কি যেন দেখা হয়নি, আবার দেখেছি তাতেও কি যেন মিস করছি। আবার দেখেছি তাতেও মন ভরেনি। একটা বিরাট ক্যানভাসের ওপর একটা মহৎ অঙ্কন শিল্প দেখলে যেমন মনে হয় যতো দেখছি নতুন কিছু পাচ্ছি। আরো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আরো গভীরে যাবার জন্যেই তাই আরো দেখি।

রক্তকরবী

প্রথম অভিনয় ১০ই মে/রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট

—ঃ চরিত্রলিপি ঃ—

নন্দিনী	....	তৃপ্তি মিত্র
কিশোর	....	পরেশ ঘোষ
অধ্যাপক	....	গঙ্গাপদ বসু
গোকুল	...	বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়
রাজা	....	শম্ভু মিত্র
ফাগুলাল	....	মহঃ জ্যাকেরিয়া
চন্দ্রা	....	আরতি মৈত্র
বিশু	.....	শোভেন মজুমদার
সর্দার	...	অমর গাঙ্গুলী
গোঁসাই	....	নির্মল চ্যাটার্জী (পরে কুমার রায়)

মোড়ল	....	পুলিন বসু
ছোট সর্দার	....	সমীর চক্রবর্তী
পুরাণ বাগীশ	....	সন্তোষ ব্যানার্জী
গণ্ডু	....	শীতাংশু মুখোপাধ্যায়
চিকিৎসক	....	অনিল ব্যানার্জী
৩২১ মোড়ল	....	অমর পাঠক

গণনাট্য আন্দোলন যেখান থেকে শুরু করেছিল, বহুরূপী সহরের নব নাট্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নতুন জীবনধর্মী নাট্য আন্দোলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল এই রক্তকরবীর মাধ্যমেই। সংগঠন প্রসঙ্গে গঙ্গাপদ বসু বহুরূপীর সভাপতির কৈফিয়ত হিসাবে বলতে গিয়ে বহুরূপীর ঐ সংখ্যাতেই লিখেছেন :

"একটা গল্প বলি, শুনুন :

অনেক দিন আগে একটি প্রগতিশীল দলের এক বিখ্যাত নাটকে একটি কুচক্রী গ্রাম্য লোকের ভূমিকায় অভিনয় করতাম। নাটকটি রঙ্গজগতে নানা কারণে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আমার অভিনীত চরিত্রটিও লোকের মনে একটা বিশ্রী রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত, এটা বুঝতে পেরে স্বভাবতঃই খুশী হতাম, হঠাৎ এক দিন ঐ দলের একটি মেয়ে এসে বললো : 'আপনাকে এক দিন আমাদের বাড়ী যেতে হবে, দাদা। নইলে আমার তো আর অভিনয় করতে আসাই হবে না।'

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : 'কেন ? বাড়ী থেকে আপত্তি উঠছে নাকি ?'

সে বললো : 'হ্যাঁ। আপত্তিটা আপনার জন্যেই। মা বলেছে, যে দলে ঐরকম লোক আছে সেখানে তোমার যাওয়া হবে না বাপু।'

অতিরিক্ত বিস্ময়ে লোকের চোখ দুটো নাকি কখনো কখনো ছানা বড়ার মতো হয়ে ওঠে। আমার চোখও সেই রকম হয়ে উঠেছিল কিনা বলতে পারি না। তবে একেবারে ভেতরে চুপসে গিয়েছিলাম, সেটা এতদিন পরেও বেশ মনে আছে। কোন মতে বললাম : 'কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাঁর এরকম ধারণা হ'লো কেন ? তাঁর সঙ্গে আমার কোথাও দেখা হয়েছে বলে তো মনে করতে পারছি না।'

আমার অবস্থা দেখে মেয়েটা হেসে ফেললো। বললো : 'আপনি নার্ভাস হয়ে পড়েছেন, এটা আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আসল ব্যাপারটা

হচ্ছে আপনার অভিনয় দেখে যার মনে ভীষণ রিঅ্যাকসন হয়েছে। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছেন না যে আপনি ভালো লোক।'

'সর্বনাশ! তা কী বলছেন তিনি?' আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। মেয়েটি বললো: 'মা বলছেন, ও লোকটা এমনিতেও নিশ্চয়ই খারাপ, নইলে অমন করে কেউ হাসতে পারে? তাছাড়া মানুষের চাউনি দেখলেই তার ভেতরটাও নাকি চেনা যায়। কাজেই ঐ সব লোক নিয়ে যেখানে দল সেখানে কোন ভদ্রলোকের মেয়ের যাওয়া উচিত নয়।'

কয়েকজন মিলে গেলাম তাদের বাড়ী। মেয়েটি আলাপ করিয়ে দিল তার মায়ের সঙ্গে। কিন্তু ভদ্রমহিলা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না যে আমিই সেই লোক। মেয়েকে বললেন, 'বাপু, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। এখনো মুখ দেখলে চিনতে পারব না? তোরা যে কী ভাবিস আমাকে? এ সে মুখও নয়, চোখও নয়, হাসিও নয়'—

অবশেষে সেই অভিনীত চরিত্রটির মত করে কথা বলে, হেসে এবং তাকিয়ে তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করতে হলো। ভদ্রমহিলা তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে খুশীই হলেন এবং সকলকে আশীর্বাদ করে বললেন: 'তোমাদের আদর্শ জয়যুক্ত হবেই। এই রকম লোকগুলোর মুখোস খুলে দেখাও সকলকে। জানো, আমাদের গাঁয়েও ঠিক এই রকম একটা লোক ছিল। অনেক বয়েস পর্যন্তও তার কথা মনে হলে আমার গায়ে কাঁটা দিত্।'

মোটামুটি শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা। অথচ তাঁর এই বিভ্রম। এর জন্যে দায়ী কে? তিনি যে আমাদের সেই দলটিকে একটা সাধারণ সখের থিয়েটারের দলের চেয়ে কিছু বলে ভাবতে পারেন নি, তিনি যে অভিনীত চরিত্র আর অভিনেতা-শিল্পীকে অভিন্ন বলে ধরে নিয়েছিলেন, এর মূল কারণটা কী? আমার কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল, কারণটা যাই হোক, দোষটা আমাদেরই, আমাদের কথা আমরা তাঁর কাছে পৌছে দিতে পারিনি। তিনি থিয়েটার দেখে এসেছেন এবং নিজের মনে মনে একটা ধারণা করে বসে আছেন।

'পথিক' নাটকের অভিনয় দেখে একটি ভদ্রলোক বলেছিলেন: 'মশাই, সেই 'নবান্ন' নাটকে যে চট দেখিয়েছিলেন এখানেও সেই চট। আপনারা কি দৃশ্যপট ব্যবহারের বিরোধী? না, এটা একটা স্টাণ্ট?

এখানেও সেই অজ্ঞতা যার ত্রুটি আমাদেরই। প্রত্যেক অভিনয়ের শেষে চটের ব্যাখ্যা করাটা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনটা অনস্বীকার্য।

ঠিক এই একই ধরণের ভুল ধারণা, অপপ্রচার এবং ভ্রান্ত ব্যাখ্যার পাহাড় ঠেলে নতুন নাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে চলতে হচ্ছে, এগিয়ে চলতে হচ্ছে বহুরূপীকেও। অথচ দেখেছি, আমাদের প্রত্যেকটি নাটক সম্বন্ধে, আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে, আমাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ লোকের অপরিসীম। একটা ভালো নাটক দেখার পর তাঁদের জানতে ইচ্ছা করে: কেমন করে এরা কটা করলো, কেন এমন করে করলো? কেউ হয়ত সার্থক শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস দেখে আমাদের গলায় অকুণ্ঠভাবে ঝুলিয়ে দিলেন জয়ের মালা, আবার অন্য কেউ হয়ত বা সংশয়দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, এরা যেন কার ঢাকের বাঁয়া! প্রচারের ঝাণ্ডা নিয়ে বেরিয়েছে! এমন লোকও দেখেছি, যাঁরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, আমাদের রং কী তাই জানবার জন্যে। অর্থাৎ আমরা কি সাদা, না হলদে? নীল, না লাল? নিজের মনে নিজের মত করে যুক্তি দিয়ে এঁরা যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে যে কোনো রংএ রঞ্জিত করে প্রচার করেছেন, যে কোন দলের ঘাড়ে যে কোন উদ্দেশ্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন তাদের অজ্ঞাতসারে এবং যে কোনো ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন অত্যন্ত লঘুভাবেই।

এই অবস্থার প্রতিকার কী? যাঁরা সত্যি সত্যি আমাদের কথা জানতে চান তাঁদের মধ্যেও যেমন,—যাঁরা অপপ্রচার করেন তাঁদের জন্যে তেমনিই প্রয়োজন আছে আমাদের তরফের প্রচারের। নতুন নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত থাকার ফলে এই কথাটা বার বার মনে হয়েছে, আমরা যা করতে চাই তা লোককে বুঝিয়ে বলবার দরকার আছে। যা করেছি এবং যা করতে চেয়েছি অথচ করতে পারিনি দুটোর কথাই জনসাধারণের দরবারে পেশ করবার আবশ্যকতা আছে। ভালো করে ভাল নাটক করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, আমাদের আনন্দ বেদনার সংবাদও আমাদের দরদীদের জানাতেই হবে।

যেমন ধরুন, বহুরূপী ভাবছে একটা নিজস্ব স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের কথা, কিন্তু ব্যাপারটা ভাবা মাত্রই করে ফেলা যায় এমন সহজ তো নয়। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তবে এই রকম একটা কথা ভাবতেও পারা যায়, এমন একটা পর্যায়ে বহুরূপী এসেছে, এটাও বড় কম কথা নয়। আমরা জানি, আমাদের অগণিত গুণগ্রাহী দরদী আছেন, আছেন আমাদের অনুগ্রাহক সদস্যরা, যাঁদেরকে আমরা বহুরূপীর স্তম্ভ বলে মনে করি। বহুরূপী ভাবনাটা তাঁদের কাছে

পৌঁছে দিতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে নিজস্ব রঙ্গনালয়ে নিজস্ব পাদপ্রদীপের আলোকে নাট্যরসিক জনসাধারণকে আমরা অভিনয় দেখবার আমন্ত্রণ জানাতে পারব, এ বিশ্বাসও আমাদের আছে। তবে ভাবনাটা পৌঁছে দেওয়া চাই এবং ভালো করে পৌঁছে দেওয়া চাই। যে কোন পরিকল্পনার সার্থকতা এবং সাফল্য নির্ভর করে ভালো করে তার প্রয়োজনটা উপলব্ধি করবার এবং করাবার ওপর। এর জন্য প্রয়োজন আছে প্রচারের।

"মনে আছে 'রক্তকরবী' অভিনয়ের গোড়ার দিকে প্রথম তিন দিন আমাদের অভিনয়ের পূর্বে 'রক্তকরবী' সম্বন্ধে গুরুদেবের নিজস্ব মতামত উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যামূলক বক্তৃতা করতে হয়েছিল। অর্থাৎ ঐ রকম করে কিছু বলবার প্রয়োজনটা আমরা বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করেছিলাম এবং পরে দেখা গেল, অত করে বক্তৃতা করেও বিরূপ সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না, এমন কি অভিনয় বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও শুনতে হলো। বাংলা দেশের নাট্যরসিক জনসাধারণকে ধন্যবাদ, আজ অবস্থাটা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এক্ষেত্রেও আমরা অনুভব করছি, বহু চিন্তা, গবেষণা এবং শারীরিক পরিশ্রম করে, ব্যক্তিগত ভাবে আর্থিক দিকে লাভবান হবার বিন্দুমাত্র আশা না রেখে, সমষ্টিগত ভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে একটি নাটক মঞ্চস্থ করবার পর যখন কিছু সংখ্যক লোকের অকারণ অপপ্রচারের ও বাধার সম্মুখীন হতে হয় তখন শুধু রসিক দর্শকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মত নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না আমাদের।"

রাজনৈতিক দলের সুবিধা আছে, তাঁরা মাঠে ময়দানে সভা করে নিজেদের মতামত প্রচার করতে পারেন, সংবাদপত্র তাঁদের মতামত পছন্দ না করলেও খবর হিসেবে ছাপতে বাধ্য হয় নিরপেক্ষতার নামে অর্থাৎ ব্যবসার খাতিরে। আর্টের শ্রীক্ষেত্রে লোক জড়ো করবার ভালো উপায় হচ্ছে ভালো করে ভালো ভালো খেলা দেখানো, বড়জোর আমরা যে ভালো খেলা দেখাতে পারি তার বিজ্ঞাপন কাগজে লিখে রসিক লোকদের বাড়ী পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। অর্থাৎ এখানেও প্রচারের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার ধরনটা হবে আলাদা। এই ধরন অর্থাৎ 'ফরম' নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু তবু 'বহুরূপী'র রূপকারদের মনে গোড়া থেকেই একখানা পত্রিকা প্রকাশের ভাবনাটা ছিল। মহর্ষি প্রায়ই বলতেন : 'দেখ, তোমাদের

কথা জানবার একটা আগ্রহ লোকের হয়েছে, কিন্তু জানাবে কি করে? এই জন্যেই কাগজ একখানা থাকা দরকার।'

আজ মহর্ষি নেই। কিন্তু তাঁর অভীপ্সিত পত্রিকা আমরা করলাম। দৈনিক নয়, সাপ্তাহিক নয়, মাসিক নয়—আমাদের পত্রিকা নিতান্তই আকস্মিক। দরদীদের কাছ থেকে উৎসাহ পেলে নিয়মিত ভাবে পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা তো রয়েছেই—কেননা আমরা বিশ্বাস করি দরদীদের আগ্রহ এবং উৎসাহই যে-কোন শিল্প সংস্থার অগ্রগতির পথের পাথেয়। আমাদের দেশেও যেমন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তেমনই, সৌখিন মঞ্চ দেশের জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে পুষ্ট হ'ত এবং দরদীরাই ছিলেন এর প্রকৃত পরিচালক। সেদিনকার সৌখিন মঞ্চের সঙ্গে আজকের সৌখিন মঞ্চের স্বভাবতঃই কোন মিল নেই। সেদিনকার আবেদন ছিল; অনুগ্রহ করে আমাদের অভিনয় দেখে আমাদের উৎসাহ দিন। আর আজকের আবেদন হল, আমাদের অভিনয় দেখবার মত বলেই দেখুন। দরদীদের মনোভাবের তাই আজ পরিবর্তন হয়েছে। আজ তাঁরা অপেশাদার সম্প্রদায়ের অভিনয় নিছক অর্থ সাহায্য করবার বা অর্থের অপব্যয় করবার মনোভাব নিয়ে দেখতে আসেন না, পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে অ-পেশাদার সম্প্রদায়ের তুলনা করেই তাঁরা অভিনয় দেখে থাকেন। অর্থাৎ পেশাদার না হলেও তাঁরা আমাদের কাছে আশা করেন পেশাদারী যোগ্যতা, হয়ত তার চেয়েও কিছু বেশী। তাঁদের এই আশা আমাদের পূর্ণ করতে হবে সর্ববিষয়েই। এমনকি বহুরূপীর নিজস্ব পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের যে কল্পনা ব্যক্ত করলাম সে সম্পর্কেও। উভয়পক্ষের কল্যাণে, নাট্য-আন্দোলনের প্রগতির প্রয়োজনে একখানি সুন্দর সুরুচিপূর্ণ পত্রিকা থাকা বহুরূপীর দরকার, এই বোধ সৃষ্টি করতে পারলেই কল্পনা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করবে, এ আত্মপ্রত্যয় নিরর্থক নয়। কেননা পেশাদার নাট্য-আন্দোলনের ব্যবসায়িক দিক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একজন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ যা লিখেছেন তা আমাদের পক্ষেও সমভাবে প্রযোজ্য:
—"Business and Art and a little artfulness must go hand if the Amateur Movement is to continue to fulfil the promise of its childhood and to play its full part—a leadiug role perhaps—in what every lover of the theatre hopes for in the future, another and an even greater. English Drama renaissance." (Theatre & stage. Vol. I, p. 31.)

রক্তকরবী নাটকের মধ্যে দিয়ে বহুরূপী বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে যে

একটা পথের চিহ্ন এঁকেছিল তারই উদাহরণস্বরূপ উৎপল দত্তের সম্পাদনায় সমীরণ দত্তের সহযোগিতায় ১৯৫৫ সাল নাগাদ যে পাদপ্রদীপের একটি বিশেষ সংখ্যায় উৎপল দত্ত বহুরূপীর 'রক্তকরবী' নিয়ে একটি আলোচনা করেন সেই লেখাটি আমি হুবহু ছেপে দিলাম।

বহুরূপী ও রক্ত-করবী

উৎপল দত্ত

"বহুরূপী সম্প্রদায়-অভিনীত 'রক্তকরবী' দেখে সাধারণ দর্শক বিস্ময়াভিভূত হয়ে আশীর্বাদ করে গেলেও তথাকথিত ওয়াকিবহাল মহলে বহুরূপীর পাশপোর্ট শম্ভুবাবু সুদূর দিল্লী থেকে এই সেদিন যোগাড় ক'রে এনেছেন। এখন সেই অপরূপ যোদ্ধার দল কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলছেন—হ্যাঁ, মন্দ করেনি বটে! প্রতি কথায় প্রতি সমালোচনায় সেই একই ভাব পরিস্ফুট —যেন বাংলা দেশে অমন নাট্য প্রয়োগ প্রায়ই হয় এবং তারই মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য অভিনয় বহুরূপীর। এ বাঙ্গালী নাট্য সমালোচকদের আত্ম সন্তুষ্টির আর একটি নিদর্শন।

আসলে শম্ভুবাবুর সূক্ষ্ম রসবোধ এবং প্রয়োগ কৌশলের অভিনবত্ব এমন এক নাটক সৃষ্টি করেছে যা' বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রকৃত ঐতিহ্যকে ধরে তাকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। বিগত পঁচিশ বৎসরে বাংলা দেশে কোনো নাটক এ করতে পেরেছে বলে জানা নেই। এটা স্বীকার করতেই রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ-সাধকদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। শম্ভু মিত্র এক প্রচণ্ড ব্যতিক্রম। উদাহরণস্বরূপ থেকে থেকে নিউ এম্পায়ারের ঠাণ্ডাগৃহে রবীন্দ্রনাথের সরকারী উদ্যোক্তাদের যে নাট্যানুষ্ঠানগুলি হয়, তার একটা দেখে আসবেন (শেষ পর্য্যন্ত বসে থাকা যদিও অতীব কষ্টকর), প্রথমতঃ দেখবেন কালোপর্দার সামনে একসার যন্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ দৃশ্য-সজ্জার কৃত্রিমতা পরিহার করার যে পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন সেটাই এঁদের হাতে কৃত্রিমতম একটা ভাঁওতাবাজীতে পরিণত হয়েছে, এঁরা যেন প্রতিমুহূর্তে নিরুক্ত চীৎকার করতে থাকেন—দৃশ্য-সজ্জা আমরা ব্যবহার করি না; কবিগুরুর নিষেধ আছে। দ্বিতীয়তঃ দৃশ্য-সজ্জাহীন মঞ্চে (কারণ একা অভিনেতাকেই এখন দর্শকের প্রাথমিক অবিশ্বাস ভেঙে তাকে নাটকের মধ্যে টেনে নিতে হবে) সেই অভিনয় পদ্ধতির কী হাল

হয়েছে ? বাচিক অভিনয়ে শুধু শুনবেন বৃহন্নলার আর্তনাদ ; বিরাট বক্ষ, দীর্ঘ দেহ যুবাও আপ্রাণ চেষ্টায় তার কণ্ঠস্বরকে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকায় সাদৃশ ক'রে কাঁদছে। একবার দেখেছিলাম, আজানুলম্বিত শ্মশ্রু নিয়ে (সেটা রবিঠাকুরের ছবিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, বাদ দিতে চাইলেও, যায় না) জয় সিংহ আত্মদানের মুহূর্তে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের অপর প্রান্তে ত্রিভঙ্গমুরারী রঘুপতিও ; অথচ পণ্ডিতেরা বলেন "বিসর্জনের" ওই দৃশ্যটি বীররসের এক অপূর্ব প্রকাশ। আর, আঙ্গিক অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ যে আশ্চর্য্য পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তাকে এঁরা পরিণত করেছেন কতকগুলি অর্থহীন হস্ত ও বপু সঞ্চালনে—কথক, মণিপুরী বা ভারতনাট্যম্‌-আদির সঙ্গে কোনো-ক্রমেই যার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে গেলে যেমন তাল-লয়—সুর-ঠাট্‌—পর্দা-তান কিছুরই প্রয়োজন হয় না বলে অনেকের দৃঢ় ধারণা, এও ঠিক তেমনি। একবার এক, 'নটীর পূজা' দেখে চমকে গিয়ে-ছিলাম ; শেষকালে শ্রীমতীর নৃত্য কী একটা ঢং-এ খুব জমে উঠেছে, এমন সময়ে প্রতিহারিণী এগিয়ে এসে শ্রীমতীর ঘাড়ের কাছে একটা মাছি তাড়ালেন—পরমুহূর্তে বিষাদঘন সারেঙ্গী বাদনের তালে তালে ধাপে ধাপে শ্রীমতী মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। অন্ধ আমি, বুঝতেও পারি নি : ওটাই রবীন্দ্রকল্পিত নিদারুণ অস্ত্রাঘাত—নাটকের ক্লাইমেক্স।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে "শম্ভুমিত্রের" প্রয়োগ পদ্ধতিকে ; রবীন্দ্রনাথ-কে এই সব নপুংসক প্রয়োগকর্তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে শম্ভুবাবু প্রতি বিষয়ে একটি করে বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মেরেছেন। তার জবাব দেবার ক্ষমতা না হওয়ায় অবশেষে নিষেধাজ্ঞার গুণ্ডাবাজীও কিছুদিন চালানো হোলো। এই ভাণ্ডাবাজীই তথাকথিত রবীন্দ্রভক্তদের চরম পরাজয়ের স্বীকারোক্তি—এই গুণ্ডাবাজীই শম্ভুবাবুর জয়।

আমরা এখন এই চ্যালেঞ্জ ক'টির কিছু আলোচনা করবো।

প্রথমেই আসে রবীন্দ্র-নাট্যের রূপক ও সংকেতের জটিল প্রশ্ন। এতকাল রবীন্দ্ররূপক-নাট্য অভিনয় হয়েছে এই দ্বৈত জটিলতা বজায় রেখেই। অর্থাৎ যক্ষপুরীর ঘটনাগুলি যেমন আধুনিক সমাজের নানা দিকের রূপক প্রতিচ্ছবি—তেমনি প্রতিটি চরিত্র আবার নানা ভাবের অসার প্রতীক। রক্তমাংসের মানুষ "রক্তকরবীতে" নেই—আছে নানা আইডিয়ার দেহপ্রাপ্ত মূর্তি। যেমন রাজা বোধ করি মানুষের অন্তরতম মুক্ত আনন্দময় সত্তার প্রতীক, যাকে



১৯৫৪ সালে নয়াদিল্লীতে জাতীয় নাট্যউৎসবে রক্তকরবী নাট্যানুষ্ঠানের শেষে স্থানীয় অনুগ্রাহকদের সঙ্গে বহুরূপীর সভ্যরা।



'আমাদের অঙ্গীকার'-এ হাজার শিল্পীর মাঝে নির্দেশক শম্ভু মিত্র।



সুরকার-নাট্যকার সলিল চৌধুরী, সাংবাদিক-নাট্যকার প্রবোধবন্ধু অধিকারী ও দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার পরিষদের উৎসবে বীরু মুখোপাধ্যায়, সজল রায়চৌধুরী, কালী ব্যানার্জী ও অমিতা রায়।

ধনতন্ত্রের এবং পশুশক্তির মত্ত একটা জালের রূপ ধরে বন্দী করে ফেলেছে ; নন্দিনী লীলাময় প্রাণের প্রতীক ; রঞ্জন যৌবনের প্রতীক—এবং যৌবনকেই হত্যা করে করে রাজার জীবন অভিশপ্ত হয়ে গেছে। এরকম সবাই। শম্ভুবাবুর সাহসিকতার পরিচয় এখানেই—রূপক বজায় রেখে (কারণ রূপকটুকু বাদ দিলে রক্তকরবীর থাকে কী ?) চরিত্রগুলিকে সাংকেতিকতার গুরুভার থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। নন্দিনীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রের হাসি-কান্না শুনতে শুনতে কখন যে তাকে ঘরের লোক বলে স্বীকার করে নিয়েছি নিজেই জানি না। ক'ঙ্গাল ও চন্দ্রাকে আমরা বহুবার দেখেছি। দেখেছি গোঁসাইকে, কলকাতার আশেপাশে কারখানার কাছে দেখেছি গফুর পালোয়ানকে, অধ্যাপককেও চিনলাম। এই জন্যই এত ভাল লাগলো "রক্তকরবী" ; সামগ্রিক কাহিনীর রূপকটা আরো স্পষ্ট, আরো নিকট হয়ে এল কতকগুলি রক্তমাংসের মানুষের মাধ্যমে।

এই উদ্দেশ্যেই কল্পলোকের যক্ষপুরী ছেড়ে শম্ভুবাবু আমাদের নিয়ে এলেন আমাদের অতি পরিচিত জগতে, শ্রমিককে পরালেন শ্রমিকের পোষাক ; আবৃত্তি না ক'রে তার কথা কইল সেই ভাষায়, যে ভাষায় আমরা কথা কই। কোনো কোনো সমালোচক ইদানীং বলতে শুরু করেছেন— এ আর নতুন কী ? রবীন্দ্রনাথ তো তাই বলতে চেয়েছেন ? তিনি মোটেই তা চান নি, কারণ রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার সামনে বারবার তাঁর নাট্য-সংযম হার মেনে কাব্য ও দর্শনের স্রোতে ভেসে গেছে। কোনো অধ্যাপক জগতে নেই যে বলে :

"ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন। যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন না হয় সাড়া দিয়ে গেলে।"

পৃথিবীতে কোনো ঈশানীপাড়ার মেয়ে নন্দিনীর মতো ছন্দে ছন্দে জীবন দর্শন ঘোষণা করতে পারে না। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ-কল্পিত অধ্যাপক ও ওপাড়ার নন্দিনী কবি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এক রূপকথার রাজ্যে উন্নীত হয়েছে, তারা তাদের শ্রেণীচরিত্র হারিয়েছে। বহুরূপীর অভিনয়ে এরকম বহু চরিত্রের ছান্দিক ও ভাবগত সৌন্দর্যকে ইচ্ছে করেই পরিত্যাগ ক'রে তাদের আমার জাগতিক পরিবেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বিশুকে নন্দিনী যখন বলে, "বিশুদা, আমার দুখ হলে না। একথা কোনো দিন ভুলতে পারবো না, তোমাকে দুঃখ হাতে বিদায় দিয়েছি।"—তখন তার অন্তর্নিহিত বেদনাকে তার উপস্থিত করার দিকে নজর না দিয়ে শম্ভুবাবু কথাগুলি অতি সাধারণভাবেই

বলিয়েছেন, যেন সুখ দুঃখের কথা হচ্ছে কোনো নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে। জবাবে বিশু বলছে :

"মনে যে আগুন দিয়েছো, তাতে ওর (কিশোরের) অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে। আর কী চাই? মনে আছে, সেই নীলকণ্ঠের পালক রঞ্জনের চূড়ায় পরিয়ে দিতে হবে?"

নন্দিনী বলে : "এই যে, রয়েছে আমার বুকের আঁচলে।"

সাহিত্যিক ও দর্শনের ছাত্রদের কাছে এ হয়তো এক নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান দেবে, প্রযোজক শম্ভু মিত্রের কাছে এ নেহাতই ঘটনা—কারণ সত্যিই নীলকণ্ঠের পালক রয়েছে নন্দিনীর কাছে। অনস্বীকার্য রবীন্দ্র কাব্যস্রোত অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু কাব্যস্রোতকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে, নাটকের মূল উপাদান, কতকগুলি মানুষ এবং তাদের অত্যন্ত মানবিক অনুভূতি—এগুলির ঘটতো অপমৃত্যু। রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকেই দেখতে পাওয়া উচিত, কবিকে নয়। বহুরূপীর অভিনয়ে যে অধ্যাপক, যে নন্দিনী, যে শ্রমিকদের আমরা পাই, তা শম্ভুবাবুর সৃষ্টি বললেও অত্যুক্তি হয় না, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ-কল্পিত অতি সূক্ষ্ম অমানুষিক চরিত্রের সহজবোধ্য, বাস্তব রূপান্তর তো বটেই।

আর, এখানেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাটকের দুর্বলতা। গর্ডন ক্রেগ বলেছিলেন :

"The theatre was for the people, and always for the people, The poets would make theatre for the select dilettanti. They would put dificult psychological thoughts before the public expressed in dificult words...whereas the theatre must show them sights, show them life, show them beauty, and not speak in dificults sentences."

নাটককে দুর্বোধ্য ক'রে তোলার এই অভিযোগ থেকে রবীন্দ্রনাথ মোটেই মুক্তি পাবেন না। বহুবার পড়েও রাজার একাধিক অনুচ্ছেদের অর্থ সম্যক বোঝা যায় না, আর দর্শক কি একবার শুনেই তার মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারবেন? বিষয়বস্তুর জটিলতা নাহয় ছেড়েই দিলাম—("রামায়ণ"—প্রভাবিত কর্ষণজীবি ও আকর্ষণজীবি সভ্যতার দ্বন্দ্বেরই নাকি একটা রূপকধর্মী প্রতিফলন "রক্তকরবী"-তে—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কথা!!) কিন্তু রূপকের বাহ্যিক কাহিনীটিকে তো সর্বতোভাবে বাস্তবধর্মী হ'তেই হবে, তা না হ'লে রূপকের আর্ট কোথায়?

রূপকের চরিত্র হ'লেই যে তাকে অসংখ্য মুন্সিয়ানা দেখিয়ে আধিদৈবিক হয়ে পড়তে হবে, তার তো কোনো মানে নেই। আধুনিক যুগের বিপ্লবের ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কটা কত সুন্দর, কত সহজ একটা রূপকে ধরেছেন এর্ণ্‌ষ্ট টলের। আমরা তাঁর "ম্যাসেস এ্যাণ্ড মেন" নাটকের কথাই বলছি। এখানে মঞ্চে বর্ণিত নানা তথ্যের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত আছে আর একটি বিরাট সত্য, তাই এটি রূপক নাটক। কিন্তু তা ব'লে উপরের কাহিনীটির মধ্যে ঢুকে পড়েনি কোনো অযাচিত দার্শনিক অসঙ্গতি। বা কোনো তেপান্তরের মাঠ থেকেও যোগাড় করে আনেনি টলের তাঁর রূপকের উপাদান—কেরাণী, শ্রমিক, পুলিশ, গুপ্তচর—প্রভৃতি সুপরিচিত চরিত্রই নিজের নিজের শ্রেণী বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হ'য়ে নিজ শ্রেণীসুলভ কথাবার্তা বলতে বলতে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেল এক চরম নাটকীয় মুহূর্তের দিকে। টলের কাব্যনাট্য লিখলেও নাটকের সংঘাত আদি উপাদানকে রেখেছেন প্রদীপ্ত ক'রে, আর, রবীন্দ্রনাথ গদ্যনাট্য লিখেও কাব্যের গমনকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছেন নাটকের নাটকীয়তাকে, নিজের ভাবনার তোড়ে চরিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্য ক'রেছেন হরণ।

বাচনভঙ্গীর স্পষ্টতা ও স্বাভাবিকত্ব এবং পোষাক-আষাকে নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে "বহুরূপী" এই স্বাতন্ত্র্যবহুল পরিমাণে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাই শ্রমিকদের হেঁটমাথা আর নম্বরমারা কামিজ আর হতাশার কথা তাদেরকে "ঠাস দাসত্ব আর নিবিড় ছুটির" "এক চুমুকের তরল আগুনের" অশরীরি দেশ থেকে উদ্ধার ক'রে আমাদের মাঝে নিয়ে এসেছে। তাই গজু পালোয়ান যখন বলে—"বোধ হচ্ছে ভিতরটা ফাঁপা হ'য়ে গেছে" তখন তা আর একটা অসাড় দার্শনিক তত্ত্ব থাকে না, হয়ে ওঠে আহত মজুরের অন্তর্ভেদী আর্তনাদ। নন্দিনীর "পাগল ভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে" হয়ে ওঠে বহুবার শোনা নারী শ্রমিকের ব্যাকুল ক্রন্দন।

কিন্তু প্রতি চরিত্রের সাংকেতিকতা মোচন করতে গিয়ে শম্ভুবাবু এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মনীষা বোধহয় এমন ক'রে প্রতীকি চরিত্র ও নাটকের সামগ্রিক রূপকধর্ম মিশিয়ে দিয়েছে যে, এটাকে আমূল উৎপাটন ক'রতে গেলে অন্যটিরও বিশেষ ক্ষতি হয়। রাজা চরিত্রে এই সমন্বয় সমধিক পরিস্ফুট এবং ঠিক এই চরিত্রটিরই সাংকেতিকতাও তত্ত্ববহুল আবৃত্তি শম্ভুবাবু বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ এতে ক'রে নাটকে এসেছে একটা বিশেষ অন্তর্বিরোধ। সম্পূর্ণ প্রতীকধর্মী

রাজার সঙ্গে ঈশানীপাড়ার মেয়েটির সাক্ষাৎ কিছুতেই মানতে পারা যায় না, আবার রাজগৃহের প্রতীকী জালের সামনে একদল বাস্তব রক্তমাংসের শ্রমিকের উপস্থিতি নগ্নভাবে স্ব-বিরোধী। এখানেই রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার গুরুদায়িত্ব। চরিত্রগুলোর নির্জীব সাংকেতিকতা চটিয়ে যদি রূপকের ব্যক্তিক কাহিনীটিকে বাস্তব রূপ প্রদানে কেউ সচেষ্ট হন তো, তাঁকে কাহিনীর প্রতি ঘোর-ফেরেই এই বাস্তবতাকে প্রসারিত করতে হবে, সুবিধানুযায়ী কোনো অংশকে প্রতীকধর্মীই রাখলাম এবং কোনো অংশকে বাস্তবধর্মী করলাম—এ রকম দোঁ-আঁশলা ব্যবস্থা দর্শককে সন্দিগ্ধ ক'রে তোলে। শেক্‌স্‌পীয়ারে তো রূপক নেই, তবু "জুলিয়াস সীজার" বা "হ্যামলেট"-কে আধুনিক পোষাকে ও দৃশ্যসজ্জায় মঞ্চে নামাতে বিলাতী পরিচালকদের হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, কারণ, থেকে থেকে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যাকে কোনোক্রমেই আমাদের শতাব্দীর কালান্তরিত করা যায় না। সীজারকে ছোরা দিয়ে হত্যা করা চলে না—কারণ আধুনিক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নিশ্চয়ই আ.গ্নেয়াস্ত্র দিয়ে সাধিত হবে। অথচ ফোরাম দৃশ্যে ব্রুটাস ও এ্যান্টনির গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দুটির মধ্যে ক্রমান্বয়ে ওই ছুরিকাঘাতের কথা বলা হচ্ছে। এই দৃশ্যটি বাদ দেয়া অসম্ভব, তা হলে চাতুরী ক'রে এড়িয়ে যাওয়া হবে, পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হবে—শেক্‌স্‌পীয়ারকে আধুনিক পোষাকে সাজানো যায় না। ঠিক এই রকমই এক দুরূহ সমস্যা—"রক্তকরবীর রাজা।"

কিন্তু দুরূহ হলেও সমাধান বোধহয় অসম্ভব ছিল না। ঠিক কী করলে হোতো, তা শম্ভুবাবুই ভাল বুঝবেন, তবু স্পর্ধা করে বলি—রাজাকেও আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন কর্ণধার করলে রূপক ব্যাহত হোতো কি? নিশ্চয়ই নয়, কারণ, আধুনিক রাষ্ট্রের কর্ণধার সত্যিই একটা জালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন। সে জালটাকে সত্যি জাল না ক'রে সরকারী প্রাসাদের সম্মুখভাগ করলেই কি আর দর্শক তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হ'তেন? আর ঐ অদৃশ্য কণ্ঠস্বর?—আধুনিক রাষ্ট্রের কর্ণধাররা সাধারণের কাছে শুধু কণ্ঠস্বরই তো—রেডিওতে বা মাইক্রোফোনে বা ভিক্টোফোনে। এটাই তো সমসাময়িক রাজনীতির বৃহত্তম সত্য। দেখা যাচ্ছে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি বোঝাবার জন্যে মোটেই ব্যঞ্জনা-ব্যঞ্জনীর অবতারণা করার প্রয়োজন নেই, বরং সহজ শহুরে রাজনৈতিক জীবনেই অঢেল মালমসলা ছড়ানো রয়েছে যা থেকে গৃহীত হতে পারে বিশেষ কাব্যিক তাৎপর্যপূর্ণ এক একটি কাহিনী।

বহুরূপীর দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ—রবীন্দ্রনাটকে মঞ্চসজ্জা। সেই গুরুভারজনক ফাঁকা মঞ্চের ঢং না দেখিয়ে, তার স্থলে তাপস সেনের অত্যাশ্চর্য আলোক সম্পাতে বিকশিত খালেদ চৌধুরীর দৃশ্যসজ্জা দেখে বোঝা যায় শম্ভুবাবু রবীন্দ্রনাটক ব'লে আলাদা অপার্থিব ধরণের কিছু নাটকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাট্যই হোক, আর শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্তের ঐতিহাসিক নাটকই হোক—মঞ্চে ওঠার বেলায় তাকে মঞ্চের ঠাটে, মঞ্চের বিশেষ ঘরোয়ানায় দীক্ষিত হ'তে হবে—কারণ, মঞ্চটা কলেজি আবৃত্তির কমনরুম নয়। কিন্তু আবার পূর্বে উল্লিখিত কারণেই খালেদ চৌধুরীর ৭তধর্মী দৃশ্য পরিকল্পনার সঙ্গে স্থূল, বাস্তব চরিত্রগুলির প্রতিমুহূর্তে ঘটে সংঘর্ষ, সুর যায় কেটে কেটে। ফাগুলাল, চন্দ্র আর নবরমারা শ্রমিকদের আমরা দেখতে অভ্যস্ত বস্তীতে, বা প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনে ল্যাম্পপোষ্টের নীচে। দৃশ্যসজ্জার বৃহত্তর রূপকের আমেজটা নিশ্চয়ই রাখা উচিত, কিন্তু, হয় তা বর্তমান জীবনের নানা পরিচিত বস্তুর অতিরঞ্জিত চিত্রণের মধ্য দিয়ে হওয়া উচিত ছিল, অথবা চরিত্রগুলিকেই পাগড়ি আর রঙীন জোব্বা পরানো উচিত ছিল (তাতেই যে প্রতি চরিত্র সাংকেতিকতার নিগড়ে বাঁধা প'ড়ে যেত, তারই বা কী মানে? বলিষ্ঠ অভিনয়ে ওর মধ্যেও দর্শকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া সম্ভব)। আধুনিক রূপকে নিশ্চয়ই ঈষৎ বাঁকানো ল্যাম্পপোষ্ট, দাম্ভিক অট্টালিকার অসংখ্য ইস্পাত-শলাকার বেড়াজাল, বৈচিত্র্যহীন, নির্জীব খোলার ঘরের সারী এ সব থেকেই নির্মিত হতে পারে এমন এক কাব্যময়, বিচিত্রবর্ণ দৃশ্যপট যা, প্রতিদিন দেখা স্থূল বাস্তবের পরিবেশটাকে রাঙিয়ে তুলবে, কল্পনার উদ্দামতাকে ক'রবে সংযত, তার নানা খেয়ালের হেঁয়ালিকে দেবে এক একটা সহজবোধ্য রূপ, জীবনের খণ্ডচিত্রের মধ্যেই আনবে মহাজীবনের সম্পূর্ণতা, আবার মহাজীবনের জটিল দর্শনকে বাঁধবে খণ্ডচিত্রের স্বল্পপরিসরে।

প্রথমে যে কথা বলেছিলাম প্রসঙ্গতঃ তাতেই আবার এসে পড়েছি। বহুরূপী বাংলা মঞ্চের প্রকৃত ঐতিহ্যটিকে ধরেছেন। এই ঐতিহ্যে আছে দুটি ধারার মিলন—প্রথম, দেশজ যাত্রার, দ্বিতীয়, য়ুরোপীয় বাক্সবন্দী মঞ্চ। "রক্তকরবী" দেখে অবশ্য অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক বলা যায় না—এটি হলো যাত্রার প্রভাব, আর এটি সর্বাধুনিক য়ুরোপীয় মঞ্চ পরীক্ষার ফল। কারণ, অঙ্গাঙ্গী মিলনে এমন স্বাতন্ত্র্য খোঁজা বাতুলতা। তবু স্পষ্ট অনুভূতি জাগে, কোথায় যেন বহুরূপী খাঁটি বাংলা নাট্যরূপটা ধরেছেন—বাচিক অভিনয়ে বিশেষ

ক'রে। পুরো নাটকের কথোপকথন, যেন একটা সঙ্গীতের উত্থান-পতনের মতন কানে আছড়ে পড়তে থাকে, তার মধ্যে শম্ভুবাবুর নিজের উদাত্ত কণ্ঠস্বর যেন উচ্চপর্দায় কতকগুলি চমকপ্রদ তান দিয়ে বৈচিত্র্য আনে, গান জমিয়ে দেয়া কঠিন চরিত্র সৃষ্টির মধ্যেও এই সুরের আর গদ্যছন্দের খেলায় বহুরূপী অপ্রতিদ্বন্দ্বী ; এখানেই বিশেষ ক'রে তাঁরা খাঁটি বাঙালী। অন্যপক্ষে য়ুরোপীয় মঞ্চের প্রোসিনিয়ামের অভ্যন্তরে ইন্দ্রজাল সৃষ্টির অপূর্ব কলাকৌশলও বহুল পরিমাণে এনে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন শম্ভু মিত্র। ক্রেগের মতে রং, রেখা ও ছন্দের ঐক্যতান সৃষ্ট হবে প্রকৃত অভিনয়ে। দৃশ্যপটের যেমন রং আছে, তেমন রেখাও আছে। এ সবটা এক সুরে, এক রং-এ, এক রেখায়, এক ছন্দে গাঁথবেন পরিচালক। এটাই আধুনিক য়ুরোপীয় থিয়েটারের প্রধান তত্ত্ব। শম্ভুবাবু দৃঢ়পদে এদিকে পা বাড়িয়েছেন "রক্তকরবী"তে। যক্ষপুরীর স্বর্ণ-জঠর থেকে নির্গত যথা শ্রমিকের মিছিলের দৃশ্যটি ; এই রং-রেখা-ছন্দ সমন্বয়ের এক অপূর্ব নিদর্শন এই দৃশ্যটি। প্রতি অভিনেতার চলন ভঙ্গী, নন্দিনীর আর্তনাদ, লাল আলোর চমক, নেপথ্যে কর্কশ ধাতব ধ্বনি—সব মিলে একটা নূতন ভাব, নূতন রকমের সৃষ্টি হয়।

অন্যপক্ষে একটা বিষয়ে বহুরূপীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য মনে করি। শান্তিনিকেতনী ন্যাকামি আঙ্গিক অভিনয় থেকে উচ্ছেদ করেছেন শম্ভুবাবু, ভালো কথা! আবার যাত্রার নিছক শোভাবর্ধনকারী নৃত্যমূলক অঙ্গ সঞ্চালনেরও কোনো স্থান শম্ভুবাবুর "রক্তকরবী"তে নেই, মানলাম। কিন্তু ওই য়ুরোপীয় নাট্যশালাতো এ বিষয়ে মহাশিক্ষা দিয়ে গেছে। ওঁরা যাকে বলেন—Composition বা positional interplay of actors—এর সুচিন্তিত ব্যবহারে নাটকের কাব্যগুণ অনেক পরিমাণে রক্ষিত হয়, কথার ধ্বনিগত সৌন্দর্য্য মূর্ত হয় সমগ্র মঞ্চে অভিনেতাদের অবস্থান ও স্থান পরিবর্তনের দৃষ্টি গ্রাহ্য পারিপাট্যে। আবার চলাফেরা শুধু ডাইনে বাঁয়ে, আগে পেছনে নয়, সমতল মঞ্চকে সিঁড়ির সাহায্যে একাধিক প্লেনে বিভক্ত করে উচ্চ-নীচ composition ও আধুনিক নাটকে অপরিহার্য্য। অথচ বহুরূপীর প্রযোজনায় মঞ্চের একধারে সিঁড়ির ধাপ অবহেলিত হ'য়েই রইল, বড়জোর ব্যবহৃত হোলো কয়েকটি নেহাৎ প্রবেশ বা প্রস্থানের প্রয়োজনের। আবার মঞ্চের এক কোণে শ্রমিকদের ভীড়, অন্যদিক শোচনীয়ভাবে ফাঁকা ভারসাম্যের এমন অভাবও থেকে থেকে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। "দর্শকচক্রে"-ও বহুরূপী মাঝে মাঝে এই রকম অপরিচ্ছন্ন

চলাফেরা ও grouping-এর পরিচয় দিয়েছিলেন—বিশেষ ক'রে ড্রইংরুমের দৃশ্যে। তাই মনে হয় এটা ওঁদের একটা স্থায়ী দোষে দাঁড়িয়ে গেছে। অথচ কথার অমন সুরঝংকার বহুল বিস্তারের কী শক্তিশালী, কী লালিত রূপই না দেয়া যেত দশধাপের এক বৃহৎ আড়াআড়ি সিঁড়ির সাহায্যে।

কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে, মুখ্য কিছু ত্রুটি না ধরতে পেরে মামুলি কিছু সমালোচনা ক'রে চলেছি কলমপেষার তাগিদে। তাই, যা আমাদের দিয়েছেন তার জন্যেই বহুরূপীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এ আলোচনা শেষ করি।"

১৯৭২ সালে বহুরূপী আরো অনেক নাটক মঞ্চস্থ করে ফেলেছেন। তার মধ্যে শম্ভু মিত্রর রাজা ওয়াদিপাস একটি স্মরণীয় প্রভাকশন বলা যায়। ১৯৭২ সালে রবীন্দ্রনাথের রাজাকে নতুন করে নাট্য রসিকদের কাছে নিয়ে এসে হাজির করলেন। রাজা নাটকের নেপথ্যে শম্ভু মিত্রর কণ্ঠস্বর যেন দর্শক মনকে আন্দোলিত করে। তবে রাজা নাটকের আসল অভিনয়ে তৃপ্তি মিত্র অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এই নাটকে। নাচ গান, অভিনয় করে বহুমুখী শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল তৃপ্তি মিত্রর অভিনয়ে। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার কোলকাতার কড়চায় ৭ই মে '৭২ বহুরূপী সম্পর্কে একটা লেখা প্রকাশ হয়। আমি সেই লেখাটি এখানে ছেপে দিলুম।

বহুরূপীর পূর্ণ যৌবনে

বহুরূপী ১ মে আকাদমি প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটক মঞ্চস্থ করে পঁচিশ বছরে পা দিল। 'ভালো করে ভালো নাটক করব' এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে বহুরূপীর সঙ্গে জড়িত সবাই পঁচিশ বছর আগে যাত্রা শুরু করেছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই, সে-কথা তাঁরা রেখেছেন। বাংলাদেশের জলবায়ুর এমনি গুণ এখানে কোনও কিছুই টেকে না। সেখানে "বহুরূপী" আত্মমর্যাদা বজায় রেখে পঁচিশ বছরে পা দিল, এ একটা আশ্চর্য হবার মতই ঘটনা। আর সেই আশ্চর্য সংগঠক শম্ভু মিত্র, তিনি তো আজ এক দৃষ্টান্তে পরিণত।

১৬ অক্টোবর ১৯৪৯ শিয়ালদহের রেলওয়ে ম্যানসন ইন্সটিটিউটে তুলসী লাহিড়ী রচিত "পথিক" মঞ্চস্থ করে এঁরা সাধারণের সামনে "বহুরূপী"-রূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। (যদিও দল হিসাবে সূচনা ১৯৪৮-এ, তখন "বহুরূপী" নাম ছিল না। কোনও নামই ছিল কি? নাম না থাক, কাজের পরিচয় যে আছে, তার প্রমাণ '৪৮ সালের ১৩, ১৪ এবং ১৫ সেপ্টেম্বর

রঙমহলে গণনাট্য সঙ্ঘের সফল নাটক 'নবান্ন'র পুনরভিনয়। 'মহর্ষি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ১৯৫০ সালে দলের নামকরণ করেন "বহুরূপী"।)

১৯৪৯-এর অক্টোবর থেকে ১৯৭১-এর ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত "বহুরূপী" নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছেন (এবং "ভালো করেই" করেছেন) বত্রিশখানা। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরই সাতখানা (চার অধ্যায়, রক্তকরবী, স্বর্গীয় প্রহসন, ডাকঘর, মুক্তধারা, বিসর্জন আর রাজা)। আর যে-সব নাটক অভিনীত হয়েছে তার মধ্যে শম্ভু মিত্রের রচনা আছে সওয়া ছয়খানা (কাঞ্চনরঙ্গে $\frac{1}{2}$ + বিভাগে $\frac{3}{4}$)। তার মধ্যে অনুবাদ বা স্থান ও কালের উপযোগী করে গ্রহণ তিনখানা (ওনীল, ইবসেন এবং সোফোক্লেস) বাদল সরকারের নাটক আছে চারখানা, তুলসী লাহিড়ীর তিনখানা (পথিক, ছেঁড়া তার ও চৌর্যানন্দ), গঙ্গাপদ বসুর "অংশীদার"। এছাড়া নীতীশ সেন ও অজিত গাঙ্গুলীর দুখানা করে, এবং শান্তি বসু, মন্মথ রায়, কুমার রায়ের একখানা করে।

দেখা যাচ্ছে, নাট্যকার সম্পর্কে ছুঁৎমার্গ নেই এঁদের। 'ভালো নাটক' পেলেই হল। আর পঁচিশ বছরে ঢাল নেই তলোয়ার নেই, চাল নেই চুলো নেই, শুধু মাত্র আদর্শ আন্তরিকতা, ত্যাগ, কঠোর পরিশ্রম এবং কঠিন শৃঙ্খলা পাথেয় করে বত্রিশখানা ভাল নাটকের ভালো করে পরিবেশন, অবশ্যই গর্ব করার মত সাফল্য। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন শিশির ভাদুড়ী। কিন্তু "বহুরূপী" এবং শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের নাটককে অপূর্ব প্রয়োগ দক্ষতা এবং অভিনয়ের গুণে সাধারণ দর্শকদের ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন। বহুরূপী এগিয়ে না এলে রবীন্দ্রনাথের নাটক এ যুগে হয় বই বন্দী হয়েই থাকত, আর না হয় সদিচ্ছাসম্পন্ন কোনও অ্যামেচারের পাল্লায় পড়ে তা মাঠে মারা যেত। একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা চলে। সেই সঙ্গে এই কথাটাও: "বহুরূপী" তার পঁচিশ বছরের নিরলস সৎ প্রচেষ্টার দ্বারা শুধু যে একটি নতুন প্রয়োগরীতি এবং অভিনয়ধারার প্রতিষ্ঠা করেছে তা নয়, আমার মতে, তার থেকেও একটা বড় কাজ বহুরূপী করেছে। ওরা এ যুগের দর্শকদের একটা ভালো অংশের মনে সুস্থ পরিচ্ছন্ন এবং প্রবল একটা নাট্যরুচি গড়ে দিয়েছে। যার ফলে ভালো নাটক ভালো করে করার মত দলের যেমন তেমনি ভালো করে দেখে ভালো লাগাবার মত লোকের সংখ্যা এই পঁচিশ বছরে এদেশে বেড়ে গিয়েছে। সাধু বহুরূপী তোমার যৌবন অক্ষয় হোক।

থিয়েটার সেণ্টার / মুখোশ

১৯৫৪ সাল। কোলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে তরুণ রায়ের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা পেল নতুন একটি মঞ্চ, থিয়েটার সেণ্টার। নবনাট্য আন্দোলনে এই মঞ্চ নতুন পথ খুলে দিল। যে সময়ে বাংলাদেশে একাংক নাটকের বিশেষ কোনু প্রচলন ছিল না, ঠিক সেই মুহূর্তে থিয়েটার সেণ্টারে তরুণ রায়ের একক প্রচেষ্টায় শুরু হল একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা।

জীবনের অনেক কিছু কণ্ঠ-স্বরাচ্ছ রূপ-রেখায় আঁচড় টেনে একটি মাত্র দৃশ্যের আবর্তে ভাবা যায়। থিয়েটার সেণ্টার মঞ্চে সে দিন তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা পেল। অবশ্য এর আগে যে একাংক নাটক লেখা হয়নি একথা আমি বলছি না— কিন্তু আজ কোন সন্দেহের অবতারণা না করেই একথা স্বীকার করতে হবে, যে প্রতিমা গড়া হয়েছিল থিয়েটার সেণ্টারে সেই দেবীকে আবাহন করা হল, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। আজ একাংক নাটকের যে জোয়ার এসেছে, দিকে দিকে একাংক নাটকের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে নব তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে, তাকে যদি আমরা স্বীকার করি তাহলে তার মূল খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, ১৯৫৫ সালে তরুণ রায়ের থিয়েটার সেণ্টারে তার সুর।

আজ আমরা বাংলাদেশে থিয়েটার আন্দোলনের' অংশীদার রূপে, এমন অনেক দলকে দেখি, যাদের অনেককেই থিয়েটার সেণ্টার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে অমৃত বাজারের আলোচনাটি খুবই মূল্যবান। "ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম। এর দ্বারা উদীয়মান এ্যামেচার ও কনিষ্ঠা নাট্যদলগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর আদান-প্রদানের বৃহত্তর সুযোগ ঘটিয়েছে।" এছাড়া স্টেটসম্যান প্রেক্ষাগৃহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন :

"A well equipped and excellently designed miniature stage and auditorium which for the first time uphold opportunities to the various dramatic groups with meagre resources to produce experimental plays regularly".

থিয়েটার সেণ্টার যদি প্রতিষ্ঠিত না হত তাহলে বহু একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় দেখার সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত থাকতুম। যেমন অভ্যুদয় নাট্য সংস্থা একটি দল। যদিও ওঁদের জন্ম ১৯৫১ সালে কিন্তু সুযোগের অভাবে ওঁরাও আমাদের সামনে আসতে পারছেন না; আমরাও ওঁদের প্রতাকসন দেখতে পেতুম না।

আর একটি দলের নাম করা যায় ক্যালকাটা মেরী মেকার্স ক্লাব। ১৯৫৬ সালে শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'গোলপার্ক' নাটক নিয়ে এরা এলেন। সেদিন তাঁদের বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। এমন কি থিয়েটার সেণ্টারে ১২টি শোয়ের ব্যবস্থা করা হয়। থিয়েটার সেণ্টারের এক হাজার দর্শককে দেখাবার জন্য ঐ নাটক। একটি সগু নতুন দলের অভিনয় দেখে ঐ এক হাজার দর্শক মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে শৈলেশ গুহ নিয়োগী (পিকলু) মুখোশ দলের সঙ্গে অনেক দিন অভিনয় করেছিলেন। আজ যাকে আমরা নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতা হিসাবে দেখছি তারও আর্বিভাব ঐ থিয়েটার সেণ্টারের মাধ্যমে।

যতদূর আমি জানি ১৯৫৫ সালে 'নবজন্ম' নামে একটি একাংক নাটক প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। নাট্যকারের নাম না জানার দরুন দিতে পারলুম না। অমরেশ দাসগুপ্তর 'দৈনন্দীন'ও প্রথম স্থান অধিকার করেছিল এবং কিরণ মৈত্রের 'আয়না' তৃতীয়। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল গোপীকানাথ রায় চৌধুরীর সম্রাজ্ঞী। এই নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন অগ্নি মিত্র। ১৯৫৬ সালে ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'এক পশলা বৃষ্টি' প্রথম স্থান অধিকার করে। কিরণ মৈত্রের 'বুদবুদ' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। 'বুদবুদ' নাটকের পরিচালনায় ছিলেন প্রভাত গৌতম। শিল্প নির্দেশনা সুধীর খাঁ। আলোক সম্পাতে গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। মিউজিক সুনীল বোস, অনিল ভাদুড়ী, রবীন পাল ও রূপ সজ্জায় নীহার পোদ্দার (রূপম)। অভিনয়ে ছিলেন প্রভাত গৌতম, কল্যানী দাসগুপ্ত, তারক ঘোষ, কিরণ মৈত্র, লীলা বন্দোপাধ্যায়, শ্যামল লাহিড়ী ও হিরণ মৈত্র। আগন্তকের 'শতাব্দীর স্বপ্ন' নাটকটিও ঐ প্রতিযোগিতায় অভিনীত হয়েছিল। এছাড়া আরো বহু দল ঐ মঞ্চে নাটক অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন।

এই প্রতিযোগিতার উৎকর্ষ বিচারের ভার যাঁদের ওপর ছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, শম্ভু মিত্র, প্রফুল্ল রায়, মহন সিং সগঁর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কে এম ওলাথা ও বি এম সিংহ। থিয়েটার সেণ্টার কি শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা করেই খান্ত ছিলেন? না, ঐ একই সঙ্গে ওঁরা ভারত-বর্ষের বিভিন্ন ভাষাতেও নাট্য উৎসব করেছিলেন। চার বছর ধরে এই উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন বহুরূপী, লিট্‌ল থিয়েটার, মুখোশ, অনামিকা (হিন্দী), সাজ ঘর, এ্যামেচার থিয়েটার গ্রুপ, পাঞ্জাবী অক্ল এ্যাসোসিয়েশন, গুজরাট সাহিত্য৮

এছাড়া থিয়েটার সেন্টার পশ্চিম বাংলার একটি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এঁরা রাষ্ট্রপুঞ্জের ইউনাইটেড নেশান এডুকেশনাল স্যোশাল এবং কালচারাল অর্গানাইজেশান-এর সঙ্গে এর অন্তর্ভুক্ত ইণ্টার ন্যাশনাল থিয়েটার ইনষ্টিটিউটের সহিত ভারতীয় নাট্য সঙ্ঘের মাধ্যমে যুক্ত আছেন

১৯৫৮ সালে ৫ই জানুয়ারী থিয়েটার সেন্টার হলে মুখোশ দলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রূপোলী চাঁদ' অভিনয় শুরু হল। এই নাটকে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন: অমরেশ দাসগুপ্ত, গোবিন্দ চক্রবর্তী, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, বাকা রায়, রবীন্দ্রলাল রায়, বিধীন সেন, হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা রায়, হিল্লোলা, অরুণ দত্ত, স্নিগ্ধ বন্দোপাধ্যায়, গোপাল কৃষ্ণ রায়, শৈলেশ গুহ নিয়োগী, তরুণ রায়, যামিনী মিত্র, প্রণবেশ বর্দ্ধন, অসিত রায়, মোহন মিত্র, সুনীল সিংহ, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, শিবকুমার শর্মা, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সৌমেন চক্রবর্তী। পরিচালনায় ছিলেন তরুণ রায়।

১৯৬১ সাল থেকে থিয়েটার সেন্টারে মুখোশ দল নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করে আসছেন। যেমন ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'আর হবে না দেরী', অমৃতলাল বসুর 'অলীক বাবু', দিলীপ রায়ের 'অঘটন আজো ঘটে', প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'ওরা থাকে ওধারে', ধনঞ্জয় বৈরাগী (নিশাচর) 'পুড়েও যা পোড়ে না', 'লেবেডেফ,' 'বিদেহী'। ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রজনী গন্ধা', 'কেঁচো খুড়তে সাপ', 'পরাজিত নায়ক।' ইতিমধ্যে থিয়েটার সেন্টার আগুনে পুড়ে যায়। তার ফলে শিল্পীদের বেশ কিছুদিন অসুবিধায় পড়তে হয়।

পরাজিত নায়ক দেখার পর তরুণ রায়কে আনন্দ বাজার পত্রিকায় ১৮ই জুন, ১৯৭১ সন্তোষকুমার ঘোষ একটা খোলা চিঠি লিখেছিলেন, আমি সেই চিঠিটা এখানে ছেপে দিলুম।

"রাজনীতি নিয়ে একটা খোলা চিঠি একবার লিখেছিলাম, মনে পড়ছে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু এবারের বিষয় সাংস্কৃতিক, চিঠিটা তরুণবাবু আপনাকে। অব্যবহিত হেতু 'পরাজিত নায়ক'কে নিয়ে আপনি জয় যাত্রায় বেরিয়েছেন। থিয়েটার সেন্টার নামে ছোট কেন্দ্রবিন্দুটি ছাড়িয়ে আপনি পড়েছেন বৃহত্তর পরিধিতে। আগামী শুক্রবার ফাইন আরটস্ অ্যাকাডেমির প্রেক্ষাগৃহে, পরে শুনেছি দেশের উত্তর পশ্চিমে নানা দিকে বেরিয়ে যাওয়ার বাসনাও আপনার আছে। আপনার সাহসকে তারিফ করি, সেই সঙ্গে বলিহারিও বলি।

সাহসের কথাটা উঠছে এইজন্যে যে, তরুণবাবু, আপনার পিছনে তো কোনও দলগত 'প্রচার' নেই—পৃষ্ঠের পোষণ যাকে বলে! এতদিন ধরে এত নাটক করলেন, কিন্তু কী সোচ্চারে, কী কানাকানিতে, কই কাউকে তো বিশেষ উচ্চবাচ্য করতে শুনিনি। 'হুইসপারিং ক্যাম্পেন' আপনার বেলায় একেবারে নেই। তার কারণ আপনি কোনও কালেই, যতদূর জানি, কোনও বিশেষ আখড়ায় নাম লেখাননি, নিজের সাধ্য, বিশ্বাস আর আদর্শেই স্থিত আছেন। বাংলা মঞ্চের জন্যে অনেকেই অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু নিজের বসত বাটিতে প্রতিকূল অবস্থাতেও একটা থিয়েটার বসিয়েছেন, বহাল রেখেছেন কে? কয়জন? এ সেই নিষ্ঠা, সেই আদর্শ—পুড়েও যা পোড়েনি। তথাকথিত প্রাগতিক হাওয়া পালে লাগালে এর চেয়ে ঢের বেশী আপনার হিল্লে হয়ে যেত। অনেকের গিয়েছে।

এই দেখুন না, এই নিয়ে আপনার কম নাটক তো দেখলাম না, কম-সে-কম দশ-বারোটা। কিন্তু উপযাচক হয়ে কখনও কিছু লিখেছি কি? না। যে-সংকোচ বোধ করেছি, সেটা অন্যের বেলায় কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু এবার না লিখে পারছি না, তরুণবাবু 'পরাজিত নায়ক' আমার সমস্ত দ্বিধা-প্রতিরোধকে পরাস্ত করেছে।

পরাস্ত এই লেখক, আর কে? নায়ক তো নিশ্চয়ই, নামেই তার স্বীকার আছে। পরাজিত বোধ হয় এই নাটকের নায়িকাও, জীবনে যে-মেয়েটি বার বার পুতুল, পোড় খেল প্রতারিত হল প্রবঞ্চক মানুষের হাতে, তার এই শেষ ঘটনায় দেখছি আরও একবার পরাজিত সে। মাত্র দু-তিন দিনের সাহচর্যে সাচ্চা মানুষ বলে যাকে গ্রহণ করতে যাচ্ছিল—ভালও বেসে ফেলেছিল কিনা বলা যায় না—দুটি ঘণ্টার ঘাত প্রতিঘাতে রুদ্ধশ্বাস অভিনয়ের শেষ মুহূর্তে দেখা গেল সেই মানুষটাও খড় মাটির, তার সব রং ধুয়ে গলে কাদা হয়ে গেছে। এই ট্র্যাজেডি প্রধানতঃ ওই মেয়েটিরই, যাকে সাবলীল অভিনয়ে দীপান্বিতা অত্যন্ত বিশ্বাস্য, মর্মগ্রাহী রূপ দিয়েছেন। আপনার অভিনীত চরিত্রটিতে তবু বাচনে আতিশয্য আছে—শেষ ক্ষণের আহ্লাদে গদগদ প্রলাপ সংলাপের তো তুলনাই নেই—কিন্তু স্বভাবী, স্বচ্ছন্দ অভিনয় কতদূর নিয়ে যেতে পারে, এই নাটকে দীপান্বিতার কলা-কৌশলও তার উদাহরণ।

নাটকটির বিশেষ আলোচনা আমাদের নাট্য সমালোচক আগেই করেছেন, যে মাসের শেষের দিকে, আমি তার দ্বিরুক্তি করব না। তবু পুনরুক্তি যদি

বরদাস্ত হয় তবে বলি এর বিষয়বস্তু শুধু বাহ্যতই রাজনৈতিক। আসল কথা মানুষের। যে-মানুষ সংগ্রামী, আরোহণ-কামী, সাপ-লুডোর খেলা, যার ওঠা-নামার প্রতীক।

আর প্রয়োগ প্রকরণ? এক কথায়, এমনি পরিচ্ছন্ন ঠাসা নিপুণ নাটক বাংলায় অনেক দিন দেখিনি। আর এর জন্য আপনাকে বিদেশী কোনও মহাজনের কাছে হাত পাততে হয়নি, সেও বিশেষভাবে উল্লেখ্য একটি বাহাদুরী। টু ইজ কম্প্যানি। সারাক্ষণ মঞ্চ অধিকার করে আপনারা দু'জন। দ্বৈত ভূমিকা একটুখানি তো আছেই, আক্ষরিক অর্থেও এ অভিনয় দ্বৈত। আর মনে করুন যেখানে আপনি পিছনে জনতা রেখে বক্তৃতা করে যাচ্ছেন—বক্তৃতা নয়, শুধু তার নির্বাক ভঙ্গী—সেই দ্যোতনার কোনও তুলনা হয় না। তুলনা হয় না একেবারে শেষে নায়িকার যেন টেলিফোনে স্বাগত বিলাপ; অথচ সেই সময়ে সে হাত দিয়েও ওই দুরন্ত যন্ত্রটিকে স্পর্শ করেনি। আলোক সম্পাত আর আবহসংগীতের কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ সেই আলো যা প্রয়োজনোচিত, এ সেই আবহ ধ্বনি যা পরিস্থিতিতে অলক্ষ্য-ভাবে ওতঃপ্রোত। আমরা শুনেছি, আবার শুনিওনি, সবটাই একটি প্রবাহের মধ্যে শান্ত, স্থিত, লীন হয়ে মিশে গেছে। চেতনাকে ধাক্কা না দিয়ে শুধু অনুভব করা আর করানোর একটা ব্যাপার। আপনার রুচি আর শক্তিকে প্রশংসা করি।

কিন্তু প্রশংসা তো শুধু সেই জন্যই আপনার প্রাপ্য নয়, আমার কাছে আপনার প্রকৃত দাবি অন্যত্র। সমসাময়িক বিষয় আর গভীর, স্থায়ী, তাৎপর্যময় রসসৃষ্টি, এ-দুয়ের সহ-অবস্থিতি সম্ভব কিনা, এ নিয়ে আমার দীর্ঘকালের সংশয়। আপনার নাটকটি সেই সংশয়ের উত্তর দিয়েছে। এ-নাটকে নায়ক পরাজিত হতে পারে কিন্তু নিঃসংশয়ে বিজয়ী এর নাট্যকার।" ইতি—সন্তোষকুমার ঘোষ

নবনাট্য আন্দোলন / রূপকার

১৯৫৫ সাল। বৎসরের শেষ দিন ৩১শে ডিসেম্বর, আর একটি নতুন দল উজ্জ্বল সম্ভাবনার পথে পা বাড়িয়েছিল। শুরু হল নতুন বৎসর, জন্ম নিল রূপকার। রূপকার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি নাম সবিতাব্রত দত্ত।

বাংলা মঞ্চের একাধারে সঙ্গীত, অন্য ধারে জীবন ধর্মী অভিনয়, একই সঙ্গে দুটি গুণ বোধ হয় বিগত ত্রিশ বছরে আর এক জনও শিল্পীর নাম করা যায় না। সবিতাবাবু, কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী, মহঃ ইসরাইল এঁরা সকলেই এক সময়ে ছিলেন বহুরূপীতে। মতবিরোধই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, এঁরা বহুরূপী থেকে চলে আসেন। পরবর্তীকালে এঁদেরই প্রচেষ্টায় জন্ম নেয় রূপকার। তুলসী লাহিড়ীর সেই গভীর জীবনের নাটক 'ছেঁড়াতার' দিয়ে যাত্রা শুরু করল রূপকার। ছেঁড়াতারের গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার পরই রূপকারের শিল্পীদের নতুন পদক্ষেপে তুলসী লাহিড়ীর 'বাংলার মাটি' দিয়ে। ১৯৫৬ সালের বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে 'বাংলার মাটি' পেল প্রাণ। সেদিন বাংলার মাটিতে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন: তুলসী লাহিড়ী, অমর বসু, সবিতাব্রত দত্ত, রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহঃ ইসরাইল, সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রাণী রায়, অনিতা চক্রবর্তী, লতিকা মণ্ডল, গীতা দত্ত ও কালী সরকার। এই কালী সরকার মহাশয় সম্পর্কে কিছু বলার আছে, না বলে পারছিনা তাই বলি! তিনি পেশাদার রঙ্গ মঞ্চ থেকে এসে নবনাট্য আন্দোলনে অংশ নিলেন। বহুরূপীর 'পথিক' নাটকে আমরা তাঁকে প্রথম দেখি। সত্যি বলতে কি এতো শক্তিশালী অভিনেতাকে নবনাট্যের মঞ্চে দেখে আমরা যেমনি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম, আবার তেমনি মুগ্ধও হয়ে গিয়েছিলুম। তাঁর পুরোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক অভিনয়ের ভঙ্গী পরিবর্তন করে নবনাট্যের জীবনধর্মী চরিত্র অভিনয়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে নতুন জীবনকে সার্থক রূপ দেওয়ার ফলে। সমস্ত টিমটার মধ্যে যেন একটা স্ফুলিঙ্গ মনে হত তাঁকে। এতো বড় একজন প্রতিভাবান শিল্পী, যাঁকে প্রথম দেখেছিলাম 'দুঃখীর ইমানে' তাঁকে যে এতো কাছে পাব ভাবতেও পারিনি। তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানা যেমন দরকার তেমনি জানানও প্রয়োজন বোধ করি। তাই এ প্রসঙ্গে রূপকারের ১৯৬৮ সালের স্যুভেনিরে শম্ভুদা লিখেছেন কালীবাবুর মৃত্যুর পরে। আমি সেই লেখাটি ছেপে দিচ্ছি।

"কালী সরকার মহাশয়"

শম্ভু মিত্র

"প্রথমে মহর্ষি গেলেন, তারপর তুলসীবাবু, তারপর কালীবাবু। এঁরা বাংলাদেশের 'অন্য থিয়েটার'-এর লোক। যদিও সবাই সমান সময় থেকে এবং সমান ভাবে নয় তবু।

মহর্ষি একেবারে শুরু থেকে—সেই পঁচিশ বছর আগে যখন এই নতুন নাট্যের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়, তখন থেকে, তাই বা বলি কেন, যখন থেকেই দেখেছি তিনি এই তখনো অজাত নতুন নাট্যের স্বপ্নের বীজ ছড়িয়েছেন। তখন থেকেই—সেই ভ্রূণ অবস্থা থেকেই—তিনি এই আসন্ন সম্ভব নাট্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কালীবাবু এসেছিলেন মহর্ষির টানে। প্রথমে গণনাট্য সঙ্ঘে। বোম্বেতে ধরতি-কে লাল ছবি করার পর কলকাতায় এসে তাঁকে দেখি। তুলসীবাবুকেও এনেছিলেন মহর্ষি, তাঁর 'পথিক' নাটকের সঙ্গে, তবে সে আরও পরে।

কালীবাবু বহুরূপীতে একদম শুরু থেকে ছিলেন মহর্ষির সঙ্গে। অদ্ভুত শ্রদ্ধা ছিল তাঁর মহর্ষির সম্পর্কে। এমন কি মহর্ষির সঙ্গে মতে না মিললেও যদি মহর্ষি জোর ক'রে কোন কাজ করতে আদেশ করতেন তাহলে যতো ক্ষতি বা অসুবিধেই হোক না কেন কালীবাবু তা পালন করতেন ব'লে আমার বিশ্বাস। একথা বলতে শুনেছি তাঁকে। কিন্তু ওরকম জোর ক'রে আদেশ দেবার মতো লোকই ছিলেন না মহর্ষি তাই কালীবাবুরও একলব্য-সমান প্রমাণ দিতে হয়নি! কিন্তু দরকার হ'লে তিনি যে দিতেন, এইটাই তাঁর চরিত্রের একটা পরিচয়।

শ্রীরঙ্গম মঞ্চে 'দুঃখীর ইমান' নাটকে ও নিউ থিয়েটার্স-এর 'অঞ্জনগড়' ছবিতে অভিনয় ক'রে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তারপর তাঁর যা কিছু শ্রেষ্ঠ অভিনয় সবই এর অন্য নাট্যপ্রচেষ্টার মধ্যে। টুকরো টুকরো অনেক অভিনয়ের কথা মনে আসে। তাঁর বিশদ বিবরণ দেবার বা বিশ্লেষণ করবার স্থান এটা নয়, কিন্তু সেই—মজলিসী-মেজাজের উচ্ছ্বসিত-প্রাণ মানুষটিকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের পক্ষে তাঁকে ভুলে যাওয়া শক্ত।

বাংলাদেশে নতুন নাট্যপ্রয়াসের এই যে ধারা চলেছে তার বয়স বড়ো কম হোল না। এই পথে চলতে চলতে আমরা এক একজন করে সাথী হারাচ্ছি,

তবু এখনো আমাদের সামান্য লক্ষ্যেও আমরা পৌছুতে পারিনি। এখন অন্য যুগ এসেছে, কতো নতুন কর্মী ও শিল্পীর দল এই কাজে এসে হাত লাগিয়েছেন। এখন সমস্ত ভবিষ্যৎটাই নির্ভর করবে তাঁদের বোধ, তাঁদের ইচ্ছা এবং তাঁদের ঐকান্তিকতার ওপর। বিগত যুগের এই সমস্ত মানুষ যাঁরা নতুন নাট্য প্রচেষ্টায় নিজেদের উৎসর্গ ক'রে গেছেন নাট্যপ্রচেষ্টার বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে তাঁদের আত্মা যেন সার্থক হয়।

বাংলার নব নাট্যসংস্কৃতির সমস্ত কলাকারদের সঙ্গে শ্রীকালী সরকার মহাশয়ের স্মৃতিকে নমস্কার জানাই।"

রূপকার গোষ্ঠীর রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে মিনিস্ট্রি অফ সাইনটিফিক রিসার্চ এণ্ড কালচারাল এ্যাফেয়র্স থেকে এককালীন সাহায্য করেছিল। যাতে রূপকার গোষ্ঠী থিয়েটারকে আরো উন্নত করতে পারে সেই জন্যেই এই সাহায্য করা হয়েছিল। রূপকার গোষ্ঠীও সেদিন নাট্য অনুরাগি দর্শকদের এই আশ্বাস দিয়েছিল। থিয়েটারের উন্নতি তারা নিজের প্রচেষ্টাতেই করে যাবে।

পরবর্তীকালে আমরাও রূপকার গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রডাকসনের মাধ্যমে দিনে দিনে অভিনয় শিল্পের উন্নতির পরিচয় পেয়েছি, পাচ্ছি। তাদের অভিনয় শিল্প যে কতো উন্নত হয়েছে তার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৯৬২-৬৩ সালে। দিল্লীর সংগীত নাটক একাডেমী রূপকারের 'ব্যাপিকা বিদায়' অভিনয় দেখে তাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছে। শুধু একটা পুরস্কার পেয়েছে বলেই আমি তাদের ভাল বলছিনা। বাংলাদেশের জনগণও তাদের প্রডাকসন দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছে। এছাড়া ১৯৬২-৬৩ সালে তাদের দিল্লী ও বোম্বাই তে যে তৃতীয় নাট্য উৎসব হয়েছিল তাতে তারা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করে। তারা বিভিন্ন সময়ে যে সব নাটক অভিনয় করেছেন তার একটা তালিকা দেওয়া হল। ১৯৫৬ : ছেঁড়াতার : তুলসী লাহিড়ী, চলচিত্তচঞ্চরি : সুকুমার রায়, বাংলার মাটি : তুলসী লাহিড়ী, শাস্তি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৫৭ : নায়ক : তুলসী লাহিড়ী, নাট্যকার : তুলসী লাহিড়ী, কাবুলীওয়ালা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৫৮ : স্বর্ণমৃগ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৫৯ : দুখীর ইমান : তুলসী লাহিড়ী, মাল্যদান : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৬০ : ব্যাপিকা বিদায় : রসরাজ অমৃতলাল বসু, চৌর্য্যানন্দ : তুলসী লাহিড়ী, ভিত্তি : তুলসী লাহিড়ী, ত্যাগ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৬১ : বিবাহবিভ্রাট : রসরাজ অমৃতলাল বসু, লাহিড়ী : বাঁক

মুখোপাধ্যায়, জীবিত ও মৃত : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৬২ : কালের যাত্রা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৬৪ : মুচিরাম গুড় : বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডিটেকৃটিভ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৬৬ : অচলায়তন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সব থেকে আনন্দের ও গৌরবের কথা ১৯৫৫ সালে যে মাসে তাদের জন্ম হয়েছিল, আজ থেকে ১৬ বছর আগে, তারা তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, ১৯৫৬ সালে তারা যে 'বাংলার মাটিকে' বেছে নিয়েছিল আজ ৭২ সালে আবার তারা তুলসীদার বাংলার মাটিকে নব রূপে প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন। সবিতাব্রত দত্তকে আমরা জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। তিনি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেদিনের ত্রুটি বিচ্যুতিকে সংশোধন করে আজ আবার বাংলার নব জাগরণের মুখে সেই 'বাংলার মাটি'র প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন। এ প্রসঙ্গে রূপকারের স্যুভেনিয়ের একটি লেখা আমি উল্লেখ করছি।

"১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদে কবিকণ্ঠ সোচ্চার হয়ে গেয়েছিল :

বাংলার মাটি, বাংলার জল
ধন্য হোক, ধন্য হোক হে ভগবান।

বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর ভাষা এবং বাঙ্গালীর বুক ভরা ভালবাসার মর্মকথাটি—প্রেম এবং বিদ্রোহের জোড়-কলমে-লেখা হয়েছে মানব-দরদী নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর 'বাংলার মাটি' নাটকটিতে।

সাহিত্যের রসোত্তীর্ণতার সঙ্গে কালোত্তীর্ণতার এক অদৃশ্য মেল-বন্ধন দেখা যায়। ১৯৫৩-৫৪ সালে রচিত এ নাটকে সমসাময়িক মৌল সমস্যাকে নিয়ে নাট্যকার যে "ক্ষণিক অবসর বিনোদনের জন্য" আসর সাজাননি তার প্রমাণ মিলবে সত্তরের দশকের সেই সমস্যার পুনরাবৃত্তিতে। ভূমিকায় নাট্যকার নিবেদন করেছেন যে 'বাংলার মাটি' "ভাঙ্গা বাংলার বর্তমান ভাঙ্গা মনের কাহিনী।"

তাই কয়েক যুগ পরে আবুমিঞা ও কালীবাবুর বন্ধুত্বে আজ নতুন করে আবার বিচ্ছেদ এসেছে। লটকা আর মুকুন্দের রক্তে ঢাকার রাজপথ আবার লাল হয়েছে ৭১ সালে। "পশ্চিমা গুলার সাথে" গরীবুল্যাদের আজও বনছে না। তবে সেদিনের সদানন্দ উকিল আর সলিম মিঞারা আজ হয়ত তেমন ভাবে আর বেঁচে নেই, কিন্তু এ নাটকের রচনাকালে তারা অশরীরে পায়ে হেঁটে রঙ্গমঞ্চে উঠে এসেছিল পূর্ব পাকিস্তানের মাটি থেকে।

চিত্রাদের সমস্যা আরও গভীরে। তাদের সমস্যা সমাধানের যে ইঙ্গিত নাট্যকার দেখেছেন, তার সম্ভাব্যতাকে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি না করে শুধু বলা যায়, আজ যখন নটকা আর নুরুরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদানের যজ্ঞে মেতেছে তখন তাদের চরমত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হতেই হবে।

এ নাটকের মূল কথাটা "অত্যাচারী বকরাক্ষসকে বধ করতে সমবেত অন্যায়-বিরোধী জনসাধারণই ভীম সেন।"

আজকের রূপকারের বাংলার মাটিতে যারা অভিনয় করছেন তারা হলেন, সবিতাব্রত দত্ত, দেবব্রত দে, নিরঞ্জন গাঙ্গুলী, সুধাংশু মুখার্জি, প্রশান্ত বোস, অতীশ সেন, শৈলেন চন্দ্র সাহা, অমল ঘোষ দস্তিদার, সলিল চক্রবর্ত্তী, মধুসূদন দত্ত, নারায়ণ চ্যাটার্জী, সমীর রায়, সলিল চক্রবর্ত্তী, অলক চক্রবর্ত্তী, দিলীপ ব্যানার্জী, কমলা ব্যানার্জী, রমা ব্যানার্জী, কল্যাণী বোস ও গীতা দত্ত।

নেপথ্যের শিল্পী—আলো তাপস সেন, মঞ্চ—সুরেশ দত্ত, শব্দপ্রক্ষেপণে—কমল চৌধুরী, রূপসজ্জা—দি মেক-আপ, নির্দেশনা—সবিতাব্রত দত্ত।

এছাড়া নেপথ্য শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যে আরো যারা রূপকারে বিভিন্ন সময়ে ছিলেন, কেউ কেউ এখনও আছে তাঁদেরও নাম দেওয়া হল। সংগীত—প্রবগোপাল গাঙ্গুলী, রবীন দাস, শচিন ঘোষ, শৈলেন মণ্ডল, নিরঞ্জন ব্যানার্জী, আলো—অমিতাভ সেন, মেক-আপ—মহঃ হাসিদ, মহঃ সত্তার, অচলায়তনে রবীন্দ্র সঙ্গীতে ছিলেন প্রসূন দাসগুপ্ত।

গণনাট্য সঙ্ঘ / হরিপদ মাস্টার

১৯৫৫ সাল। বহু সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণ এগিয়ে চলেছেন। কতো শোষিত মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। কতো জীবন আত্মাহুতি দিয়েছে বাঁচবার জন্তে লড়াই করতে গিয়ে। ১৯৫৪ সালে মাস্টার মশাইরা আর আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে পারলেন না। পারলেন না বলেই বেঁচে থাকার দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলনে নেমে পড়লেন। দিনের পর দিন রাজভবনের সামনে বসে রইলেন আমাদের মাস্টার মশাইরা, একাধারে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন দেশের অগণিত জনসাধারণ। অন্যধারে পুলিশ দিয়ে নিস্পেষণ চালালেন দেশের সরকার।

সুনীল দত্তর হরিপদ মাস্টার এই ঘটনাকে নিয়ে লেখা। আমাদের জীবনে যেমন আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা থাকে, মাস্টার মশাইদের জীবনের মধ্যেও তেমনি কিছু চাওয়া পাওয়ার সাধ আছে। হরিপদ মাস্টারও সেইভাবেই বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল না। কিন্তু সামাজিক নিষ্পেষণ আর অন্যায় অবিচার তাকে বাধ্য করল সেই পথে নামতে। এই নাটকটি মুর্শিদাবাদ পুলিশ কর্তৃপক্ষ শো বন্ধ করে দিয়েছিল। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বরানগর শাখা এই নাটকটি অভিনয় করতেন। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তারক ঘোষ, কিরণ মৈত্র ও আরো অনেকে। নাটকটি ১৯৫৪ সালে বহরমপুরে গণনাট্য সঙ্ঘ অভিনয় করতে গিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষ নাটকের শো বন্ধ করে দেয়। এই নিয়ে সেই সময়ে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন জনসাধারণ। উৎপল দত্ত বহরমপুরে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

গণনাট্য আন্দোলন/পোস্টার নাটিকা

১৯৫৫-৫৬ সাল। গণনাট্য আন্দোলন নবপর্যায়ে শুরু হলো। গণজাগরণের ক্ষেত্রে যেমন শুরু হলো নতুন জয়গান, নাট্য আন্দোলনেও তার প্রত্যক্ষ ছাপ পড়ল। গণশিল্পীরাও আর বসে থাকলেন না, গণ-আন্দোলনের তালে তাল দিয়ে তারাও ছড়িয়ে পড়লেন সহরে গ্রামে গ্রামান্তরে।

একটি রাজনৈতিক বক্তব্যকে ঘিরে পোস্টার নাটিকার মাধ্যমে আরো বেশী জনগণের কাছাকাছি পৌঁছলেন গণশিল্পীরা। মঞ্চ নেই, আছে শুধু একটা তক্তাপোষ, আলোর মধ্যে পাওয়া গেছে শুধু একটা গ্যাসলাইট। সেট সেটিং-এর বালাই নেই। রূপসজ্জারও প্রয়োজন নেই; শুধুমাত্র একটা বলিষ্ঠ বক্তব্য, যে বক্তব্যটাই সাধারণ মানুষের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করত। পশ্চিমবঙ্গে পোস্টার নাটিকা সর্ব্বপ্রথম লেখা হয় সলিল চৌধুরীর একটি গানকে কেন্দ্র করে। বন্দী মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় "চার্জশীট"। এই নাটকটি যদিও উমানাথ ভট্টাচার্যর নামে প্রকাশ হয়েছিল আসলে কিন্তু এটাতে অনেকেরই অবদান আছে। একথা উমানাথ বাবু তাঁর ভূমিকায় স্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে নাম করা যায় উৎপল দত্ত, ঋত্বিক ঘটক, মমতাজ আমেদ, উমানাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। এই নাটকটি প্রথম অভিনয় হয় হাজরা পার্কে একটি জনসভায়।

পরিবর্তীকালে আমার বেশ মনে আছে খাদ্যের দাবীতে যখন দেশের মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে আমাদের মহলা হয়, সেইখানেই ঠিক হল একটা নাটক করতে হবে। কে লিখবে? পানু পাল লিখলেন নাটক। নাম দেওয়া হল "কতো ধানে কতো চাল"। সেই নাটক ধর্মতলার রাস্তায় প্রথম অভিনয় হয়। গ্রাম থেকে লোক এসেছে রাজভবনের সামনে তাদের দাবী জানাতে। সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন: ঋত্বিক ঘটক, মমতাজ আমেদ, শান্তনু ঘোষ, অমল কর, সুনীল দত্ত ও পানু পাল।

পানু পাল পরবর্তীকালে একটি নাটক লেখেন ওয়েটিং ফর লেফটি অবলম্বনে। নামটা আমার ঠিক মনে নেই। সে নাটকটি মনুমেন্টের তলায় একটি জনসভায় অভিনীত হয়েছিল।

সেই সময়ের নাট্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উৎপল দত্ত সম্পাদিত পাদ-প্রদীপ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। সেই পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় নান্দী (সম্পাদকীয়) নামে একটা লেখা প্রকাশ হয়েছিল। আমি সেই গুরুত্বপূর্ণ লেখাটি ছেপে দিলুম সেই সময়কার অবস্থাটা বর্ণনা করার জন্যে।

॥ পাদপ্রদীপ ॥

॥ নান্দী ॥

"প্রথমেই মার্জনা ভিক্ষা! এই বিশৃঙ্খল এবং "পাদপ্রদীপ" প্রকাশের বিলম্বের কারণ কতকগুলি আমূল সাংগঠনিক পরিবর্তন। বিশেষ করে সম্পূর্ণ অপেশাদার, অর্থাৎ নিছক আদর্শবাদী পত্রিকা হওয়ার ফলে "পাদপ্রদীপ" কিছু কিছু অনভিজ্ঞতাপ্রসূত দুর্বলতায় ভুগছে। বর্তমান পরিবর্তনে যে তা একেবারেই দূরীভূত হোলো, এমন স্তোকবাক্য পাঠকদের দেব না, তবে বিশৃংখলা কমলো এটা নিশ্চিত। এইসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই গ্রাহকদের, যাঁরা অসীম ধৈর্য সহকারে আমাদের সকল ত্রুটি ক্ষমা করেছেন।

সারা দেশে নির্বাচন হয়ে গেল। এই নির্বাচনী সংগ্রামে একাধিক দল সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাহায্য পেয়েছেন। আমরা এইসব কর্মীদের অভিনন্দন জানাই, কারণ আমরা মনে করি না যে একদেশদর্শী আখ্যা পাওয়ার ভয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীদের রাজনৈতিক প্রচার কার্য পরিহার করে চলা উচিত ছিল।

এতে সাংস্কৃতিক কর্মীরা রাজনৈতিক দলগুলির ক্রীড়নক হয়ে পড়বেন এ আশঙ্কা অমূলক, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা শুধু আমাদের অধিকার নয়, কর্তব্য। থেকে থেকে অবশ্য শোনা যায়—শিল্পীরা রাজনীতিতে মাথা গলান কেন? সেই সুরেই অনুযোগ হয়—ছাত্ররা বড় বেশী রাজনীতি করছেন, উদ্বাস্তুরা রাজনৈতিক প্ররোচনায় উত্তেজিত হচ্ছেন, শ্রমিকরা তাঁদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে করতে আজকাল বড় বেশী রাজনীতি করছেন, শিক্ষকরা রাজনীতি নিয়ে এমন মেতেছেন যে মিছিল পর্যন্ত বার করেছেন, সংবাদপত্রগুলিকে (এই সেদিন) সতর্ক করার চেষ্টা হয় তাঁরা নাকি দেশের স্বার্থের দিকে ঝুঁকছেন; এমন কি চিকিৎসকদের সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রতিও অনুরূপ কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে। জিজ্ঞেস করি—রাজনীতি তবে করবে কে? ছাত্র যদি রাজনীতি না করেন, অধ্যাপক-শিক্ষক-চিকিৎসক যদি রাজনীতি না করেন, শ্রমিকরা যদি রাজনীতি না করেন, তবে বাকী থাকে বোধ করি কতিপয় "পেশাদার" রাজনীতিজ্ঞ ও কিছু গুণ্ডা-আইনের আসামী! আসলে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার এইসব উপদেশ গণতন্ত্রবিরুদ্ধ, ভারতের সংবিধান বিরোধী।

ঠিক এইজন্যেই শিল্পীরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবেন। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ গ্রহণের দুটি তাৎপর্য:—

(১) জনজীবনে যেসব আলোড়ন আসে তাই যদি আমাদের নাটক প্রভৃতির উপজীব্য হয় তাহলে নির্বাচনের এই প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে নাট্য আন্দোলন পুষ্টি লাভ করবে, নূতন নাটকে গানের স্রোত শুরু হবে। দক্ষিণপন্থী হোক, বামপন্থী হোক নূতন ভাবধারায় নাট্য আন্দোলন প্লাবিত হবে; পাশাপাশি নানা ধরণের নানা মতের রাজনৈতিক নাটক সৃষ্টি হবে। এর অধিকাংশের মূল্যই হয়ত সাময়িক হবে; কিন্তু অসংখ্য কালোপযোগী সমস্যামূলক নাটক থেকেই অবশেষে সৃষ্টি হয় কালজয়ী ক্ল্যাসিকের। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে সামাজিক বিপ্লবের প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল তার প্রতিটি সমস্যা, প্রতিটি সংগ্রাম রূপ পেয়েছিল অসংখ্য ছোট বড় নাটকে। তার সঙ্গে এসে মিশেছিল ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা; তবেই না সম্ভব হয়েছিল "নীল-দর্পণের" জন্ম। রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করলেই শিল্পীদের ভাববিলাস কাটবে, "শাশ্বত" নাটক সৃষ্টির মোহ কাটবে, সাধারণ মানুষকে তাঁরা বুঝবেন, দৈনন্দিন সমস্যাকে এড়িয়ে স্বপ্নলোকের উপর যে "শাশ্বত" নাটক সৃষ্টি হয় না বরং দৈনন্দিন সমস্যাগুলোকেই যে জীবন দর্শনের রসে সিঞ্চিত করে তাকে

বিমূর্ত তত্ত্বের মার্গে তুলে আনতে হয়, তাকে স্থান কালের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিতে হয়—এ তথ্যটি শিল্পীরা বুঝবেন।

(২) ভারতে যে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ দেখা দিয়েছে একে জাগিয়ে রাখার, ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব আর সব মানুষের মত শিল্পীগোষ্ঠীর ওপরও এসে পড়েছে। গণতন্ত্রের মূল কথাই তো প্রতিটি পরিণত বয়স্ক মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগ। শুধু অধিকার পাওয়া বড় কথা নয়; এ দলকে দেব বা ও দলকে দেব—সেটিও তত বড় প্রশ্ন নয়, যত বড় হচ্ছে নির্ভীকভাবে, উৎসাহ সহকারে ভোট দেওয়া। এদেশের মানুষ নাট্যপ্রিয়। নাটকের মাধ্যমে তাঁদের এপবিত্র অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা সম্ভব। তাঁদের বোঝানো সম্ভব নির্বাচন আসলে দুটি বিরোধী নীতির সংঘর্ষ, ব্যক্তির নয়; এবং এ সংঘর্ষের বিচার করবেন জনতা। যাকে খুসী ভোট দিন, কিন্তু ভোট দিতেই হবে। নইলে আমাদের মুমূর্ষু গণতন্ত্র অতি শীঘ্রই শ্মশানযাত্রা করবে। নাট্যশিল্পীরা তথ্যবহুল প্রচার নাটিকা মঞ্চস্থ করে তাঁদের কর্ত্তব্যই করেছেন।

এতে এক শ্রেণীর লোক, এক শ্রেণীর শিল্পীও নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন সন্দেহ নেই। আর্টের মহত্ব খর্ব হচ্ছে বলে তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করবেন। কিন্তু উপায় নেই! শিল্প কবে কোথায় রাজনীতি নিরপেক্ষ হয়েছে আমাদের জানা নেই। সব শিল্প প্রচেষ্টাই প্রচারধর্মী, কোনোটি প্রচ্ছন্ন, কোনোটি প্রকট, কোনোটি বা আবার উৎকট।

এবার আসছে আমাদের নিজেদের কথা। নাট্য আন্দোলনের নিজস্ব কতকগুলি অভিযোগ আছে: নির্বাচনে প্রার্থীদের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করা আমাদের কর্তব্য। কলকাতার প্রতি পাড়ায় সাংস্কৃতিক সংগঠন রয়েছে; মফঃস্বলেও অসংখ্য সংগঠন। এগুলিই প্রমাণ করছে বাংলার সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের শিল্পবোধ ও শিল্পের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার আকাঙ্খা। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের চাপে এদের কোনোরকম বিকাশ হতে পারছে না। অথচ এরা একাধিকবার প্রতিভার স্ফুরণে কলকাতাকে চমকে দিয়েছেন। একবার প্রচুর ঢক্কানিনাদ সহকারে বিঘোষিত হয়েছিল—সরকার অকস্মাৎ সংস্কৃতি সচেতন হয়ে গেছেন; তাঁরা এবার থেকে উপযুক্ত সংগঠনগুলিকে অর্থসাহায্য দেবেন এবং যোগ্য শিল্পীদের বৃত্তি দেবেন। দু-একটি যে তাঁরা দেননি এমন নয়, তবে বিনিময়ে যেসব অর্ভাবি মাল সেই হতভাগ্য সংগঠন ও শিল্পীদের স্কন্ধে তাঁরা আরোপ করেছেন, তাতে করে তাদের স্বকীয়তা

স্বাধীনতা ও প্রতিভার অকালমৃত্যু ঘটেছে। এর নাম কি গণ-সংস্কৃতিকে রক্ষা? আবার ওপর থেকে এক অপরূপ সংগঠনকে "লোকরঞ্জন" উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে; এদের কাজ কতকগুলি আধা বিলিতি সুরে সরকারী প্রশস্তি গাওয়া। সত্যি বিকিয়ে কোনো বরেণ্য শিল্পীই এই রাইটার্স বিল্ডিং মার্কা কাল্‌চার প্রচারে রাজী হন নি।

সত্যিই গণ-সংস্কৃতির প্রতি যদি কোনো শ্রদ্ধা সরকারের থাকত তবে সাততলা থেকে "লোকরঞ্জন" না করে শুরু করতেন প্রতি পাড়া, প্রতি গ্রাম থেকে। পল্লীর সাংস্কৃতিক বিকাশ যে সঙ্ঘের মাধ্যমে হচ্ছে সেই সঙ্ঘকে করা উচিত ইউনিট; এইরূপে ক্রমশঃ পিরামিডের আকারে এসে পৌঁছুনো উচিত ছিল কলকাতার সরকারী মহলে, যেখানে শুধুমাত্র সাংগঠনিক ব্যাপারেই কাজকর্ম আবদ্ধ থাকবে। তা তো হবে না! শেখ গোমানি, রমেশ শীলকে সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দেবেন জনৈক ব্রিটিশ আমলের আমলা! স্পর্ধা!

বাংলার লোককবিরা যে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছেন, বাংলার যাত্রা-শিল্পীরা যে ক্ষুধাক্লিষ্ট শীর্ণাকার ধারণ করেছে সে সংবাদ কি "লোকরঞ্জনের" সংগঠকদের কাছে পৌঁছয়? কীর্তনের হাস্যকর অনুকরণে কংগ্রেসের গুণগানে অত টাকা খরচ না করে যাত্রার দলগুলিকে কিছু অর্থ বরাদ্দ করে দিলে বাংলার নিজস্ব একটি লোকনাট্য হয়ত বেঁচে যেত।

শহরের অপেশাদার নাট্যসম্প্রদায়গুলিকে কয়েকটা হারমোনিয়াম, কিছু মঞ্চের যন্ত্রপাতি, পোষাক তৈয়ারীর জন্য কিছু কাপড় প্রভৃতি সরবরাহ করলেই তাঁরা খুসী হয়ে বাংলার মঞ্চের গৌরব বর্দ্ধনে ব্রতী হতেন। আর যদি অতি বৃহৎ পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কিছু করা সরকারের পক্ষে হেয় মনে হয়, তবে আয়ারল্যাণ্ডের অনুকরণে সিভিক থিয়েটার গঠন করতে পারতেন, প্রতি মিউনিসিপ্যালিটি মারফৎ সস্তায় কাঠ ও এ্যাসবেসটসের ছাদযুক্ত ছোট ছোট প্রেক্ষাগৃহ তৈরী করে দিলেও চলত। এই থিয়েটারগুলি বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে এলাকার ইউনিটগুলির ব্যবহারার্থে দেওয়া যেত; কারণ সকলেই জানে রঙ্গমঞ্চগুলি কয়েক ব্যক্তির অর্থলালসা চরিতার্থের উপায়মাত্র। ফলে সাধারণ সঙ্ঘগুলি রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিতে অক্ষম; মঞ্চের ঠাট বজায় রাখতে গলদঘর্ম হতে হয়।

এই যে সুবিধাগুলি আমরা দাবী করছি, একি ভিক্ষা? মোটেই নয়। যে বিপুল অর্থ প্রমোদকর হিসাবে আমরাই সরকারে দিয়ে থাকি তা থেকেই

অনায়াসে এ সকল ব্যবস্থা হতে পারে। এই শতকরা ২৫ টাকা প্রমোদকরের রক্তচক্ষুর সামনে অনেক অপেশাদার সম্প্রদায় দরজা বন্ধ করে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। অথচ পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলিকে এ কর দিতে হয় না। আর দিতে হয় না তাঁদের যাঁরা বছরে একবার নিউ এম্পায়ারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গৃহে মুখ্যমন্ত্রীর অমুক ফাণ্ড বা দার্জিলিং-এ শ্বেতাঙ্গদের অমুক ছাত্রাবাস তহবিলের সাহায্যার্থে নাট্যাভিনয়ের ভাণ করেন।

আবার প্রমোদকর যাতে কেউ ফাঁকি না দিতে পারে তজ্জন্য বিনিদ্র প্রহরার ব্যবস্থা আছে (এ তো আর কোটিপতির আয়কর ফাঁকি নয় যে পুলিশ অফিসার বদলি করেও তাঁকে রক্ষা করতে হবে)। সব টিকিট বিক্রী হ'লে যে টাকাটা সঞ্চিত হবে তার একচতুর্থাংশ একটি টিকিটও বিক্রী হবার পূর্বেই জমা দিতে হবে গ্যারান্টি হিসাবে। মণ্ডপ নির্মাণ করে, মঞ্চ বেঁধে, টিকিট ছেপে, দৃশ্যসজ্জাদি প্রস্তুত করে, মায় ফায়ার ব্রিগেড ও পৌরসভায় সেলামী গুণে, আবার টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? সে ভাবনা হতভাগ্য শিল্পীদের। তারপর আর এক রসিকতা! সব টিকিট বিক্রী না হলে গ্যারান্টির কিছুটা ফেরৎ পাওয়ার কথা; কিন্তু এ টাকা উদ্ধার করতে চুল পেকে যাওয়ার উপক্রম হয়।

এত সত্ত্বেও বাংলার নাট্যপিপাসু মানুষের প্রেরণায় নাট্য আন্দোলন বেঁচে আছে। অতএব আর এক অস্ত্র—সেন্সরশিপ। গণতন্ত্র আদি আদর্শবাদী বাক্যালঙ্কার পুঁথির পাতায় থাক, বাংলার নাট্য আন্দোলনের কোনোরকম মতামতের স্বাধীনতা বরদাস্ত করা হবে না। তাই পুলিশের গুটিকয়েক অর্ধশিক্ষিত কর্তার হাতে ভার দেওয়া হয়েছে দীনবন্ধু-মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের নাটকের ছাড়পত্র প্রদানের। এঁরাই তো শোনা যায় ধ্বংসাত্মক কথাবার্তায় উত্তেজিত হয়ে "নীলদর্পণ" লেখককে জরুরী তলব পাঠিয়েছিলেন লালবাজারে আসতে। সবশেষে রয়েছে ব্রিটিশ সৃষ্ট ১৮৭৬ সালের আইন, যদ্দারা খাকীভূষিত সংস্কৃতির নায়কগণ যে কোন নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করতে পারেন। এই সেদিনও গণনাট্য সঙ্ঘের ওপর এই ১৮৭৬-এর তাণ্ডব চলেছে।

আমাদের প্রার্থীদের কাছে আমাদের প্রশ্ন দারিদ্রগ্রস্ত সম্প্রদায়গুলিকে অর্থসাহায্য করা হবে কি? লোককবিদের রক্ষার চেষ্টা হবে কি? লোক-নাট্য বাঁচবে কি? প্রমোদকর রদ বা অন্ততঃ কমানো হবে কি? আজ পর্যন্ত প্রমোদকর যা সংগৃহীত হয়েছে তা কোন্ বদ্ধপথে কোথায় অদৃশ্য হোলো

জানতে পারব কি? ১৮৭৬ সালের আইন ও পুলিশী হস্তক্ষেপ বন্ধ হবে কি? "লোকরঞ্জন"-এর বর্তমান কায়দা পরিত্যক্ত হবে কি? যে সব শিল্পী আছেন "মাটির কাছাকাছি" সত্যই তাঁদের নেতৃত্ব কায়েম হবে কি? অসুস্থ ও বৃদ্ধ শিল্পীদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হবে কি?

সর্বোপরি যে প্রশ্ন মনে জাগে তা হচ্ছে খেতে পাব কি? ক্ষুধার্ত মানুষ যে সাংস্কৃতিক জীবনের স্বাদ গ্রহণে অসমর্থ তা সকলেই জানে। কঠোর ত্যাগেও যে অনির্বচনীয় আনন্দ (ইদানীং যার কথা এমন সব ব্যক্তির মুখে শোনা যাচ্ছে যাঁদের জীবনে অভাবও নেই, ত্যাগের প্রয়োজনও নেই!) সে বোধকরি ভারতের বিশেষ ঐতিহ্য (লক্ষ্মণ চৌদ্দ বছর অনাহারে ছিলেন বলেই কিনা কে জানে?)। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে মনে হয় উদরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবার পরেই শুধু মনের ক্ষুধা জাগে।"

পোস্টার নাটিকার যে জোয়ার এসেছিল, পরবর্তীকালে দেখা গেছে উৎপল দত্ত নির্বাচনের পটভূমিকায় 'স্পেশাল ট্রেন' লেখেন। বাংলা হিন্দী দুটো ভাষাতেই এই নাটক ছাপা হয়েছিল। এই নাটকে অভিনয় করতেন উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ সেন, কমল মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধান মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বন্দোপাধ্যায়। এই নাটক হিন্দ মোটরস-এর কারখানাকে কেন্দ্র করে লেখা। ঐ এলাকার জনসভায় প্রথম অভিনয় হয়েছিল। এরপর সুনীল দত্ত নির্বাচনের পটভূমিকায় লেখেন "ভাঙ্গাতরী"। সহরে গ্রামে বহু সংগঠনের উদ্যোগে এই নাটক অভিনীত হয়। পরবর্তীকালে সুনীল দত্ত বাংলা বিহার সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে 'মালা বদল', 'শুভদৃষ্টি' নামে দুট নাটক লেখেন। সেই সময়ে এই আন্দোলনের সহায়ক হিসাবে এই নাটক দু'টি খুবই সমাদৃত হয়েছিল। পোস্টার নাটিকা আরো অনেকেই লিখেছেন। বীরু মুখোপাধ্যায় 'নবকর্ণ', দিপিন বন্দ্যোপাধ্যায় 'কাঁঠালের আমসত্ব।'

ব্রাইট থিয়েটার

১৯৫৫ সালে কয়েকজন সদস্যের মাধ্যমে 'ব্রাইট থিয়েটার' সংস্থা জন্মলাভ করেছিল। প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করলেন বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'অমৃত যন্ত্রণা'। তারপর একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করলেন। ১৯৬৮ সালে মনমোহন মজুমদারের 'ওরা কাজ করে' স্থানীয় নাট্য সংস্থা শুভলাভ

আয়োজিত প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ সংস্থা ও পরিচালকের সম্মান লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে প্রথম বাইরের প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ব্যারাকপুরের সুভাষ মঞ্চে রতন ঘোষের 'শেষবিচার' নাটকটি নিয়ে। ওখানে তাঁরা প্রশংসাপত্র অর্জন করলেন। তার পরের বছর থেকে আজ পর্যন্ত নৈহাটির যাত্রিক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন ওঁরা। তাছাড়া আরও কয়েকটি প্রতিযোগিতায় যোগদান করে প্রশংসা ও পুরস্কার অর্জন করেছেন। এ বছর '৭২-এর শতবর্ষে নবতম প্রযোজনা স্বরূপ ব্রহ্মের 'সাগর প্রাণ' নাটকটি ২৪শে জানুয়ারী 'যাত্রিক' আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম মঞ্চস্থ হ'লো। এ ব্যাপারে আগামী দিনের নাট্য আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তোলার জন্য বাংলা দেশের নাট্যকারদের সহযোগিতা করতেও ওঁরা প্রস্তুত আছেন।

(ক) বর্তমান সম্পাদক শ্রী অক্ষয় কুমার সেন।

(খ) এতাবৎকাল অভিনীত নাটক ও নাট্যকারের নাম এবং তাছাড়া আরো যেসব নাটক করেছেন: যবনিকা কম্পমান—সত্যেন ভদ্র, চৌর্য্যানন্দ—তুলসী লাহিড়ী, বাজীকর—জ্যোতু বন্দোপাধ্যায় এবং নবতম প্রযোজনা স্বরূপ ব্রহ্মের 'সাগর প্রাণ'।

পূর্ণাঙ্গ:—আমি এ চাইনি—সুধাংশু দাশগুপ্ত, পাখীর বাসা—জগমোহন মজুমদার, ঝিঁঝি পোকার কান্না—অগ্নিদূত, বৌদির বিয়ে—শৈলেশ গুহ নিয়োগী, কাঁটা তারের বেড়া—শচীন ভট্টাচার্য এবং শিশু নাটক অরুণ-বরুণ কিরণ মালা—শৈলেন ঘোষ।

(গ) পরিচালকের নাম:—দুর্গাশঙ্কর পাণ্ডা।

(ঘ) নাটক মঞ্চায়নে অসুবিধা:—প্রথমতঃ এখানে স্থায়ী মঞ্চ নেই। একটি স্কুলের ব্যক্তিগত মঞ্চে অথবা সিনেমা হলে অভিনয় করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ অর্থ ও মহিলা শিল্পী। তৃতীয়তঃ দর্শক।

(ঙ) নাটকে অংশ গ্রহণকারী সদস্য:—দুর্গাশঙ্কর, প্রদীপ্ত বসু, অক্ষয় সেন, কানাই সামন্ত, সৌরীন্দ্র আচার্য্য, শঙ্কর দে, রবীন মালাকার, কাশীনাথ দাস, তুষার চক্রবর্ত্তী, শোভন ঘোষ, অজিত ব্যানার্জী, চণ্ডীদাস, রমেশ দত্ত, দিবাকর দাস, নব কোলে, সুকুমার সেন, প্রশান্ত দে, কল্যাণ চক্রবর্ত্তী, রাজেন দাস প্রভৃতি।

(চ) অন্যান্য:—তাছাড়া ছোটদের নাটক যাতে মঞ্চস্থ হয় সেজন্য ছোটদের

নাটকও এঁরা করেন। শ্রীমতী গীতা সিংহের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' নাটকটি মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া আগামী প্রযোজনা 'মিতুল নামে পুতুলটি'র মহড়া চলছে।

লোক ও নাটক থেকে লোক মঞ্চ

১৯৫৩ সাল, লোক ও নাটক সাধারণ মানুষের হাসি কান্নার কথা বলার জন্যে ছোট ছোট নাটক নিয়ে শুরু করলেন তাঁদের যাত্রা। আমরা দেখলাম মাঠে ময়দানে এঁদের প্রথম সার্থক নাটক গিরিশংকরের আজকের নাটক তিন শিক্ষক আন্দোলনের পটভূমিকায়। অবশ্য এর আগেও এঁরা শ্রমিক জীবনের পটভূমিকায় আজকের নাটক ১৯৫০ সালে করেছেন। ১৯৫৩ সালেও আজকের নাটকের উৎসব করলেন। সেই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন তুলসী লাহিড়ী ও অজিতকুমার ঘোষ। ১৯৫৫ সালে এঁরা অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের শিক্ষক জীবনের পটভূমিকায় 'ভাঙন' ও উদ্বাস্তু জীবনের বেদনাকে ঝড়ের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেন গিরিশংকরের 'পথ' অভিনয় করে। পর পর তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করলেন এঁরা বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের আহ্বানে। গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'এক অধ্যায়' একাংক নাটক অভিনয় করে পুরস্কৃত হন। এই প্রযোজনাটির পরিচালনার দায়িত্ব নেন ত্রিদিব লাহিড়ী। এর পর ১৯৬৪ সালে চিত্ত ঘোষালের 'উইল' পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনয় করেন এবং একই সঙ্গে নাট্যকারের বিষবৃক্ষ একাংক অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই দলে ছিলেন গিরিশংকর, নিমাই চট্টোপাধ্যায়, তৃপ্তি চৌধুরী, মীনাক্ষী চৌধুরী, মনীষা চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, প্রণ ভট্টাচার্য, ভবতোষ সিংহ রায়, ত্রিদিব লাহিড়ী, সত্যেন সেন, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, জ্ঞান গাঙ্গুলী ও শৈলেশ বাবু।

১৯৫৭ সাল। এবার ভাঙনের পালা, নাটক নয়, দল ভাঙলো। লোক ও নাটক ভেঙে সৃষ্টি হল, লোক মঞ্চ। এঁরা প্রথম কাজের দায়িত্ব নিলেন একটি নাট্য সেমিনারের। মহাবোধি সোসাইটি হলে হলো তিন দিন ব্যাপী পশ্চিম বঙ্গ নাট্য সেমিনার। এই সেমিনারে সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়,

মন্মথ রায়, অহীন্দ্র চৌধুরী। আহ্বায়ক ছিলেন অজিতকুমার ঘোষ, সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও গিরিশংকর। নাটকের নানা সমস্যার ওপর এখানে আলোচনা শুরু হয় এবং একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় এই প্রথম সেমিনার যেখানে একটা হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার মধ্যে দিয়ে নাট্যানুরাগীদের একটা ঐক্য স্থাপন হল। পরস্পরের মধ্যে চেনা জানার ভেতর দিয়ে সামান্য কিছু পরিচয় ঘটল।

এঁরা শুরু করলেন গিরিশংকরের 'সাইরেন' কাব্য নাটক দিয়ে। মহাজাতি সদনে কাব্য মেলায় এই 'সাইরেন' অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেন। এর পর ওয়াই এম সি এ চৌরঙ্গীতে একাংক নাটক গিরিশংকরের 'এক চিলতে শহীদ স্মৃতি' মঞ্চস্থ করেন। এই সময়ে গিরিশংকরবাবু বাংলা দেশে প্রথম একক অভিনয় শুরু করেন। নাটকের নাম 'শেষ সংলাপ'। ১৯৫৮ সালে তৃপ্তি চৌধুরীর 'ঘরোয়া', মন্মথ রায়ের 'রক্ত কমল', সুনীল দত্তের 'কুয়াসা', গিরিশংকরের 'ঘর বদল' পূর্ণাঙ্গ নাটক পর পর অভিনয় করলেন। ১৯৫৯ সালে কৃষ্ণ ধরের কাব্য নাটক নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন। রঙমহলে গিরিশংকরের মধ্যবিত্ত জীবনের উপর নাটক 'সকাল দুপুর সন্ধ্যে' অভিনয় করলেন। ১৯৬০ সালে মন্মথ রায়ের 'পেটপাড়া', 'মমতাময়ী হাসপাতাল' একাংক নাটক বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় করেছেন। ১৯৬১ সাল ১৮ই ডিসেম্বর লোক মঞ্চ বিদ্যাসাগরের জীবনীর ওপর রচিত নাটক সুনীল দত্তের 'বর্ণপরিচয়' মঞ্চস্থ করলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরাট কর্ম জীবনের সামান্য অংশ—যেমন স্ত্রীশিক্ষার প্রসার আর সমাজের কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্যকে এই নাটকে দেখানো হয়েছে। নাটকটি পরিচালনা ও বিদ্যাসাগরে ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন গিরিশংকর। অতিথী শিল্পী হিসাবে অভিনয় করেছিলেন প্রখ্যাত নট কালী সরকার মহাশয় ও সুনীল দত্ত। আবহ সঙ্গীতে ছিলেন অনল চট্টোপাধ্যায় ও আলোয় তাপস সেন। আর বিভিন্ন চরিত্রে লোক মঞ্চের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন বঙ্গেন্দু মুখার্জী, অরুণ চৌধুরী, শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন ভট্টাচার্য, মিহির গঙ্গোপাধ্যায়, গণপতি সেনগুপ্ত, নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, হারু রায়, অনিতা হোম চৌধুরী, মনীষা চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, প্রভাত সেনগুপ্ত, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুন্দ চক্রবর্তী, শুভেন মুখার্জী, জহর দাস, অমল সান্যাল, স্বরাজ ঘটক, অজয় দাসগুপ্ত ও শ্রীমতী বন্দনা।

১৯৬৮ সাল। দীর্ঘ সাত বছর পরে লোকমঞ্চ সুনীল দত্তের গোর্কীর এনিমিজ

অবলম্বনে 'দানব' নাটকের অভিনয় করলেন। গোর্কী শতবার্ষিকীতে মিনার্ভার লোক মঞ্চের স্যুভেনিরে একটি লেখা প্রকাশ হয়েছিল আমি সেটা ছেপে দিলুম।

"পুঁজিবাদের লোহার শেকল মজুরদের হাতে তৈরী, পুঁজিবাদের চমৎকার জীবন মজুররাই তৈরী করে থাকে। কিন্তু তারা নিজেরা পদদলিত, নিঃস্ব, এই কথা বলেছেন গোর্কী। আর এই কথার মূল তত্ত্বটিকে সামনে রেখেই এই নাটকের প্রয়াস।

গোর্কীর কালজয়ী নাটক 'এনিমিজ'-এর ভাবানুসারে 'দানব'। পুঁজিতন্ত্রী সমাজে ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিককে বলা হয় স্বাধীন। অবশ্য তার নিজের বলতে আছে শুধু শ্রমশক্তি। সেই শ্রমশক্তিকে ধনীক শ্রেণীর কাছে বিক্রী না করলে তাকে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হয়। অবশ্য মালিকের মর্জির উপর নির্ভর করে শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে কেনা না কেনা। তাদের মুনাফার পাহাড় থেকে সামান্য একটু ধ্বস নামলেই শ্রমশক্তিকে কেনা বন্ধ করে তারা তখন অল্প খরচে বেশী মুনাফার দিকে লক্ষ্য রাখে। শ্রমিক তখন হয়ে যায় বেকার। এইভাবে শিল্পপতিগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতা বজায় রেখেছে। আর একেই বলা হয় বুর্জোয়া সভ্যতা। গোর্কী বোধ হয় এই কথাই বলবার চেষ্টা করেছেন যে, এই মুখোশধারী রক্তচোষা ধনিক বনিক গোষ্ঠীই হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত শোষিত মানুষের শত্রু। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম সর্বহারা শ্রেণীকে এমন এক শক্তিরূপে প্রতিফলিত করেছেন গোর্কী, যারা এই সমাজ ব্যবস্থাকে পালটাতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আজ শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে দিয়ে যে সংগ্রামী মন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন, তারই কিছুটা চিত্র এই নাটকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের দেশের নিপীড়িত মানুষ যারা নির্যাতন ভোগ করছে, আবার সময় সময় তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে, তাদের যদি কিছুমাত্র কাজে লাগে এ নাটক, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক।"

অভিনয়ে যারা অংশ নিয়েছিলেন তারা হলেন আনন্দ ঘটক, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রমেন নন্দী, রঞ্জিত দাঁ, গোপাল হাজরা, মহাদেব প্রসাদ গুহ খাসনবীশ, বৃন্দাবন কুণ্ডু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুনীল দত্ত, দেবেন গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণচন্দ্র ঘোষ, শ্যামলাল সোম, বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, তপন সেন, জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীষা চট্টোপাধ্যায়, অশোক নন্দী। মঞ্চ—বৃন্দাবন কুণ্ডু, আবহ

সঙ্গীত—রমণী মোহন সান্যাল, বিমলচন্দ্র ঘোষ, রূপসজ্জা—মনীষা চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। নির্দেশনা নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের।

ক্যালকাটা মেরী মেকার্স ক্লাব

ক্যালকাটা মেরী মেকার্স ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ সালে। এই সংস্থার প্রথম নাটক শৈলেশ গুহ নিয়োগী (পিকলু নিয়োগী) রচিত ও পরিচালিত 'কলেজ হোস্টেল'। এই নাট্য সংস্থা সর্বপ্রথম জনপ্রিয়তা লাভ করে থিয়েটার সেণ্টার আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতায় শৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত ও পরিচালিত 'গোল পার্ক' নাটক অভিনয় করে। গিরীশ নাট্য উৎসবে অভিনীত একই নাট্যকারের নাটক 'ক্যাম্প-থ্রি' সংস্থাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। নাট্য সম্মেলনে সঙ্গীত-নৃত্যবহুল নাটক 'ঝুমুর' মঞ্চস্থ করে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হয়। পরবর্তীকালে এই সংস্থা শ্রীগুহ নিয়োগীর 'ফ্লু', 'রি-এ্যাকশন্', 'পলিটিক্স', 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ', 'রিহার্সাল', 'ডাইভোর্স', 'পাহাড়ী ফুল', 'বৌদির বিয়ে', 'ঝর্ণা', 'ক্লান্ত-রূপকার', 'রঞ্জন রায়ের পাঞ্জাবী', অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'তুফানী' এবং আরব্য উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'কুজ দরজী' অভিনয় ক'রে প্রথম শ্রেণীর নাট্য সংস্থা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। উপরোক্ত নাটকগুলিতে প্রশংসনীয় অভিনয় করেন—অজিত দাস, বিমল রায়, রঞ্জন রায়, কমল চন্দ, শিবকুমার শর্মা, শৈলেশ গুহ নিয়োগী, বিমান বিশ্বাস, তুষার ঘোষ রায়, কালিপদ মুখার্জী, বিশ্বনাথ দাস, নিরঞ্জন দে, রামেশ্বর রায়, অরুণ ব্যানার্জী, কালিদাস ব্যানার্জী, ভিক্টর ঘোষ, মানস ঘোষ, মিলন রায় চৌধুরী, নিমাই ঘোষ, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ সেনগুপ্ত, অশ্রুজিত ব্যানার্জী, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা রায়, মীরা হাজরা, তৃপ্তি গাঙ্গুলী, সুতপা ভট্টাচার্য, ছন্দা দেবী, হিমানী গাঙ্গুলী, দত্তা মুখার্জী, রীতা পলিন, ঝুমা মুখার্জী এবং প্রতিমা পাল।

রঙ্গম শিল্পী সঙ্ঘ

১৯৫৬ সালে রঙ্গম শিল্পী সঙ্ঘ নবেন্দু ঘোষের সাজিনা অবলম্বনে 'দ্বীপ' (নাট্যরূপ অগ্নিমিত্র) মঞ্চস্থ করেন মার্চ মাসে। ঐ বছরই ওঁরা রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' মঞ্চস্থ করেন। এই নাটক দুটি বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় করে প্রচুর প্রশংসা পান এঁরা। ১৯৫৭ সালের গোড়ার দিকে "মাটির কেল্লা" (অগ্নিমিত্র) নামে একটি নাটক ওঁরা মঞ্চস্থ করেন। কলকাতার থিয়েটার সেণ্টার আয়োজিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় 'দৈনন্দিন' (অমরেশ দাসগুপ্ত) নামে একটি মৌলিক নাটক মঞ্চস্থ করেন ও প্রথম স্থান অধিকার করেন। "দৈনন্দিন" নাটকটি. বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, ইণ্ডো: সোভিয়েট কালচারাল সোসাইটি, যুব উৎসব, অল ইণ্ডিয়া ফ্যামিলি প্ল্যানিং কনফারেন্স এবং কলকাতা ও আশ-পাশের বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় করে দর্শক সমাজের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেন। ১৯৫৮ সালে আবার থিয়েটার সেণ্টার আয়োজিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। 'মেঘমুক্তি' নাটক (অমরেশ দাসগুপ্ত) এবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং শম্ভু মিত্রের উৎসাহ এবং আশীর্বাদ এই শৌখীন সম্প্রদায়কে এগিয়ে দিলো অনেকখানি।

চলার পথে এরা অমরেশ দাসগুপ্তের "অবলম্বন" ও "দূর থেকে" এবং অমিতাভ সেনের "চমক" নামে তিনটি মৌলিক একাংক নাটক মঞ্চস্থ করেন। তাছাড়া হালকা রসের পূর্ণাঙ্গ নাটক "কল্পারম্ভ" (অমরেশ দাসগুপ্ত) রঙমহলে মঞ্চস্থ হয়।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের "নাট্যনীড়" নাট্যরূপ (অক্ষয় মুখোপাধ্যায়) বিশ্বরূপার গিরিশ নাট্যোৎসবে এবং রঙমহলে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করা হয়। নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সংস্কৃতি সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের "পোস্ট মাস্টার"-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করা হয়।

এঁদের বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সর্বশ্রী অমরেশ দাসগুপ্ত, সুনীল মুখার্জী, শঙ্কর সিকদার, স্বদেশ দাসগুপ্ত, সুনীল আচার্য, সত্য ভট্টাচার্য, দিলীপ মজুমদার, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, অজিত দে, তারাপদ গাঙ্গুলী, মৃণাল বসু, নরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুশীল চ্যাটার্জী, শান্তি রায়, মিনতি সরকার,

অঞ্জুশ্রী চ্যাটার্জী, স্বানন্দা ভট্টাচার্য, কমলা মুখার্জী, বনশ্রী চক্রবর্তী, কাজল রায়, কুমারী কুমকুম, মীরা আইচ ও মিনতি ব্যানার্জী।

অমরেশ দাসগুপ্তের পরিচলনায় প্রতিটি নাটক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের নাট্য উৎসব

১৯৫৭ সাল। লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ১৭ই জুলাই রঙমহল মঞ্চে তিন দিন ধরে নাট্য উৎসব শুরু করলেন। উৎসবের নতুন নাটক ছিল গোর্কীর লোয়ার ডেপথস্ অবলম্বনে উমানাথ ভট্টাচার্যের 'নীচের মহল'। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বেড়াজালের বাইরে যারা পথে ঘাটে ফুটপাতে জীবন যাপন করে, যারা ভব-ঘুরে, নির্যাতিত, শোষিত, সমাজে স্থানচ্যুত, যারা পোড় খাওয়া, নোংরা, নিঃস্ব, কিন্তু যাদের আছে প্রচণ্ড আত্মমর্যাদা, যারা স্বপ্ন দেখে বড় হবার, বেঁচে থাকবার, সুখী সমৃদ্ধ স্বাধীন জীবনের এমনি কিছু খণ্ড-বিচ্ছিন্ন জীবন চিত্র নিয়ে 'নীচের মহল'।

লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের কাছ থেকে 'নীচের মহল' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এদিন নতুন কিছু দেখতে পেলাম। যা পেলাম তা হচ্ছে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে যে সমবেত সুর বাজা সম্ভব। (কালেকটিব এ্যাকটিং) সেটা আমরা ঐ প্রথম দেখলাম এবং মুগ্ধ হয়ে গেলাম। অভিনয়ের প্রতিটি চরিত্র যেন জীবন্ত মানুষ হয়ে আমাদের সামনে ঘোরাফেরা করছে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য বলা যায়, উৎপল দত্তর মত গুণী শিল্পীর পক্ষেই এটা সম্ভব হয়েছে।

এই উৎসবে যাঁরা অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন তরুণ মিত্র, শোভা সেন, কৃষ্ণ রায়, বিধান মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দোপাধ্যায়, নিমাই ঘোষ, সুনন্দা গুহ নিয়োগী, মঞ্জু সেন, নীলিমা দাস, প্রভাস বসু, পরে উমানাথ ভট্টাচার্য, সুনীল রায়, শ্যামল সেন, সমরেশ বন্দোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, দীপেশ সেন, অজয় মিত্র। নাটকটি পরিচালনা করেন উৎপল দত্ত। মঞ্চ স্থাপনায় সলিল ভট্টাচার্য, আলোয় তাপস সেন। এই উৎসবে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ আরো যে দুটো নাটক অভিনয় করেছিলেন তার মধ্যে একটি রবীন্দ্রনাথের 'তপতী', আর একটি ঐতিহাসিক নাটক গিরীশ ঘোষের 'সিরাজদৌল্লা'।

১৯৫৮ সালে বিশ্বরূপায় আবার নাট্য উৎসব করলেন, সেই উৎসবে একটা

স্ন্যাভেনির প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে শোভা সেন লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের সম্পাদিকা হিসেবে একটি রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন। আমি সেই রিপোর্টটির কিছু অংশ ছেপে দিলাম।

"সবিনয়ে নিবেদন,

বৎসরান্তে উৎসবের উপলক্ষ্যে দু'একটি কথা উপস্থিত করার লোভ সামলানো শক্ত। কারণ, এ সুযোগ তো রোজ রোজ আসে না। চেষ্টা করলে, আসে একবার—বছরে।

নাটুকে দল আমরা। ষ্টেজের বাইরে আমাদের কিছু বলার থাকে কিনা জানি না। যা বলার, বলতে হবে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে—নাটকের মাধ্যমে। এই-ই প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু তবু কথা অনেক থেকে যায়, যা বলা যায় না ষ্টেজে দাঁড়িয়ে, নাটকের মাধ্যমে। তাই এমন সুযোগ হাতের কাছে এলে মনটা আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। কাজ করতে গিয়ে সারা বছরে কত কথাই তো জমা হয়ে গেছে ; একবার অন্ততঃ মনের আগল খুলে যাক ; পাঁচজনে শুনুক, শুনুক আমাদের মনে কি আছে ; সারা বছর নাটক করে কি বুঝেছি, কি করেছি ; জানতে চেয়েছি কি, বুঝিনি কোন্ কথা।

কৈফিয়ৎ এ নয় ; দর্শক ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের কাছে এ আমাদের সবিনয় নিবেদন। মনের কথা পাঁচজনের কাছে খুলে না বললে সেটা ঠিক কি বেঠিক যাচাই হয় না ; তাই এই ভূমিকা।

আমাদের গ্রুপের বয়স এগার বছর ; কিন্তু নিজেদের চেষ্টায় বছরে একটা করে উৎসব উদ্‌যাপন করার ক্ষমতা অর্জন করেছি মাত্র এক বছর—গত ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে আমাদের প্রথম উৎসব। এবং গত উৎসবের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা কিছুই করিনি, একথা বললে ভুল হবে ; আত্মসমালোচনার নামে আমরা আত্ম-ধিক্কার দিয়ে বসব। আর যদি বলি : অনেক কিছু করেছি, যা করেছি—বেশ করেছি, খুব করেছি ; তাহলে সেটাও ভুল হবে, আত্ম-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মস্ত দম্ভ প্রকাশ করে বসব। তাই প্রথমে, সারা বছরে আমরা কি নাটক করেছি, কতগুলো অনুষ্ঠান হয়েছে,—তার একটা মোটামুটি হিসেব উপস্থিত করা যাক :

"নীচের মহল" : গত নাট্যোৎসবে "নীচের মহলের" প্রথম অনুষ্ঠান। তারপর "নীচের মহলের" অনুষ্ঠান হয়েছে মোট পনেরোটি।

"অলীকবাবু" : প্রথম অনুষ্ঠান হয় তিলক সভাগৃহে এ বছরের ৭ই মার্চ। তারপর "অলীকবাবুর" অনুষ্ঠান হয় মোট আটটি।

"শোধবোধ" : প্রথম অনুষ্ঠান হয় বি, কে, পাল পার্কে ১১ই মে ৫৮ তারিখে। এরপর ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত "শোধবোধের" অনুষ্ঠান হয় মোট সাতটি।

এ তিনটি নতুন নাটক। এ ছাড়া পুরনো নাটক যা আগেই আমাদের তৈরী ছিল, তার অভিনয় হয়েছে :

ম্যাকবেথ—দশটি, তপতী—একটি, জুলিয়াস সীজার—ছটি, সুন্দবিচার (একাঙ্ক)—চারটি, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ—ছটি, মা (মে দিবস)—একটি, গুরুবাক্য (একাঙ্ক)—ছ'টি, নবসংস্করণ (একাঙ্ক)—এগারটি, দ্বাদশ রজনী—তিনটি ও সিরাজদ্দৌলা (গিরিশচন্দ্রের)—একটি।

উপরের হিসেব অনুযায়ী মোট অনুষ্ঠানের সংখ্যা একাত্তরটি। এর বেশীর ভাগ না হলেও বেশ কিছু সংখ্যক অনুষ্ঠান হয়েছে কলকাতার বাইরে। বাংলার বাইরেও গেছি আমরা : গত বছর আগষ্ট মাসে লখ্‌নউ-এ আমাদের দুটি অনুষ্ঠান করতে হয়—"নীচের মহল" ও "ম্যাকবেথ"।

গত এক বছরে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন দর্শকের কাছে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। যেমন, "ম্যাকবেথ" অভিনয় করেছি কলকাতা ছাড়াও বাংলাদেশের গণ্ডগ্রামে, শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক এলাকায়। "নীচের মহল" অভিনয় করেছি সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের বিরাট প্যাণ্ডেলে, যেখানে কম করে বলা যায়, পনেরো হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন ; থিয়েটার সেণ্টারের বাৎসরিক নাট্যোৎসবে (১৮-১-৫৮)—মহাজাতি সদনে এবং কলকাতার আশেপাশে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের সামনে। "অলীকবাবু" অভিনয় করেছি বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে (৩০-৩-৫৮) ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবসে নেতাজী ভবনে (২৭-৪-৫৮)। "শোধবোধ" করেছি নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সংস্কৃতি সম্মেলনে (১৫-৫-৫৮)।

অর্থাৎ, আমাদের দর্শকদের মধ্যে, একদিকে পেয়েছি সহরের শিক্ষিত সুধীজন, অপর দিকে গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর কৃষক, শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত। আনন্দ পেয়েছি এতে ; দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছাকাছি হতে পারছি, এই বোধ মনকে দোলায়িত করেছে ; যাদের জন্যে নাটক, সেই বৃহত্তর জনতার সঙ্গে একাত্ম হতে চলেছি, এই আশা মনকে উত্তেজিত করেছে। কিন্তু প্রশ্নেরও শুরু হয়েছে সেইখান থেকেই।

আধুনিক নাটক বলতে আমরা কি বুঝি, স্পষ্ট করে বলে রাখি। নাটক জীবনের প্রতিবিম্ব। মানুষের জীবন সমাজ-বিচ্ছিন্ন নয়; সুতরাং নাটক সমাজেরও প্রতিবিম্ব। অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশে মানুষের জীবনকে প্রতিফলিত করা, দর্পণের ন্যায় তার চোখের সামনে তুলে ধরাই হল নাটকের কাজ।

আমাদের সমাজ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করেছে। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের জীবনও জটিল থেকে জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করছে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক, ক্রমশঃ আরও জটিল (Complex) হচ্ছে।

কিন্তু তার প্রতিফলন নেই নাটকে। হয়তো আছে, নাটকের বিষয়বস্তুতে। আধুনিক জীবনের সমস্যা ও জটিলতাকে আমাদের নাটকে হয়তো প্রাধান্য দিই। কিন্তু সাধারণভাবে বিচার করলে, আধুনিক বিষয়বস্তু নির্বাচিত হলেও আধুনিক নাটক সার্থক নয়, কারণ আধুনিক জীবন তাতে সম্যকরূপে প্রতিফলিত নয়। (ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ব্যতিক্রম—ব্যতিক্রমই। সাধারণটাই আমাদের আলোচনা।)

তার কারণ মনে হয় আমরা এক জায়গায় পিছিয়ে আছি। চিন্তার ও নাটকের বিষয়বস্তুর নির্বাচনে আধুনিক হলেও, আমরা সেই আধুনিক বিষয়-বস্তুকে প্রকাশ করার যে উপায় সেটি এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি। অর্থাৎ বর্তমানের এই জটিল জীবনকে প্রকাশ করার জন্যে আমরা এমন হাতিয়ার গ্রহণ করছি যার দিন শেষ হয়েছে বলেই বিশ্বাস; গত যুগের বিগত-জীবনকে প্রকাশ করার জন্যেই যে হাতিয়ার যথেষ্ট ছিল। আধুনিক জীবনকে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন আধুনিক আঙ্গিকের—এটা বোধ হয় আমরা এখনো পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি।

এখানে কিন্তু বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিবাদ এসে পড়ছেনা। কারণ বিষয়-বস্তু সব নয় আঙ্গিকও সব নয়; দুই এর সার্থক সমন্বয়ই হল সার্থক সৃষ্টির চাবি কাঠি। এ কথা আমরা মানি। তবু মনে হয় আমাদের নাটকে এই দুই-এর মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, যে জন্যে এখনো আধুনিক বাংলা নাটক বেশী বেশী করে লেখা হচ্ছে না।

এবং আধুনিক নাটক নিয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত হতে না পারলে তার হৃদয় পুরোপুরি জয় করা যাবে না—এটা তো ঠিক। তাই নাট্যকে দল হিসেবে এই কথাগুলো আমাদের বলতে হচ্ছে প্রয়োজনের খাতিরেই। আর কিছু নয়।—

লিট্‌ল থিয়েটারের এই উৎসবের দিনে আমরা স্মরণ করি তাকে, যে ছিল, কিন্তু আজ নেই; গত বছর উৎসবের সময় তার একার উপস্থিতিতে যে ভরে রেখেছিল আমাদের হৃদয়। মাত্র বাইশ বছর বয়স ছিল তার; কিন্তু কর্ম সম্পাদনায় সে মাতিয়ে রাখত সবাইকে। আজকের এই উৎসবের দিনে ক্ষণে ক্ষণেই তার কথা মনে পড়ছে—আমরা তার অকালমৃত্যুতে শোক জানাই। স্বপন ভট্টাচার্য দীর্ঘজীবি হোক।

অনেক কথা বলেছি, কারণ মনে ছিল অনেক কথা। বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছেই তো মন খোলা দরকার। তাই যদি কিছু ভুলে বলে থাকি, আপনারা সংশোধন করে দেবেন। যদি ঠিক বলে থাকি, আপনারা আমাদের সমর্থন করবেন। আপনাদের উপদেশ ও সমালোচনাই আমাদের পাথেয়, কারণ আপনারাই দর্শক। দর্শক ছাড়া নাটক নেই, দর্শক ছাড়া নাট্যকে দল নেই।

তাই দর্শক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে এ আমাদের কৈফিয়ৎ নয়। এ আমাদের সবিনয় নিবেদন।"

ইতি—

শোভা সেন

সাধারণ সম্পাদিকা

গণনাট্য থেকে নবনাট্যর শরিক হলেন শৌভনিক

১৯৫৭ সাল, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘর দক্ষিণ কলকাতা শাখা রাহুমুক্ত নিয়ে যেসময়ে রমরম করে স্রোতের মত এগিয়ে চলেছে সেই মুহূর্তে শিল্পীদের মধ্যে এলো প্রশ্ন, এলো সংঘাত। দলগত—সংগঠনগত-মতবাদগত। এক কথায় বলা যায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে যতো মতবিরোধ সৃষ্টি হল! সেই সংকটের আবর্ত থেকে বেরোনোর একমাত্র পথ পাওয়া গেল। কিছু বেড়িয়ে এলো কিছু রয়ে গেল। যারা রয়ে গেল তারা পরবর্তীকালে গণনাট্য সঙ্ঘর প্রান্তিক শাখায় পরিণত হল, আর যারা বেড়িয়ে এলো তাদের নামকরণ করলেন বীরেশ মুখোপাধ্যায় "শৌভনিক"। রাহুমুক্ততে বীরেশ মুখোপাধ্যায় আর নিবেদিতা দাস ভীম আর পদ্ম এই দুটি চরিত্রের রূপ দিয়ে সেই সময়ে খ্যাতির চূড়ায় উঠেছিলেন। এই দুজনই পরবর্তীকালে শৌভনিকের মূল গায়েন

বলা যায়, অবশ্য এদের সঙ্গে আরো অনেকেই এসেছিলেন, তাদের মধ্যে শৈল মুখার্জী, টুলু বসু, অরুণ কর, অতুল ভট্টাচার্য্য, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, গোপাল স্যান্যাল, নিমু ভৌমিক প্রভৃতি।

অবশ্য একথা বলা যায় গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে বেড়িয়ে এসেও ঐ সময়ে ওদের আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল গণনাট্য আন্দোলনেরই ব্যাপ্তি ও প্রসার। রাহুমুক্তকে হাতে নিয়েই ওরা প্রথম দিকে এগিয়ে গেলেন। এরপর ওরা বিশ্বশ্রমিক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গোর্কীর মাদার অবলম্বনে বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'মা' নিয়ে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করলেন। সেই সময়ে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার সুব্রত সেন 'মা' নাটকে অভিনয় করছেন, তাঁরই প্রচেষ্টায় ডি. এন মিত্র স্কোয়ার জোগাড় করে সেইখানে ১৯৫৮-র ১২ই, ১৩ই, ১৪ই, এপ্রিল শৌভনিকের প্রথম গণরঙমহল অভিযানের নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। মাঠ ভরা দর্শকের সামনে সে কী উত্তেজনা, কী উদ্দীপনা, দৈনিক ১৯ পয়সা টিকিটের হার। তিন হাজার দর্শকের আসন সামনের দিকে ১'২৫ পয়সা সিজন টিকিট। প্রথম দিনে গোর্কীর 'মা', দ্বিতীয় দিনে বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে 'দ্বিতীয় মহীপাল' ও শুদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' এই তিনটি নাটক পরিবেশন করা হয়।

তিনদিনের উদ্বোধক ছিলেন যথাক্রমে ডঃ ত্রিগুণা সেন, মনোজ বসু ও অহীন্দ্র চৌধুরী। প্রতিদিনের হাজার হাজার দর্শকের হাততালিতে শিল্পী জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করলেন এঁরা।

দ্বিতীয় গণরঙমহল উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ঐ ডি. এন. মিত্র স্কোয়ারেই অক্টোবর ১৯৫৮ সালে। এবার অভিনয় হল 'মা,' রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'. ইবসেনের 'ঘোস্টস্' বঙ্গীয় করণ মমতা চট্টোপাধ্যায়। এই গণরঙমহল অভিযানে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন, অহীন্দ্র চৌধুরী, কমল মিত্র, বিজয় ব্যানার্জী, সাধন কুমার ভট্টাচার্য্য।

১৯৬০ সালে আবার ওঁরা ডি. এন মিত্র স্কোয়ারে ৭ দিন ব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করেন, এবারে অভিনয় হয়েছিল গোরা, মা, মাহিংসী কল্যানী, ঘোস্টস্, মানুষ, (যা নয় তাই) ও মৃচ্ছকটিক।

৭ দিনের গণরঙমহল অভিযান সফল হবার পর বিভিন্ন জেলা থেকে গণরঙমহল অভিযানের ডাক এলো। দলবল নিয়ে ওঁরা উত্তরবঙ্গ চলে গেলেন। এবার এঁরা এগিয়ে গেলেন নিজস্ব স্থায়ী মঞ্চের দাবীতে। সেদিন ওঁদের মধ্যে ক'জন বীরেশ মুখার্জী, নিবেদিতা দাস, সুব্রত সেন, শৈল মুখার্জী, অজিত

সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লেন। জমি কেউ কোন সংগঠনকে লীজ দিতে রাজী নন। সেই সময়ে সমীরণ দত্ত, বিশ্বকল্যাণ দাস, বিজু ভাওয়াল, দীপ্তি চক্রবর্তী এই মঞ্চের সন্ধানে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। শেষে এঁদের-ই প্রচেষ্টায় প্রমোদ লাহিড়ীর জমিটুকু পেলেন।

১৯৬০ 'সালের সাধারণ সভায় স্থির হয় শৌভনিক নাট্য নিকেতন, তারই প্রথম পদক্ষেপ কলকাতায় একটি স্থায়ী মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হয়েছেন। এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে একটি স্থায়ী মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা, একটি নাট্য বিদ্যালয় পরিচালনা, নাট্য বিষয়ক একটি পত্রিকা প্রকাশনা, শৌভনিকের পাঠাগারকে সাধারণ পাঠাগারে পরিণত করা। গ্রামাঞ্চলে ১২টি মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা, নাট্য বিষয়ে একটি গবেষণা কেন্দ্র ও একটি প্রদর্শনী পরিচালনা করা।

১৯৬০ সালে ওঁরা সত্যি সত্যি মুক্তাঙ্গন মঞ্চ বাস্তবে রূপায়িত করলেন। ঐ বছরেই ২৭শে নবেম্বর লেবদফ দিবসে দক্ষিণ কলকাতায় বর্তমান মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করে শৌভনিক বাংলাদেশের নাট্য ইতিহাসে একটি স্থান অধিকার করে। মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবিবার ও প্রত্যেক ছুটির দিনে একটি করে প্রদর্শনী হয়। এমন একটি নাটক দিয়ে যাত্রা শুরু করেন যে নাটকটি বিশ্বশ্রমিক আন্দোলনের ও নিপীড়িত মানুষের একমাত্র উপন্যাস গোর্কীর মা'র। বীরেশ মুখার্জীর নাট্যরূপ "মা" এ প্রচেষ্টা মহৎ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে এই ধারাকে বহন করে গেলে তবেই এই মহত্বটা মহৎ হয় এটাও সত্যি কথা। সেটা আর সম্ভব হল না। কারণ জানি না। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে ৫ দিন ধরে মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে রবীন্দ্র নাটক অভিনয় করে শতবার্ষিকী উদযাপন করে। তাতে রাজা, রাজা ও রাণী, বাঁশরী ও মুক্তির উপায় নাটক অভিনীত হয়, এই বছরেই এঁরা জামসেদপুর, রৌরকেল্লা, পাটনা, লক্ষ্ণৌতে রবীন্দ্র নাটক অভিনয় করতে যান।

১৯৬৫ সাল। এবার এঁরা নাটকে নতুন পথ ধরলেন, আর সে নাটক পরিচালনা করলেন গোবিন্দ গাঙ্গুলী। চিরাচরিত নাট্য রীতির বাইরে একটা নাটক তিনি বাছলেন। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ'। নতুন আঙ্গিকে তিনি এই নাটককে মঞ্চস্থ করলেন।

এই নাটকের মূল কথা ধরতে গেলে এই কথাই বলা যায়। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যে জীবন ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে-জীবনের পর সমাপ্তিতে

তাই আমরা দেখি নাটকের প্রতিটি চরিত্রের মুখে একটি কথা প্রতিধ্বনিত হয়।

"আজও তাই
পথের শেষ
নাই পাই"।

এই নাটকটি প্রায় ৩০০ রাত্রি অভিনীত হয়। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' প্রসঙ্গে ৫ই কার্তিক ১৩৭২ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সমালোচনা এখানে ছেপে দেওয়া হল।

পাদপ্রদীপের আলোয়

শৌভনিক প্রযোজিত "এবং ইন্দ্রজিৎ"

"মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে শৌভনিক-এর নতুন নাটক "এবং ইন্দ্রজিৎ" নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে এক বিশেষ এক্সপেরিমেন্ট হিসাবে অভিনন্দিত হবে। ("বি-নাটকীয়" এই নাটকের ফর্মই বড় কথা। এবং তা নাট্যরচনা (বাদল সরকার রচিত) এবং নাট্যপ্রয়োগ (গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়) উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার কয়েকটি ভগ্ন চিত্র নিয়ে এই নাটক অথবা অ-নাটক। নাট্যকারের বক্তব্য সম্ভবত এই : জীবনের অখণ্ড চিত্র আজকের দিনে খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। পরিণামবিহীন এই জীবনের আদি ও অন্ত বৃত্তাকারে নিয়ত ঘূর্ণায়মান। আবর্তিত জীবনচক্রের কয়েকটি নিমেষ, বুঝি বা একটি চিত্রকল্প, "এবং ইন্দ্রজিৎ"-এ তুলে ধরা হয়েছে।

"এবং ইন্দ্রজিৎ" শুধু অমল, বিমল, কমলের কথা নয়। নিয়ম ও রীতি দিয়ে বাঁধা অসার্থক অতি সাধারণ জীবনের কয়েকটি প্রতিভূ অমল, বিমল, কমলের সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ-এর কথাও নাট্যকার বলতে চেয়েছেন।

নাটকের প্রথম দৃশ্যে দেখানো হয়েছে এক কবির যন্ত্রণা। সে নাটক লিখবে। কিন্তু কাকে বা কাদের নিয়ে সে নাটক রচনা করবে? তাকে প্রেরণা দেয় এক নারী (সে কি সহধর্মিণী? নাকি তার মানসী?)। বলে ওই তো তোমার চোখের সামনে রয়েছে কত মানুষ। ওদের নিয়ে নাটক লেখ। লেখক অনুরোধ করে কয়েকজন দর্শককে যারা সবে আসনে বসতে যাচ্ছিল।

আপনারা একটু আসবেন মঞ্চের উপরে? ওরা আমতা আমতা করে এগিয়ে যায়। অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ। ওরাই নাটকের পাত্র। ওদের জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা নিয়েই নাটক। ইন্দ্রজিৎ অসাধারণ হতে পারত। কিন্তু পারেনি। তার স্বপ্ন ছিল, তেজ ছিল। অথচ উল্কার মত শূন্য ভেদ করতে পারেনি। শূন্যতার মধ্যেই ডুবে গিয়েছে।

বর্তমান মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় ও শূন্যতার অচলায়তনে বদ্ধ, বিপন্ন কয়েকটি জীবনের প্রতিচ্ছবি "এবং ইন্দ্রজিৎ"। অনেকটা রূপক-নাট্যের আঙ্গিকে রচিত। রূপক শুধু ভাবেই নয়, কর্মেও পরিস্ফুট।

প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথমেই অকুণ্ঠ-প্রশংসা করতে হয় নাটকের বক্তব্যানুসারী ব্যঞ্জনাত্মক মঞ্চরূপের। রাজপথের লাল বাতি (যা সব কিছু থেমে যাওয়ার ইঙ্গিত) গোড়া থেকেই মঞ্চে জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। নাটকের শেষে পাত্র-পাত্রীরা যখন "চরৈবেতি" মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছে তখন জ্বলে উঠেছে সবুজ বাতি। ঘূর্ণায়মান চক্রের ছায়াভাসটিও চমৎকার। একই শিল্পীকে একাধিক চরিত্রে উপস্থিত করানোর মধ্যে প্রয়োগ-কল্পনার অভিনবত্ব দেখা যায়। এবং খণ্ড খণ্ড ঘটনা ও দৃশ্য বিন্যাসের মধ্যে (যার মধ্যে ফ্ল্যাশব্যাকও আছে) একা ভিন্নতর প্রয়োগ-রীতির পরিচয় মেলে। অবাক হবার মত অনেক কিছুই রয়েছে এই আঙ্গিক-প্রধান নাটকে।

নাটকের বক্তব্য সম্পর্কেই শুধু প্রশ্ন থেকে যায়। নাটকটি কথাসর্বস্ব। সেটা দোষের কিছু নয়। ঘটনা যেখানে সামান্য সেখানে কথা দিয়েই সব দৃশ্য ভরিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু যে আত্মিক বন্ধ্যাত্ব ও গতিহীনতার কথা নাটক প্রধানত বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ আছে। এই নৈরাশ্যবাদ অবশ্য শেষে তিরোহিত। তারপর যাত্রার কথা উঠেছে। যাত্রা আছে তীর্থ নেই। এই আদর্শহীনতা ও লক্ষ্যহীনতা নিয়েও বিতর্ক হতে পারে। ভাবগত অস্পষ্টতা নাটকে যাই থাকুক, নাটকটি যেন ভিন্নধর্মী তাতে সংশয় নেই। এবং মননশীলতায় সমৃদ্ধ।) তার চেয়েও বিস্ময়কর এই নাট্য প্রযোজনা—যা শৌভনিক গোষ্ঠীকে অগ্রগামীর সম্মানে ভূষিত করবে।

প্রত্যেকটি চরিত্রের অভিনয় বুদ্ধিদীপ্ত সাবলীল। কে কার চেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন বলা কঠিন। তবে যে দুজন মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেন তারা হলেন গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় (লেখক) ও মমতা চট্টোপাধ্যায় (মানসী)। অন্যান্য চরিত্রে সুকুমার ঘোষ (ইন্দ্রজিৎ) পান্নালাল মৈত্র (অমল),

বীরেশ্বর মিত্র (বিমল), ননী দাস (কমল) ও ইন্দু চট্টোপাধ্যায় দর্শকের প্রশংসা পাবেন।

সংগীতের ব্যবহার পরিমিত ও অর্থবহ (দেবাশিস দাশগুপ্ত)। আলোক-সম্পাত (স্বরূপ মুখোপাধ্যায়) ও মঞ্চ পরিকল্পনা (বিমল চক্রবর্ত্তী) বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।"

১৯৭৬ সাল, ২২ শে মে শৌভনিকের স্বপ্নসৌধ মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয় আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল। কিছুই নেই আর, পড়ে আছে শুধু কয়েকখানা পোড়া কাঠ। আবার নতুন ভাবে গড়তে হবে মুক্তাঙ্গনকে। এই প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন বাংলা দেশের সমস্ত নাট্য দলের শিল্পীরা। বহুরূপী, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, নান্দীকার, চতুর্মুখ, রূপকার, রূপান্তরী, অভ্যুদয় ও আরো অনেকে। ২৩ শে মে চতুর্মুখ মুক্তাঙ্গনের সাহায্যে পথে অভিনয় শুরু করলেন 'জনৈকের মৃত্যু'। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। শুধু তাই নয় পথে নামলেন শিল্পীরা। মুক্তাঙ্গনকে পুনর্গঠন করতে হবে। জনতার মাঝে নামলেন শিল্পীরা। মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন, মুক্তাঙ্গনকে রক্ষা করুন। আজও আমার মনে আছে সেদিনকার মিছিলে যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, তাপস সেন, জোছন দস্তিদার, সুধীপ্রধান, কিরণ মৈত্র, অসীম চক্রবর্তী, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, দীপ্তিকুমার শীল, সুনীল দত্ত, কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, মুক্তাঙ্গনের শিল্পীরা ও আরো অনেকেই এই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন, টাকাও তুলেছিলেন। মত, পথ, যার যাই থাক না কেন সেদিন সমস্ত শিল্পীদের জমায়েতের মধ্যে দিয়ে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেল, মঞ্চের যে কোন সমস্যায় শিল্পীরা অন্তত এক সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারেন।

এবং ইন্দ্রজিতের পর রতন ঘোষের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', অভিনয় করেন ও পর পর যেসব নাটক অভিনয় হয় তার তালিকা দেওয়া হল :

বাঁশরী, তাসের দেশ, নুরজাহান, জোয়ান অব্ আর্ক, ওথেলো, শেষরক্ষা, মার্চেন্ট অব্ ভিনিস্, ঘরে বাইরে, নোনা জল মিঠে মাটি, অ্যান্টিগোন, হয়তো সেদিন, মলাটের রঙ মুহূর্ত, শেষ কণ্ঠস্বর। একাংক :— পাতা ঝ'রে যায়, চিড়িয়াখানায় গল্প, ছুটি, উপসংহার, এরা কারা।

শৌভনিকে বিভিন্ন সময়ে যারা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন : নিবেদিতা দাস, বিনতা রায়, প্রীতি চট্টোপাধ্যায়, আলপনা গুপ্তা, সুজাতা রেমন, মঞ্জুশ্রী রাহা, তৃপ্তি মুখার্জী, শ্রীলেখা মহান্তি, গৌরী ভট্টাচার্য্য, সন্ধ্যা চক্রবর্তী, নীলা চক্রবর্তী,

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত সেন, রথীন ঘোষ, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক ঘোষ, পার্থ বক্সী, টুলু মুখার্জী, সুধাংশু মণ্ডল, অশোক মিত্র, অসীম মুখোপাধ্যায়, নিমু ভৌমিক, সুভাষ ব্যানার্জী, দীপক গাঙ্গুলী, গোপাল সান্যাল, চুনী চট্টোপাধ্যায়, অমর বসু, বিশ্ববন্ধু সান্যাল, রজত রুদ্র, মোহন মেহরাত্রা, জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী, অজয় চট্টোপাধ্যয়, শ্রীমান আশীষ, ইন্দ্রজিৎ সাহা, মুরারী, কানন মুখার্জী, নবেন্দু ভট্টাচার্য, বুলবুল চৌধুরী, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীনাথ হালদার, সুকুমার ঘোষ, পান্নালাল মৈত্র, অমল মুখোপাধ্যায়।

আলো :—স্বরূপ মুখোপাধ্যায়।

রূপসজ্জাকর :—পার্থপ্রতীম বক্সী, সুধাংশু মণ্ডল, সমীর দাস, মহঃ হেসিব।

নির্দেশক :— আগে ছিলেন বীরেশ মুখোপাধ্যায়, পরে কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, অশোক মিত্র, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীত তত্ত্বাবধায়ক :—ধনগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, পরে ভাস্কর মিত্র।

গণনাট্য শাখা থেকে অনুশীলন সম্প্রদায়

১৯৫৭ সাল, গণনাট্য সঙ্ঘের অনুশীলন শাখা ভেঙে জন্ম নিল অনুশীলন সম্প্রদায়। ২৯শে জানুয়ারী মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এদের প্রথম নাটক দেখলাম রনেন ঘোষ দস্তিদার ও মমতাজ আহমেদ খাঁর 'ইস্পাত'।

অনুশীলন সম্প্রদায় তার জন্ম থেকেই বিশ্বাস করেছে নাটকের উৎকর্ষতা Quality-তে, Quantity-তে নয়। তাই কোন্ নাটক কত রাত্রি অভিনীত হল কতহাজার দর্শক তা অবলোকন ক'রে ধন্য হল এটা তথ্য হলেও সত্য নয়। তাই অনুশীলন সম্প্রদায় তার গত দশ বছরের জীবনে প্রযোজনা করেছে মাত্র আটটি নাটক। কিন্তু তার প্রত্যেকটি যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তবু অনুশীলন সম্প্রদায় বিশ্বাস করে এটাই শেষ কথা নয়।

শ্রমিক জীবনের পটভূমিকায় লেখা ইস্পাত।

একটি ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে কতোগুলো খেটে খাওয়া মানুষ, ঘাত প্রতিঘাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিভাবে জীবনের সবকিছু ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে।

আবার এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই সব কিছুকে তুচ্ছ করে কতো মানুষ ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে যাচ্ছে এই নাটকের মূল তত্বটা এইটেই বলা যায়। সেদিন অভিনয়ের একটি মুহূর্তে আজও ভুলিনি কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। একজন শ্রমিকের চরিত্রের একটি মুহূর্তে তার চোখ দিয়ে যেন আগুন বেড়িয়ে আসছে। এ ধরণের জীবন্ত অভিনয় খুবই কম দেখা যায়।

এরপরে অনুশীলন শাখা সলিল চৌধুরীর 'অরুণোদয়ের পথে' অভিনয় করেন।

এরপর এঁরা উমানাথ ভট্টাচার্যর 'শেষ সংবাদ' নাটক অভিনয় করে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও 'কাবুলিওয়ালা' এঁরা রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে অভিনয় করেন। রমেন লাহিড়ীর পান্থশালা, হাসির নাটক ও এঁরা অভিনয় করেন।

এরপর এই দল ব্রেখট্ অবলম্বনে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিধি ও ব্যতিক্রম নিয়মিত অভিনয় করেন থিয়েটার সেন্টারে। এই প্রযোজনার মধ্যে সব কটাই প্রায় মমতাজ আহমেদ খাঁ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সহযোগিতায় ছিলেন আদিত্য পাল। শিল্পনির্দেশনায় সুবিমল রায়, রূপসজ্জায় মনতোষ রায়, আলোক সম্পাতে বিমল দাস।

এই দল এরপর সুব্রত নন্দী ও ধূর্জটি দত্তর সার্ত্রে'র অবলম্বনে 'একা একা' অভিনয় করেন। এছাড়া সুব্রত নন্দীর 'আরো আলো' অভিনয় করেন।

এই দলে অভিনয় করেন ননী নাগ, সুনীল দাস, সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর সরকার, অরুণ দে, হরিদাস কাবাসী, কমলেন্দু ভট্টাচার্য, সীতা মুখার্জী, মঞ্জু সুর, প্রীতিময় ঘোষ, সুনীতা ঘোষ, সুনীল বিশ্বাস, সমীর মুখোপাধ্যায়, আদিত্য পাল, মমতাজ আহমেদ খাঁ, ফজলুল হক্।

লোকতীর্থ

১৯৫৭ সাল, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কালিঘাটে, সুনীত মুখোপাধ্যায়ের 'আবিষ্কার' নিয়ে এগিয়ে গেলেন লোকতীর্থ। নাটকের দাবী একটাই, আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করতে হবে। পরিচালনায় ছিলেন সুনীত মুখোপাধ্যায়। আঞ্চলিক যুব উৎসবে এই নাটক প্রথম অভিনয় হয়।

এর পর এঁরা সুনীত মুখোপাধ্যায়ের 'ইলুস্টেশন', 'দৃষ্টান্ত', 'দীপা কেবিন', পঙ্কজ মিত্রর 'সূর্যের অপর পিঠ', বিমল দের 'মুখবিম্ব', 'পদাতিক' নাটক ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত মুক্তাঙ্গনে, মিনার্ভা থিয়েটারে ও বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন সময়ে মঞ্চস্থ করেন। এরপর ১৯৭১ সালে সুনীত মুখোপাধ্যায়ের 'বিদ্রোহের নাম গোলাপ' বিমল দের পরিচালনায় মুক্তাঙ্গনে ১৮ই ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয়। লোকতীর্থে যারা বিভিন্ন সময়ে অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে বিভূতি মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গাঙ্গুলী হচ্ছেন প্রথম দিকের অতিথি শিল্পী। এছাড়া যারা বিভিন্ন সময়ে অংশ নিয়েছেন, তাদের মধ্যে গৌরী পাঠক, স্নিগ্ধা কুণ্ডু, মঞ্জুশ্রী ঘোষ দস্তিদার, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, মল্লিকা ঘোষ, রাণু রায়, বেলা সেনগুপ্ত, পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিমল দে, অসীম মুখোপাধ্যায়, শচীন ভট্টাচার্য, মিলন মুখোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিকাশ ঘোষ দস্তিদার, কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়, প্রভাত ভূষণ, বাবুল ভট্টাচার্য, অশোক মিত্র, দীপেন মুখোপাধ্যায়, সনৎ চক্রবর্তী, রতন ভট্টাচার্য, দিলীপ দত্ত, পরিমল ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে সৌরেন পাল ও প্রভাত সেন।

নবনাট্য আন্দোলন/অন্বেষা

অন্বেষা নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ সালে। জন্মলগ্নে সংস্থার নাম ছিল 'সাংস্কৃতিকী'। পরে নাম পরিবর্তন করা হয়। 'অন্বেষা' নামকরণটি করেন প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার গঙ্গাপদ বসু।

১৯৬১ সালের আগে নাট্য আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে সংস্থার কার্য্যাবলী সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৬১ সালে প্রথম নাট্য প্রযোজনা 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে। এই নাটকের একাধিক প্রযোজনার পর গঙ্গাপদ বসু রচিত 'অংশীদার' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। তারপর একাধিক্রমে বহু নাটক বহুবার মঞ্চস্থ হয়। নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত গঙ্গাপদ বসু এই নাট্য সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন গোড়া থেকেই। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন এই সংস্থার উন্নতি সাধন সম্ভব হ'ত না। তিনি শুধু মাত্র এই সংস্থার জন্যই চারটি নাটক রচনা করেছিলেন। নাটকগুলির নাম অন্ধকারের বৃত্ত, একটি স্বপ্নের জন্যে, নষ্টমাতা ও অপমানিত।

গঙ্গাপদ বসু ছাড়াও রঙ্গমঞ্চের প্রতিভাবান আরো অনেক শিল্পীই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাটকে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কালী বন্দোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু ও জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায় এঁদের নাম উল্লেখ করা যায়।

'অন্বেষা' নাট্যগোষ্ঠী বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে তাঁদের 'সত্য মারা গেছে' নাট্য প্রযোজনার মাধ্যমে। সত্য মারা গেছে ছাড়াও অন্যান্য নাট্য প্রযোজনা গুলির নাম এবং সংগে নাট্যকারের নাম নীচে দেওয়া হোল।

কাঞ্চনরঙ্গ (শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র), অংশীদার (গঙ্গাপদ বসু), প্রতিধ্বনি (শেখর চট্টোপাধ্যায়), প্রজাপতয়ে নমঃ (গঙ্গাপদ বসু), তাহার নামটি রঞ্জনা (বিধায়ক ভট্টাচার্য), মহাগুরু নিপাত (গঙ্গাপদ বসু), নমোযন্ত্র (গঙ্গাপদ বসু), নীতাপাশ (অগ্নি মিত্র), বিভাব (বহুরূপী), অন্ধকারের বৃত্ত (গঙ্গাপদ বসু) সত্য মারা গেছে (গঙ্গাপদ বসু), নহ মাতা (ও'নীল অবলম্বনে গঙ্গাপদ বসু), একটি স্বপ্নের জন্যে (ইবসেন অবলম্বনে গঙ্গাপদ বসু), অতিথি (রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে স্বদেশ বসু), বদনাম (রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে স্বদেশ বসু (অপমানিত (গঙ্গাপদ বসু)।

'অন্বেষা'র বর্তমানে যে সব শিল্পীরা অভিনয় করছেন তাঁদের নাম: স্বদেশ বসু, প্রশান্ত সেন, নিমাই দে, সন্দীপ রায়, পার্থসারথী বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ সেন, স্বরাজ বসু, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, স্বপন বসু, সুদর্শন দাস, শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী, শেলী বসু, ধ্রুব দাস, অশোক মিত্র প্রভৃতি।

অন্বেষা'র ১৬ টি নাটকেরই নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন স্বদেশ বসু। স্বদেশ বসুর পরিচালনার বিশেষ কয়েকটি দিক হ'লো: নাট্যপ্রযোজনায় আঙ্গিকের অকারণ প্রাধান্য দিয়ে নাটককে ভারাক্রান্ত করতে চান না। তবে আঙ্গিকের উপস্থাপনা অবশ্য বিজ্ঞানসম্মত হবে। নাটক যেখানে সিরিয়াস সেখানে আঙ্গিকের কৌশল দেখিয়ে দর্শকদের চমৎকৃত করতে নারাজ। কেননা দর্শক তখন অভিনয়ের কথা ভুলে গিয়ে আলোকসম্পাত বা আঙ্গিকের অন্যান্য উপকরণের দিকে নজর দিতে আরম্ভ করবেন।

অন্বেষার নাট্য-নির্দেশক স্বদেশ বসু এই নাট্য সংস্থার প্রধান অভিনেতা। অন্যান্য সম্ভাবনাময় অভিনেতাদের মধ্যে নিমাই দে, স্বরাজ বসু, সন্দীপ রায় ও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যে গঙ্গাপদ বসুর প্রচেষ্টায় অন্বেষা সেই গঙ্গাদা প্রসঙ্গে কিছু জানা দরকার। তাই গঙ্গাপদ বসুর স্মারক গ্রন্থ থেকে আমি একটি লেখা উল্লেখ করছি। ঋত্বিক ঘটক সেই লেখাটির লেখক।

আমাদের সেই গঙ্গাদা : শান্ত মানুষটি

ঋত্বিক ঘটক

"গঙ্গাদা'র মৃত্যু সংবাদ শুনে খুব মর্মাহত হয়েছিলাম। আরও খারাপ লাগছিলো যে তার দুদিন আগে যখন তিনি বোম্বেতে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন, তখন আমি সেখানেই ছিলাম। তা সত্ত্বেও দেখা করিনি। দেখা করতে গেলে হয়ত গঙ্গাদা'কে শেষবারের মত দেখতে পারতাম।

গঙ্গাদা'র স্মারক গ্রন্থে কিছু লিখতে পারলে ভারাক্রান্ত মনটা হয়ত খানিকটা হালকা হবে। এই ধরণের স্মারক গ্রন্থ গঙ্গাদা'র জন্যে বেরুবে, এটা অপ্রত্যাশিত। কেননা তাঁর মত মানুষ মারা গেলে স্মৃতিরক্ষার চেষ্টার চাইতে, স্মৃতিটাকে ধ্বংস ক'রে ফেলার প্রবণতাই বেশি হ'য়ে ওঠে। আমার মতে কারণটা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ আজকের যুগটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে এমনই একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, মনে হয় মৃত্যুর পর কারো সম্বন্ধে কিছু করতে হলে, জীবিতাবস্থায় তাকেই পাবলিসিটি করে, নিজের শোক সভার বা স্মারক গ্রন্থের যোগাড় যন্ত্র করে তবে তাকে মরতে হবে। দ্বিতীয়তঃ গঙ্গাদা'র মত অভিনেতা, বিজনবাবুর মত অভিনেতার কৃতিত্বকে ধামা চাপা দিতে পারলে তবেই গণনাট্য আন্দোলনের ইতিহাস থেকে তাঁদের নাম বুঝি বা মুছে দেওয়া যাবে!

আগামী দিনের নাট্য-প্রেমী মানুষেরা এঁদের নাম ভুলে যাবেন কিনা জানিনা, তবে আমি ভুলব না। আমি এঁদের কাছে অভিনয় শিখেছি, এঁদের সাহচর্য পেয়েছি,—এটাই আমার গৌরব। ১৯৪৬ সালে আমি গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলাম সাধারণ কর্মী হিসেবে। তখন গণনাট্য সঙ্ঘই ছিল সবচেয়ে সম্মানিত নাট্য সংস্থা। সেখানে অভিনয়ের সুযোগ পাওয়াটাই ভাগ্যের কথা। সেই সুযোগ আমি পেয়েছিলাম ১৯৪৮ সালে 'নবান্ন' নাটকে একটা ছোট্ট ভূমিকায়। গঙ্গাদা'কে আমি তখন থেকেই জানি। তিনি গণনাট্যে ছিলেন একেবারে গোড়াথেকেই। কাজেই অভিনয়ে তখন তাঁর সুনামও হয়েছে যথেষ্ট। ওঁদের সঙ্গে অভিনয় করতে আমার খুব ভয় করতো। কারণ আমি

তখন একেবারেই কাঁচা, তার ওপর আবার গাঁয়ের ছেলে। 'নবান্ন' নাটকের দুই পরিচালক বিজন ভট্টাচার্য এবং শম্ভু মিত্র মশাই উভয়েই অনেক সাহায্য করেছিলেন আমাকে, তবে তাঁদের হাতে দায়িত্ব ছিল পঞ্চাশ ষাটজন শিল্পীর। কাজেই অভিনয়ের ব্যাপারে বিশেষ ভাবে আমাকে যে দু'জন শিল্পী সাহায্য করেছিলেন তাঁরা হলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও গঙ্গাপদ বসু। এঁদের দু'জনের সাহায্য ছাড়া আমি যেটুকু অভিনয় সেদিন করতে পেরেছিলাম, তা'ও করতে পারতাম না।

এর পরে গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে আমরা চলে আসি এবং 'নাট্যচক্র' নাম দিয়ে একটি নাট্য সংস্থার উদ্ভব হয় যাতে গণনাট্য সঙ্ঘের অনেকেই ছিলেন। গঙ্গাদা, বিজনবাবু, শম্ভুদা, দিগিনবাবু এবং আরো অনেকেই। 'নাট্যচক্রের' প্রযোজনায় 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ হয়, এবং প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি যে 'নীলদর্পণ' নাটকেই আমার প্রথম একটা পরিচিতি হয়। ভাবতে অবশ্য আজ হাসি পায় যে আমিও এককালে মঞ্চাভিনেতা ছিলাম। তা যাই হোক, সেই নাটকে ভুলতে পারব না দুটি চরিত্রকে। একটি হলো বিজন ভট্টাচার্যের 'তোরাপ', অপরটি গঙ্গাপদ বসুর 'গোপীদেওয়ান'। নবান্নে'র 'প্রধান সমাদ্দার' এর চেয়েও বিজনবাবুর 'তোরাপ' আমার বেশী ভালো লেগেছিলো। আর গঙ্গাদা'র একটি সংলাপতো এখনো আমি যেন শুনতে পাই। এই দৃশ্যে খুন অত্যাচার ইত্যাদি ঘটিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে একটা সংলাপ উচ্চারণ করতেন স্টেজে একা দাঁড়িয়ে: "সাতশো শকুনি মরলি পর একটা নীলকুঠির দেওয়ান হয়।" চোখের দৃষ্টি, সংলাপ উচ্চারণের বিশিষ্টতা—সব মিলিয়ে তাঁর যে অভিনয় আমি দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, এটা একমাত্র গঙ্গাদা'র পক্ষেই সম্ভব—আর কেউ তাঁর কাছাকাছি আসতে পারবে না।

'নীলদর্পণ' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হলেও 'নাট্যচক্র' দীর্ঘায়ু হোলোনা। এর সমসাময়িক কালেই 'বহুরূপী'র গোড়াপত্তন। যদিও তখন 'বহুরূপী' নামকরণ করা হয় নি। তুলসীবাবুর 'পথিক' নাটক নিয়ে বসা হয়েছে। গঙ্গাদা', শম্ভুদা', মনোজবাবু, মনিদি (তৃপ্তি মিত্র), অমর গাঙ্গুলী এঁরা সব রয়েছেন। তুলসীবাবু তো আছেনই। আমিও আসি রোজ। রিহার্সাল রোজই হয়, কিন্তু নাটক আর হয় না। এগারো মাস ধরে রিহার্সাল হচ্ছে, তবুও নাটক মঞ্চস্থ হবার কোন লক্ষণ নেই। পয়সা কড়ির অভাব। সকলেরই এক অবস্থা। এই সময় লক্ষ্য করতাম যে শেষের দিকে অনেকেরই উৎসাহে যেন কিছুটা ভাঁটা

প'ড়ে গিয়েছিলো। আমার তো মনে হোতো যে আর কতদিন ধরে রিহার্সাল দেবো এভাবে! যেতাম না, এমনও অনেকদিন হয়েছে। কিন্তু আমি এমন একটি মানুষ দেখেছিলাম যিনি প্রতিদিন ঠিক সময়ে রিহার্সালে হাজির থাকতেন, তিনি হলেন গঙ্গাপদ বসু। এত 'ডিসিপ্লিনড' এ্যাকটর আমি কখনো দেখিনি আগে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 'পথিক' নাটক মঞ্চস্থ হবার আগেই মতান্তরের ফলে আমি এই সংস্থা ছেড়ে দিয়ে চলে যাই এবং যার ফলে গঙ্গাদা'র সঙ্গে স্টেজে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার হয়নি। এই সময় আমি একটা নাটক লিখেছিলাম। তার নাম দিয়েছিলাম 'দলিল'। যে কারণে মতবিরোধ ঘটেছিলো সে কাহিনীর অবতারণা করতে চাই না, তবে একথা বলবো যে 'বহুরূপী' (তখনও নামকরণ হয়নি) ছেড়ে চলে এলেও গঙ্গাদা'র সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমার আগের মতই ছিল। 'দলিল' নাটকটি পরে গণনাট্য সঙ্ঘে অভিনীত হ'লে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নাটক, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—ইত্যাদি পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়েছিলো এবং এর কৃতিত্বে গঙ্গাদা'ও অংশীদার ছিলেন, কেননা আমি নাটকের প্রতিটি দৃশ্য লেখা হলেই গঙ্গাদা'কে পড়ে শোনাতাম এবং নিজেও বলতেন: 'ঋত্বিক, এটা বদলাও, এ দৃশ্যটা এরকম ক'রে করো, চরিত্রগুলো বদলে এইভাবে করো'—এইরকম।

মোটামুটিভাবে এই পর্যায়ে মঞ্চে গঙ্গাদা'র সঙ্গ ছাড়া হলেও চিত্রজগতে যেখানেই আমি যুক্ত ছিলাম, সেখানেই গঙ্গাদা'কে নিয়ে গিয়েছি অভিনয় করবার জন্যে। স্বর্গত নির্মল দে মশাই-এর 'বেদেনী' ছবিতে আমি সহকারী পরিচালক ছিলাম, গঙ্গাদা'কে নিয়ে গিয়েছিলাম ওই ছবির একটি চরিত্র রূপায়ণের জন্যে। শ্রীবিমল রায়ের 'তথাপি' ছবিতে আমি ছিলাম প্রধান সহকারী পরিচালক, সেখানেও গঙ্গাদা'কে দিয়ে একটা ভালো কাজ করিয়ে ছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার ইতিপূর্বে ১৯৪৮ সালে শ্রীনিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' ছবিতে দুটি প্রধান ভূমিকায় গঙ্গাদা' এবং আমি এক সঙ্গে অভিনয় করি। এটাই গঙ্গাদা'র এবং আমার প্রথম চিত্রাভিনয় এবং 'ছিন্নমূল' যে কি অসাধারণ ছবি, তা যদি আজকালকার ছেলেমেয়েরা দেখেন তবেই বুঝতে পারবেন। 'ছিন্নমূলই' ভারতবর্ষের প্রথম বাস্তববাদী ছবি, আর গঙ্গাদা কতবড় অভিনেতা তারও প্রমাণ মিলবে এই ছবিতে।

আমার প্রথম নিজস্ব ছবি 'নাগরিক'। এই ছবিতে গঙ্গাদা' অভিনয় করেছেন। কিন্তু ছবিটি মুক্তি পায়নি। আমার প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি

'অযান্ত্রিকেও গঙ্গাদা' এক অদ্ভুত সিরিও-কমিক চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন। আট দশ মিনিটের আউটডোরের কাজ ছিলো রাঁচীতে। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রায় মাসখানেক ধ'রে। তখন গঙ্গাদা'কে দেখে মনে হতো যে আজকের দিনে তাঁর মত নিষ্ঠাবান শিল্পী পাওয়াই দুর্লভ। নতুনদের তিনি কি নিঃস্বার্থভাবেই না উৎসাহ দিতেন।

গঙ্গাদা'র মৃত্যুতে তিনি যে ধারার অভিনেতা, তার মৃত্যু ঘটলো। অর্থাৎ ক্রুর চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। তার সৃষ্ট ক্রুর চরিত্র আর পাঁচ জন অভিনেতার চোখ বাঁকানো ভিলেন নয়, কাজেই তারা জীবন্ত। আর সিরিও-কমিক রোলেও তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো না। তাঁর তৈরী কমিক চরিত্র ভাঁড় নয়, স্বাভাবিক মানুষ। কাজেই এই সব চরিত্রসৃষ্টিতে ভবিষ্যতে আর কার দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যাবে, আমি জানি না।

এটুকু বলতে পারি অভিনেতা হিসাবে এবং গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে আগামী দিনের ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা থাকবে—নতুন মানুষের নতুন সমাজে।

গঙ্গাদা'র অভিনয় প্রতিভার দীপ্তিতে ম্লান হয়ে যাবার ভয়ে যারা ভীত ছিল, সেইসব নকল নবীশদের ভাবা উচিৎ যে শিশিরকুমারকে অনুকরণ ক'রে গলার কায়দা দেখিয়ে যেমন বড় অভিনেতা হওয়া যায় না, তেমনি গঙ্গাদা'র মত আজীবন-সংগ্রামী মানুষকে অবহেলা করেও ইতিহাসকে কখনও বদলে দেওয়া যায় না। আজ 'বহুরূপী'র খুব নামডাক হয়েছে, কিন্তু এই 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল খুবই দীনভাবে। এবং সেই সাংগঠনিক দারিদ্র্যের মধ্যে যাঁরা সর্বতোভাবে স্বার্থ ছাড়াই সাহসের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন তাঁদের মধ্যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসুরাই ছিলেন কয়েকজন মাত্র। তাই আজ যখন গঙ্গাদা'র মৃত্যুর দিনও তাঁরা অভিনয় বন্ধ করেন না বা তাঁর মৃত্যুর পর একটা দিনের জন্যও স্মৃতি-আলোচনার ব্যবস্থা করেন না, তাঁর কর্মময় জীবন সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করা হয় না, তখন বড় দুঃখ হয়। কি জানি, কিসের ভয়? যে লোকটা জীবিত অবস্থায় কখনো খেতাবের জন্যে কান্নাকাটি করে নি, সেই মানুষটা মৃত অবস্থায় এসে কার পাকা ধানে মই দেবে বলে আশঙ্কা, কে জানে!"

বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির নাট্যোৎসব উপলক্ষে স্যুভেনিরে আর একটি লেখা গঙ্গাপদ বসুর স্মরণে লিখেছেন শম্ভু মিত্র। সে লেখাটিও তুলে দেওয়া হল।

যেন ভুলে না যাই

শম্ভু মিত্র

"গঙ্গাপদ বসু ছিলেন বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির প্রথম সভাপতি। তাঁকে সম্মুখে রেখে যে কাজ আমরা শুরু করেছিলুম তা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। আমাদের কাজের পথে যে অজস্র বাধা আর বিপত্তি আমাদের উদভ্রান্ত করে, ও আরো করবে, তার মধ্যে গঙ্গাদার মতো একজন স্থিরবুদ্ধি, শান্ত এবং বিচক্ষণ লোকের প্রয়োজন এখনো রয়েছে ও আরও থাকবে। তাই তাঁর অভাবটা আমাদের কাছে এতো তীব্র।

তিনি শিল্পী ছিলেন। যাঁরা তাঁর অভিনয় দেখেছেন তাঁরাই তাঁর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করেছেন। নবান্ন-র হারু দত্ত হিসাবে তাঁর—'মেয়ে তোর? মেয়ে আমার না'? থেকে আরম্ভ ক'রে পথিক-এর 'হারমনিটা ভালো হইয়েছে তো?' এবং রাজা অয়দিপাউসের 'রাজা, আমি যে এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি' পর্যন্ত অজস্র সংলাপ তাঁর অননুকরণীয় অভিনয়ভঙ্গীতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

সেই অনন্ত অভিনেতা ছিলেন আমাদের বন্ধু, আমাদের পরামর্শদাতা, এবং বিপদের দিনে আমাদের সবচেয়ে বড়ো সহায়ক। কোনো নীচতা ছিল না তাঁর মধ্যে। সঙ্কীর্ণতা, তুচ্ছ অহঙ্কার ও দলাদলির ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি। এবং এই শিল্পীসুলভ ভদ্রতাবোধ নিয়েই তিনি কাজ ক'রে গেছেন ১৯৫৬ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত।

আজ এই নাট্যোৎসবের প্রারম্ভে তাঁকে স্মরণ না করলে আমাদের উৎসব অসম্পূর্ণ থাকবে। তাঁর মতো শিল্পী ও সৎ মানুষেরই প্রয়োজন বাংলা নাট্যমঞ্চের স্বপ্নকে সার্থক করতে। এই সমস্ত মানুষের নিঃশব্দ আত্মত্যাগ আমরা যেন কখনো না ভুলে যাই।"

গণনাট্যের পথ ধরে নবনাট্যের পথ বেয়ে

গন্ধর্ব

জীবনমুখী নাট্যাদর্শে একটি নিরীক্ষামূলক নাট্য সংগঠনরূপে ১৯৫৭-র গন্ধর্ব-র আবির্ভাব। উদ্দেশ্য নাটকের মানোন্নয়নে তৎপর থেকে নাট্যপ্রযোজনা, পত্রিকা প্রকাশ ও নাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন করে গণরুচি নির্মাণ করা। প্রথম প্রযোজনা 'রাইডার্স-টু-দি-সী' অবলম্বনে 'দুর্বলগ্ন'। ভুবনেশ্বর পাণ্ডের বাড়ীতে স্টেজ বেঁধে অভিনয় করা হয়। তৎকালীন গণনাট্য সঙ্ঘের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী শ্যামল ঘোষ ছিলেন নাট্য নির্দেশক, আর অভিনয়ে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে নেপথ্যে কর্মসম্পাদন, সংগঠন পরিচালনা প্রভৃতি কার্যে স্কটিশচার্চ কলেজের এবং উক্ত অঞ্চলের একদল তরুণ উদ্যোগী হয়ে সমবেত হয়েছিলেন। প্রতীক চিহ্ন আঁকা হলো শিল্পী রুবেন দত্তকে দিয়ে, মঞ্চ সজ্জার দায়িত্ব নিলেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। এইভাবে গন্ধর্বর জন্ম।

এর পর সর্বজন সমক্ষে প্রভূত অর্থব্যয়ে বিপুল উৎসাহে প্রযোজিত হলো ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল'। উক্ত প্রযোজনার মধ্য দিয়েই গন্ধর্ব যে গণনাট্য চেতনায় বিশ্বাসী, তা প্রমাণিত হলো। এ নাটকের অভিনয়ে কতিপয় গণনাট্য-শিল্পীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল—তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সঙ্ঘের শাখার ইন্দ্র রায়, মায়া রায়, দেব দত্ত প্রভৃতি। এই সময় বিশ্বরূপা আয়োজিত প্রথম একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় গন্ধর্ব বলবন্ত গার্গীর 'অঙ্কুর' নাটকটি প্রযোজনা করে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। অন্যতমা অভিনেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তীর প্রাণোচ্ছল অভিনয় 'দি' চরিত্রকে অবিস্মরণীয় করে রাখে। ইতিমধ্যে 'গন্ধর্ব' নামে নাট্যত্রৈমাসিক প্রকাশিত হয়।[1] প্রথম বছরে দুটি সংখ্যা বের হয়। এ দুটি প্রায় স্মারক পুস্তিকাধর্মী ছিল। সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হলো নৃপেন সাহা ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়কে। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে নৃপেন্দ্র সাহাই একাদিক্রমে ন' বছর ধরে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন। ইতিমধ্যে গন্ধর্ব নিত্য নতুন নাটক মঞ্চস্থের পরিকল্পনা করে পর পর প্রযোজনা করলো 'সন্ধ্যার রঙ', 'থানা থেকে আসছি', 'অমৃত অতীত', 'মোরগের ডাক', 'বিসর্জন', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'শেষ রক্ষা', 'মঞ্চ', 'নায়িকার নাম নিয়তি' এবং 'শপথ'। এর মধ্যেই আয়োজন করা হয় "নবনাট্য উৎসব"-এর। মিনার্ভা থিয়েটারে দীর্ঘ ছ'

মাস ব্যাপী এই উৎসবে গন্ধর্ব ১২টি একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ ক'রে একাঙ্ক নাট্য রচনা ও প্রযোজনার একটা ঢেউ সৃষ্টি করলো। একাঙ্কিকাগুলি ছিল—'সন্ধ্যার রঙ', 'একরাত্রির জন্ত' (কাব্যনাট্য), 'অন্তস্বর', 'রক্তকরবীর পরে', 'নেপথ্য দর্শন', 'দেবরাজের মৃত্যু', 'নীলকণ্ঠ' (কাব্যনাট্য), 'পাখির চোখ', 'মাটির রং সবুজ', 'সূর্যের মত সমুদ্র' (প্রথম নতুন রীতির নাটক), 'এক চক্ষু' এবং 'উড়ো পাখির ছায়া'। এই পর্বে বহু নতুন নাট্যকার এবং প্রবীণ নাট্যকারদের কাছে 'গন্ধর্ব' ছিল অতি প্রিয়। গণনাট্য থেকে গন্ধর্ব সরে গেল নবনাট্যের আদর্শে। এসব নাটকেরই নির্দেশক ছিলেন শ্যামল ঘোষ। এই সময়ের বিভিন্ন পর্বে নাট্যকারদের মধ্যে যাঁরা গন্ধর্বের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন—শ্যামল ঘোষ (সুরঞ্জন মিত্র), ঋত্বিক ঘটক, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, মনোজ মিত্র, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, গিরিশঙ্কর, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, ইন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, তৃপ্তি চৌধুরী। এছাড়া সাহিত্যিক বিমল কর গন্ধর্বের উৎসাহে প্রথম নাটক লেখেন। রবীন্দ্র শতাব্দী বৎসরে রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করা হয় মূলত কল শো অ্যাটেণ্ড করার জন্ত। গন্ধর্বতে মনোজ মিত্রের পূর্ণাঙ্গ নাটক 'মোরগের ডাক' অভিনীত ও প্রকাশিত হয়। অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ নাটক গন্ধর্বতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ লাভ করে। অভিনয়ে ছিলেন শ্যামল ঘোষ, কণিকা রায়, অরূপ মুখোপাধ্যায়, প্রতুল চৌধুরী, নির্মল কুণ্ডু, নীতিশ দত্ত, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেব দত্ত, ইন্দ্র রায়, গৌতম সান্ন্যাল, নকুল ভট্টাচার্য, নারায়ণ, অসিত দে, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, দেবকুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতি এবং স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতেন—স্বপ্না চক্রবর্তী (দেবী), রমা গঙ্গোপাধ্যায়, কাজল ঘোষ (পরে চৌধুরী), মমতা চট্টোপাধ্যায়, কাজল মুখোপাধ্যায়। এঁরা সবাই সদস্যা হিসাবেই যুক্ত ছিলেন। এছাড়া অভিনয় করেছেন—রেবা দেবী, কল্যানী দেবী, মীনা পাল, দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। আলোকে ছিলেন প্রথম দু' তিনবার তাপস সেন, পরে সুজিত মিত্র ও শান্তনু দাস। রূপসজ্জায় প্রথম দিকে ছিলেন শক্তি সেন, পরে গুণজিৎ মিত্র, পরে শান্তনু দাস।

এরপর শেক্সপীয়ার চতুর্থ শতবর্ষে শেক্সপীয়ারের জীবনী অবলম্বনে একটি নাটকের বঙ্গানুবাদ ও প্রযোজনার ব্যাপারে প্রয়োগ প্রধান শ্যামল ঘোষের সঙ্গে সংগঠনের নীতির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, ফলে শ্যামল ঘোষকে বিদায় নিতে হয়। ইতিমধ্যে দেবকুমার ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় গন্ধর্ব সংগঠনের নবজন্ম হয়। এ পর্বের

প্রথম নাটক উৎপল দত্তের 'মধুচক্র'। বাগবাজারের ভারতী ভবনে প্রথম মঞ্চস্থ করার পর দীর্ঘ দিন ধরে কলকাতার এবং বাইরের বিভিন্ন মঞ্চে অতীব সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হতে থাকে। দেবকুমার ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় গন্ধর্বের পরবর্তী প্রযোজনা সার্ত্র আলটোনা অবলম্বনে 'অনিরুদ্ধ'। নাটকটি রচনায় সুধাংশু তুঙ্গ এবং দেবকুমার ভট্টাচার্য উভয়েরই অবদান আছে। এই পর্বের তৃতীয় প্রযোজনা গোর্কীর গল্প অবলম্বনে লেখা অরুণেশ মুখোপাধ্যায়ের 'একা নয়'। এ নাট্যের বলিষ্ঠ বক্তব্যে গন্ধর্ব আবার গণনাট্য চেতনায় ফিরে আসে। পরবর্তী প্রযোজনা কৃষ্ণ ধরের 'ফুল ওয়ালী'।

'মধুচক্র', 'একা নয়' ও 'ফুলওয়ালী' গন্ধর্ব-র এতাবৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজনা। কলকাতা, বাংলার মফঃস্বল শহর এবং বহির্বঙ্গের বিভিন্ন মঞ্চে এই নাটকগুলি নিয়ে গন্ধর্ব-র বর্তমান জনপ্রিয়তা। এই পর্বে যাঁরা অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন তাঁরা হলেন—দেবকুমার ভট্টাচার্য, শান্তনু দাস, কণিকা রায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু মৈত্র, শিবাজী সেন, অনিব্রত দাশগুপ্ত, বিপ্লব চৌধুরী, বীণু চৌধুরী, দেবু ঘোষ, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, নীলাদ্রি বসু প্রভৃতি। মহিলাদের মধ্যে ছিলেন অরুণা মুখোপাধ্যায়, ভাস্বতী ভট্টাচার্য। প্রথম জনের অকাল মৃত্যু গন্ধর্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ভাস্বতী অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া গন্ধর্ব-র এই পর্বে যাঁর অভিনয় অবিস্মরণীয়, তিনি হলেন শ্রীমতী কাজল মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া অভিনয় করেছেন মমতা চট্টোপাধ্যায়, বাসনা ভট্টাচার্য, ঝুমুর ভট্টাচার্য, স্মৃমিতা ভট্টাচার্য, বীথিকা গাঙ্গুলী প্রভৃতি। এ পর্বের সকল প্রযোজনাতেই আলোকসম্পাত ও রূপসজ্জার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শান্তনু দাস। 'মধুচক্রের' মঞ্চসজ্জায় ছিলেন যোগেন চৌধুরী। 'একা নয়' ও 'ফুলওয়ালী'র মঞ্চসজ্জায় পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র শতাব্দীতে পার্ক সার্কাস রবীন্দ্র মেলায় গন্ধর্বের নাট্য-প্রদর্শনীর আয়োজন এ প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণযোগ্য। পরে আর একবার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনেও গন্ধর্ব দল অংশ নিয়েছিল।

১৯৬১-৬২ সালের গন্ধর্ব পত্রিকার শারদ সংখ্যায় ছুটি সম্পাদকীয় ছাপা হলো।

"বাংলা নাট্যাভিনয়ের মরা গাঙে ভরা জোয়ার এনেছিলো ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। তারপর সে জোয়ার ভাঁটার মুখে পড়ে জল যথারীতি ঘোলা হয়ে ওঠার আগেই পুনরায় বান ডাকলো; তার নাম নবনাট্য আন্দোলন। যে

সংগঠন শক্তি, বিশিষ্ট ভাবাদর্শের নৈতিক বন্ধনে, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘকে সর্ব ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের সজাগ প্রহরী করে তুলেছিলো, সময়, স্থান কর্মপদ্ধতির আভ্যন্তরিক গোলোযোগে তা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত হলো। ব্যক্তিত্ব বিলীন প্রতিভার সঙ্গে দলগত সংগঠন নীতির অহোরাত্রি কলহের পরিণতি যাই হোক, শুভ কি অশুভ, কারণ যেটা, তা হলো স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনীতির ভূমিতে শিল্পের ফসল ফলাতে গিয়ে তারুণ্য শক্তির কাছে রাজনীতির উন্মাদনার তাৎপর্য যে অর্থে লঘু প্রতীয়মান হলো সেই অর্থেই তাঁরা সমবেত শিল্পের শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিলো। আর শুষ্ক রাজনীতির চর্চার চাইতে শিল্প সৃষ্টির উন্মাদনা যেখানে অনেক বেশি জাগতিক লাভের কারণ। স্থূলভাবে এই লাভ-জ্ঞান আত্মপ্রকাশের সূত্রে আত্মপ্রচারের তৃপ্তি এবং নাট্যাভিনয় মারাত্মক অস্ত্র।

বিগত দশকের এই নবনাট্য আন্দোলন ব্যাপকতার দিক থেকে এতো বেশি ছড়িয়েছে যে আজ বাংলার ঘরে ঘরে অভিনেতা, মঞ্চকুশলী ; বৎসরে যারা বা যে সমস্ত সংগঠন মাত্র একবার নাটক নিয়ে মত্ত হতো, আজ সেখানে সারা বছর ধরেই তারা নাট্য প্রযোজনা নিয়ে ব্যস্ত। যে সমস্ত সংগঠন (ক্লাব বা সমিতি) নাটকের ধারে কাছে ঘেঁষেনি কোনদিন, তাঁরাও আজ রাতারাতি নাট্যসংগঠনে পরিণত হচ্ছে—এ চোখের সামনে দেখা। ব্যাপকতার প্রশ্নে নবনাট্য আন্দোলন বহুজন পরিচিত, অনুপ্রেরিত ; কিন্তু প্রশ্ন ওঠে তখনই নব-নাট্য আন্দোলনের তাৎপর্য নিয়ে, যখন কিনা নবনাট্য আন্দোলনের দায়ভাগ অঙ্গীকার করেও তার ঋণ স্বীকার করতে চায় না—নাটক একাধিকবার মঞ্চস্থ করেও বুঝতে পারে না নাটক নিয়ে, শিল্প নিয়ে তার নিজস্ব কোন বক্তব্য আছে কি না। ধোঁয়াটে ভাবে একদল বলে নাটক করছে মন-রঞ্জনের জন্য। অন্য দল নাটক নিয়ে আন্দোলনের পুরো ব্যাপারটাই অন্ধকারে বিশ্বাস করে মাত্র, তাৎপর্য তাদের কাছে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট।

নবনাট্য আন্দোলন প্রথাগত নাট্য ভাবনার শিথিল অবিন্যস্ত রূপকে সংহত করে নতুন করে সঞ্জীবিত করেছে। বিগত দশক গেছে সম্পূর্ণ নাট্য অনুশীলনে, চলতি দশক থেকে নতুন করে শুরু হয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষা। নাট্য রচনায় যেমন, তেমনি নাট্য প্রযোজনায়। এখন নবনাট্য প্রযোজনায়। এখন নব-নাট্যর প্রগতিপথে মূলত সংবর্ধমান জীবন-দ্বন্দ্বকেই মঞ্চ আলোয় সুস্পষ্ট করে তোলা যেখানে লক্ষ্য সেখানে পুরনো দিনের ক্ল্যাসিক নাটক করা যেমন

নাটকের পুনরুজ্জীবন, তেমনি নতুন দিনের নতুন রীতির নাটক করাও বাংলা নাট্য প্রবাহে নতুন সংযোজন।

গণনাট্য সঙ্ঘ যে নতুন গণনাট্য আন্দোলন শুরু করেছিলো, তাতে তারা কেবল গণগ্রাহ্য তাদের সোচ্চারিত বক্তব্যের নাটকই করে নি, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী', মাইকেলের প্রহসন প্রভৃতি পূর্ব স্বীকৃত নাটকও মঞ্চস্থ করেছেন। তাতে এটা প্রমাণিত হয়নি যে তারা গণনাট্য আন্দোলন করছেন না। তেমনি যে কোন পুনর্জাগৃতিরই মূল কথা নতুনকে বরণ করে পুরনোর পুনর্বিচার।

নাটক যেখানে সমাজমনের ফসল। সেখানে পুরনো দিনের সমাজ বক্তব্য সম্বলিত নাটক সেই কালকে যেমন সচল করে তুলেছিলো, তেমনি বর্তমানের যে সমাজ-দ্বন্দ্ব, তার জিজ্ঞাসায় অনুপ্রেরিত হয়ে যদি পুরনো নাটক করা হয়, তাতে ঐতিহ্যকে যে আমরা শ্রদ্ধা করি এবং কোন আন্দোলনই যে ভুঁইফোড় নয়, তাই প্রমাণিত হয়।

নাট্য প্রযোজনাগত এমন শিল্পীমুখীনতা বাংলা নাটকে পূর্বে ছিলো না, সেটা গণনাট্যের দান, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগে যেমন গিরিশ ঘোষ, কি মধ্যযুগে শিশির কুমার আবির্ভূত হয়েছিলেন, তেমনি গণনাট্যের যুগে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী; নবনাট্যের কালেও শক্তিশালী অভিনেতা স্বল্প নয়, অন্তত দু'জনকে পাই—শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্ত। রবি ঘোষও উল্লেখ্য।

গন্ধর্ব—এই নবনাট্য আন্দোলনে পূর্ণ আস্থা রাখেন। নবনাট্য আন্দোলনের একমাত্র ত্রিমাসিক রূপে গন্ধর্ব-র চতুর্থ বর্ষ শুরু হলো। 'বাংলায় নাটক নেই' এই বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য আমরা আমাদের প্রতি সংখ্যাতেই যেমন যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে সৎ উন্নতমানের নাটক প্রকাশ করতে চাই, বর্তমান সংখ্যাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বরং আরো এক পা আমরা এগিয়ে এলাম। ছোটগল্প উপন্যাসের শক্তিশালী কথাকার, বিমল কর তাঁর সাহিত্য জীবনের মধ্যকালে পরিণত বয়সে এসে প্রথম নাটক লিখলেন এবং প্রথম নাটকেই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী নাট্যকাররূপে। অজিত গঙ্গোপাধ্যায় নাট্যরচনায় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী, গন্ধর্ব সেখানে তাঁর ওপর গভীর আস্থা রাখে। তাঁর 'সূর্যের মত সমুদ্র' গত বৎসর গন্ধর্বে বেরিয়েছিলো, এ বৎসর প্রকাশিত হলো 'পোস্ট-মাস্টারের বউ'।

অমর গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ ক্ষমতাবান নাট্যকার; তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রথম প্রকাশিত হলো গন্ধর্বে। মনোজ মিত্র তরুণ নাট্যকাররূপে তাঁর ক্ষমতার জন্য সুপরিচিত। তাঁর দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটকে অপূর্ব জীবন-দর্শন রূপময় হয়ে উঠেছে। মূলতঃ এবারে যে চারখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক গন্ধর্বে বেরোলো, আমরা গর্ব করে বলতে পারি, তার তুলনা সাম্প্রতিক নাট্যরচনায় বিরল।

চলতি দশকের নাট্য-আন্দোলনে আরো দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে: (এক) বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী সংগঠিত হওয়া এবং তার সক্রিয় উদ্যোগে বাংলা যাত্রার পুনরাবির্ভাব। (দুই) তার উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ যাত্রা উৎসব পনেরো দিন ধরে অনুষ্ঠিত হলো। ন্যাশনাল থিয়েটার সম্পূর্ণ হয়ে এলো। এইবার আগামী সংখ্যায় ন্যাশনাল থিয়েটার কেন্দ্রিক যে নতুন ও পুরনো সমস্যা দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে তার সম্পর্কে আমরা নিবন্ধ রাখবার চেষ্টা করবো।"

নবনাট্য আন্দোলনের পরিণতি: নবনাট্য সূচনা

নৃপেন সাহা

"উনিশ শ' ষাট বা একষট্টি সাল পর্যন্ত নবনাট্য আন্দোলনের ব্যাপকতার গতিপথে যদি সময় সীমা টেনে তার সূত্রপাতের দিকে পশ্চাদমুখী হওয়া যায়—তাহলে সময়ের বিচারে নবনাট্য আন্দোলনের বয়স মোটামুটি বছর দশেক —এই জাতীয় একটা হিসেবই পাওয়া যায়। (আমাদের ধারণায় অবশ্য ১৯৫৪ সালেই নবনাট্য আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষণ চিহ্নিত হয় বহুরূপীর 'রক্তকরবী'-র প্রযোজনাসূত্রে তবু আরো বছর দুয়েক প্রস্তুতির জন্যও অন্তত হিসেবে রাখা দরকার।) বিগত দশ বছরে এই নবনাট্য আন্দোলন, একথা বহুজন বিদিত এবং গন্ধর্বেও বহুবার উচ্চারিত হয়েছে যে, ব্যাপকতার দিক থেকে যতখানি ছড়িয়ে পড়েছে, সে তুলনায় গভীরতার দিকটিতে তার চরিত্র তাৎপর্য বিমণ্ডিত হয়ে ওঠে নি। (নবনাট্য আন্দোলনের এই স্বরূপ সন্ধান এই সংখ্যায়ই অন্য প্রবন্ধে আলোচিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু স্থানাভাববশতঃ প্রকাশ করা সম্ভব হলো না বলে এখানে তার মৌলিক সমস্যা এবং তার থেকে উত্তরণের ইঙ্গিতই আলোচনা করা যাক।) নবনাট্য আন্দোলনের তাৎপর্য নিয়ে আজ যে প্রশ্নের আমরা সম্মুখীন সেটা হলো সাময়িক আনন্দ বিনোদনের ঊর্ধ্বে চিরন্তনের স্পর্শকামী যে শিল্প-আকাঙ্ক্ষা, তার কতোখানির বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব

হলো—এই জিজ্ঞাসা। স্থায়ী শিল্পমূল্যের বিচারে নবনাট্য আন্দোলন আদৌ কোন ফসল ঘরে তুলেছে কী। যে বিশিষ্ট নান্দনিক রসউপলব্ধির গাঢ় সংবদ্ধতা—তার সন্নিকটে আদৌ আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি কি? সময়ের তাপে বা শৈত্যে পচনশীল নয় এমন কোন স্থায়ী শিল্পাদর্শের উপস্থাপনায় নবনাট্য আন্দোলন যে অব্যর্থ লক্ষসন্ধানী, এমন কোন উদ্দেশ্যও তার চরিত্রে ততো প্রকট নয়। এ অবস্থায় নবনাট্য আন্দোলনের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন আসবে স্বভাবতই এবং সেখানে মূল প্রসঙ্গ যে নাটক—নাট্যসাহিত্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং দেখা যাবে যে এই 'নাটক' প্রসঙ্গেই আমরা দ্বিধান্বিত। তদনন্তর: মঞ্চ। এবং এইখানে আপেক্ষিক শিল্প-সার্থকতা। নাটক ব্যতীত মঞ্চগত প্রাকরণিক কৌতূহলের একজাতীয় উন্নত রুচিবোধের উত্তর নবনাট্য আন্দোলনের কাছ থেকে প্রমাণ-সহই মেলে না যেটা তা হলো নাটক: নাট্যসাহিত্য।

মঞ্চের সঙ্গে নাটকের পরিণয়ে, আমাদের দেশে, নাটকের স্বভাব স্ত্রীর মতো—তদগত চিত্তে মঞ্চের একাধিপত্যে তার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। তার কারণ আমাদের নাট্যবোধ, যা ভীরু, সংস্কারাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট ও অসুস্থ এবং স্থূল। নাটক যাঁরা লেখেন তাঁরা 'নাট্যকারে' পরিণত হন, সাহিত্যিক হয়ে ওঠার অবকাশ পান না। তার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতার অভাব। না হলে জীবনের গভীরতার যে উত্তাপ, আবেগ আছে অথচ সংযত, সমস্যার বিভিন্নমুখী গতিতে দ্বন্দ্ব জটিল মুহূর্তগুলি যে বিরাট ক্ষতমুখ রচনা করে চলেছে—যে কোন পদক্ষেপেই পতন বা উত্থান যেখানে অনিবার্য—জীবন সম্পর্কে, তার দায় সম্পর্কে; সামাজিক অর্থনৈতিক ও মানসিক মূল্যবোধগুলির যে পরস্পর সংকট সম্পর্ক—ইত্যাদি উপলব্ধির কেন্দ্রে বাসও নাট্যকাররা এতাবৎ স্বচ্ছন্দ মঞ্চভাষার মাধ্যমে সোজাসুজি হয় কাঁদান, নয় হাসান। তদতিরিক্ত যে ভাবনা-র বৈভব, সূক্ষ্মভাবে যা আরো গভীর রসবোধের মূল ধরে টান দিতে পারে—প্রকরণের প্রকর্ষে যা স্থায়ী হতে পারে—সেই উন্নতমানের নাটক—আধুনিক কবিতা বা ছোটগল্পের মতন রসোদ্বোধক সাহিত্য, বিগত পৌনে দু'শ বছরের নাট্য-রচনার প্রবাহে প্রায় বিরল বলা চলে। ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। এবং রচনা-নৈপুণ্যের গুণে দু-চারটি উল্লেখযোগ্য নাটক। এর বহুবিধ কারণের মধ্যে একটি হলো নাট্যবোধের অভাব। আর সেই অভাবটাকেই আরো বড়ো করে তুলেছেন মঞ্চের কলাকুশলী। এঃ

কলায় যে অর্থে নিদিধ্যাসন সম্ভব হয়েছে—সেই অর্থে নাটক-এর বেলায় সাহিত্য বর্জন করে আর সবই হয়েছে।

নাটক ও মঞ্চের গোপন সর্ত সামগ্রিকতা রক্ষা করা। এবং এই সামগ্রিক প্রাঙ্গই বাংলা নাট্যজগতে বারবার হানা দিয়েছে। আর একান্ত ভাঁটা না পড়লে সব সময়েই জোয়ারের জল। ভীড় প্রচণ্ড। ভাসমান সংকট, সমস্যা, তার ছকবাঁধা রূপ, এইটাই আলোকিত হয়েছে। সামগ্রিক স্থূলতা এতো বেশি যে তার থেকে মুক্তি কঠিন-সম্ভব। এই কঠিন-সম্ভব মুক্তিকেই সম্ভব করা যেতো যদি বাংলার নাট্যসাহিত্য আধুনিকতার সংস্পর্শে আসতো।

আধুনিকতা কালিক নয়, চলমান যুগের বিশেষ কতকগুলি মূল্যবোধের লক্ষণে তাকে চিহ্নিত করা যায়। আর শিল্পের প্রাকরণিক পারদর্শিতার শাখতে তার উৎক্রান্তি। এই আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথে মেলে আর মেলে তিরিশের যুগের কবি ও সাহিত্যিকদের রচনায়। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী আধুনিকতার লক্ষণে স্পষ্টত চিহ্নিত। তাই রক্তকরবী যখন মঞ্চে উপস্থাপিত হয়—তখন বোঝা যায় যে মঞ্চভাষা ও সাহিত্যভাষার এই যুগ্ম মিলনের মধ্যেই নাট্যসাহিত্যের আধুনিকতা। আর আধুনিক জীবন চর্চার সংবেদনশীল প্রতিবিম্বনেই সাহিত্যের চিরন্তনতা।

বস্তুত আমাদের প্রয়োজন সাহিত্য-শিল্প-চলচ্চিত্র জগতের আধুনিকতার মতো নাট্য সাহিত্য-এর আধুনিকতা। এবং এই আধুনিকতার জন্য প্রয়োজন নতুন দৃষ্টি কোণের। গভীর জীবনবোধের। প্রয়োজন আধুনিক content-এর। প্রকরণগত আধুনিকতাও আসবে অবশ্যম্ভাবী। চরিত্রের সংলাপও হবে আধুনিক মানুষের মনের ভাষায় রচিত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিবোধের সঙ্গে সংঘর্ষ-রচক ব্যক্তি মনের ক্ষয়িত মূল্যবোধের যে পরাস্থ অভিযান-তারই যথার্থ মূল্যায়নে আধুনিকতা। এর বৈচিত্র্য ও গভীরতা এবং বহু আয়তনিক প্রতিফলনের জন্য মঞ্চরীতির যে নব্যতা—যা নবনাট্য আন্দোলনের আপতিক সার্থকতা,—তার গুরুত্ব তখনই স্বীকৃত হবে যখন নাটকও স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে রচিত হবে আধুনিক শিল্প রীতিতে। নাটকে দরকার এখন কবিতার চরিত্র, তার ইমেজ। অতি প্রত্যক্ষতায় ঘটবে কল্পনার তীব্র সংগ্রাম। বাস্তবের সঙ্গে ফ্যান্টাসির মিলন। আপাত উদ্ভটত্বের সঙ্গে অভিন্ন হবে বস্তুগত মাধ্যম। কাহিনী বা প্লট নতুন অভিধায় চিহ্নিত হবে। অতি ব্যবহৃত 'নাটকীয়তা' আসবে অন্য ভাষায় অন্য চরিত্রে। এখন এই নাটক-রচনাগুচ্ছ

পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই নবনাট্যের নতুন পর্ব সূচিত হবে। এবং বিগত ১৯৮১ সাল থেকে স্পষ্টতই তার সূচনা লক্ষ্য করা গেছে। গন্ধর্ব এই নব্যনাট্য সাহিত্য রচনার জন্য বরাবরই উৎসাহী—বিগত এবং চলতি বছরের গন্ধর্বে প্রকাশিত নাট্য তালিকার দিকে নজর দিলে বিদগ্ধ পাঠকদের কাছে আশা করি তা ধরা পরবে। আগে নাট্য সাহিত্য রচিত হোক পরে অন্য কথা। তাই বা বলি কি করে একত্রে নবনাট্য আন্দোলন আক্ষরিক ও তাৎপর্যগত অর্থেই পূর্বাপর যুগের থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হয়ে উঠুক। উনবিংশ শতাব্দীর ম্যাচারিলিজমের প্রেতের হাত থেকে বাংলা নাট্যের মুক্তি ঘটুক নব লব্ধ জীবন-বোধে বিমূর্ত উপলব্ধিতে। মঞ্চ ও সাহিত্যের যথার্থ পরিণয়েই যে নবনাট্য—সেই উপলব্ধিই সংক্রামিত হোক নবনাট্য আন্দোলনের শিল্প-কুশলীদের মানসে—তাঁহলেই আসন্ন ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচানো যাবে এই প্রচেষ্টাকে: নাট্যসৃষ্টিতে প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শ আর বিলম্বিত নয় বলেই, এখনো আমরা এ আন্দোলনের কাছে পাকা ফসল প্রত্যাশা করি।"

নবনাট্য আন্দোলনে / অভ্যুদয়

১৯৫৮ সাল। কোন নাটক নয়, কোন নাট্য প্রযোজনা নয়, একটি নাট্য প্রতিযোগিতা বাংলা নাট্য জগতের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল। এই প্রতিযোগিতার পরই বাংলার অপেশাদার নাট্যচর্চা এক অভূতপূর্ব নতুন বাঁক নিল। অনেকগুলি নাটক ও নাট্যসংস্থা প্রভূত শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। জনসাধারণের সপ্রশংস দৃষ্টি পড়ল এই সব নাটক ও নাট্যসংস্থাগুলির ওপরে। প্রতিযোগিতাটি হলো বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত গিরিশ পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা। যে সব দলগুলি তাঁদের স্বতন্ত্র স্বাক্ষর রাখলেন তার কয়েকটি হলো প্রান্তিক, শ্রীমঞ্চ, বৈশাখী, রং-বেরং এবং অভ্যুদয়। নাটক এলো, 'সংক্রান্তি', 'দুই মহল', 'শুধু ছায়া' এবং 'বারোঘণ্টা'। 'অভ্যুদয়' এবং 'বারো ঘণ্টা' দুটি নাম এই সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্বরূপা মঞ্চে প্রথম অভিনয়ের পরই ঝড়ের মত ছড়িয়ে পড়ল। অখ্যাত সংস্থা, অনামা নাটক, অপরিচিত নাট্যকার, তবু কী প্রচণ্ড শক্তি নাটকের। কী অসাধারণ দলগত অভিনয়। কী অপূর্ব পরিচালনা পদ্ধতি। বিস্ময়ে হতবাক হলেন বিচারকরা। যাঁদের মধ্যে ছিলেন অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষ। মন্মথ

রায়, মনোজ বসু, শোভা সেন, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, বিধায়ক ভট্টাচার্য, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, ডঃ অজিত ঘোষ, ডঃ সাধন ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে।

ডঃ সাধন ভট্টাচার্য প্রথম সুযোগেই আমাকে বললেন "বারো ঘণ্টা দেখেছেন? এই রকম একটা নাট্য প্রযোজনা দেখা জীবনের একটা দুর্লভ অভিজ্ঞতা।"

সত্যিই একটা অভিজ্ঞতা। কোলকাতা সহরের নাট্যামোদী মানুষের কাছে, 'বারোঘণ্টা' প্রযোজনা দেখা একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা। তাই নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভবপর হলো না। 'বারো ঘণ্টা'র তরুণ নাট্যকার কিরণ মৈত্রকে একদিন কাছে পাবার সুযোগ ঘটল। জানলাম, 'অভ্যুদয়' তার সফল পথ যাত্রা শুরু করেছে তারও কয়েক বছর আগে থেকে। ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালের থিয়েটার সেণ্টার একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় 'আয়না' (বারোঘণ্টার একাঙ্ক রূপে) ও 'বুদবুদ'-এর সাফল্য তাঁদের হিসেবের খাতায়। কিন্তু জন্মটা তারও কিছু আগে ১৯৫১ সালের আগষ্ট মাসে বরাহনগরে। বরাহনগর একটি নাট্য-পিপাসু জায়গা হলেও তখনও পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, আর ড্রইংরুম ড্রামা অভিনয়ের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। কিরণ মৈত্র এই প্রচলিত ধারাকে ভাঙতে চাইলেন। তিনি জড়ো করলেন তারক ঘোষ, তমাল লাহিড়ী, বিমল রায়, শ্যামল লাহিড়ী, হিরণ মৈত্র ও আরও কয়েক জনকে। প্রতিষ্ঠা করলেন 'অভ্যুদয়' নাট্য-সংস্থার। ' ডিসেম্বর মাসে প্রথম মঞ্চস্থ করলেন তাঁর নিজেরই লেখা নাটক 'নাটক নয়'। মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, আলোক সজ্জাহীন, এই নাটকটিতে সমাজ ব্যবস্থার ওপরে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছিল। সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "এই নাটক ও নাট্য সংস্থাটি শীঘ্রই বাংলার জনসাধারণের মন জয় করবেন।" করেও ছিল তাই। অতি সামান্য অর্থ নিয়ে, কখনো বা না নিয়ে এই সংস্থা গ্রাম গ্রামান্তরে 'নাটক নয়' অভিনয় করে বেড়ালেন। কিন্তু কোলকাতার বুকে তাঁরা ব্রাত্য হয়েই রইলেন। কিন্তু পরে নিজেদের ক্ষমতা বলেই 'আয়না' ও 'বুদবুদ' প্রযোজনা করে কোলকাতার বুকে নিজেদের পরিচিত করে তুললেন। ইতিমধ্যে দলে এলেন মনোরঞ্জন সোম, নীলোৎপল দে, শিবশঙ্কর ঘোষাল, কল্যাণী দাসগুপ্ত, অনিলা ভট্টাচার্য। এর পরের প্রযোজনা 'বারোঘণ্টা', বিশ্বরূপা নাট্য প্রতিযোগিতায় আসবার আগে তাঁরা দু'বার

নাটকটি বরাহনগরে মঞ্চস্থ করেছিলেন। সাড়াও পড়েছিল। কিন্তু প্রচণ্ড আলোড়ন তুললেন বিশ্বরূপায় এই নাটকটির অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। তারক ঘোষের 'অমিয়', তমাল লাহিড়ীর 'অনিল', হিরণ মৈত্রর 'ধারিক', বিমল রায়ের 'সুনীল', প্রভাত গৌতমের 'অলক', শ্যামল লাহিড়ীর 'জগৎ', কিরণ মৈত্রর 'রাজেশ্বর', মনোরঞ্জন সোমের 'গোয়ালা', কল্যাণী দাসগুপ্তার 'সন্ধ্যা' অতুলনীয় অভিনয়ের স্বাক্ষর হয়ে রইল। নেপথ্যে বৃদ্ধ রাজেশ্বরের চীৎকার, 'নিয়ে গেল, চুরি করে নিয়ে গেল', রাধার ক্রমাগত আর্তনাদ, বাইরের ঘর আর ভেতরের ঘর একসঙ্গে দেখানো, রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে লোকের যাতায়াত সব মিলিয়ে আঙ্গিকের এক অপূর্ব বিশিষ্টতা।

ফল হলো : দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা। প্রসঙ্গতঃ—কিরণ মৈত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কি করে প্রযোজনাটি করেছিলেন? উত্তরে বলেছিলেন, নতুন কিছু করবো ভেবে আমরা কিছু করিনি। আমরা সকলে ভেবেছিলাম, অসুস্থ স্ত্রী, ও বিকৃত মস্তিষ্ক পিতা যখন ঘরে রয়েছেন, তখন মাঝে মাঝে আর্তনাদ ও চীৎকারের মধ্য দিয়ে দর্শকদের অস্তিত্বকে অনুভব করানো উচিত। তাই করানো হয়েছিল। যথাসম্ভব স্বাভাবিক অভিনয় করাটা উচিত, তাই আমরা করেছিলাম। অভিনয় করতে হলে পার্ট মুখস্থ করা, নিরলস রিহার্সাল দেওয়া উচিত, তাই আমরা করেছিলাম। প্রচণ্ড জনসম্বর্ধনা লাভ করার পর মনে হয়েছিল আমরা নতুন কিছু করেছি। সেই ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত 'অভ্যুদয়' আজ পর্যন্ত সজীব আর সক্রিয় রয়েছে এটা কম আনন্দের বিষয় নয়। প্রযোজনা করেছেন, 'চোরাবালি', 'পুরাতন ভৃত্য', 'মায়ের ডাকে', 'মীরকাশিম' এবং সর্বশেষ ২টি প্রযোজনা 'নাম নেই' এবং 'অন্তচ্ছায়া'।

'নাম নেই' নাটক প্রযোজনার মধ্য দিয়ে 'অভ্যুদয়' পুনরায় প্রমাণ করলেন নতুন কিছু করবার শক্তি তাঁদের জন্মগত। 'নাম নেই' প্রযোজনায় তাঁরা এক নতুন পদ্ধতির আশ্রয় করলেন যার নাম দেওয়া হলো 'টেক্নি থিয়েটার'। বলা হলো 'নাটক আঙ্গিক নয়, আঙ্গিকে নাটক'। বহু রকম আঙ্গিকের আশ্রয় নেওয়া হলো, যাদের অভিহিত করা হলো, টেলিস্কোপি, ফ্রিজ টিল, ফ্লাশকোর, টেজ মিউজিক প্রভৃতি বলে। দারুণ বিতর্কের সৃষ্টি করলো এই নাট্য প্রযোজনা। বর্তমানে যে 'ফ্রিজ'-এর বহুল ব্যবহার দেখা যাচ্ছে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ এই ফ্রিজ পদ্ধতির সার্থক ব্যবহার আমরা প্রথম দেখতে পেলাম এই নাটকে। আলোক সম্পাতে শ্রীঅমিয় সেন দেখালেন যে, আলো নাটকে

কতটা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য এই নাটকের প্রথম আলোক পরিকল্পনা করেছিলেন শ্রীস্বরূপ মুখোপাধ্যায়। নেপথ্যে কোন মিউজিক ব্যবহার করা হয়নি। একটি চরিত্র অভিনয় করেছে, ফাঁকে ফাঁকে "মিউজিক' রচনা করেছে এই নাটকের। এক অসাধারণ পরিকল্পনা। 'নাম নেই'-এর অসাধারণ প্রযোজনার পর অভ্যুদয় মঞ্চে নিয়ে এল 'অন্তছায়া'। আর এক নতুন পদ্ধতিতে যার নাম দেওয়া হলো 'সিনে-থিয়েটার'। একদিকে নেপথ্য কর্ম, ছায়া আর সাংকেতিক চিহ্ন, অন্যদিকে মঞ্চাভিনয়। উভয় মিলে সিনে-থিয়েটার। অভ্যুদয় সম্প্রদায় অদ্যাবধি 'বারো ঘণ্টা', 'নাম নেই', 'অন্তছায়া' নাটকের দুই শতাধিক অভিনয় করেছেন।

একাঙ্ক নাট্য প্রযোজনাতেও অভ্যুদয়-এর সফলতা কম নয়। 'বুদবুদ', 'অন্ধকারায়', 'শিককাবাব', 'কোথায় গেল' প্রভৃতির নাম সকলকারই জানা।

বর্তমানে অভ্যুদয়ের সঙ্গে যাঁরা জড়িয়ে রয়েছেন তাঁরা হলেন, অভিনয়ে বিশ্বনাথ পাল, হিরণ মৈত্র, শান্ত সান্যাল, তপন রক্ষিত, চন্দ্রনাথ রক্ষিত, চুনি গুপ্ত, কিরণ মৈত্র, সুশীল দালাল, মানব গুহ, দিলীপ দে, গোরাচাঁদ লাহিড়ী, পল্টু চৌধুরী, হারাধন গুহ, কানাই গাঙ্গুলী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিলীমা চক্রবর্তী, অলকা গাঙ্গুলী, মঞ্জুলা ভট্টাচার্য, স্বপন বিশ্বাস, তারাপদ ভট্টাচার্য, সুন্দর রায়, নিখিলেশ ভট্টাচার্য, হৃদয় কয়াল, তপোময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। আলোক নির্দেশনায় অমিয় সেন ও সঙ্গীত নির্দেশনায় সুনীলবরণ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।

নাট্য আন্দোলনে বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ

১৯৫৮ সাল, বিশ্বরূপা মঞ্চের কর্ণধার রাসবিহারী সরকার নাট্য আন্দোলনকে আর এক পা এগিয়ে দিলেন। শুরু করলেন গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা। প্রতিষ্ঠা করলেন গিরিশ গ্রন্থাগার। শুধু মাত্র নাটক ও নাটক সম্বন্ধীয় বইয়ের পাঠাগার। এই প্রচেষ্টা যে কতো শুভ তা পরবর্তীকালে অচেনা অজানা নাটকের পরিচিতি দেখলেই বোঝা যায় এই প্রচেষ্টার সার্থকতা। ১৩২টি নাট্য সংস্থা এই প্রথম প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ৩৫টি নাটক ও দলকে বিচারকমণ্ডলী অংশ গ্রহণ করার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। এই ৩৫টি

নাটকের মধ্যে প্রথম বছরে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রান্তিক শাখা বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' অভিনয় করে প্রথম স্থান পায়। 'সংক্রান্তি'তে শ্রেষ্ঠ নাটকের মর্যাদা, পরিচালনায় ও রতনের ভূমিকা অভিনয়ে যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে পুরস্কৃত হন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতা হিসাবে গুকুর রূপী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গার ভূমিকাভিনেত্রী রেবা রায় শ্রেষ্ঠা সহ অভিনেত্রী হিসাবে পুরস্কৃত হন। এ ছাড়া 'সংক্রান্তির' প্রযোজক সংস্থা প্রান্তিক শাখা শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে টিম ওয়ার্কের এবং বিখ্যাত আলোক শিল্পী তাপস সেন ও রূপসজ্জায় শক্তি সেন যথাক্রমে আলোকসম্পাত ও রূপসজ্জায় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন অভ্যুদয় গোষ্ঠী। কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘণ্টা' নাটকে সহ অভিনেতা হিসাবে পুরস্কার পান তমাল লাহিড়ী। প্রতি বছর পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতা ছাড়াও এঁরা একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা করেন। সেখানে অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দ্বান্দ্বিক', বিদ্যুৎ বসুর 'লার্নিং ফ্রম দি বার্নিং ঘাট' পুরস্কার পায় ও বহুল পরিচিতি লাভ করে। এই পরিকল্পনা পরিষদের আরো অনেক কিছুই এই গ্রন্থে দেবার ইচ্ছে ছিল। ঐ প্রতিষ্ঠানের কোনরকম সহযোগিতা না পাওয়ার দরুনই দিতে পারলাম না, এর জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। তবুও আমি মনে করি এই তের বছরের নাট্য আন্দোলনে এঁদের অবদানও কিছু কম নয়। বহু অপেশাদার নাটক এঁদের প্রচেষ্টায় পরিচিতি লাভ করেছে। নাটক সম্বন্ধে ভাবনা বাড়ানোর চেষ্টা এঁরাই প্রথম করে নাট্য আলোচনার মাধ্যমে। এই পরিকল্পনা পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন ডঃ অজিত কুমার ঘোষ ও রাসবিহারী সরকার। এঁদের প্রচেষ্টায় প্রতি বছর এপ্রিল মাসে নাট্য সম্মেলন হয়, সেই সম্মেলনের ১৯৫৪ সালের ৪ঠা এপ্রিলের যুগান্তর পত্রিকায় একটি সম্মেলনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, আমি সেই লেখাটি সংগ্রহ করে দিলাম।

নাট্য-সাহিত্য সম্মেলনে আলোচনা

বিশ্বরূপা থিয়েটারের বহিঃপ্রাঙ্গণে বঙ্গ নাট্য-সাহিত্য সম্মেলনের যে চার দিন-ব্যাপী অধিবেশন হয়ে গেল তার প্রথম দিনে উপস্থিত থাকতে না পারায় বক্তাদের আলোচনা-ধারা সেদিন কোন্ পথে ধাবিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনো আলোকপাত করা গেল না। বাকী তিন দিনের আলোচনা শুনে মনে হলো কোনো বিষয়ে চিন্তা ও মতের দিক দিয়ে বক্তাদের অবস্থান বিপরীত মেরুতে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ থাকা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু একই বিষয়ে বলতে গিয়ে বক্তারা যদি একেবারে বিপরীত মত প্রকাশ করেন, কোনো সামঞ্জস্যই না থাকে, তবে সেই বিতর্কসভা থেকে শ্রোতাদের কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন।

যেমন দ্বিতীয় দিনের আলোচনার কথাই ধরা যাক। আলোচ্য বিষয় ছিল বর্তমান বাংলা নাট্য-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি। আলোচনার অবতারণা করে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, চল্লিশোত্তর কালে বাংলা নাটক তার বিষয়বস্তু প্রসারিত করে সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর সাধারণ মানুষকে নায়কের মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, অধিকাংশ নাট্যকার জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু না হয়ে একটা রীতির দাস হয়ে পড়লেন এবং ফরমুলায় ফেলা নাটক লিখতে লাগলেন। ফলে তিনি প্রাণশক্তি হারিয়ে দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করতে থাকেন। নাট্যকারগণের মনে তখন দ্বিধা উপস্থিত হয় যে, কোন্ বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক লেখা উচিত। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, সেই দ্বিধা থেকে মুক্ত হয়ে জীবননিষ্ঠ হতে হবে নাট্যকারদের—সমাজ ও ব্যক্তির মানসিকতায় যে রূপান্তর হচ্ছে সেটিকে ধরতে না পারলে যুগচিন্তা থেকে পিছিয়ে পড়বেন তাঁরা এবং তার ফলে নাট্য সাহিত্যে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হবে।

অল্পবিস্তর মতভেদ থাকলেও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য মোটামুটি ভাবে সমর্থন করেই আলোচনা করেন সলিল সেন, সুধী প্রধান, গিরিশঙ্কর সুনীল দত্ত ও কানাই বসু। সুধী প্রধানের মতে নাটকের আদর্শ হওয়া উচিত সমাজকল্যাণ। সেই কল্যাণবোধ থেকে ভ্রষ্ট হলেই নাটকের অবনতি ঘটে। সলিল সেন বলেন, এত কান্না থাকতেও দর্শকরা যখন হাসি পেয়েই তুষ্ট তখন নাট্যকাররাও তাঁদের হাসাতেই লেগে গেছেন। এই জীবনবিমুখ



'৬৫-তে বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত বঙ্গ নাট্যসম্মেলনে পুস্তক প্রদর্শনীতে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও সুনীল দত্ত।



নাট্যনির্দেশক শ্যামল ঘোষ ও নাট্যকার
মোহিত চট্টোপাধ্যায়।



জীবনরঙ্গ নাটকের আবহসংগীত গ্রহণকালে হিমাংশু বিশ্বাস,
ডঃ ভূপেন হাজারিকা ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী।

মনোভাবের প্রতি শ্লেষোক্তি করে তিনি যেন খানিকটা আত্মসমালোচনাই করেন। গিরিশঙ্কর বলেন যে, উপযুক্ত নায়কের অভাবই আজ নাট্যকারদের সঙ্কট। সুনীল দত্ত বলেন যে, সরকার যেসকল দেশাত্মবোধক নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করেন ও অর্থ দিয়ে থাকেন, সেসব নাটক অভিনয় করলে দেখা যায় প্রেক্ষাগৃহ খালি থাকে—দর্শকরা দেখতে আসেন না। কানাই বসুর মতে একমাত্র সমাজ কল্যাণই নাটকের উদ্দেশ্য হতে পারে না—যথার্থ নাটক উপস্থিত করে দর্শকদের আনন্দ দিতে পারলেই নাটকের সার্থকতা।

এইদিনের সভাপতি ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্য কিন্তু মূল বক্তব্যটিকেই চ্যালেঞ্জ করে তাঁর ভাষণ দেন। তাঁর মতে শেক্সপীয়রীয় রীতিতে নাটক রচনা না করলে তা নাটকই হয় না। যেহেতু গত দু'দশকে বাংলা নাটকে সেই রীতি কেউ অনুসরণ করেননি, শেক্সপীয়রীয় পদ্ধতিতে চরিত্রের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রয়াস পাননি, সেই হেতু একালের একখানা নাটকও নাটক হয়ে ওঠেনি।

সভাপতির ভাষণ নিয়ে বিতর্কের রীতি নেই বলেই কোনো মহল থেকে তাঁর এই উক্তির প্রতিবাদ সেদিন হয়নি; কিন্তু তাঁর এই মন্তব্য নাট্যকার সমাজ নির্বিচারে মেনে নিতে পারবেন বলে মনে হয় না।

এর জবাব দিলেন পরের দিন অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ সেন। তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল 'বাংলা নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব'। ইতিবৃত্ত বর্ণনা ক'রে উপসংহার টানলেন তিনি এই বলে যে শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করে যেসব বাংলা নাটক রচিত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সেগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই আজ জনপ্রিয়তা নেই—অর্থাৎ কালজয়ী হয়ে সেসব নাটক জনসমক্ষে টিকে থাকতে পারেনি। বরঞ্চ শেক্সপীয়রের প্রভাবমুক্ত নাটকগুলিই সেই তুলনায় আজও সমধিক সমাদৃত। তিনি আরও বলেন যে, শেক্সপীয়র শেক্সপীয়রই। তাঁর অনুকরণ করতে গেলে ব্যর্থতাই আসে। আধুনিক কোনো বাস্তুকার তাজমহলের অনুকরণ করতে যাবেন না নিশ্চয়ই। তাজমহল যেমন আপন মহিমায় উজ্জ্বল, শেক্সপীয়রও তেমনি আপন গরিমায় দীপ্ত। এলিজাবেথীয় যুগের রীতিতে আধুনিক জীবনকে রূপ দেওয়া যাবে কেমন করে? তাঁর বক্তব্য—যুগের প্রভাবেই শিল্পরীতিরও পরিবর্তন হয়। তৃতীয় দিবসের অধিবেশন শেক্সপীয়র সম্পর্কে আলোচনার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ডক্টর শীতাংশু মৈত্র তাঁর লিখিত ভাষণে শেক্সপীয়র সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের মনীষীদের অভিমত উদ্ধৃত করে তুলনামূলক বিচারের চেষ্টা করেন। উপসংহারে তিনি যেকথা

বলতে চান তার মধ্যে একটা দুর্জ্ঞেয়তাবাদের ইঙ্গিত ছিল। 'সাইকলজিক্যাল রিয়ালিজম্' বরবাদ করে তিনি বলেন যে, নাটকে সম্ভাব্যতার প্রশ্নটাই বড়ো নয়। শেক্সপীয়রের নাটকের অসম্ভাব্যতাই এক অভূতপূর্ব অনাস্বাদিত নাট্যস্বাদ সঞ্চারিত করে। সুতরাং যাঁরা সম্ভব অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব নিয়ে বেশি মাথা ঘামান তাঁরা নাট্যচেতনার পূর্ণ বিকাশে অন্তরায়ই সৃষ্টি করেন।

বাংলা নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ডক্টর অজিত ঘোষ যে সমস্ত তথ্য উপস্থিত করেন, পরে অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ সেনের আলোচনায়ও তার অনেক বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে। পূর্বে বক্তাদের মধ্যে বোঝা-পড়া না হওয়ার দরুণই এরূপ হয়ে থাকে। একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন বক্তা যদি বিভিন্ন দিক থেকে আলোকপাত করেন তবে আলোচনা মনোজ্ঞ ও বক্তব্য নিটোল হয়ে ওঠে। শ্রোতাদের আর বিরক্তির কারণ ঘটে না।

তৃতীয় দিনের আলোচনায় সাহিত্যের প্রকৃত রসাস্বাদন করা গেছে সেদিনকার সভাপতি অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার গুহের সংক্ষিপ্ত অথচ রসমণ্ডিত ভাষণে। মনে হলো শেক্সপীয়রের নাট্যসাহিত্যের অমিয়ধারায় অবগাহন ক'রে পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল।

চতুর্থ দিবসে সভাপতির ভাষণে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দনতত্ত্বের কতকগুলি মৌল বিষয় বিশ্লেষণ করে নাটকের লক্ষণ ও সাহিত্যজগতে নাট্যকারের স্থান নিয়ে যে আলোচনা করলেন তা যেমনই শিক্ষণীয় তেমনই রমণীয়। কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্পকারের মেজাজ থেকে নাট্যকারের মেজাজ যে সম্পূর্ণ আলাদা এবং জীবনকে দেখা ও তাকে প্রকাশ করার রীতিও যে তাঁর স্বতন্ত্র— ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘোষণা শিরোধার্য করে নেবারই মতো। নাটক যে গল্প উপন্যাস-কবিতার লেজুড় বা বিকল্প নয়, স্বকীয়তায় সে নিজে পরিপূর্ণ— একথাটি ইতিহাসসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকুমারবাবুর বর্ণনাভঙ্গিতে আবার নতুনের মন্তনই শোনাল।

সাহিত্য সম্মেলনে রসের আলোচনা না-করে কোনো কোনো বক্তা যখন ঐতিহাসিক তথ্যের ধারা বিবরণ দেন এবং প্রতি বছর একই কথা বলেন, তখন অন্তত রসিকজনদের ধৈর্যধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবু প্রতি বছরই এই নাট্য-সাহিত্য সম্মেলনে তেমন কয়েকজন বক্তা এসে যখন বাঁধা গৎ বাজিয়ে মৌল চিন্তার পরিবর্তে অতীতবিদ্যার পরীক্ষা দেন, ক্লাসের নিরীহ ছাত্রদের মতো শ্রোতারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে বসে তা শোনেন বলেই তাঁদের সহিষ্ণুতার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

১৯৫৮ সাল। নাট্য আন্দোলনের দীর্ঘ বারো বছর পরে, এই থিয়েটার আন্দোলনের সঙ্গে সামিল হলেন সলিল সেনের 'ডাউন ট্রেন' নিয়ে চতুরঙ্গ। এই দলের প্রধান নায়ক বরুণ দাসগুপ্ত, ইনি আগে ছিলেন উত্তর সারথীতে পরে যার নামকরণ হয় সাজঘর সেই দলে। ২৬শে মে রঙমহলে আমরা এঁদের প্রথম 'ডাউন ট্রেন' দেখি। একটি অসাধারণ নাটক এই 'ডাউন ট্রেন'। পরবর্তীকালে ১৯৫৯-৬০ সালে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় এই দলের 'ডাউন ট্রেন' শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা বিবেচিত হয় এবং আরো পাঁচটি পুরস্কার এঁরা পান। ডাউন ট্রেনের অভিনয় দেখে নাট্যানুরাগী জনসাধারণ এঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যদিও এঁদের জন্ম ১৯৫৫ সালে বনফুলের 'কঞ্চি' নাটকের মাধ্যমে। মহারাষ্ট্র নিবাসে ২২শে জুন এটি অভিনীত হয়। ডাউন ট্রেন চলাকালীন এঁরা একটু পেছিয়ে গেলেন। অমৃতলালের সেই উনবিংশ শতকের সামাজিক নক্সা 'বাবু' নাটককে আধুনিক ব্যাখ্যায় নতুনভাবে প্রযোজনা করলেন চতুরঙ্গ।

এতো গেল অন্য ধরনের নাটক। এবার বরুণ বাবু আমাদের দেশে যে বৃহত্তর জনসংখ্যা কৃষক, সেই কৃষক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলেন। সমরেশ বসুর ছোট গল্প অবলম্বনে বরুণ দাসগুপ্ত নাট্যরূপ দিলেন 'আবর্ত'। এই প্রযোজনা দেখে একবাক্যে সবাই বলেছে একটি চমকপ্রদ জীবন্ত নাট্য প্রযোজনা। এরপর এঁরা আবার পেছিয়ে গিয়ে নাটক বাছলেন সতীনাথ ভাদুড়ীর 'পারবে না এদের সঙ্গে'।

তারপর এঁরা নামালেন শ্রীবটুক রচিত একটি রূপক নাটক 'চাঁদ বণিকের পালা', আর বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'জলছবি'। ১৯৭২-এ এসে এঁরা একটি বিস্ময়কর প্রযোজনা করলেন রবীন্দ্রনাথের "সে"। নাট্যরূপ অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সে নাটক সম্পর্কে চতুরঙ্গের ষোল বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে স্যুভেনিরে যা লেখা ছিল তা এখানে ছেপে দেওয়া হল।

"আমি আছি আমাকে নিয়ে।

আমার সঙ্গে আছে আমার জটিল বর্তমান; এই বর্তমানকে চিন্তায় ধ'রে রাখার মত আমার যে বুদ্ধির ধার, সেই ধারের অহংকারও রয়েছে আমার সঙ্গে।

আরও আছে। অন্যের থেকে আমি অনেক উঁচুতে, বুদ্ধিতে আমি অনেক উজ্জ্বল। কবি আমি, আমার কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে কাব্যের পালিশ। ন্যায়বোধের জন্য, রুচিবোধের জন্য আমার অহঙ্কার আছে—রূপবোধের জন্য আমি গর্বিত। এই সব নিয়ে বর্তমানের মধ্যে নিজের অহঙ্কার নিয়ে আমি বেশ আছি—নিজেকে কবি ভেবে, বুদ্ধিমান ভেবে, রসিক ভেবে দিব্য আছি আমি।

হঠাৎ মাঝে মাঝে, হঠাৎ হঠাৎ, 'সে' এসে আমার এই 'আমি'টাকে কেমন যেন তছনছ ক'রে দিয়ে যায়। জটিল সব আর্ট করতে করতে ব্যস্ত মন বিশ্রাম চায়। পুপেদিদি আর সুকুমারের মত ছোট্ট ছেলে-মেয়ে হ'য়ে যেতে চায়। চিত্তের নানা গলি-ঘুঁজির অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া সত্যিকারের সরল মানুষটিকে আস্ত বার ক'রে নিয়ে আসতে চায়। পারে কি ?

পারুক বা না পারুক—ঠিক ঐ সব সময়ে হঠাৎ হঠাৎ, সহর-সহরতলির বাইরে বৃষ্টি ভেজা গ্রাম ছাড়া এক রাঙামাটির পথ ধ'রে 'সে' এসে হাজির হয় চিত্তের এ 'আমি'র মুখোমুখি।

এর ওর তার বাড়ি মাড়িয়ে, কুচোচিংড়ির সঙ্গে আলুরদম ভাজা খেতে খেতে, নিমতলার ট্রাম হয় তো বা বহুবাজার দিয়ে ঘুরিয়ে, টিকেট ফাঁকি দিয়ে কবির মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়—করতে ইচ্ছে করে, অথচ, কে কি বলবে, এই ভয়ে করা হয় নি—এই সব খামখেয়ালপনার, এই সব উল্টো পাল্টা কাজের চূড়ান্ত—কবির 'সে'।

আশ্চর্য এই 'সে'। সব কিছুই যেন খামখেয়ালপনা—কোনো সময় নেই অসময় নেই যখন তখন বেশ ঘটা ক'রে ঘ'টে যায়। ছোট্ট ছোট্ট পুপেদিদি-সুকুমারদের মনের ইচ্ছাগুলোর মত। কোন নিয়ম নেই, কোন ব্যাকরণ মানে না। তার শুধু একটাই পায়, যখন তখন তার শুধু ক্ষিদে পায়। যখন তখন যেমন তেমন ঘটনাই তার কাছে গল্প। রসগোল্লা খাবার সময় শালপাতার ঠোঙা থেকে একফোঁটা রস যদি তার ময়লা কাপড়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে, তখন সেটাই একটা গল্প হয়ে যায়। যখন যা মনে করে তাই। কুম্ভমেলায় চান করবে, প্রয়াগে না গিয়ে চ'লে গেল কাঁচরাপাড়ার আঘাটায়—সেখানেই প্রয়াগের চানটা সেরে নিলে।

কুসংস্কারের টিকি বেড়েই চলেছে। তাতে কি! পোশাক আর পাগড়ির মধ্যে ঢেকে নিলেই হ'ল। যখন কিছুতেই ঢেকে রাখা যাবে না, তখন উধো-

পঞ্চু-গোবরার মত গেছোবাবার পিছু পিছু ছুটলেই হবে। গেছোবাবা ওপর থেকে একখানি গামছা ফেলে দেবেন। বাস্, সব ভাবনা মিটে যাবে—যা চাইবে তাই পাওয়া যাবে। কি সব বলছ? পুপেদিদি হাসবে, সুকুমার হাসবে, সবাই হাসবে। কেউ হাসবে না। হাসবে কেন? এখানে সবাই সব কিছু বিনা বিচারে বিশ্বাস করে যে। দেখনি—এত বড় বৈজ্ঞানিক—জামার হাতার তলায় লুকনো থাকে অতবড় মাদুলি। আর পুপেদিদি, সুকুমার! তারা হাসবে কেন? তারা তো গেছোবাবার সন্ধানে লোক পাঠাবে।

কবির 'সে' আর 'আমি'—এই দুজনের খামখেয়ালপনায় পুপেদিদির কাদা দিয়ে ময়দা দিয়ে গড়া পঞ্চপুতুল হয় তো জ্যান্ত হয় না, কিন্তু সার্কাস দেখার পর পুপেদিদির মনের ভেতরকার সার্কাসের বাঘটা 'কঙ্কনলুব্ধ পান্থ কথা'র হঠাৎ গোঁফ কামাতে হাজির হয়। হবে না কেন? সবারই তো মনের ইচ্ছে—কবির, 'সে'র, ঐ বাঘটার—যেন পুপেদিদির মনে ধরে। মনে ধরাবার জন্যে কাণ্ডগুলোও যেন সব উদ্ভট হয়ে যায়। মোহনবাগানের গোলকিপার স্মৃতিরত্ন-মশায়ের গোলের পর গোল খাওয়ার পরেও ক্ষিধে পেয়ে যায়। তিনি মনুমেণ্ট চাটতে থাকেন, 'সে' তার চেহারা হারিয়ে ফেলে—'দি ষ্টেট্‌সম্যান' লাফাতে লাফাতে এসে সব টুকে নিয়ে যায়। কিন্তু এত ক'রেও কিছু হয় কি? বুদ্ধিটা যাবে কোথায়? আসল বুদ্ধিটা নয়—যে বুদ্ধির বড়াই ক'রি—সেটা। সেই বুদ্ধিটা প্যাঁচে প্যাঁচে জড়িয়ে সব কিছুকেই যেন কিরকম প্যাঁচাও ক'রে তোলে—এমন কি 'সে'র বিয়ে করতে যাওয়াটাকে পর্যন্ত। আর অত করতে গেলে কি পুপে-সুকুমার ব'সে থাকে। তারাও তো বড় হ'য়ে উঠেছে। সুকুমার হয় তো বিদেশে চন্দ্রলোক যাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। আর পুপে হয় তো অপেক্ষায়—কার? হয় তো বা—থাক সে কথা। কবিও তো ততক্ষণে বুদ্ধির প্যাঁচে 'সে'কে বিষণ্ণ ক'রে তুলেছেন। রাঙামাটির পথ ধ'রে আসা 'সে' তো তখন অন্য সুর অন্য গান।"

এঁরা বিভিন্ন নাটক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় অভিনয় করেছেন। যেমন মালদহ, মুরশিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর ও বীরভূম, বাংলার বাইরে-বম্বে, বেনারস, জব্বলপুর, কানপুর। এছাড়া আর একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা বলা যায় বোমবাইয়ে মারাঠি ও বাংলা নাট্যোৎসবের আয়োজন করা ১৯৬৯ সালে মে মাসে। এই উৎসবটিকে বোম্বাইয়ের একটি স্মরণীয় নাট্যউৎসব বলা যায়। এঁদের দলে বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেছেন, বরুণ দাসগুপ্ত,

মিহির চ্যাটার্জী, সুজন সেনগুপ্ত, অরুণ সেনগুপ্ত; সুবিমল মুখার্জি, অর্ধেন্দু সেনগুপ্ত, সলিল কুমার সেন, রনজিৎ সাঁতরা, বরুণ ব্যানার্জী, অমল মুখার্জী, অনিমেষ চক্রবর্তী, •তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, মনীশ দাসগুপ্ত, দেবাশিস দাসগুপ্ত, সঙ্গিতা মুখার্জী, নীলা শর্মা, সৌমিতা চৌধুরী। নির্দ্দেশনায় বরুণ দাসগুপ্ত।

নটরাজ কলা কেন্দ্র

১৯৫৮ সাল। প্রগতিশীল চিন্তায় উদ্বুদ্ধ কয়েকজন যুবক গ্রাম বাংলার দিকে তাকিয়ে গণ সংস্কৃতিকে প্রচারের ব্রত নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন। সংস্থার নাম নটরাজ কলা কেন্দ্র। এঁদের প্রথম পরীক্ষামূলক নাটক বীরেন চক্রবর্তীর 'ঘটনা'। নাট্যকার আয়োজিত পরীক্ষামূলক নাটকের প্রদর্শনী অনুষ্ঠান হল বঙ্গীয় নাট্যসংসদের মঞ্চে। সেই অনুষ্ঠানে ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী প্রমুখেরা সেই সময়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন এই নাটকটি বাংলায় প্রথম এ্যাবসার্ট একাংক।

এই নাটকের মূল তত্ব বলা যায় চরৈবেতি অর্থাৎ এগিয়ে চলার কথাকে নাট্যকার কয়েকটি প্রতীকধর্মী চরিত্রের মাধ্যমে নাটকীয় দ্বন্দ সৃষ্টি করে প্রকাশ করেছেন। চরিত্রের নামকরণের মধ্যেও সে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যেমন ঘটনা, সংঘাত, সাধারণ চিন্তা ইত্যাদি।

দ্বন্দাত্মক বস্তুবাদকে ভারতীয় দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতেই নাটিকাটিকে দাঁড় করানো হয়েছে।

এরপর নীহার দত্ত রচিত 'বিভ্রাট' নাটকটি বীরেন চক্রবর্তীর পরিচালনায় অভিনয় হয়। এই নাটকটি চিকিৎসা সংকটের ব্যঙ্গ কৌতুক, হাসির মাধ্যমে এতে কিছু বলার চেষ্টা করা হয়েছ।

এরপর এঁদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা বীরেন চক্রবর্তীর 'পুষি' নাটিকা। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব উপলক্ষে যুব সঙ্ঘের 'বিভিন্ন এলাকার নাট্য প্রতিযোগিতায় নাট্যকার বীরেন চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ সম্মান পান। সেই পুষি নাটিকাই ১৯৬০ সালে মহারাষ্ট্র নিবাস হলে এঁরা প্রথম অভিনয় করেন।

বিভিন্ন সময়ে এই সংস্থায় অভিনয় করেছেন সদানন্দ পালিত, উমা পালিত, অমিয় রায় চৌধুরী, বীরেন চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ সরকার, পাঁচুগোপাল গুঁই, ছায়া মুখোপাধ্যায়, সুদেব মুখোপাধ্যায়, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়।

নাট্য আন্দোলনে থিয়েটার ইউনিট

নাট্য আন্দোলন—বাংলা যার পথিকৃত সারা ভারতবর্ষে তাই আজ পরিব্যাপ্ত। এক দশকের কিছু আগে ১৯৫৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী এই নাট্য আন্দোলনে "থিয়েটার ইউনিট" একটি নতুন সংযোজন—আর জন্মের পর থেকেই শুরু হলো জাতির জীবনের পঙ্কিল সমস্যাকে নাটকাকারে রূপায়িত করা ও দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করা মঞ্চের মাধ্যমে।

আজকের সমাজ জীবনে অভিনেতার দায়িত্ব বড় কম নয়। অভিনেতাকে হতে হবে সমাজ সচেতন। তাই রাজনীতি এড়িয়ে যেতে অভিনেতা অপারগ। তবুও 'থিয়েটার ইউনিট', একটা গোষ্ঠী-সভ্যদের ব্যক্তিগত পরিচয়। স্বার্থ-সিদ্ধি সব বিলীন হয়ে আছে ঐ একটি নামের মধ্যে। যৎসামান্য পুঁজি ও অক্লান্ত অনুশীলন ও আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে চলেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা—এবং উন্নীত করা।

যদিও বেশ কিছু নাট্যামোদী জনসাধারণ এই নবনাট্য আন্দোলনকে সার্থকতার পথে প্রবাহিত করতে শরিক হতে এগিয়ে এসেছেন—তবুও পেশাদার নাট্য সংস্থাকে দীর্ঘ উপেক্ষা ও অবজ্ঞার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে হয় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য—এবং 'থিয়েটার ইউনিট'ও এর অংশীদার।

আজ অবধি 'থিয়েটার ইউনিট', যে সমস্ত নাটক মঞ্চস্থ করেছেন তার মধ্যে আছে কালজয়ী ক্লাসিক "মৃচ্ছকটিক"—প্রায় দু'হাজার বছর আগের লেখা নাটকের চরিত্রের মুখে আজকের মানুষের দুঃখ বেদনা—আবার ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত বাংলার মানুষ ও মাটির কথা-কাহিনী "জন্মভূমি" Since Laughter is a privilege granted to man alone—তাই এঁরা পরিবেশন করেছেন দেশ বিদেশের "কমেডি" নাটক। ইতিহাসের ঘটনাবলী আধুনিক সমাজ জীবনের নিরীক্ষে মূল্যায়ণের প্রচেষ্টায় "তুঘলক"। এঁদের প্রধান উদ্যোক্তা বলা যায় শেখর চট্টোপাধ্যায়, সাধনা রায় চৌধুরী। শেখরবাবু আগে ছিলেন লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপে। সাধনাদি ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে।

বিভিন্ন সময়ে প্রযোজিত নাটকের তালিকা :—"মৃচ্ছকটিক"—শূদ্রকের সংস্কৃত ক্লাসিক-এর অনুবাদ। "কৃষ্ণচূড়া"—'সমরসেট মম' অবলম্বনে সামাজিক সমস্যামূলক। "চারদেয়াল"—কাতায়েভ-এর রুশ নাটক অবলম্বনে সমস্যামূলক কমেডি। "কৃপণের ধন" ও "বিবাহ বিভ্রাট"—রসরাজ রচিত রঙ্গনাট্য।

"যোগাযোগ", "চিরকুমার সভা", "নৌকাডুবি", "শোধ-বোধ", "সূক্ষ্ম বিচার" (একাঙ্ক), "গুরুবাক্য", সবগুলোই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। "বিদুষী", পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত প্রহসন (মলেয়ার অবলম্বনে)। "গৃহদাহ"—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। "জুলিয়াস সীজার" (বাংলায়), "অলীকবাবু"—জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর। "জন্মগত" (একাঙ্ক), "প্রতিপক্ষ", "প্রতিবিধান", "ফরিয়াদ", "জন্মভূমি", "তুঘলক"—গিরীশ কারচাড-এর মূল রচনার বঙ্গানুবাদ শেখর চট্টোপাধ্যায়।

'৭২ সালে এঁরা সলিল চৌধুরী যিনি '৪৯ সালে সংকেত লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তারই লেখা "আপনি কে? আপনি কি করছেন? আপনি কি করতে চান" নাটক অভিনয় করলেন ২৬শে জুলাই রঙ্গনাতে। নাটকটি নতুনত্বের দাবি রাখে। থিয়েটার ইউনিট-এর সভ্য/সভ্যা তালিকা :—

সাধনা রায় চৌধুরী, নমিতা চৌধুরী, দীপিকা ভট্টাচার্য, অরুণ ঘোষ, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, কমল চক্রবর্তী, অজিত পোদ্দার, অলোক রায়, উত্তীয় দেব, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, গৌর ঘোষ, গৌর গোস্বামী, দীপেন রায়, দেবী চট্টোপাধ্যায়, নবেন্দু গুপ্ত, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রভাত রায় চৌধুরী, সুনীল রায়, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, সৌমেন চক্রবর্তী, বিভাস বোস, উৎপল রায়, বিভূতি দে, বাদলচন্দ্র মান্না, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ দাস, রঙ্গনাথ দে, সুজিত সরকার, গোপাল গাঙ্গুলী, প্রবীর বোস, কমল ঘোষ, প্রবীর দাস, অরুণ চক্রবর্তী, কমল দাস, সুবল রায়, মৃদুল সেনগুপ্ত, বাদল মান্না ও মন্ট ঘোষ।

নবনাট্যের শরিক ক্যালকাটা থিয়েটার

১৯৫৯ সাল। ১৫ই আগষ্ট 'নবান্নের' নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করলেন একটি দল। যার ফলে নবনাট্য আন্দোলনে আর একটি দলের আর্বিভাব হল 'ক্যালকাটা থিয়েটার'। রবিবার সকালে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' নাটক সেদিন সকালে দেখতে পেলাম। ক্যালকাটা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের

মধ্যে অন্যতম বিজন ভট্টাচার্য, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, জগদীশ চক্রবর্তী ও বারীন বসু।

গোত্রান্তর নাটকে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা অভিনয় করেছেন—বিজন ভট্টাচার্য, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন বসু, জ্যোৎস্না মৈত্র, দিব্যেন্দু ঘটক, জিতেন বসু, বিমান ভট্টাচার্য, অসিত দাস, বিধু মুখোপাধ্যায়, হীরেন চক্রবর্তী, অমলেন্দু পাত্র-নবীশ, শক্তি সেন, ফল্গু ঘটক, মুরারী সেন, নবারুণ ভট্টাচার্য, জগদীশ চক্রবর্তী, অনিল দাস, সলিল ভট্টাচার্য, অরুণ দাসগুপ্ত, অমল ভট্টাচার্য, অবনী রায়, অতনু দেব, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বেনু চট্টোপাধ্যায়, রণবীর দাসগুপ্ত, ঝুনু ব্যানার্জী, সাধন চট্টোপাধ্যায়, শৈলশেখর চট্টোপাধ্যায়, পরিমল রায় চৌধুরী, রেণু ঘোষ, মানসী দাসগুপ্তা, সীতা মুখার্জী, মণিকা চক্রবর্তী। আলোয় তাপস সেন, শিল্প নির্দেশনা খালেদ চৌধুরী, কারু শিল্প কৃষ্ণ রায়, যন্ত্র সংগীত সৌমেন ঘোষাল, মঞ্চাধ্যক্ষ জগদীশ চক্রবর্তী, ব্যবস্থাপনায় শৈলেন ঘোষ, গোকুল দে। ক্যালকাটা থিয়েটার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বাধীনতা দৈনিক বলেছেন :

"পশ্চিমবঙ্গে বহু নাট্য প্রতিষ্ঠান ; তার মধ্যে বিশিষ্ট এক নাট্য সংস্থার নাম ক্যালকাটা থিয়েটার। নাট্য আন্দোলনের জোয়ারে পশ্চিমবঙ্গে বহু নাটকের দলের জন্ম হয়েছে। কোন দলের কথা মানুষ মনে রেখেছে কোন দল স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। ক্যালকাটা থিয়েটার আপন বৈশিষ্ট্যে প্রগতিশীল নাটক প্রযোজনায় পশ্চিমবঙ্গের নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের দিক থেকে এই সংগঠনের অবদান উল্লেখযোগ্য।

১৯৫১ সাল ক্যালকাটা থিয়েটারের সূচনা 'মরাচাঁদ' (একাঙ্ক) ও কলঙ্ক'—এই দুটি নাটক নিয়ে তাঁরা দর্শকদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সংগঠনের বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে সেদিন ছিলেন বাংলার অবিস্মরণীয় অভিনেত্রী প্রভাদেবী, আর শোভা সেন, গীতা সোম (সেন)। আলোক সম্পাতে ছিলেন তাপস সেন। তারপরে এই সংস্থা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি গীতি নৃত্যনাট্য "জীয়ন কন্যা" অভিনয় করেন রঙমহল থিয়েটারে। নানা বাধা নানা অসুবিধা অতিক্রম করে "গোত্রান্তর", "মরাচাঁদ" (পূর্ণাঙ্গ), "ছায়াপথ" অভিনয় করেছেন। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে এঁদের অভিনীত নাটক 'মাস্টার মশাই'।

ক্যালকাটা থিয়েটারের নাটক আঙ্গিকে ও বক্তব্যে স্বতন্ত্র। এঁরা নিছক

শৌখীন নাটুকে দলও নয়, নাটকের রঙদার ব্যবসায়ীও নয়। নাটক এঁদের কাছে লোকশিক্ষার এক শক্তিশালী মাধ্যম। জীবন দর্শনের বলিষ্ঠবাণী দর্শকদের কাছে প্রকাশ করতে চান মানবিকতার মহৎ আদর্শে। তাই আদর্শ ও বক্তব্যকে ছোট করে পেশাদারী পথে বা চটকদার নাটুকে চাহিদার সাথে তাঁরা আপস করতে রাজী নয়। একারণে নাটক প্রযোজনায় এঁদের বিস্তার বাধা বিপত্তির মুখে পড়তে হয়। কিন্তু আদর্শনিষ্ঠার জন্য আজ নাট্য আন্দোলনে তাঁরা সগৌরবে বেঁচে আছেন।

এই সংস্থার প্রত্যেকটি নাটক রচনা করেন বিজন ভট্টাচার্য। অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও গণআন্দোলনের প্রভাব তাঁর নাটকে প্রতিফলিত, জনগণের চেতনা ও চিন্তাধারা এবং সমাজের পরিবর্তনের দিকগুলি তাঁর অত্যন্ত স্পষ্ট। বাংলার সংস্কৃতি আন্দোলনে বিজন ভট্টাচার্যকে প্রথম দেখা যায় ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক সঙ্ঘে। এই সময় তিনি রচনা করেন 'আগুন', 'জবান বন্দী' ও বিখ্যাত 'নবান্ন' নাটক। ১৯৭২-৪৩ সালে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের এই নাটক বাংলায় নাট্য আন্দোলন সৃষ্টি করে এবং নাট্য মঞ্চে বিরাট আলোড়ন ও পরিবর্তন সূচনা করে। গণনাট্য সঙ্ঘের সদস্যরূপে তিনি এই নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫০ সালে নাট্যচক্র নামে এক সংস্থার পক্ষে তিনি সর্বপ্রথম 'নীলদর্পণ'-এর নতুন করে নাট্যরূপ দেন এবং 'অবরোধ' নাটক রচনা করেন।

সমবায়ভিত্তিক নাট্য সংস্থা গঠনের ব্যাপারে তিনি অন্যতম অগ্রণী। ১৯৫০ সালের দিকে রঙমহল থিয়েটারে প্রযোজক পরিচালকরূপে সমবায়ভিত্তিক নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন প্রভাদেবী, কানু ব্যানার্জী ও উৎপল দত্ত প্রমুখ। কিন্তু থিয়েটার কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

নাটকের ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্য বহুমুখীন প্রতিভাবান। তিনি একাধারে নাটক রচয়িতা, পরিচালক, অভিনেতা। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাঁর জ্ঞান অসাধারণ। গীতিকার হিসাবে এবং সুরদানের ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'জীয়ন কন্যা' এবং 'মরাচাঁদে' তাঁর গীত রচনা ও লোক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সুরজ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা' বিস্ময়কর। ক্যালকাটা থিয়েটারের আর একটা বৈশিষ্ট্য লোকসঙ্গীত অনুশীলন কেন্দ্ররূপে। বাংলার প্রাচীন লোক-সঙ্গীত ধারা। এই কেন্দ্রে তিনি নিজেই শিক্ষা দেন।

ক্যালকাটা থিয়েটারের আগামী নাটক 'আজ বসন্ত' এবং 'কলঙ্ক'। শেষোক্ত

নাটকটি বীরভূম বাঁকুড়ার পটভূমিতে কৃষি সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। এই নাটকটি অভিনয়ের জন্য তাঁরা সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

বিজনবাবু ও তাঁর সহকর্মীদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁদের প্রধান সমস্যা কি? জবাবে তাঁরা বলছেন: মঞ্চের অভাব তো আছেই, তার উপর শিল্পীর অভাব। নাটকে অভিনয় ও গানের জন্য ছেলেমেয়ে চাই, উৎসাহী ছেলেমেয়ে দরকার। ক্যালকাটা থিয়েটারের ঠিকানা ৩২।এ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০।"

লোকরঙ্গ

১৯৬৯ সাল। একাংক নাটক দিয়ে লোকরঙ্গের পরিচয় ঘটল নতুন করে ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্র ভারতী আয়োজিত সারা বাংলা একাঙ্ক নাট্য প্রতি-যোগিতায়। এঁরা প্রথম পুরস্কার পেলেন রতন ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে', মঞ্চস্থ করে। আজকের আমরা আগামী কালের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কি বলব? কি কৈফিয়ত দেব? তাদের কাছে কি আমরা আজকের কর্মের ফল যা দাঁড়াবে, তার হিসাব দিতে গিয়ে হাজার মিনতি জানিয়ে কোন ক্ষমা পাব? এই একটি প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে আছে পিতামহদের উদ্দেশ্যের মূল তত্ত্ব।

লোকরঙ্গ শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা অভিনয় করেন: জয়ন্ত চৌধুরী, অজিত দে, শম্ভু ভট্টাচার্য, চিত্ত মুখার্জী, প্রশান্ত চৌধুরী, সুশান্ত চৌধুরী, অনন্ত লাল ভদ্র, অখিল মজুমদার, শিবু চ্যাটার্জী। পরিচালনায় অনন্ত লাল ভদ্র। আলো ইন্দ্রজিত রায়। আবহ-সংগীত ও ব্যবস্থাপনায়-লোকরঙ্গ শিল্পীবৃন্দ। লোকরঙ্গ রতন কুমার ঘোষের 'শেষ বিচার' অভিনয় করেন।

অহীন্দ্রম্

অহীন্দ্রম্ নাট্য সংস্থা নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নামানুসারে তাঁরই প্রেরণায় ১৯৫৯ সালের ১৬ই আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় বেহালায় ১৪ নং সৌরীন রায় রোডে।

ঐ বছর এই সংস্থার প্রথম নাটক অভিনীত হয় "সার্কাসের দেশে"। রচনা ও নির্দেশনা প্রযোজক-প্রতিষ্ঠাতা অমর গাঙ্গুলীর।

স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহে ঐ নাটক আরও দুবার ওখানেই অভিনীত হয়।

১৯৬০ এর ২৩শে জানুয়ারী রামমোহন লাইব্রেরী হলে ঐ নাটক চতুর্থবার অভিনীত হয়, দর্শকাসনে ছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, শচীন সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যবিশারদগণ।

এরপর ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে—প্রায়শ্চিত্ত ১ বার, সংসার ২ বার, নোঙর ২ বার অভিনীত হয়। রচনা ও নির্দেশনা অমর গাঙ্গুলীর।

"নোঙর" মিনার্ভায় বঙ্গ নাট্য সম্মেলনেও অভিনীত হয়।

১৯৬২—রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে—"অচলায়তন", "মুক্তধারা" ও "শোধবোধ" অভিনীত হয়।

এই সময় নটসূর্যের প্রেরণায় একটা ছোট মুক্তাঙ্গন মঞ্চ গঠনের চেষ্টা হয় এবং ১৯৬২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর বেহালায় রায় বাহাদুর রোডে "অহীন্দ্রমঞ্চ" স্থাপিত হয়। উদ্বোধন করেন ডক্টর কালিদাস নাগ।

উদ্বোধন হয় অমর গাঙ্গুলীর ত্রিমাত্রিক প্রথায় রচিত নাট্যজগতের নতুন নাটক "অমিয়পন্থা" দ্বারা।

ঐ নাটক প্রতি রবিবার টিকিট বিক্রী করে ১৯৬৩'র জুন মাস পর্য্যন্ত চলে। বিশ্বরূপার কর্ণধার রাসবিহারী সরকার মহাশয় ঐ নাটক দেখেন ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে এবং নটসূর্যের সামনে বলেন যে তিনি ঐ পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন। সম্ভবতঃ তাঁর থিয়েটারস্কোপ-প্রথায় 'লগ্ন' নাটক তারই ফল। ত্রিপলের ছাউনি, দর্মায় বেড়া দেওয়া অহীন্দ্রমঞ্চ আস্তে আস্তে টিনের ছাউনিতে এবং পরে টিনের হলে পরিণত হল, ৩৫০ আসনও ছিল। লম্বায় এই মঞ্চ ছিল ৩৯' চওড়া ২০' ফুট। ১৯৬২ থেকে ১৯৭০ অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এই মঞ্চে অহীন্দ্রম্-এর সদস্যরা অভিনয় করেছেন—প্রতি রবিবার এবং কখনও প্রতি শনি/রবিবার—"অমিয়পন্থা", "আদিকাণ্ড", "ধর্মতলা", "নিরুদ্দেশ", "সাজাহান", "কালিন্দী", "দৃষ্টিপাত", "ওর থাকে ওধারে", "মুক্তধারা", "ক্ষুধিত পাষাণ", অমর গাঙ্গুলীর "হিটলারের মৃত্যু", "আমি যদি রাজা হতাম", "লীলাবসান", "সত্য মারা গেছে", "পেলারামের স্বদেশিতা", "সিলাকান্থ"।

এই মঞ্চে প্রতি বছর সারা বাংলা একাংক নাটক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতি-যোগিতা হতো। প্রতি বছর গড়ে ৬০টি দল বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতো। এই মঞ্চে মোট ৮ বছরে ২২ হাজার টাকা লোকসান দিয়ে প্রযোজক এই মঞ্চ তুলে দিতে বাধ্য হলেন এবং স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহের অভাবও তুলে দেওয়ার আর একটি কারণ।

২৫শে ডিসেম্বর ৬২ এই মঞ্চ উদ্বোধন হয়, নিয়মিত অভিনয় হয়ে আসছে প্রতি রবিবার।

প্রয়াসী

১৯৬৯-এ—নভেম্বরের এক মনোরম সন্ধ্যায় এগিয়ে এল বাংলার নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে 'প্রয়াসী' নাট্যগোষ্ঠী। নাট্যচর্চা, নাট্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যার একমাত্র উদ্দেশ্য।

সহকর্মীসুলভ সৌভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ এই সংস্থার সদস্যদের ঐক্যের বিশেষ তাৎপর্য্য হ'ল এই যে, ঐক্য মৈত্রকে সৃজনধর্মী করেছে। এরা চান কিছু বলতে—কিছু করতে। তাই সংস্থার সভ্যপদ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এরা নিয়ম নির্দ্ধারণ করলো যে, যারা প্রকৃতই নাটক তথা নাট্য শিল্পকে জানতে চায়, শিখতে চায় এবং সর্বোপরি একটি নাট্য সংস্থার উন্নতিকল্পে, সার্বিক পর্য্যায়ে ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করতে চায়, শুধুমাত্র তারাই প্রয়াসীর সভ্যপদ পাওয়ার উপযোগী।

নাট্য আন্দোলনের পুরোধা শ্রদ্ধেয় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য্যের 'ছায়াপথ' নাট্যকার তপন কুমার ঘোষালের 'ওরা কি হারালো' এই নাট্যদ্বয়ের অভিনয়ের মাধ্যমে যাত্রা শুরু। যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ২১শে মার্চ ১৯৭০ সালে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে, নাট্যোন্নয়ন সহযোগিতা কর্মসূচীতে। সর্বপ্রথম প্রয়াসে, সফলতার চরম শীর্ষে উন্নীত হতে না পারলেও কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েও, এরা হারায়নি এদের উত্তমকে, ভোলেনি এদের কর্ত্তব্যকে। মননশীল রুচিবান দর্শকের তথা নাট্য সমালোচকের সমালোচনাকে পাথেয় করে, নাট্য-শিল্পের বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে জীবনধর্মী নাট্য প্রযোজনায় অগ্রণী হয়েছেন এরা। অবশ্য অর্থানুকূল্যের অভাবই ছিল এদের এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রধান অন্তরায়। কিন্তু প্রয়াসী শুধুমাত্র যে কোন প্রতিকূল অবস্থাকে দুর্জয় শক্তিতে

মোকাবিলা করতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয়, এর থেকে উত্তরণের লক্ষ্যেও এরা স্থির ও সুনিশ্চিত। এবং একথা প্রমাণিত হয়েছিল এদের তৎপরবর্তী নাট্য প্রযোজনায় ১৯৭০-এর ১৫ই আগষ্ট, প্রতাপ চন্দ্র মেমোরিয়াল হলে। অভিনয় করেছিলেন নাট্যকার তপন কুমার ঘোষালেরই লেখা একাংকত্রয়ী 'অ্যাসাইলাম', 'গুরুদক্ষিণা' ও 'নতুন জোয়ার'। 'মুক্ত অঙ্গনে' বর্তমানের নাট্যচর্চার পরীক্ষা নিরীক্ষার তীর্থক্ষেত্রে, বিদগ্ধ দর্শক সমূহের উপস্থিতিতে। দিনটি ছিল ১৯৭১-এর ১৪ই জানুয়ারী।

শুধুমাত্র নাট্য প্রযোজনাই লক্ষ্য নয়। এই সংস্থার কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ নাটক পঠন, নাট্যকলা বিশ্লেষণ, নাট্যশিল্পের অঙ্গীভূত বিভিন্ন উন্নত-মানের নাট্য প্রযোজনা দেখা ও সংস্থার সভ্য ও সভ্যাদের মধ্যে তার সম্যক পর্য্যালোচনা করা, নতুন কিছু জানা ও শেখাই যার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ হেন শিক্ষণ পদ্ধতিকে কার্য্যকরী করতে গিয়ে স্বভাবতই নিয়মিত নাট্যাভিনয় সম্ভব নয়।

'প্রয়াসীর' নাট্য প্রযোজনা ও অগ্রগতি এই পর্য্যায়ে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন,—সুদূর প্রবাসে বিলাসপুর বাঙালী সমিতি আয়োজিত একাংক নাট্য প্রতিযোগিতায় দলগত নৈপুণ্যের পুরস্কার। নিঃসন্দেহে এ এক আনন্দ সংবাদ। কিন্তু তবুও বলি যে, কোন পুরস্কারের মোহ এদের নেই, আছে সাফল্যের স্বীকৃতি আদায়ের সার্বিক প্রচেষ্টা।

সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমস্ত রকম অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায় এরা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রয়াসীর শিল্পীবৃন্দ আবার মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ে উপহার দিয়েছেন তপন কুমার ঘোষালের পূর্ণাঙ্গ নাটক "বাঁচা একটি প্রশ্ন।" শিল্পীদের মধ্যে আছেন—চন্দন লাহিড়ী, গনেন্দ্রনাথ রায়, হারাধন ভট্টাচার্য্য, প্রাণিনাথ পাল, চন্দন বোস, সত্যব্রত গাঙ্গুলী, গৌতম সিনহা, দিলীপ দাস, নন্দন বোস, পীযুষ বোস, শ্রীমতী কনিকা রায় ও অন্যান্য আরও অনেকে।

নাট্য আন্দোলনে সংবাদপত্র

১৯৬০ সাল, শ্রীপ্রবোধবন্ধু অধিকারীর (সূত্রধার) সঙ্গে দ্বিজেন্দ্র ভৌমিকের একটি সাক্ষাৎকার।

অপেশাদার নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯৬০ সাল নানা দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আনন্দবাজার পত্রিকার অপেশাদার নাট্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে আনন্দলোক বিভাগের প্রবর্তন। সম্পূর্ণ একটি পৃষ্ঠা সপ্তাহে একদিন (বৃহস্পতিবার অধুনা শনিবার) ছেড়ে দেওয়া হ'ত অপেশাদার নাটক ও সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহ দানের জন্য। এ সম্পর্কে আনন্দলোকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক প্রবোধবন্ধু অধিকারী (সূত্রধার) মহাশয়ের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছিলাম। এই প্রশ্ন ও উত্তরগুলির মধ্য দিয়ে তৎকালীন নাট্য জগতের চেহারা অনেকখানি প্রতিফলিত। প্রশ্নোত্তরগুলি নিচে দেওয়া হল :—

প্রশ্ন :—আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দলোক' বিভাগটি কোন্ সালের কত তারিখে শুরু হয় ?

উত্তর :—১৯৬০ সালের ৩০শে জুন, প্রথম আনন্দলোক প্রকাশিত হয়।

প্রঃ—এই বিভাগটির পরিকল্পনা কে করেন ?

উঃ—সন্তোষকুমার ঘোষ, উনি তখন আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক ছিলেন।

প্রঃ—এই বিভাগটি প্রকাশের পেছনে আনন্দবাজার পত্রিকার কোন্ উদ্দেশ্য কাজ করেছিল ?

উঃ—১৯৫৭ সালের পর থেকে এদেশে নতুন নাট্যদলের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছিল। ১৯৬১ সালে আমি ১৯৬০-এর এক সমীক্ষা করে জেনেছিলাম তখন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নাট্যদলের সংখ্যা ছিল প্রায় এগারো হাজারের মতো। অতএব এই নাট্যচর্চায় উৎসাহ দানের জন্যেই মূলতঃ এই বিভাগটির জন্ম।

প্রঃ—এই বিভাগটির সম্পাদনার দায়িত্বভার আপনার ওপর পড়লে, আপনি কীভাবে এটি গ্রহণ করেছিলেন এবং কীভাবে কাজ করবেন ঠিক করেছিলেন ?

উঃ—গল্প এবং উপন্যাসের জগত থেকে এসে আমি তখন হঠাৎ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে পাওয়ায় খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। তবে একটা

লক্ষ্য মোটামুটি আমার ছিল, তাহ'লো এই যে আমাদের সাহিত্যের অবহেলিত এই শাখাটির উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসার এবং নাট্য শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা আছে সে সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করা। প্রথম দিকে এ ব্যাপারে আমি আমার সহকর্মী শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়ের সক্রিয় সাহায্য পেয়েছি। পরবর্তীকালে এই বিভাগটির অসম্ভব জনপ্রিয়তা দেখে আমার মনে হয়েছে আমি যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি।

প্রঃ—আনন্দলোকে প্রথম কোন্ নাটকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়? ওই নাটকটি কার রচনা, কে প্রযোজনা করেন? আপনি কি সমালোচনার ক্ষেত্রে সেই পুরনো গল্প বলা এবং অভিনয় প্রযোজনা সম্পর্কে দু'চার কথা বলার পক্ষে ছিলেন, নাকি এ সম্পর্কে আপনি অন্যরকম কিছু ভেবেছিলেন?

উঃ—'আনন্দলোক'-এ প্রথম যে নাটকটির সমালোচনা প্রকাশিত হয় তার নাম 'মরুঝঞ্ঝা'। প্রযোজক পাভলভ ইনস্টিটিউট। নাট্যকার ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথাগত নাট্য সমালোচনার আমি বিরোধী ছিলাম। কারণ একজন নাট্যকার যখন একটি নাটক রচনা করেন তাঁর যে বলার কথা, তথা বক্তব্য সে সম্বন্ধে পাঠকের মনে কোনো চিত্রকলা প্রথাগত সমালোচনা সৃষ্টি করেনা—তেমনি করেনা একজন নাট্য নির্দেশকের সৃষ্টি সম্পর্কেও। আমি দুটোকেই 'ক্রিয়েশন' বলি। যেমন বলি চরিত্র চিত্রণও এক ধরণের সৃষ্টি! সুতরাং আমি সমালোচনা সেইখান থেকে শুরু করেছিলাম যেখানে নাট্যকার তাঁর সমগ্র রচনার মধ্য দিয়ে যে কথাটি বলতে চেয়েছেন, নাট্য নির্দেশক তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে তাকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন ইত্যাদি। আনন্দলোক-এর প্রথম সমালোচনা থেকেই এই বিশেষ ধারাটি প্রচলিত।

প্রঃ—ওই সময়ে এই বিভাগটিকে সমৃদ্ধ করতে আপনি কোন্ কোন্ নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীর সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

উঃ—এই বিভাগটি সমৃদ্ধ করতে প্রথম আমরা উৎপল দত্তের একটি রচনা 'নিশীথ চিন্তা' প্রকাশ করি। পরে বিভিন্ন নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করেছি। তাঁদের মধ্যে কয়েকটি নাম: মন্মথ রায়, শোভা সেন, উৎপল দত্ত, কৃষ্ণ কুণ্ডু, সবিতাব্রত দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল সরকার, কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী, সুনীল দত্ত, শ্যামল ঘোষ, বরুণ দাশগুপ্ত, জোছন দস্তিদার, শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য, দীপক রায়, অসীম চক্রবর্তী, দেবব্রত সুর চৌধুরী, শিশির ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতীম চৌধুরী, অভয় সর্বাধিকারী,



সুনীল দত্তের বাড়ীতে একটী অনুষ্ঠানে : (দাঁড়িয়ে বাঁপাশ থেকে) জোছন দস্তিদার, হাবু লাহিড়ী, দ্বিজেন ঘোষ, ঋত্বিক ঘটক, (?) সুনীত মুখার্জী, কিরণ মৈত্র, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, বীরু মুখার্জী, বিভূতি মুখার্জী, উমানাথ ভট্টাচার্য, মমতাজ আমেদ খাঁ,



উপরে : 'নান্দীকার'-এর শিল্পীদের একাংশ। নীচে : 'শিল্পীমন'-এর শিল্পীবৃন্দ।

মনোজ মিত্র এবং আরো অনেকে। তৎকালীন নাটক ও নাট্যশিল্পের সমস্যা সম্পর্কে এঁদের কারো কারো সাক্ষাৎকারও সেই সময় 'আনন্দলোক' এ প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রঃ—ওই সময়ে নাট্যজগতে বিশেষ উল্লেখ্য ঘটনার কথা বলুন।

উঃ—ওই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি নাট্য সংগঠনীর জন্ম। নাম বঙ্গীয়-নাট্য সংগঠনী। এই সংস্থার সঙ্গে আগে উল্লিখিত নামের অধিকাংশ শিল্পীই জড়িত ছিলেন! এই সংস্থা মিনার্ভা থিয়েটারে ছোট নাটকের দলগুলি নিয়ে তিনমাস ব্যাপী এক নাট্যোৎসব করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভিনীত হয় সুনীল দত্ত অনূদিত ভাসের 'কর্ণভারম্।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ডঃ অজিত ঘোষ, ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, নাট্যকার মন্মথ রায় প্রভৃতি। পরে বিভিন্ন সময়ে এঁরা বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে নাট্য উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য নাট্যকার ও নাট্য শিল্পী সম্মেলন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাট্য পত্রিকা গন্ধর্ব-এর প্রকাশ, মিনার্ভা মঞ্চে রূপকার ও গন্ধর্ব-এর নাট্যোৎসব ও নান্দীকারের জন্ম ইত্যাদি।

প্রঃ—নাট্য আন্দোলন বলতে আপনারা কি কেবল কলকাতা ও শহরতলীর কথাই ভাবেন?

উঃ—না। আমরা পশ্চিমবঙ্গ, বহির্বঙ্গ এবং ভারতের বাইরেও বাংলা নাটকের অভিনয় সংবাদ প্রকাশ করেছি এবং করছি।

প্রঃ—বিভিন্ন সময়ে নাটক ও নাট্যশিল্পের ওপর যে সব আঘাত এসেছে সে সময় আপনাদের ভূমিকা কী ছিল?

উঃ—নাটক ও নাট্যশিল্পের ওপর যখনই কোন আঘাত এসেছে বা নাট্য জগতে কোন বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে 'আনন্দ লোক' তৎক্ষণাৎ তাতে সাড়া দিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে নাটকের নানা রকম সমস্যা আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যান্য পাতাতেও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে কভার করা হয়েছে। নাটকের সঠিক উন্নতির জন্যে যখনই কোন চেষ্টা হয়েছে তখনই আনন্দলোক তাতে সমর্থন জানিয়েছে সহযোগিতা করেছে। অতীতেও যেমন সহযোগিতা করেছে, বর্তমানেও করে চলেছে এবং ঠিক একইভাবে সে ভবিষ্যৎ-এও নাট্য উন্নয়নে সহযোগিতা করে যাবে।

গণনাট্য থেকে নবনাট্য আন্দোলনে/নান্দীকার

১৯৬০ সাল। বৎসরের মাঝামাঝি এসে একটি নতুন গোষ্ঠীর নাম শোনা গেল। সত্যি কথা বলতে কি তখন এতোটা গুরুত্ব দিইনি। কারণ অনেক নামইতো শোনা যায়, মুছে যেতেও বেশি সময় লাগেনা। কিন্তু এই গোষ্ঠী একটু একটু করে গড়ে উঠল, ভাল ভাবেই গড়ে উঠল। আস্তে আস্তে জানা গেল এই গোষ্ঠীর নায়ক আজকের প্রতিভাবান নট ও নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। যাকে দেখেছিলাম একদিন গণনাট্য সঙ্ঘের মঞ্চে তারই লেখা 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ও 'সেতুবন্ধন' অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। সেই গণনাট্যের শিল্পী অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়ের কঠিন পরিশ্রমের ফলেই একটি গ্রুপ থিয়েটারের সূচনা হল যার নাম নান্দীকার। আজ যে নান্দীকারের নাম ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে সেই নান্দীকারের জন্ম ১৯শে জুন ১৯৬০ সালে। জন্ম থেকে হিসাব করলে দেখা যায় বয়সে সে আজ সবে কিশোর। যৌবনে পা না দিয়েও আজ সে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' দিয়ে যাদের সংগঠনের মোড় ঘুরল, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিন পয়সার পালা'র মাধ্যমে জনমানসের মনের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতেও তাদের বেশী সময় লাগল না। সত্যি এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল কেমন করে?

সুস্থ নাট্য শিল্প-কর্মকে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগের মাধ্যমেই এতো অল্প সময়ে তাদের পরিচিতি হয়তো একথা বলা যায়। এই গোষ্ঠীর প্রতিটি শিল্পীর সঙ্গে আমি আলাপ করে দেখেছি, নাটককে যেমন তারা ভালবাসেন, নান্দীকারকে ততোধিক অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন। তারা একমাত্র নিষ্ঠাকে সম্বল করে, দুর্যোগকে সাথী করে, ঝড়কে উপেক্ষা করে দিনে দিনে এগিয়েই চলেছেন। কখনো বাধা আসছে থমকে দাঁড়ালেন, আবার এগিয়ে গেলেন। তাই নান্দীকারকে নাট্য আন্দোলনের এতো উচ্চ শিখরে দেখতে পাই আজ। এই প্রসঙ্গে নান্দীকারের ১৯৭০ সালে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করলাম। এতে ওদের বিগত দশ বছরের কর্ম্মকাণ্ডের একটা হিসাব পাওয়া যাবে।

অজিতেশবাবুর উদ্যোগে ছাত্র অবস্থাতেই একাধিক নাটকের অভিনয়ে অংশ

নিই। ১৯৬০ সালের ২৯শে জুন 'নান্দীকার' তৈরী হয়। 'নান্দীকার' নাম অবশ্য ঠিক হয় আরও কয়েকটি সভার পর। বন্ধুবর দীপেন সেনগুপ্তর দেওয়া 'নান্দীকার' নামটিই শেষ পর্যন্ত সকলের কাছে গ্রাহ্য হ'লো।

ভালো নাটক ভালো ক'রে করবো—এই ছিল প্রারম্ভিক চিন্তা। দেশ কালের গণ্ডীতে নাটক আটকে থাকবে না, শিল্পসম্মত নাটক আমাদের ক্ষমতায় কুলোলে তা প্রযোজনা করতে দ্বিধা করবো না—এই ছিলো সিদ্ধান্ত। নাটক খুঁজতে লাগলাম সকলে। অনেক নাটক পড়া হ'লো। ঠিক হ'লো ইব্‌সেনের 'ঘোষ্ট্‌স'-এর রূপান্তর হবে আমাদের প্রথম প্রযোজনা। অজিতেশ বাবু আর দীপেন বাবু রূপান্তর-এর কাজ শেষ করলেন। নাম হ'লো 'বিদেহী'। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে আমাদের সংগী মথুরানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক বন্ধুর বাড়ীতে মহলা চলে। ১১ই সেপ্টেম্বর '৬০ রবিবার সকালে রঙমহলে প্রযোজিত হ'লো 'বিদেহী'। অভিনয় করেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন সেনগুপ্ত, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায় ও মায়া ঘোষ।

এরপরে দলের প্রথম সম্মেলন হ'লো বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী হলে। সম্মেলনে আবৃত্তি ছাড়া আমরা চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'দাও ফিরে সে অরণ্য' ও চেখভের 'দ্য প্রোপোজাল' অনুসরণে 'প্রস্তাব'—এই দুটি একাঙ্ক মঞ্চস্থ করি। অর্থের সমস্যা এতোদিনে বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। স্থির করা হ'লো পরিচিত জনের কাছ থেকে ছ' মাস অন্তর পাঁচ টাকা করে চাঁদা নেবো। এঁদের সংগে মৌখিক সর্ত ছিলো—আমাদের প্রতিটি নতুন প্রযোজনায় এঁদের আমন্ত্রণ করা হবে। নান্দীকারের প্রথম অনুগ্রাহক সদস্যের নাম—বৃন্দাবন বিহারী গোস্বামী। এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের কয়েকজন সদস্যকে ছাড়তে আমরা বাধ্য হয়েছি—আবার কেউ কেউ নতুন এসেছেনও। যাঁরা রইলেন তাঁদের নিয়ে নতুন নাটক তৈরীর চেষ্টা চলতে লাগলো। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ অজিতেশবাবুকে দিয়ে একটি নাটক লেখালেন "সেতুবন্ধন"। বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার অভিনয় হ'লো। এর পরে আমরা এই নাটকটিই প্রযোজনা করলাম ১৯৬১তে ফেব্রুয়ারী মাসের একটি শনিবারের দুপুরে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও নির্দেশিত এই নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন আনন্দবাজার পত্রিকা। অভিনয়ে ছিলেন অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণু রায়, শীতালি ঘোষ, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, জগত

বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও দীপক নন্দী। এ নাটকে আমাদের অনুরোধে আলোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন 'বহুরূপী'র কালীপ্রসাদ ঘোষ।

নাটক ভালো হ'লো—কিন্তু আর্থিক অবস্থা তখন চরমে। এ সময়ে আমরা আই. পি. টি.-এর সংগে যুক্ত হ'লাম। আই. পি. টি.-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা শ্রদ্ধাবান ছিলাম—তা'ছাড়া প্রমোদকর থেকে মুক্তির আশাও আমাদের আই. পি. টি.-এর সংগে যুক্ত হ'তে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। আই. পি. টি. এ-তে যোগ দিয়ে আমরা প্রথম ক'লকাতার বাইরে অভিনয় করতে যাই আসানসোলে—সেন র‍্যালে কোম্পানীর কর্মীদের আহ্বানে। 'সেতুবন্ধন' সেখানে নান্দীকারের সুনাম এনে দেয়। 'সেতুবন্ধনে'র তৃতীয় অভিনয় হয় এক বছর পরে—রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে—আই. পি. টি.-এর নাট্যোৎসবে।

১৯৬১ ছিলো রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর বছর। আমরা তৈরী করলাম 'চার অধ্যায়'। 'চার অধ্যায়'-এর মহলা হয়েছে বি. কে. পাল এভেন্যুতে ডক্টর সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর একতলায় মূলতঃ দুপুর বেলায়। 'চার অধ্যায়' নাটকে অভিনয় করেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, মহেশ সিংহ ও সুরঞ্জন রায় (পরে রাধারমন তপাদারও একটি চরিত্রে অভিনয় করেন)। চার অধ্যায়ের অভিনয় হয়েছিলো মোট আটটি—সবই বাইরের আমন্ত্রণে। মোটামুটি ঋণমুক্ত হয়েছিলাম এই সময়ে। এর ক'দিন পরে রবীন্দ্রনাথের 'বদনাম' গল্পটিও নাট্যরূপ দিয়ে অজিতেশবাবু নান্দীকারের সকলকে দিয়ে অভিনয় করান। একটিই অভিনয় হয়েছিলো—উল্টোডাঙ্গায়। চার অধ্যায়ের পর আমাদের কলেজ জীবনের অন্যতম বন্ধু রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত আমাদের পিরানদেল্লো রচিত "সিক্স ক্যারেকটার্স ইন্ সার্চ অব্ অ্যান অথর"-এর অনুবাদ পড়ে শোনালেন। রুদ্র সেনগুপ্ত এর আগে থেকেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন—কিন্তু এই নাটক পড়ার সূত্রে আরও ঘনিষ্ঠ হলেন। নাটকটি শুনে আমাদের লোভ হ'লো। বশীকরণ করানো হ'লো অনতিবিলম্বে—কিন্তু এতো বড়ো মাপের নাটকের উপযুক্ত মহলাঘর পাচ্ছিলাম না। অনেক কষ্টে দর্জিপাড়ার অতীন মিত্রদের বাড়ীর একতলায় একটি ঘর পাওয়া গেলো। পুরোদমে মহলা শুরু হ'লো। ১৯৬১-র ১২ই নভেম্বর সকালে রঙমহলে প্রযোজিত হ'লো 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র'। এ নাটকের প্রথম অভিনয়ে ছিলেন—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় গঙ্গো-

পাধ্যায়, চিন্ময় রায়, জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী, সত্যেন মিত্র, জয়ন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক নন্দী, সুরঞ্জন রায়, কেয়া চক্রবর্তী, মায়া ঘোষ, নমিতা ঘোষ, তপতী রায় ও বিভা মিত্র।

নাটক হ'লো। একসঙ্গে প্রশংসা আর নিন্দায় আমরা বিহ্বল হ'য়ে গেলাম। প্রথম দিনে দর্শকের সারিতে ছিলেন শ্রদ্ধেয় হেমাঙ্গ বিশ্বাস। তিনি আমাদের উৎসাহিত করলেন।

কিন্তু তখন আমরা কপর্দক শূন্য। এ নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়ের প্রয়োজন বুঝতে পারছি—কিন্তু সঙ্গতি তখন নেই কিছুই। ইতিমধ্যে শরৎ-সাহিত্য সম্মেলনের ডাকে আমরা মহাজাতি সদনে শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' করলাম। হাতে কিছু টাকা এলো। রিহার্সালের জন্য কেয়া চক্রবর্তীর বাড়ীতে কিছুদিন ঘর পেলাম—কিন্তু 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র'র দ্বিতীয় অভিনয় নভেম্বরের আগে সম্ভব হ'লো না। কেয়া চক্রবর্তী তখন লেখাপড়ার জন্য নান্দীকারে আর থাকতে পারছিলেন না। 'বড় মেয়ে'র অভিনয় করলেন মায়া ঘোষ—দীপালি চক্রবর্তী করলেন 'মা'র অভিনয়। মিনার্ভায় হ'লো দ্বিতীয় অভিনয়। শ্রদ্ধেয় শম্ভু মিত্র—এই অভিনয়ের দর্শক ছিলেন। অভিনয়ের পরে তিনি আমাদের ওঁর বাড়ীতে আলোচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। ১৯৬২-র শুরুতে বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী হলে আমাদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়।

'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' আমাদের প্রতিষ্ঠা আনতে পারে এ সম্ভাবনা ১৯৬২-তে রঙমহলে তৃতীয় অভিনয় করে আমরা বুঝতে পারি। আই. পি. টি. এ-তে তখন কিছু কিছু সাংগঠনিক গোলমাল চলছিলো। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম আই. পি. টি. এ-কে সাহায্য করতে। কিন্তু গোলমাল এতোই বড় এবং আমাদের শোধরানোর সাধ্য এতই সীমিত ছিলো, যে আমাদের মনে হ'লো এ ব্যাপারে আর শক্তিক্ষয় না ক'রে সৃজনশীল কাজেই নিজেদের নিয়োজিত করা উচিত। আই. পি. টি. এ-র সঙ্গে আমাদের কোনো আদর্শগত বিরোধ হয় নি। ১৯৬২-র শেষে আমাদের আই. পি. টি. এ. ছাড়তে হ'লো। ১৯৬৩-র শুরুতে আমরা আলাদাভাবে রেজিষ্ট্রীকৃত হ'লাম। এই বছরই মুক্ত অঙ্গনে আমরা পর পর আটটি অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নিলাম। এ সময়ে একটি স্থায়ী ঘরও পেয়েছিলাম। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর দিদি শ্রীমতী কমলা সেনগুপ্তা ৪৭/১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে তাঁর একটি ঘর আমাদের ব্যবহার করতে

দিলেন। (এখন তারই পাশে আরও দুটি ঘর নিয়ে আমাদের মহলাঘর ও অফিস বেড়ে উঠেছে)। 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' নাটকের মহলা চলতে লাগলো। প্রতি মঙ্গলবার মুক্ত অঙ্গনে এ নাটক হবে—এই মর্মে আমরা লিফলেট ছাপিয়ে নিজেরাই প্রতি সন্ধ্যায় দক্ষিণ ক'লকাতার পথে পথে বিলি করেছি। অনেক মন্তব্য কানে এসেছে—কিন্তু চতুর্থ অভিনয়ের পর দেখলাম লোকে টিকিট কিনে আমাদের খরচ তুলে দিচ্ছেন। পরিচিতদের কাছে জোর করে টিকিট গছিয়ে দেবার আর প্রয়োজন পড়ছিলো না। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অভিনয়ে আমরা লাভ করলাম। অনেকদিন ধরে মনে মনে রাখা একটা স্বপ্ন একটু একটু করে সত্যের আলো দেখতে পেলো। ১৯৬৩-র শ্রেষ্ঠ নাটক বলে আমরা ছবি বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার পেলাম রঙ্গসভা সংগঠনের কাছ থেকে। বাইরের আমন্ত্রণ শুরু হ'লো। বাংলা দেশের শিল্পাঞ্চল থেকে ডাক আসতে লাগলো ১৯৬৪-র প্রথম থেকেই। নতুন বার্ষিক সম্মেলন হ'লো।

সম্মেলনের পরেই এগারো মাস সরকারী চাকরীর খাতিরে আমাকে বাইরে থাকতে হয়। নিয়মিত চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিলো অজিতেশবাবুর সংগে। শেক্সপীয়ারের চতুর্থ জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রঙমহলে আমরা প্রযোজনা করি ২৪শে এপ্রিল সকাল দশটায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অনূদিত "উইল শেক্সপীয়ার"—একটি কল্পনা। রুদ্রপ্রসাদ ১৯৬৩তে সদস্য হয়েছিলেন। 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' প্রযোজিত হয় ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মুক্ত অঙ্গনে। প্রথম অভিনয়ে ছিলেন—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, বিভাস চক্রবর্তী, সত্যেন মিত্র, রাধারমণ তপাদার, মহেশ সিংহ, বরুণ সেন, পশুপতি বসু, সুকন্যা রায়, দীপালী চক্রবর্তী, মায়া ঘোষ, নিমাই ঘোষ, অমলেন্দু চক্রবর্তী ও তাপসী গুহ। চেখভ রচিত 'দ্য চেরী অর্চার্ড' অনুসরণে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত ও রূপান্তরিত 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' নান্দীকারের একটি স্মরণীয় প্রযোজনা। ১৯৬৫ সালের শুরুতে দলে ফিরে আসি। নিউ এম্পায়ারে মাঝে মাঝে অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা—মুক্ত অঙ্গনে স্বল্প পরিসরের কথা ভেবে। এছাড়া প্রতি তিন মাস অন্তর তিনটি করে নতুন একাঙ্কও আমরা প্রযোজনা করতে থাকি মুক্ত অঙ্গনে। নিয়মিত বাইরের অভিনয়ের আমন্ত্রণে আমরা তখন বাংলা দেশের সবচেয়ে ব্যস্ত দল। ১৯৬৫-তে আমাদের মোট অভিনয় হয় ১২৭ বার।

১৯৬৬ সাল এলো প্রচুর প্রতিশ্রুতি নিয়ে। অর্থের অনটন থাকলেও দল

হিসেবে নান্দীকার তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশ নাট্যকার ওয়েস্কারের "রুটস্" অনুসরণে তৈরী হলো "যখন একা"।

নাটকের বিষয়বস্তু, অভিনয় ও মঞ্চসজ্জায় এ নাটক ছিলো আগের প্রযোজনাগুলি থেকে স্বতন্ত্র। 'যখন একা' আমাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবে এ কথা উপলব্ধির মুহূর্তেই কিন্তু আরেকটি অনাস্বাদিত ঘটনা ঘটলো। সংগঠনের বয়স ছ'বছর পূর্ণ হবার ক'দিন পরেই একসঙ্গে বারোজন বিক্ষুব্ধ সদস্য পদত্যাগ করলেন। একই সময়ে কিছু নতুন সদস্য সভ্যপদ পেয়েছিলেন ঠিকই—কিন্তু প্রায় সংগে সংগেই এতোজন সভ্যের দলত্যাগ 'নান্দীকার'কে সাময়িকভাবে অপ্রস্তুত ও অসহায় করে দিয়েছিলো। সংগঠনের ধার তখন সাড়ে তিন হাজার টাকা।

পর পর কয়েকটি জরুরী সভা বসলো। পুরনো নাটক সব বন্ধ হয়ে গেলো উপযুক্ত সংখ্যক অভিনেতা অভিনেত্রীর অভাবে। নতুন নাটকের মহলা শুরু হ'লো। পিরানদেল্লোর 'হেন্‌রী ফোর্থ'-এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী। তার বাংলা রূপান্তর করলেন অজিতেশবাবু 'শের আফগান'। মাত্র বারোদিনের মধ্যে লিখে মহলা দিয়ে জুলাই মাসের শেষে এ নাটক মঞ্চস্থ হ'লো মুক্ত অঙ্গনে। প্রথম অভিনয় থেকে এ নাটকে আজ পর্যন্ত আমাদের কখনও ক্ষতি স্বীকার করতে হয় নি। বাইরের ডাকে সব জায়গাতেই আমরা 'শের আফগান' নিয়ে হাজির হ'লাম। তিন মাসে আমাদের ঋণমুক্তি ঘটলো। 'শের আফগান' হ'লো এক অসামান্য জনপ্রিয় প্রযোজনা।

ধাক্কা সামলে উঠে পুরনো নাটকগুলোর সংস্কারে মন দেওয়া গেলো। ১৯৬৭ সালে কয়েকটি একাঙ্ক ছাড়া আমরা সব পুরনো নাটকগুলোই অভিনয়যোগ্য করে ফেললাম। এ বছরে যুব সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে আমরা দিল্লীতে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' ও 'শের আফগান' করে এলাম—সেই সংগে নিয়ে এলাম দিল্লীবাসী রসিকজনের শুভেচ্ছা। যুব সম্প্রদায়ের সংগে সখ্যতার সূত্রে আমরা বাঁধা পড়ে গেছি। দিল্লী যাবার আগে সভ্যদের আমরা সুটকেশ ও বেডিং উপহার দিই সংগঠনের পক্ষ থেকে। শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায় আমাদের প্রতীক চিহ্নটি এই বছরে এঁকে দিলেন। এর আগে আমাদের মনের মতন কোনো প্রতীক চিহ্ন ছিলো না।

বরুণ সেনের নেতৃত্বে ১৯৬৮-তে আমরা মনে রাখার মতো অনেক কিছু

করতে পারলাম। দিল্লীতে দ্বিতীয়বার আর পাটনায় প্রথম আমাদের অভিনয় হ'লো। এ বছরে অভিনয় করলাম আমরা মোট ১৩২ বার। "নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র"র শততম অভিনয় হ'লো এ'বছরে। মোট আয় হ'লো এক লক্ষের কিছু বেশি টাকা। ১৯৬৮ সাল শেষ হ'লো। ঘরে বাইরে অভিনয় করে নান্দীকারের সদস্যরা তখন একটু অসুবিধেয় পড়েছেন ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্রে। ছুটি পাওয়ার ব্যাপারে সভ্যদের অসুবিধের কথা ভেবে নতুন বার্ষিক সম্মেলনে স্থির হ'লো অভিনয়ের সংখ্যা কিছু কমাতে হবে। বছরে নব্বইটির মত করলে সকলেই সামলে নিতে পারেন। সেই সংগে প্রকট হ'য়ে উঠলো নিজস্ব মঞ্চের চিন্তা। সহযোগী সংগঠন 'বহুরূপী' ও 'রূপকার'এর সংগে 'বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি' স্থাপিত হয়েছিলো এর কিছু আগে। হিন্দী নাট্যগোষ্ঠী অনামিকার 'এবম্ ইন্দ্রজিত', ও আমাদের তিনটি দলের তিনটি নাটক ও একটি সম্মিলিত অভিনয় নিয়ে কলামন্দিরে হ'লো নাট্যোৎসব। কিছু টাকা উঠলো। জমির সন্ধান ও 'নাট্যমঞ্চ' প্রতিষ্ঠার কাজে নান্দীকার সাধ্যমত সাহায্য করতে লাগলো।

এ বছরের শুরুতে হ'লো "শের আফগানে"র শততম অভিনয়। ক'দিন পরেই বোম্বাইতে বিকাশ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে আমরা ওখানে রবীন্দ্র সদন মঞ্চে অভিনয় করলাম 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র', 'শের আফগান', আর 'যখন একা' ও 'নানা রঙের দিন'। পি. এল. দেশপাণ্ডে প্রমুখ শ্রদ্ধেয় শিল্পীদের কাছে নিজেদের নাটক উপস্থাপিত করতে পারায় আমরা সেদিন থেকে বিকাশবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ। বোম্বাই থেকে ফেরার পথে আমরা এলাহাবাদে কালিদাস অ্যাকাডেমির আমন্ত্রণে "মঞ্জরী আমের মঞ্জরী" অভিনয় করি। বছর শেষ করেছি আমরা ৯১টি অভিনয় ক'রে। এ বছরের অভিনয়টি কিন্তু একটু বিশদ করেই বলার।

১৯৬৯ এর চোদ্দই ডিসেম্বর বিশ্ববিশ্রুত জার্মান নাট্যকার ব্রেখ্‌ট-এর 'দ্য থ্রি পেনী অপেরা' অনুসরণে 'তিন পয়সার পালা' অভিনীত হ'লো নিউ এম্পায়ারে। ১৯৬৯-এ ব্রেখ্‌টের জন্মদিন উপলক্ষে ১০ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ নির্বাচনের দিন এই নাটকের অভিনয়ের কথা আমরা পত্র পত্রিকা মারফত ঘোষণা করি। কিন্তু এর প্রস্তুতি চলছিল এরও প্রায় ছ'মাস আগে থেকে। অনেক পরিশ্রম, অনেক অর্থব্যয়, অনেক নিষ্ঠার সমন্বয় ঘটেছে এই নাটকে। আমরা কোনো ত্রুটি জ্ঞানতঃ কোথাও রাখিনি। খরচ হয়েছে দশ হাজার

টাকা, সময় নিয়েছি দেড় বছর—নাচ শিখেছি, গান শিখেছি ব্রেখ্‌টকে যতোটা পেরেছি পরিচিত করিয়েছি আমাদের দেশে। অনেক বিভাগে অনেক সদস্য স্বয়ং সম্পূর্ণতার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

কিন্তু এতো গেলো কাজের কথা। এত কাজের মাঝেও বছরের শেষে এতো শূন্য কেন? ১৯৬৮ সালের স্বর্ণময় দিনগুলো এমন করে মলিন হয়ে গেলো কেন? ১৯৬৯-এর জুলাই-এর সর্বনাশা একটা দিন কেন এমন করে সবকিছুর দীপ্তি কমিয়ে দিল আজীবন নান্দীকারের কাজে নিজেকে ঢেলে কেন ফাঁকি দিল বরুণ সেন? দমদম ষ্টেশনের কাছে এক ট্রেণ দুর্ঘটনায় বরুণ সেনের মৃত্যু হয়েছে। এটা ঘটনা—এটা চাক্ষুষ—নিজেরা হাতে করে সাজিয়ে বরুণকে শেষ যাত্রায় নিয়ে গেছি কাঁধে করে। তবু বিশ্বাস হয় না—মনে হয় কোথায় একটা গোলমাল হয়ে আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে একদিন।

তাই সব মেনে নিয়েও কাজ করছে নান্দীকার। নতুন 'নাট্যমঞ্চ' তৈরীর কাজে ১৯৭০-এর নাট্যোৎসবও হয়েছে আগের মতো। অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় সম্মিলিত অভিনয় হয়েছে "মুদ্রারাক্ষস"। এখন শুধু চিন্তা কেমন করে নিজেদের একটা মঞ্চের ব্যবস্থা করা যায়। এ বছরের মধ্যে নান্দীকার নিয়মিতভাবে কোনো মঞ্চে অভিনয় করতে না পারলে হতাশা আসতে পারে সকলের। নান্দীকারের কর্মপদ্ধতিও আমূল পরিবর্তনের দরকার হ'তে পারে।

নান্দীকারের কথা মোটামুটিভাবে বলার চেষ্টা করলাম। এক দশকে নান্দীকার ইব্‌সেন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, পিরানদেল্লো, চেখ্‌ভ, ওয়েস্কার ও ব্রেখ্‌টকে রূপায়িত করেছে। ভারতীয় ঐতিহ্যকে ধরা যায় এমন কোন নাটক করা আর সেই সংগে 'নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি'র মাধ্যমে অথবা এককভাবে। একটি মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা—মূলতঃ এই দুটি কাজেই নান্দীকারের আগামী কর্মসূচী। সত্তরের দশকের শুরুতে সে কাজ শেষ হ'লে—নতুন কর্মসূচীর কথা আবার নতুন করে ভাবা হবে।"

১৯৭০ সালে সপ্তমী পুজোর দিন একটা নতুন রঙ্গমঞ্চ আবিষ্কার করে নান্দীকার একটা কঠিন দায়িত্ব হাতে নিলেন। রঙ্গনায় সপ্তাহে তিন দিন অভিনয় শুরু করলেন। দেখতে দেখতে রঙ্গনাও সবার কাছে পরিচিত হয়ে গেল। নাট্যানুরাগীরা নতুন ধরণের নাটক দেখার সুযোগ পেল। 'তিন পয়সার পালা' দিয়ে শুরু করলেন এরা নতুন পথের যাত্রা। পুরোন সব নাটকই

এরা এখানে অভিনয় করেছেন। ৭২ সালে এসে নতুনের মধ্যে আমরা দেখেছি অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়ের 'হে সময় উত্তাল সময়' আর 'বীতংস'।

এদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে নান্দীকারে অভিনয় করেছেন : অসিত বন্দোপাধ্যায়, লতিকা বসু, কেয়া চক্রবর্তী, শিবনাথ বন্দোপাধ্যায়, পল্লব মুখোপাধ্যায়, সুবীর দত্ত, কালিকা শেঠ, অলক ভট্টাচার্য, রনজিৎ চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অমলেন্দু চক্রবর্তী, সীমন্তিনী দাস, তপন মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর ঘোষ, সমীর চক্রবর্তী, দীপঙ্কর সেন, স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়, মঞ্জু ভট্টাচার্য, বীণা মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু ব্রহ্মচারী, কবিতা বন্দোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, পশুপতি বসু, রাধারমণ তপাদার, রণজিৎ ঘোষ, সুমৌলীন্দ্র আচার্য, জয় সেনগুপ্ত, পরিমল মুখোপাধ্যায়, রবীন চক্রবর্তী, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়। নির্দেশনায় অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়। আলো স্বরূপ মুখোপাধ্যায়। রূপসজ্জা শক্তি সেন। মঞ্চ রাধারমণ তপাদার।

নবনাট্য আন্দোলনে/চতুর্মুখ

১৯৬১ সাল, ১৫ই আগষ্ট সকালবেলা রঙমহল মঞ্চে একটি নাটক দেখেছিলাম। নাটকটা ছিল ডষ্টয়েভস্কির 'দি ইডিয়ট' অবলম্বনে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নির্বোধ'। বাংলা রঙ্গমঞ্চে এইরকম একটি বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখে একটু হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আর চতুর্মুখকে জানিয়েছিলাম অভিনন্দন, ওরা খুবই দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিল তো। শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য্য যিনি এই নাটকের পরিচালক, তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে এসে এইসব আধুনিক বিষয়বস্তুর নতুন ধরনের নাটকের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন দেখেও একটু অবাক লেগেছিল। অবশ্য জানতে পারলাম এই নাটকই এদের প্রথম নয় ১৯৫৮। সালে শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য্য, দীপক রায়, অসীম চক্রবর্তীর উদ্যোগেই জন্ম হয় চতুর্মুখের। প্রথম নাটক ছিল এদের অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'থানা থেকে আসছি'। ১৯৬০ সালে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা'। এরপর এরা শিবরাম চক্রবর্তীর বহুপুরাতন নাটক 'যখন তারা কথা বলবে' রঙমহলে দীপক রায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেন। এই সময়েই শিবরামবাবুর 'চাকার নীচে' নাটকটিও এরা শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেন।

১৯৬১ সালে 'নির্বোধ' মিনার্ভায় ধারাবাহিকভাবে অভিনয় হয়েছে বহু রাত্রি। এই নির্বোধ ৬৪ সাল পর্যন্ত অভিনয় হয় এবং সেই সময়েই শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে ১৪-১৫ জন শিল্পী একসঙ্গে নিজেদের সৃষ্ট চতুর্ম্মুখ ছেড়ে চলে গেলেন, কেন গেলেন জানি না, তবে এটুকু জানি তারা আজও অভিনয় করছেন। তবে চতুর্ম্মুখে নয় অন্য একটি নতুন সংস্থাতে।

১৯৬৫ সাল। কিছু ভাঙার পরে যারা রইলেন তাদেরই মধ্যে অন্যতম একজন অতীতের সংগঠক। এই অবস্থায় নির্দেশকরূপে এগিয়ে এলেন অসীম চক্রবর্ত্তী। প্রথম অভিনয় শুরু করলেন বিশ্ববিখ্যাত নাটক আর্থার মিলারের ডেথ অব এ সেলস্ম্যান অনুপ্রাণিত 'জনৈকের মৃত্যু'। মুক্তাঙ্গন মঞ্চে ২৪শে ফেব্রুয়ারী একেবারে নতুন ধরনের প্রডাকসন দেখলুম আমরা। একটি জীবনের গভীরের নাটককে, গভীর জীবনের ছবি, প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে হাজির করলেন মঞ্চে। বিশেষ করে অসীম চক্রবর্ত্তী কখনো যুবক, কখনো প্রৌঢ়, কখনো বা বৃদ্ধ, তার মর্মস্পর্শী অভিনয় ভোলবার নয়। এই নাটক নিয়ে ওরা বহুরাত্রি বহু জায়গায় অভিনয় করেছেন। এমনকি এই নাটক নিয়ে হাওড়া শালখেতে শীসমহল মঞ্চেও সপ্তাহে দুদিন অভিনয় করেছেন।

এই দলে বিভিন্ন সময়ে অভিনয়ে ছিলেন: জগৎ মিত্র, অসীম চক্রবর্ত্তী, দীপক রায়, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী, শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য্য, দীপিকা দাস, প্রীতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারানী ঘোষ, উত্তরা দাস, সঙ্গীতা কর, সত্য দাসগুপ্ত, লোকনাথ চন্দ্র, বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর ভট্টাচার্য্য, রবীন দে, বেণু মল্লিক, কমল বরণ দাস, সবিতা মুখার্জী (বড়), নীতিন বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃপ্তি দাস, অমর দত্ত, সুধীর দে, জিতেন ঘোষ, চিত্রিতা মণ্ডল, লোকনাথ চন্দ্র, বারীন মুখোপাধ্যায়, দুলাল মিত্র, খোকন বোস, শিশির দাস, দিলীপ দাস, বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রাণতোষ নাহা, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, কল্পনা বাগ, রেবা কুণ্ডু, গার্গী গুহ, সত্য দাসগুপ্ত, কল্যাণ মজুমদার, প্রণয় বসু, কালীপদ ঘোষ। সঙ্গীতে অতীতে শোভন গুপ্ত পরে চিত্তরঞ্জন মুখার্জী ও মণি বিশ্বাস। আলোয় আশুতোষ বরুয়া, রূপসজ্জায় সিধু বন্দোপাধ্যায়। মঞ্চে অনন্ত রায়, শিল্পনির্দেশনা পঙ্কজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

এপিক থিয়েটার

১৯৬১ সাল। একটি মনস্তাত্বিক নাটিকা নিয়ে জন্ম হল একটি নতুন দলের। থিয়েটার সেন্টারে অভিনয় করলেন ইমন গোষ্ঠী অজিত নন্দীর "কপাট"। বেশ ক' রাত্রি অভিনয় হবার পর এরা নাম পাল্টালেন। এপিক থিয়েটার নাম দিয়ে এরা বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের প্যাণ্ডেলে একাংক প্রতিযোগিতায় "কপাট" অভিনয় করলেন এবং প্রশংসাও কুড়োলেন। এরপর নানা বাধার সম্মুখীন হয়ে বেশ কিছুদিন এদের অভিনয় বন্ধ ছিল। '৬৮ সালে এরা নতুন ভাবে দল গড়লেন। এরা সিদ্ধান্ত নিলেন নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিতর্ক সভার আয়োজন করা হোক। এখানে অনেক জ্ঞানীগুণী নাট্য পণ্ডিতেরা অংশ গ্রহণ করলেন। এই সময়ে নাটক শুরু করলেন অজিত নন্দীর 'রেওয়াজ'।

এই দলের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন বা এখন আছেন মদনমোহন দে, অজিত নন্দী, কমল মিত্র, রণেন বসু, সুপ্রভাত বসু, বাবলু চক্রবর্তী। ১৯৭১ সালে এরা বিশ্বরূপায় রমেন চৌধুরীর পরিচালনায় অজিত নন্দীর 'বিস্ফোরণ' মঞ্চস্থ করলেন। দলের শিল্পীদের শিল্পের মান উন্নয়ন করার জন্যে নাটকের বিষয়ে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছেন এরা। বিশেষ করে নাটকের ক্লাস করেন এরা।

গণনাট্য আন্দোলনে/সীমান্তিক শাখা

১৯৬১ সাল। গণনাট্য সঙ্ঘের দমদম নাগের বাজার অঞ্চলের বিভিন্ন শাখা মিলে জন্ম দিল একটি শক্তিশালী সংগঠনের, সেই দলের নাম হল গণনাট্য সঙ্ঘ সীমান্তিক শাখা। সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাব এমনি কয়েকজন বিপ্লবী শিল্পী প্রথম নাটক শুরু করলেন চিররঞ্জন দাসের "বাধা আর মানব না।" ৬২-র পর যে সময়ে গণনাট্য সঙ্ঘ ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে, সেই সময়ে একথা জোরের সংগে বলা যায় এই সীমান্তিক শাখাই গণনাট্য সঙ্ঘের পতাকাকে আঁকড়ে রেখেছিল অনেক দুর্যোগ সত্বেও।

এর পর এরা নিগ্রো নির্যাতনের উপর মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের মুখোস খুলে দিয়ে নাটক শুরু করলেন (পশ্চিম স্বর্গ)। এই নাটক আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওপর মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ১৯৬৩ সালে ওরা গণতন্ত্রের পট ভূমিকায়

"সন্ত্রাস" অভিনয় করতে গিয়ে হল হ্যাপা। ১৪ই জুলাই দমদমে দু'হাজার দর্শকের মধ্যে অভিনয় আরম্ভ হবে এমন সময় পুলিশ এসে মাইক প্রত্যাহার করে নেয়। ওরা অবশ্য মাইক ছাড়াই অভিনয় করেন। এই নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই গণনাট্য সঙ্ঘ পুনর্জীবনের পথ পায়। সীমান্তিক শাখাই এই সময়ে চিররঞ্জন দাসের সম্পাদনায় গণনাট্য পত্রিকার পুর্ণ প্রকাশ করে। ১৯৬৫তে সীমান্তিক শাখা চিররঞ্জন দাসের 'মৃত্যুহীন', (ভিয়েৎনাম) শুরু করেন।

এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা মূলত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর নাটক রচনা ও প্রযোজনা করেছিলেন ১৯৬৭ সাল। এরা জমি দখলের উপর 'পদক্ষেপ' ও 'পালা বদল' অভিনয় করেন।

১৯৭০ সাল। স্মরণীয় প্রযোজনা অক্টোবর বিপ্লব। ১৯৭০ সালে কম্বোডিয়া নিয়ে আসানসোলে ডিসেম্বর মাসে অভিনয় করতে যান পুলিশের বাধায় অভিনয় করা সম্ভব হয়নি। পরে মে দিবসে আসানসোলে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে অভিনয় করতে গেলে পুলিশ জোর করে বন্ধ করে দেয় একথা নাট্যকার চিররঞ্জন দাস ক্ষোভের সঙ্গে আমায় বলেছেন। তিনি আরো বলেন শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। তিনি আরো জানান ঐ সময়ে ক্যানিংয়ে অভিনয় করতে গেলে ৩৫-৪০ জন পুলিশ শিল্পীদের ঘেরাও করে প্রত্যেক শিল্পীকে তল্লাসী করে এবং নাটকের জিনিস পত্র ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। তার পরেও ওরা ঐ অঞ্চলে ৮ রাত্রি অভিনয় করেন ঐ অবস্থাতেই।

এরা মুক্ত আকাশের নীচে গণনাট্য উৎসবের রীতি প্রথম চালু করেন।

১৯৬৭ সালে এরা চিররঞ্জন দাসের 'জুলিয়াস ফুচিক' অভিনয় শুরু করেন। অবশ্য এর আগে অনুশীলন শাখা উমানাথ ভট্টাচার্য্যের 'জুলিয়াস ফুচিক' অভিনয় করেছিল ও সেই নাটক তৎকালীন গণনাট্য পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। সীমান্তিক শাখায় বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেন: অমল নাথ, সুনীল মিত্র, মনিলেশ বন্দোপাধ্যায়, মনীন্দ্র চক্রবর্তী, রমেন ভাদুড়ী, সীমা চক্রবর্তী, সন্দীপ চক্রবর্তী, সুবিনয় সান্যাল, রবীন রায় চৌধুরী, শঙ্কর চক্রবর্তী, সৌমিত্র চক্রবর্তী, অসিত দাসগুপ্ত, নিরঞ্জন দত্ত, জীবন চক্রবর্তী, আশীষ মুখোপাধ্যায়, সুখেন্দু চক্রবর্তী, সমীর সেনগুপ্ত, জ্যোৎস্না ঘোষ, সমরেশ ঘোষ, তাপসী লাহিড়ী, ক্ষমা চক্রবর্তী, শঙ্কর দাশগুপ্ত, আরতি মুখোপাধ্যায়, মায়া ঘোষ, রেবা কুণ্ডু, বকুল নাগ, মলিনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর সেনগুপ্ত, প্রসাদ বসু, অজিত দাশগুপ্ত, নির্ঝর মুখোপাধ্যায়, প্রাণকুমার মৈত্র, বাসুদেব

গোস্বামী, নরেন ভট্ট, সমর বন্দোপাধ্যায়, অরুন্ধতী দাস, অজিত গুপ্ত, বিজয় সাহা, হারান চক্রবর্তী, বাণী দত্ত, অরুণ সেনগুপ্ত, বিজন দে, বিনয় ভদ্র, রমা চক্রবর্তী, গিরিধারী পাল, নীতিশ চৌধুরী, অনিল ভট্টাচার্য, চিররঞ্জন দাস, প্রমুখ।

মঞ্চ পরিকল্পক : খালেদ চৌধুরী (জুলিয়াস ফুচিক ও অক্টোবর বিপ্লব), চিররঞ্জন দাস ও আশীষ মুখোপাধ্যায়, (পালাবদল, কম্বোডিয়া, পশ্চিমবর্গ, ভিয়েতনাম প্রভৃতি)। আলোক পরিকল্পক : রবি চক্রবর্তী।

সঙ্গীত পরিচালনা : অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায় (অক্টোবর বিপ্লব), চিররঞ্জন দাস (জুলিয়াস ফুচিক, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম)। হেমাঙ্গ বিশ্বাস (মৃত্যুহীন)।

শব্দগ্রহণ ও ক্ষেপণ : অরুণ সেনগুপ্ত, বিজয় সাহা প্রমুখ। ১৯৬৯ সালে যে গণনাট্য সম্মেলন হয় তার ঘোষণা পত্রটি এখানে ছেপে দেওয়া হল।

ঘোষণা পত্র

[১৩, ১৪, ১৫ আগস্ট '৬৭, কলিকাতার বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী হলে তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত এবং ১২, ১৩, ১৪ই ডিসেম্বর '৬৯ শিবপুর, হাওড়া জেলায় চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনে সংশোধিত।]

প্রস্তাবনা

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, মেহনতী মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রতি আস্থাশীল নাট্যশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, যাত্রাশিল্পী ও বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটি স্ব-নিয়ন্ত্রিত সংগঠন।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, লক্ষ্য ও ভূমিকা

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীভেদাভেদের উর্দ্ধে কোন শিল্পের অস্তিত্ব নেই, সমস্ত শিল্পকর্মই শ্রেণীস্বার্থভিত্তিক। সার্থক শিল্পসৃষ্টির জন্য আমাদের শিল্পকর্ম তাই জনগণের জীবন ও সংগ্রাম অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামকেই উপস্থিত করবে এবং শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য সকল স্তরের মেহনতী মানুষের সংগ্রামী মোর্চার সাংস্কৃতিক বাহিনীরূপে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

আমাদের শিল্পসৃষ্টির ভিত্তি ও বিষয়বস্তু

আমরা লক্ষ্য করছি যে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের শাসক ও শোষক শ্রেণী আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে এমন এক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যেখানে

শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের শ্রমের ফলকে লুণ্ঠন করে লাভবান হচ্ছে প্রধানত একচেটিয়া ও বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্যবাদীরা। তদুপরি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে, বিশেষতঃ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমাগত অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে এক বিপজ্জনক অবস্থায় ঠেলে দিচ্ছে।

এই সাথে আমরা আরো লক্ষ্য করছি যে দেশের বর্তমান শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক, বুদ্ধিজীবীসহ অন্যান্য মেহনতী মানুষ ক্রমশই যৌথ মোর্চা গঠনের সংগ্রামে সংগঠিত হয়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি এই শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার (জনগণের প্রকৃতি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার) সংগ্রামের কর্মসূচী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীই একমাত্র সঠিক পথ। আমরা ঘোষণা করছি, জনগণের এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে আমরা শক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করবো।

আমরা লক্ষ্য করছি শাসক শ্রেণী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই অনিবার্য সম্ভাবনাকে ব্যাহত করতে, জনগণের মানসিকতা শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখার জন্য জনগণের ব্যাপকতম অংশে অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধতাকে লালন করছে; সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, উগ্রজাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধ উন্মাদনার রাজনীতিতে জনগণের মানসিকতা ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখতে চাইছে; সাম্রাজ্যবাদী অপসংস্কৃতির বেড়াজালে জনগণ বিশেষতঃ তরুণ সমাজকে হতাশাগ্রস্ত, সমাজবিরোধী, সংগ্রামবিমুখ, নীতিহীন, সংগ্রামবিরোধী শক্তি হিসাবে পরিচালিত করার সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সংস্কারমুক্তির নামে অবাধ যৌন ও নগ্ন ক্রিয়াকলাপগুলিকে প্রগতিমূলক এবং বৈপ্লবিক বলে প্রচার ও প্রসারে সচেষ্ট হয়েছে; পাশাপাশি শ্রেণীসংগ্রামকে বিকৃত করে জনমানসের শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রতি অসম্মান ও অস্বীকৃতির ঝোঁক তৈরী করছে; প্রকৃতিবাদ, বিমূর্তবাদ, শূন্যতাবাদ, নিয়তিবাদ, নৈরাজ্যবাদ, নবতরঙ্গ, অ্যাবসার্ডিজম্ প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব, শিল্পকলা ও তজ্জাত শিল্পরূপকে প্রগতিশীল এবং বৈপ্লবিক তত্ত্ব হিসাবে প্রচার

করে জনগণকে বিভ্রান্ত ও হতাশার মধ্যে ঠেলে দিয়ে বিপথে চালিত করতে চাইছে। শাসক শ্রেণীর দর্শনে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের এই প্রচেষ্টা, প্রচার, দর্শন ও শিল্পকলার বিরুদ্ধে আমরা তাই নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যাব। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকর্মে সমস্তরকম সুবিধাবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধেও আমাদের সংগ্রাম হবে আপোসহীন।

আমরা মনে করি মেহনতী জনগণের জীবনবোধ ও ধ্যানধারণা আজও বহুলাংশে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন ও বুর্জোয়া অবক্ষয়ী ভাবাদর্শে প্রভাবিত। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যক্রম রূপদানের পথে বাধাস্বরূপ জনগণের অনগ্রসর ও পশ্চাৎগামী মানসিকতাকে দূর করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করা আশু এবং পবিত্র দায়িত্ব।

আমরা বিশ্বাস করি যে আগামী দিনে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার ভিত্তিতে এক নতুন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটছে, সে সংস্কৃতি সামন্ততান্ত্রিক, একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির সম্ভাবনা ও বিকাশকে মূর্ত করে তোলার সংগ্রামে আমরা একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করবো।

আমরা মনে করি, প্রধানতঃ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পৃথিবীর সাম্র্যজ্যবাদী দেশগুলির শাসকগোষ্ঠী পৃথিবীকে নতুনভাবে পদানত করতে চাইছে এবং যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। সাম্রাজ্যবাদের এই সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এবং তাকে চিরকালের মত ধ্বংস করার জন্য ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর জনগণ সংগ্রাম করছে। আমাদের শিল্পকর্মে জনগণের এইসব সংগ্রামের স্বার্থ প্রতিফলিত হবে, জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে জাগ্রত করার প্রচেষ্টার রূপায়ণ ঘটবে এবং সাথে সাথে ভারতবর্ষের শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত রকম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে।

আমাদের দর্শন

আমরা মনে করি একমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী জীবনদর্শনই জাগতিক ঘটনাপ্রবাহ ও সম্পর্ক ধারার সঠিক ব্যাখ্যাকে সূত্রায়িত করতে পারে এবং মানুষকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে একমাত্র সেই জীবনদর্শনেই আমরা প্রত্যয় ঘোষণা করি।

আমাদের আঙ্গিক

আমরা মনে করি শিল্পে সার্বজনিকীরণের সাথে আমাদের শিল্প আঙ্গিক হবে আমাদের শিল্প লক্ষ্যের স্বার্থানুগ। জনগণের শিল্পবোধ বা রসচেতনাকে ভিত্তি করে, তাকে জাগ্রত এবং উন্নত করার স্বার্থেই গড়ে উঠবে আমাদের শিল্প আঙ্গিক। আমাদের শিল্পমান হবে জনগণের কাছে গ্রহণীয়, শিক্ষণীয় এবং জনগণের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আমরা মনে করি, আঙ্গিক সর্বস্বতা এবং অকারণ আঙ্গিকগত পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া আমাদের শিল্পস্বার্থবিরোধী। আমাদের আদর্শ ও জনগণের রসগ্রহণের ক্ষমতার মধ্যে একটি উন্নতিমুখী সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আঙ্গিকগত পরীক্ষা আমরা অনুমোদন করি।

অন্যান্য গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য

আমরা মনে করি শিল্পাদর্শের ভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বা নাট্যদল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির সঙ্গে আমরা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মিলিত হতে পারি। শিল্পীদের জীবন ও জীবিকার জন্য সংগ্রামে শিল্পক্ষেত্রে সাধারণ অর্থনৈতিক চাপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে শিল্পীর স্বাধীনতা রক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে আমরা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক মতাদর্শে শিল্পীদল ও গোষ্ঠীকে এক সম্মিলিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করে যাব।

নাটক

গণনাট্য আন্দোলনের দ্রুত এবং সার্থক প্রসার ঘটানোর জন্য আমাদের নাটকের হাতিয়ারকে আরো শানিত ও ব্যাপক করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের দর্শন অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী জীবনদর্শনের মূলতত্ত্ব ও সূত্রগুলিকে সঠিকভাবে জানা এবং প্রয়োগ করা অপরিহার্য। আমাদের নাট্যকারদের তাই গভীরভাবে সব তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং নাটকের কাহিনী বা উপাদান সংগ্রহে শ্রেণীসংগ্রামে যুক্ত বিবিধ মানুষ ও তাদের শ্রেণীসংগ্রাম, সামাজিক ঘটনা ও ঘটনার উত্থান পতন ইত্যাদি সকল বিষয়ের উপস্থাপনায় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন কোনমতেই এগুলি মূল আদর্শ বা তত্ত্ব থেকে বিচ্যুত না হয়। আমরা বিশ্বাস করি এই জীবনাদর্শ

আমাদের নাট্যকারকে অধিকতর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন করবে এবং তিনি তাঁর নাটকের মাধ্যমে জনগণকে ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু নির্বাচন

নাটকের কাহিনী নির্বাচন বা উপাদান সংগ্রহে অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টির ভিত্তি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঘোষণাপত্রে যে পথ নির্দেশিত হয়েছে তার প্রতি আমাদের নাট্যকারদের অধিক মনোনিবেশ করা আবশুক। মনে রাখতে হবে যে শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে কলে-কারখানায়, খেতে-খামারে, আপিসে-আদালতে সর্বত্র জনগণের যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলছে আমাদের স্বীকৃত তত্ব ও জীবনবোধের আলোকে সেগুলিকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে তবেই নাট্যায়িত করা সম্ভব। এই সব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মেহনতী মানুষের জীবনে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন জীবনবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ। সৃষ্টি হচ্ছে অসংখ্য কাহিনীর উপাদান।

শ্রমিক কৃষক এই দুই প্রধান শ্রেণীর আন্দোলনের পট-ভূমিকায় নাটক রচনার ক্ষেত্রে আমাদের নাট্যকারদের সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কৃষক-আন্দোলনের পটভূমিকায় নাটক রচনার ক্ষেত্রে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে সাম্প্রতিককালে কৃষক সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, খেত-মজুর ও গরিব কৃষকরা সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসন যন্ত্রকে আঘাত হেনে নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করছেন এবং কৃষক আন্দোলনের পুরোভাগে প্রধান শক্তি হিসাবে এগিয়ে এসেছেন। এই শক্তিই হবে আমাদের কৃষক জীবনের মহানায়ক। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, কৃষক সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মেহনতী কৃষকরা আজ বিচার বিভাগসহ সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রের শ্রেণী চরিত্র বুঝতে আরম্ভ করেছেন। আমাদের নাটকের সাহায্যে তাঁদের এই বোধকে আরো স্বচ্ছ করে তুলতে হবে, পূর্ণতা দান করতে হবে।

শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে একথা মনে রাখতে হবে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে এই শ্রেণী। তাই শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক গুণগুলিকে আমাদের নাটকে উজ্জলভাবে চিত্রিত করতে হবে। কিন্তু সাথে সাথে মনে রাখতে হবে শ্রমিক কৃষক উভয় শ্রেণীর উপরেও এখনো বুর্জোয়া, সামন্তবাদী ধ্যান ধারণার গভীর প্রভাব বিদ্যমান; এর বিরুদ্ধে আমাদের নাটকের মাধ্যমে নিরন্তর সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে; বিশেষতঃ শ্রমিক শ্রেণীর উপর অর্থনীতিবাদের যে

প্রভাব আজও আছে তার বিপদ সম্পর্কে তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া আমাদের নাট্যকারদের অন্যতম কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও আমাদের ভুললে চলবে না, শ্রমিক ও কৃষক এই দুই প্রধান শক্তি ছাড়াও অসংখ্য মেহনতী মানুষ প্রতিনিয়ত একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সামিল হচ্ছেন। এদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংগ্রামের কাহিনীও আমাদের নাটকের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া দরকার।

চরিত্র রূপায়ণ

নাটকের অন্যতম প্রধান অবলম্বন নাটকীয় চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমাদের নাট্যকারদের অধিকতর সতর্ক এবং বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। নায়ক নায়িকা নির্বাচন, শাসক শ্রেণীর চরিত্রাঙ্কন, দোদুল্যমান চরিত্রের বিচার, সর্বক্ষেত্রেই বিশেষ সতর্কতা অপরিহার্য।

নবজীবনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সংগ্রামী মেহনতী মানুষ প্রতিদিন জন্মলাভ করছেন। এইসব সংগ্রামী মানুষই হবেন আমাদের নায়ক নায়িকা।

শাসক শ্রেণীর চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রেণীশত্রুর মুখোশ যথাযথভাবে উদ্ঘাটনের ব্যাপারে আমাদের নাট্যকারদের অধিকতর যত্নবান হওয়া দরকার। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থানের সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতেই শোষক বর্গের সঠিক চরিত্র বিশ্লেষণ সম্ভব। শত্রুকে অহেতুক স্থূল ও হাস্যকরভাবে চিত্রিত করলে প্রকৃতপক্ষে তার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও আক্রমণের মানসিকতা নষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রশ্নে মূল শত্রুর চরিত্রকেই পুরোভাগে রাখতে হবে। মূল শ্রেণী শত্রুকে আড়ালে রেখে তার যন্ত্র বা হাতিয়ারকে প্রধান শত্রুরূপে চিত্রিত করার ভুল পথ পরিহার করতে হবে।

দোদুল্যমান চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে মানুষের জীবনে আজ প্রচণ্ড টানা-পোড়েন চলছে,—অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রগতির। অনগ্রসর জীবনের মূল্যবোধ, সংস্কারবদ্ধ সামাজিক ধ্যান-ধারণা মানুষের চেতনাকে আজো বহলাংশে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই সব টানা-পোড়েনের ফলশ্রুতি হিসাবেই মানুষের মধ্যে দেখা দেয় দোদুল্যমানতা। নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে এই জাতীয় দোদুল্যমান চরিত্রকে আশ্রয় করে নাটকের শেষ পাতায় তাকেই অকারণে অকস্মাৎ সংগ্রামী "হিরো"-র

ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে নাটকে উপসংহার টানার ভ্রান্ত প্রবণতা ত্যাগ করে নাট্যকারদের দোদুল্যমানতার সঠিক বস্তুবাদী বিচারে মনোযোগী হতে হবে।

রচনা শৈলী ও আর্ট

সার্থক নাটক রচনার জন্য প্রয়োজন সুনিপুণ রচনা শৈলী ও প্রয়োগ কুশলতা। গণনাট্যের নাটক বলতে তাকেই আমরা সার্থক বলে মনে করি যা একাধারে আদর্শ সম্পর্কে যত্নবান হবে এবং অন্যদিকে শিল্প হিসাবে জনগণের কাছে আদৃত হবে। "আর্ট হচ্ছে জনগণের জিনিষ, শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে একে গভীরভাবে শিকড় গ'ড়তে হবে; এমন করে এই অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে এবং পছন্দ করে। এর ভেতর জনসাধারণের কামনা-বাসনাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে; তার ভেতরের সুপ্ত শিল্পীকে জাগিয়ে তুলতে হবে।" লেনিনের এই সুচিন্তিত বাণী সার্থকভাবে যাতে নাটকে প্রতিফলিত হতে পারে তার জন্যে আমাদের নাট্যকারদের কঠোরভাবে অনুশীলন করতে হবে। কাহিনী নির্বাচন, ঘটনাসংস্থাপন, চরিত্র রূপায়ণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে বাস্তবতার সঙ্গে সৌন্দর্য্যের সুষম যোগসাধন ঘটাতে হবে।

রচনার শিল্পগত ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি বিষয়ে নাট্যকারকে সচেতন হতে হবে। প্রথমতঃ, তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে দর্শক কোনভাবেই একথা মনে না করেন যে তাঁদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, সংলাপের নামে বড় বড় বক্তৃতা পরিহার করে, বক্তব্যকে সহজ সাবলীল ঘটনাবলী এবং ছোট বাস্তব সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করতে হবে। তৃতীয়তঃ, নাট্যকারকে নজর রাখতে হবে—কোন নাটকের শেষে আলাদাভাবে নাটকের বক্তব্যকে যেন হাজির করা না হয়, কেননা এটা নাটকের দুর্বলতারই প্রকাশ।

এই প্রসঙ্গে যাত্রানাট্য রচনার দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে আমাদের নাট্যকারদের আহবান জানান হচ্ছে। সাধারণের অতি প্রিয় এবং নিজস্ব সম্পদ লোক-আঙ্গিককে পরিপূর্ণভাবে গণনাট্যের ভাবধারায় ব্যবহার করার জন্য যাত্রা রচনায় পারদর্শী হতে হবে। প্রযোজনার ক্ষেত্রে ও আনুসঙ্গিক বিষয়গুলি অর্থাৎ অভিনয়, বাদ্যযন্ত্র, আলো ও অন্যান্য বৈচিত্র্যগুলিকে সুসজ্জভাবে ব্যবহারে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

ভাষার প্রশ্নে আমাদের একথা মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য যে বাংলাদেশের শ্রমিকদের মধ্যে এক বিরাট অংশ বাংলা ভাষাভাষী নয়। তাঁদের বাদ দিয়ে

সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্ভব নয়, অতএব অন্যান্য ভাষায় বাংলা নাটকের অনুবাদ ও প্রযোজনা করার দিকেও আমাদের নাট্যকর্মীদের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

প্রযোজনা

বলিষ্ঠ নাটক শুধু রচনাতেই শেষ হয় না। নাটক রচনার উদ্দেশ্য তার মঞ্চাভিনয়। কাজেই শুধু উন্নতমানের নাট্য রচনা নয়, প্রযোজনার মান উন্নত করার দিকেও গণনাট্য কর্মীদের মনোযোগ দিতে হবে। এ বিষয়ে নিয়মিত অনুশীলন ও আন্তরিকতা একান্ত প্রয়োজন। নাট্য রচনায় যেমন বলিষ্ঠ এবং সমাজ চেতনা সম্পন্ন হওয়া উচিত, তেমনি পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং অন্যান্য নাট্যকর্মীদের যৌথ প্রয়াসে যে উপস্থাপনা হয় তাও বাস্তবানুসারী এবং শিল্প সম্মত হওয়া উচিত। প্রযোজনায় মান উন্নত করার জন্য বিভিন্ন শাখার কর্মীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন নাটকের আলোচনার প্রয়োজন আছে।

নাট্যকারদের আরো কিছু কর্তব্য

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপ্তির সাথে সাথে আমাদের নাটকের চাহিদা অসম্ভব বেড়ে গেছে। শ্রেণী সংগ্রামের বর্তমান বিকশিত অবস্থায় ঘটনা সংঘাতের মধ্য থেকে যে অসংখ্য কাহিনী প্রতিদিন সৃষ্ট হচ্ছে সেগুলিকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজে লাগাতে না পারলে এই অবস্থার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না, নাট্যকারদের এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে। এর জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালানো ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই উদ্দেশ্যেই গণনাট্য আন্দোলনের সাথী যে সব নাট্যকাররা আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন তাদের গণনাট্যের নাটক রচনায় উৎসাহিত করার দায়িত্বও আমাদের নিতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদ আজ অন্তর্দ্বন্দ্বে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন, স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে সে আজ পরাজয় বরণ করছে, তাই মরিয়া হয়ে সে নানা অপকৌশল অবলম্বন করছে এবং সাংস্কৃতিক দুনিয়ায় এক কদর্য অভিযান চালিয়েছে। অপসংস্কৃতির জোয়ারে সারা দেশকে ভাসিয়ে নিতে চাইছে, আর এই কাজে ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীও হাত মিলিয়েছে। একদল বুদ্ধিজীবীও এই হীন প্রচেষ্টায় সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। আবার শোধনবাদী ও হঠকারী চিন্তাধারাও বহুক্ষেত্রে এদেরই হাতকে শক্তিশালী করছে। এইসব চক্রান্তের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে সুতীব্র ঘৃণার সঞ্চার করবার জন্য আমাদের নাট্যকারদের এবং মঞ্চশিল্পীদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।

৬৭ সালে বাগবাজার রিডিং রুমে তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনে যে পর্যালোচনামূলক রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল তার একটা অংশ এখানে ছাপা হলো।

শিল্প ও শিল্পীর অধিকার রক্ষার সংগ্রাম

গণনাট্য সঙ্ঘ তথা গণনাট্য আন্দোলন একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভাবাদর্শের ঐতিহ্য সৃষ্টি করে তেমনি সামগ্রিক শিল্পী সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করে তোলে। নাট্য কণ্ঠরোধকারী নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করার জন্য, জাতীয় নাট্যশালা গড়ে তোলা, নাট্য আন্দোলন বিকাশের জন্য সরকারী সাহায্য দান, প্রমোদ-কর বিলোপ সাধন, নাট্য আন্দোলন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রবর্তন প্রভৃতি শিল্পী সমাজের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের দুর্বার চাপ শাসক-গোষ্ঠীকে বাধ্য করে নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল প্রত্যাহার করতে, জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করতে, রবীন্দ্রসদন প্রস্তুত করা এবং শিল্পীদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের আশ্বাস দিতে। কিন্তু শাসকশ্রেণী আন্দোলনের চাপে এগুলিকে যেমন স্বীকার করে নেয় তেমনি সাংস্কৃতিক জগতে তার শ্রেণী অবস্থানকে আরো জোরদার করার জন্য শিল্পের এইসব সংগঠন ও বিভাগগুলিকে তার শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার করতে সচেতনভাবে প্রচেষ্টা শুরু করে। এই সমস্ত দাবিগুলি স্বীকৃতিলাভের সাথে সাথে গণনাট্য আন্দোলনে নতুন কণ্ঠ ধ্বনিত হোল, গণনাট্য আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা জোরদার হল। সংস্কারবাদীরা সক্রিয় হয়ে উঠল, তারা আওয়াজ তুলল বুর্জোয়া সংস্কৃতির সঙ্গে গণনাট্য আন্দোলনকে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে, এর জন্য গণনাট্য আন্দোলনকে ব্যবসায়িক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। গণনাট্যের শিল্পীরা যদি ব্যক্তিগতভাবে বুর্জোয়া শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করে তবে গণনাট্য আন্দোলন এবং গণনাট্যের কর্মীরা সমাজে স্বীকৃতিলাভ করবে প্রভৃতি আওয়াজ তুলে গণনাট্য আন্দোলনকে বিপথগামী করতে তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফলে বুর্জোয়া চিন্তাধারাগুলি গণনাট্য আন্দোলনে ব্যাপকরূপ ধারণ করতে থাকে। তাই দেখি, সরকার কর্তৃক সঙ্গীত নাটক একাডেমী গঠন, লোকরঞ্জন শাখা প্রতিষ্ঠা, বেতার তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে চলচ্চিত্র প্রযোজনার ব্যবস্থা, পেশাদারী নাট্যমঞ্চ থেকে 'কর' প্রত্যাহার প্রভৃতি কাজ-গুলিকে সরকারের প্রগতিশীল ভূমিকারূপে গণনাট্য আন্দোলনের সম্মুখে উপস্থিত করা হল। ১৯৫৩ সালে বোম্বাইতে গণনাট্য সঙ্ঘের সপ্তম সম্মেলনের

সিদ্ধান্তের মধ্যে এর প্রতিফলন পরিস্ফুট হয়ে উঠল। এই সম্মেলন জনগণের শিল্প গড়ে তোলার জন্য সংস্কৃতি প্রেমিক, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কাছে জাতীয় স্বার্থে ক্ল্যাসিকাল ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্পচর্চার আহ্বান জানাল। লোক-সংস্কৃতির পুনর্জীবনের জন্য "দীর্ঘস্থায়ী" প্রচেষ্টার প্রতি দৃষ্টি দিল, "জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও বিশ্বশান্তি রক্ষা উভয়ের জন্য আমাদের সরকার কর্তৃক শিল্প ও সংস্কৃতিতে উৎসাহদান এই নতুন পর্যায়ে একটা বড় ঘটনা।" (সপ্তম সম্মেলনের রিপোর্ট)।

নবনাট্যের উদ্ভব

এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে গণনাট্যের আদর্শ এবং কর্তব্য বিরোধী চিন্তাধারাগুলি প্রতিষ্ঠা পেল। কিন্তু এই নীতি পরিবর্তনের পরেও 'স্বাধীন শিল্পের' প্রবক্তারা গণনাট্য আন্দোলনে রইল না. শাসকগোষ্ঠী এর সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। যে সাফল্যগুলি অর্জিত হয়েছিল, গণ-আন্দোলনের চাপে তাকে আরো বিকশিত করার সংগ্রাম সংগঠিত করার পরিবর্তে শুরু হল শাসকগোষ্ঠীর প্রসাদলাভের জন্য এক করুণ এবং মর্মান্তিক প্রতিযোগিতা। এর পরিণতি স্বরূপ দেখা গেল, এই সমস্ত শিল্পীদের গণনাট্যের পতাকাকে ফেলে দিয়ে নবনাট্যের আওয়াজে মুখর হয়ে উঠতে। কুশলী নাট্যকার এবং পরিচালকদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠল ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন। দাবি উঠল, সার্থক নাটক চাই, গণনাট্য রাজনীতি করেছে—নাটক করেনি, অতএব এখন থেকে শুধু নাটক করতে হবে, ভাল নাটক করতে হবে, এজন্য নাট্য সংস্থাগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, শুধু মাঝে মাঝে মত বিনিময়ের জন্যে মিলিত হতে হবে। অতএব গণনাট্য সঙ্ঘ তুলে দাও, "ফেডারেশন" গঠন কর। গণনাট্যের যুগ শেষ হয়েছে, এখন প্রয়োজন নবনাট্যের। গণনাট্যের কর্মীরা অর্থনীতিবাদের দ্বারা পরিচালিত হতে লাগল।

দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেউ দায়ী নয়', 'মশাল' প্রভৃতি নাটক প্রকাশিত হল। উৎপল দত্তের 'ঘুম নেই', অমর গাঙ্গুলির 'দ্বান্দ্বিক', 'ইস্পাত', 'জিজ্ঞাসা', বীরু মুখার্জীর 'ভাঙাগড়ার খেলা', 'চন্দন ডাঙার হাট' প্রভৃতি নাটকগুলির মধ্যে সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রতিফলিত হয়ে উঠল।

নেতৃত্ব থেকে উত্থাপিত আদর্শবিরোধী কাজকর্ম গণনাট্য আন্দোলনে আত্মকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, অর্থসর্বস্বতা ও পেশাদারী মনোভাবকে প্রবল করে তুলল। বিচ্ছিন্নতাবাদী, অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার এবং নিছক

চমক, ঝাঁকজমক ও বাজীমাতের প্রবণতা প্রযোজনায় প্রাধান্য পেতে লাগল। এর ফলে শিল্পকর্মে আমদানী হল নৈরাজ্যবাদী আবহাওয়া এবং গণনাট্য আন্দোলন ত্যাগের প্রবণতা। 'আধুনিক মানসিকতা ও জীবনবোধ', 'সাময়িক আনন্দ বিনোদনের উর্ধ্বে চিরন্তনের স্পর্শকামী শিল্প আকাঙ্খা ও শিল্পাদর্শ', 'ভাল নাটক', 'আরো ভাল নাটক।

বৈশাখী থেকে রূপান্তরী

১৯৬১ সাল। নাট্য আন্দোলনে আর একটি প্রগতিশীল নাট্য সংস্থা জন্ম নিল। ৪ঠা জুলাই রূপান্তরী গোষ্ঠী নিউ এম্পায়ার মঞ্চে সকাল ১০টায় জোছন দস্তিদারের 'বিংশোত্তরী' নাটক মঞ্চস্থ করলেন। জোছন দস্তিদার আগে ছিলেন বৈশাখী দলে। নানা মত বিরোধের ফলে উনি এবং চন্দ্রা চক্রবর্তী বৈশাখী থেকে চলে এসে রূপান্তরী প্রতিষ্ঠা করলেন।

পরবর্তী অবস্থায় 'দুই মহল' মঞ্চস্থ করেন রূপান্তরীর শিল্পীবৃন্দ ১৫ই জানুয়ারী ১৯৬২ সালে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে সকাল দশটায়। তাতে অভিনয় করেছিলেন, জগদীশ চক্রবর্তী, চন্দ্রা দস্তিদার (আগে ছিলেন চক্রবর্তী), সুদীপ্ত বসু, সন্তোষ বসু, নির্মল ঘোষ, আশুতোষ বাগল, চিন্ময় ঘোষ দস্তিদার, অশোক গাঙ্গুলী, কুমুদ পাল, জোছন দস্তিদার, মিলন মুখোপাধ্যায়, সুজিত ঘোষ, পঞ্চানন সাধুখাঁ, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপর্ণ ঘোষ দস্তিদার, চিত্রা চক্রবর্তী, তারক ঘোষ, টুলু মজুমদার, বীরেশ বসু, শিশির চন্দ্র। পরিচালনা করেন জোছন দস্তিদার।

এরা পরে যে সব নাটক মঞ্চস্থ করেন তা হলো :—জগদীশ চক্রবর্তীর 'প্রতিনিধি', 'অসমাপ্ত', জোছন দস্তিদারের 'স্বর্ণগ্রন্থি', 'কর্নিক', 'অমর ভিয়েতনাম'। ২৯শে জানুয়ারী 'অমর ভিয়েৎনাম' নাটকটির অভিনয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেন। এ প্রসঙ্গে সংগঠনের একটি ছাপা লিফলেট এখানে ছেপে দেওয়া গেল :—

পুলিশের কারসাজীতে "অমর ভিয়েৎনাম" নাটকের অভিনয় বন্ধ!

২৯শে জানুয়ারী :—সকালে (১০-৩০) "নিউ এম্পায়ার" মঞ্চে জোছন দস্তিদার রচিত ও পরিচালিত "অমর ভিয়েৎনাম" নাটক "রূপান্তরীর" মঞ্চস্থ করার কথা ছিল, কিন্তু নাটকটি মঞ্চস্থ করা যায়নি। কারণ প্রয়োজনীয় পুলিশ অনুমতি বহু প্রচেষ্টারও মেলেনি। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি যত ছোট মনে

হচ্ছে, আসলে কিন্তু তা নয়। পশ্চিম বাংলার শিল্পানুরাগী ও সর্ব্বসাধারণের কাছে সমস্ত ঘটনাটি জানাতে বাধ্য হচ্ছি।

নিয়মমাফিক গত ২০।১।৬৭ তারিখে খসড়া নাটকের কপি ও ২৯।১।৬৭ তারিখে নাটক মঞ্চস্থ করার অনুমতি পত্রের জন্য আমাদের আবেদন পত্র পুলিশের নির্দিষ্ট বিভাগের কাছে জমা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে "নিউ এম্পায়ারে" ও অন্যান্য কেন্দ্রের মাধ্যমে আমাদের প্রবেশপত্র বিস্তৃতভাবে বিলি করা হতে থাকে।

কারণ আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাস স্বীকৃত জীবনের ঘটনাকে নিয়ে যে নাটকটি লেখা, সে নাটক ছাড়পত্র পেতে কোন অসুবিধাই পাবে না। কিন্তু আশ্চর্য্য, গতকাল রাত সাড়ে আটটা অবধি নাট্যকার পুলিশের বিভিন্ন বিভাগে বৃথাই দৌড়াদৌড়ি করে সর্বশেষ শুনতে পেলেন যে নাটকের খসড়াটি শুধু বিভাগান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমস্তদিক বিচার করে আমরা যদি পুলিশ বিভাগের এই অদ্ভুত গাফিলতি স্বেচ্ছাকৃত বলে ধরে নিই, তাহলে কি ভুল করা হবে? কার্য্যধারাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলা যেতে পারে না? এটাকে শিল্পের উপর সরকারের হস্তক্ষেপ বলেই কি ধরতে পারি না? সর্বশেষ, এই ঘটনাটি ভারত সরকারের অতি পরিচিত "মার্কিন তোষণনীতির" একটি নজীর নয় কি?

বিচারের ভার সাধারণ মানুষের কাছেই রইল!

১৯৬৭ সালের ২৯শে জানুয়ারী গণশক্তি পত্রিকায় এই নাটক বন্ধ নিয়ে একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, তা এখানে ছেপে দেওয়া গেল।

গণশক্তি

২৯শে জানুয়ারী, ১৯৬৭

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আত্মসম্মানের স্বরূপ এই মহানগরীর একটা ঘটনায় প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

রূপান্তরী শিল্পীসংস্থা রচনা করেছেন "অমর ভিয়েৎনাম" নাটক। সেই নাটক আজ রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ারে অভিনীত হবার কথা ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় এই নাটক অভিনয় বন্ধ রাখতে হয়।

এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সংগে সংগে হাজার হাজার মানুষ নিউ এম্পায়ারের সম্মুখে সমবেত হয়ে কংগ্রেস সরকারের প্রতি ধিক্কার জানায়।

আনন্দবাজার পত্রিকাতেও ঐ নাটক বন্ধ নিয়ে ৩০শে জানুয়ারী '৬৭ সালে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, সেটাও ছেপে দেওয়া হলো।

অভিনয় বাতিল

রূপান্তরী নাট্য গোষ্ঠীর অমর ভিয়েৎনাম নামে একটি নাটক গত ২৯শে জানুয়ারী সকালে নিউ এম্পায়ারে অভিনয় হবার কথা ছিল। সরকারী অনুমোদনের অভাবে অভিনয় হয়নি। উক্ত সংস্থার সম্পাদক সোমবার একটি বিবৃতিতে ওই ঘটনার উল্লেখ করে সরকারী নীতির নিন্দা করেছেন।

১৯৭২ সালে রূপান্তরী নতুন বক্তব্য হাজির করলেন আমাদের সামনে জোছন দস্তিদারের 'গন্ত পন্ত প্রবন্ধ' নাটকের মাধ্যমে। এই নাটকে নাট্যকার যা বলেছেন তা হলো '৭২-এ এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশে বেকার বাড়ছে আর সেই হতাশাগ্রস্ত বেকারদের সামান্য কিছু লোভ দেখিয়ে যারা ক্ষমতায় বসে আছেন, যাদের পেছনে আছে পুলিশ, সেই ভদ্রলোকেরা নানাভাবে কাজে লাগাচ্ছে। সব থেকে দুঃখের যা তা হচ্ছে লোভের বশবর্তী হয়ে যে বেকার যুবকরা এগিয়ে চলেছে সামান্য কিছু পাবার আশায়, শেষ অবধি তারা কিন্তু শিকারে পরিণত হচ্ছে। অনেক ক্ষয় ক্ষতির পর যখন জ্ঞান ফিরে আসছে, অনেক কিছু হারিয়ে যখন কিছুই পেল না, আবার কিছু পেল, যা পেল তা হচ্ছে বেঁচে থাকার দরজা দেখতে পাওয়া বলা যায়। গত ৫ই জুন মুক্তাঙ্গন মঞ্চে এই নাটক অভিনয় হয়। পরিচালনায় ছিলেন জোছন দস্তিদার।

নট-নাট্যম

১৯৬১ সাল। সুদূর লক্ষ্ণৌতে বেঙ্গলী ক্লাবের উদ্যোগে সর্ব্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় বিচারকের আসনে বিজন ভট্টাচার্য্য, রমেন লাহিড়ী ও আমি ছিলাম। সেখানে বসে অনেক নাটকের মধ্যে একটি নাটকের পরিবেশনা আজও ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি তাদের প্রতিটি চরিত্রের অভিনয়, তাদের পরিবেশনার কায়দা। সিনেমার পর্দায় যেমন ক্যামেরা আমাদের চোখকে টেনে নিয়ে যায় বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। জগমোহন মজুমদারের 'পাখীর বাসা'ও তেমনি একটার পর একটা পরিবেশের সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য, বিশেষ করে শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি হতাশাগ্রস্ত মানুষের চরিত্র অভিনয়ের কথা আজও ভুলিনি। এ যুগের অস্থির বিভ্রান্তময় জীবনের ছবি এই নাটকে পাওয়া যায়। প্রযোজনায় ছিলেন নট-নাট্যম। এদের সঙ্গে পরিচয় ৬১ সালে পাখীর বাসা দিয়ে। কিন্তু

এদের শুরু অনেক আগে। ১৯৫২ সালে 'উদয়ের পথে'—জ্যোতির্ময় রায়, 'রমা' —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' দিয়ে অভিনয় আরম্ভ করেন এরা। ১৯৫৩ সালে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ করলেন।

১৯৫৫ সালে রাখাল নাহার 'ইঙ্গিত', শ্রীবাস্তবের 'মহাযুদ্ধের একাঙ্ক', ৫৬ সালে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরাণীর জীবন,' অমিয় মুখোপাধ্যায়ের 'চক্রান্ত', অভিনয় করলেন।

১৯৫৭ সালে এই দলের কর্মকর্তা জগমোহন মজুমদারের '১৮৫৭' মঞ্চস্থ করলেন। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্ট মাষ্টার' 'সম্পত্তি' 'সমর্পণ' শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' নাট্যরূপ জগমোহন মজুমদার, ৫৮ সালে শ্রমিক জীবনের বেদনাকে নিয়ে জো কুরী থেকে 'জগমোহন মজুমদারের 'ওয়াকাজ করে'। আগাথা কৃষ্টি থেকে মুরারি মোহন সেনের 'ডার্করুম', ১৯৫৯ সালে ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'কানাগলি'। ১৯৬০ সালে জগমোহন মজুমদারের "করুণা কোরো না" মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকটি খুবই পরিচিত বলা যায়। ১৯৬২ সালে পরিমল দত্তর আধুনিক কালের একাংক 'ব্যাণ্ড মাষ্টার', জগমোহন মজুমদারের 'আহ্বান'। ১৯৬৫ সালে জগমোহন মজুমদারের 'মেকআপ', 'বিজ্ঞাপন', অভিনয় করেন। ৬৬ সালে আন্তন চেখভ অবলম্বনে রমেন লাহিড়ীর 'রাজযোটক,' জগমোহন মজুমদারের 'মেয়েটির নাম', 'বাসনার মৃত্যু', 'শঙ্কর', 'ভেজাল', 'সাপুড়ের বাঁশী', সোমেন চট্টোপাধ্যায়ের 'সূচীপত্র'। ওদের সর্ব্বশেষ নাটক 'শঙ্কর' ই আর মঞ্চ হাওড়ায় ১৫ই জুন ৬৯ সালে অভিনয় হয়। বিভিন্ন সময়ে নট-নাট্যমে অভিনয় করেন—প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, হারাধন চক্রবর্ত্তী, কমল মুখোপাধ্যায়, গোপী বন্দ্যোপাধ্যায়, জগমোহন মজুমদার, ভবানী লাল চৌধুরী, শিবনাথ সরকার, সলিল মিত্র, বিশ্বম্ভর ধাড়া, দেবু চট্টোপাধ্যায়, সোমেন চট্টোপাধ্যায়, সমীর পাত্র, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনমনি ভট্টাচার্য, ফণী গুঁই।

এদের নাট্য নির্দেশক জগমোহন মজুমদার। আলো—বাবুলাল ঘোষ। দৃশ্য—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শব্দ প্রক্ষেপণ—পারুল বেতার, সঙ্গীত—কনিষ্ঠ সম্প্রদায়। অংশ গ্রহণে কমল কুমার মল্লিক, শচীন মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা দাস, মীরা ভট্টাচার্য্য, আরতি দাস, শচীন বাবু, কমল মুখোপাধ্যায় ও অরুণ মুখোপাধ্যায়।

দুর্বার

১৯৬১ সাল। যখন দিকে দিকে রবীন্দ্র শতবর্ষ উদযাপন হচ্ছে। পার্কসার্কাস ময়দানে একটা জাতীয় উৎসব হচ্ছে। সেই সময়ে দুর্বার নাট্য সংস্থা

রবীন্দ্রনাথের উপর নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি হাসির নাটক নিয়ে নতুন ভাবে যাত্রা শুরু করলেন। নাটকের নাম 'এমনও দিন আসতে পারে'। এদের প্রথম অভিনয় হয় ২রা এপ্রিল এ, বি, টি, এ হলে। দ্বিতীয় অভিনয় হয় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্য উৎসবে রঙ্গী স্টেডিয়াম ইনডোরে। নির্দেশনায় ছিলেন মনি বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ নাটক প্রায় পঞ্চাশ রাত্রি ওরা বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় করেন। আজও ওরা নাটক অভিনয় করছেন। আজকের নাটকের নাম একটি বিদেশী নাটক টুয়েলফ্ এ্যাঙ্গরি মেন অবলম্বনে "একটা বিচার হচ্ছে"। রূপান্তর নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্দেশনায় মনি বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়াংশে যারা আগে ছিলেন আজও আছেন: বিমান দেব, দেব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীতি রায় চৌধুরী, সুনীত মিত্র, হরেন ভৌমিক, সুকুমার ঘোষাল, অশোক গুহ, অর্জুন মল্লিক, মনি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন মিত্র, রবীন চট্টোপাধ্যায়, শান্তি মুখার্জী, রমাপ্রসাদ গোস্বামী, লাল কমল মুখোপাধ্যায়, মধু বসু, মিহির ভট্টাচার্য ও বিজন মিত্র।

সপ্তর্ষি

১৯৬২ সাল। বিশ্বরূপা মঞ্চে একটি নাটক অভিনয় হল গৌরচন্দ্র সাহার "দুরন্ত ঝড়"। পাহাড়ী মেয়ের জীবনের প্রেমের কাহিনী নিয়ে লেখা এই নাটক অভিনয় করলেন সপ্তর্ষি। জানা গেল এরা ১৯৬০ সালে মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত মহারাজ নন্দকুমার প্রথম অভিনয় করেন। এরপর এরা 'মিশরকুমারী' মঞ্চস্থ করেন। ৭১ সালে ৭ মার্চ রঙ্গনায় দুটি একাংক ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রস্তাবনা' ও বসন্ত ভট্টাচার্য্যর 'সারি সারি পাঁচিল' অভিনয় করেন। এরপর এই সংস্থা গৌরচন্দ্র সাহার 'যুগান্তর' পৌরাণিক কাহিনীকে আধুনিক কায়দায় প্রযোজনা করেন ১৯৭১ সালে রঙ্গনাতে। এছাড়া নাট্যকারের 'এরাও বাঙ্গালী' অভিনয় করেন, এই নাটকে বাঙ্গালী চরিত্রের গৌরবময় ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন।

বিভিন্ন সময়ে অভিনয়ে ছিলেন গৌর চন্দ্র সাহা, উমাশংকর বসু, নারায়ণ ঘোষাল, অনিল কুমার চ্যাটার্জী, ভক্তিপদ সাহা, জগৎ মিত্র, অবন্তী গিরি, প্রণব কুমার ঘোষ, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, গৌরীশংকর দাস, সিদ্ধেশ্বর সাঁই, অজিত কুমার নন্দী, সুপ্রভাত বসু, কমল মিত্র, প্রভাত কুমার সেন, রণেন্দ্র নারায়ণ বসু, মুক্তিকাম সাহা, নিখিল মুখার্জী, দীপেন সরকার, জ্যোৎস্না চ্যাটার্জী, রানু রায়, সবিতা মুখার্জী, কাজল মুখার্জী, মঞ্জুশ্রী চ্যাটার্জী, তৃপ্তি দাস, শিপ্রা সাহা, বাণী মিত্র, আশা ঘোষ।

পরিচালনায়—নট-নাট্যকার গৌরচন্দ্র সাহা, সুরকার—উমাশংকর বসু, আলো—বংশী দাস (বিশ্বরূপা), অজিত মিত্র (রঙ্গনা), আবহ সঙ্গীত—নারায়ণ চন্দ্র ঘোষাল, মুরারী ভড় ও দিলীপ ঘটক, রূপকার—মৃণাল পাল (পাল এণ্ড কোং), মদন মোহন চিত্রকর (বি, ব্রাদার্স)।

নাটকের কণ্ঠরোধ

নাট্য সংকটে জনমত

১৯৬৩ সাল। আবার নাটকের কণ্ঠরোধ। ১৮৭৬ সালের সাম্রাজ্যবাদের সেই কুখ্যাত আইন হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো পশ্চিমবঙ্গের সরকার নাটকের উপর কাঁচি চালাতে। দেশের মানুষের মধ্যে যখন গণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধে যখন দেশের শ্রমিক, কৃষক, খেটে যাওয়া মানুষ ফেটে পড়ছে, সরকার কোন দিক দিয়েই আর তাদের স্তব্ধ করতে পারছে না, চারদিক দিয়ে নাজেহাল হয়ে শেষে নাটকের ওপর সাঁড়াসি আক্রমণ চালাতে এগিয়ে এলো। সরকারী ফতোয়া জারি হোল। পুলিশ কর্তৃপক্ষ যে নাটক ঠিক করে দেবে এক মাত্র সেই নাটকই মঞ্চস্থ হবে। শিল্পী নাট্যকার সাহিত্যিকরা কিন্তু সরকারের এই ফতোয়া নীরবে মেনে নিল না। তারই কিছু কিছু লেখা নাট্য সংকটে জনমত নামে একটা পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল সুখময় চক্রবর্ত্তীর সম্পাদনায় সারা বাংলা নাট্যানুষ্ঠান বিল আলোচনা সম্মেলনের পক্ষ থেকে, আমি সেই পুস্তিকার বেশ কিছু অংশ ছেপে দিলুম।

সারা বাংলা নাট্যানুষ্ঠান বিল আলোচনা সম্মেলন

আহ্বায়ক এবং প্রস্তুতি পরিষদ সদস্য :

সত্যজিৎ রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, সুনন্দা ব্যানার্জী, সরযূ দেবী, তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, বাণী গাঙ্গুলী, সীতা মুখোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাস, ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, কমল মিত্র, তারাপদ লাহিড়ী (এ্যাডভোকেট), কৃষ্ণ কুণ্ডু, সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, ডঃ অজিত ঘোষ, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্ত, তরুণ রায়, সলিল সেন, সুধী প্রধান, বীরেশ্বর সেন, সবিতাব্রত দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, দেবী নিয়োগী, অমর গাঙ্গুলী, তাপস সেন, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, জলেন্দ্রনারায়ণ দত্ত, পীযুষ বসু, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রবর্তী, গৌরচন্দ্র ঘোষ, সুখময় চক্রবর্তী, ত্রিদিব

লাহিড়ী, হরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, সমীর চক্রবর্তী, কিরণ মৈত্র, সুনীল দত্ত, জোছন দস্তিদার, রমেন লাহিড়ী, হরিনারায়ণ চক্রবর্তী, মণ্টু গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশংকর, সুজিত সেনগুপ্ত, নিখিল রঞ্জন সেন, নবকুমার গড়াই, অধ্যাপক করুণ মিত্র, খগেন রায়, নারায়ণ ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ বসাক, প্রদীপ মজুমদার, ইন্দু চক্রবর্তী, পশুপতি কুণ্ডু, সৌমেন্দ্র কুণ্ডু, অবিনাশ দাশগুপ্ত, বীরেশ মুখোপাধ্যায়, সমরেশ দাশগুপ্ত, সুবোধ বসু, রামানন্দ সেনগুপ্ত, হরিপদ বায়েন, রঞ্জিত দত্ত, ধীরেন্দ্র নাথ রায়, অশ্বিনী কুমার দাস, অসীম চক্রবর্তী, পাঁচু মুখার্জি, শম্ভুনাথ ঘোষ, প্রবীর সেন, কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রসাদ চন্দ্র ঘোষ, অলক চট্টোপাধ্যায়, হিমাদ্রি ঘোষ, তিনকড়ি সাহা, লালচাঁদ চন্দ্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশংকর বর্মণ, নবকুমার লাহিড়ী, সখা চক্রবর্তী, রাধাবল্লভ সাহারায়, অমূল্য সান্যাল, অজিত ভৌমিক, অমূল্য পুরকাইত, দেবেশ সান্যাল, অধ্যাপক সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য, নারায়ণ চন্দ্র নন্দী, প্রমোদ লাহিড়ী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মণ্টু চক্রবর্তী, রবীন মজুমদার, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অভয় চরণ সাহা, অজিত দত্ত, রাণা বসু, আশুতোষ সাহা, প্রশান্ত সেন, অরবিন্দ চক্রবর্তী, জিতেশ সান্যাল, অহীন্দ্র ভৌমিক, অধ্যাপক সত্যব্রত দাশগুপ্ত, আশীষ দে, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, নন্দ রায়, কানাই সেন, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত মজুমদার, প্রেমাংশু বসু, রঞ্জিত চক্রবর্তী, বি, কল্যাণ, শান্তিগোপাল, নির্মল সরকার, অজিত মিত্র, জলধর চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ নাট্যশিল্পীগণ।

॥ সভাপতি ॥	॥ সম্পাদক ॥	॥ কোষাধ্যক্ষ ॥
মন্মথ রায়	হাবুল দাস	চারুপ্রকাশ ঘোষ

গত ১৯৬২ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের একটি অতিরিক্ত বিশেষ সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গে নাট্যাভিনয় সুষ্ঠুতর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রচিত West Bengal Dramatic Prefromances Bill, 1962 সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিল আইনে পরিণত হইলে উহা দ্বারা পশ্চিম বাংলার নাটক ও নাট্যশালার তথা নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হইবে। শুধু মঞ্চনাটক নহে, যাত্রা, কবিগান, তরজা, কথকতা, কীর্তন, এমন কি সঙ্গীতালেখ্য এবং আবৃত্তিও এই আইনের কবলিত হওয়ায় বিলটি জাতীয় সংস্কৃতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই বহু নাট্য সংস্থা ও সাংস্কৃতিক সংস্থা বিলটিকে জাতীয়

সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাতরূপে গণ্য করিয়াছেন। বহু পত্র-পত্রিকাও বিলটিকে ডিক্টেটরী মনোভাবপ্রসূত অগণতান্ত্রিক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বিলটিকে সম্যক্ আলোচনার জন্য আহূত গত ১৩ই মে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত সারা বাংলার নাট্যসংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বমূলক এক সম্মেলন বিলটির সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

বিলটির সম্যক্ আলোচনা-সম্বলিত এই প্রচার-পুস্তিকা দেশবাসী এবং সরকারের নিকট নিবেদিত হল।

মন্মথ রায় সভাপতি,

সারা বাংলা নাট্যানুষ্ঠান বিল আলোচনা সম্মেলন—১৫ জুন, ১৯৬৩

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব

বিভিন্ন যাত্রাদল, নাট্য সংস্থা, নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নাট্যকার মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে ১২ই মে ১৯৬৩ তারিখে কলিকাতা ষ্টুডেণ্টস হলে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব ১৩ই মে ১৯৬৩ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য অধিবেশনে সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাব :—

নাটক ও নাট্যশালার স্বাভাবিক বিকাশ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরাধীন ভারতে ১৮৭৬ সালে বিদেশী শাসকবর্গ যে নাট্যানুষ্ঠান আইনের প্রবর্তন করে-ছিলেন তার বিরুদ্ধে কেবল বাংলা দেশেই নয়, সমগ্র ভারতেই বিক্ষোভের অন্ত ছিল না। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সংবিধানের ১৯ ধারা অনুযায়ী যখন নবপর্যায়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হলো, তখন দেশবাসী স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিল যে গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার ব্রিটিশ আমলের এই বহুনিন্দিত আইনটি বাতিল বলে ঘোষণা করবেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, জন-প্রত্যাশা ও দাবী অগ্রাহ্য ক'রে স্বাধীন ভারতেও নাটক ও নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইনের অসঙ্গত প্রয়োগ চলছে। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকার-পৃষ্ঠপোষিত সঙ্গীত নাটক একাডেমির ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত সেমিনারেও ১৮৭৬ সালের নাট্য সংক্রান্ত আইন নাটকের উন্নতির ও বিকাশের পথে সর্বপ্রধান বাধা বলে ঘোষণা করা হলো এবং আইনটি প্রত্যা-হারের দাবী করা হলো। অতঃপর মহামান্য এলাহাবাদ হাইকোর্টও উক্ত

আইন সংবিধান-বিরোধী ও বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন। ক্ষোভের বিষয় এই, যে বর্জনীয় আইনটি স্বাভাবিকভাবেই একটি ভারতীয় হাইকোর্টের স্থায়-বিচারে বাতিল বলে গণ্য হ'য়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ততোধিক নাট্য-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি নতুন নাট্যানুষ্ঠান বিল বিধিবদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন। কারণ, প্রস্তাবিত বিলে দেখা যায়:

(ক) ১৮৭৬ সালের নাট্যানুষ্ঠান আইনে অভিনয়োদ্দেশ্যে নাটকের প্রাক্-অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা বা সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না এবং উক্ত আইনের বিধানগুলি একমাত্র প্রকাশ্য স্থানে ও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আয়োজিত নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু নতুন বিলে এ দু'টি বিষয়ই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(খ) পূর্ব আইনে আইন ভঙ্গের দরুন শাস্তি হিসাবে তিন মাস কারাদণ্ড বা পঁচিশ টাকা জরিমানার যে বিধান ছিল প্রস্তাবিত বিলে তা' বাড়িয়ে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড ও একহাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বিলে নাটকের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে তদনুযায়ী মঞ্চ নাটক বাদেও যাত্রা, নৃত্য, ছায়ানাট্য, মূকাভিনয়, জলসা, কবিগান, তরজা, কীর্তন, আবৃত্তি অর্থাৎ যাবতীয় প্রমোদানুষ্ঠানই এই আইনের আওতায় এসে পড়বে। অথচ ১৮৭৬ সালের আইনে যাত্রা ও ধর্মোৎসব সংক্রান্ত অনুষ্ঠান-সমূহকে বিশেষভাবে আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরূপ ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের ফলে বাংলা দেশের গোটা সাংস্কৃতিক জীবনই বিপন্ন ও সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়বে।

আপত্তিকর নাট্যানুষ্ঠানের সংজ্ঞা-নির্দেশ বিলে যে সব বিধান লিপিবদ্ধ হয়েছে তার অনেকগুলিই অসঙ্গতিপূর্ণ ও হাস্যকর; যেমন সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, হিংসা, হত্যা, অশোভনতা, অর্থ আদায়ের জন্য অসদুপায় অবলম্বন প্রভৃতি। এগুলি নাটক থেকে বাদ দিতে হ'লে শুধু সমসাময়িক নাটকই নয় অনেক ক্লাসী নাটকই বাদ হ'য়ে যাবে এবং প্রশাসনিক কর্মচারীদের অপব্যাখ্যার দরুন বহু নাটকই অভিনয়-ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রস্তাবিত বিলে নাট্যানুষ্ঠানের জন্য স্থানভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক লাইসেন্স ও মঞ্জুরী ফি ধার্য করে নাট্য শিল্পের ওপর এক গুরুভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাট্য-আন্দোলনের অবাধ প্রসারই যেখানে গণতান্ত্রিক সরকারের কাম্য হওয়া উচিত সেখানে এরূপ আর্থিক বোঝা চাপিয়ে নাট্যকলাকে আরও

সঙ্কুচিত করার প্রয়াস অবশ্যই নিন্দনীয়। এক্ষেত্রে অভিনয় আসরের লাইসেন্স ও নাট্যানুষ্ঠানের বিষয়বস্তুর মঞ্জুরীর অধিকার পুলিশ কমিশনার ও জেলা শাসকের হস্তে ন্যস্ত করা জাতীয় সংস্কৃতির পক্ষে অমর্যাদাকর। সাধারণভাবে অপেশাদার প্রতিষ্ঠানসমূহকে নাট্যানুষ্ঠানে অবাধ অধিকার দেবার পরিবর্তে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে আইনের আওতা থেকে অব্যাহতি দেবার ক্ষমতা প্রশাসনিক কর্মচারীদের হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় স্বজন-পোষণ, দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব প্রশ্রয় পাবার প্রচুর আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া নাট্যানুষ্ঠানের অনুমতি লাভের জন্য প্রার্থীদের যাবতীয় তথ্য সরবরাহে বাধ্য করা ও অন্য সূত্রে প্রাপ্ত খবরের উপর নির্ভর করে প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচারের নীতিও অত্যন্ত আপত্তিকর ও অপমানজনক।

নাটক ও নাট্যানুষ্ঠানের মঞ্জুরী প্রত্যাখ্যাত হ'লে আদালতে আপীলের যে অধিকার বিলে স্বীকৃত হ'য়েছে তাও অর্থহীন; কারণ তদ্দরুন মামলার ব্যয়বাবদ অনর্থক অর্থব্যয়, সময়ের অপচয় ও হয়রানিই সার হবে। সেরূপ অনিশ্চিত অবস্থায় নাট্যানুষ্ঠানের কোন তারিখ নিরূপণ করা দায় হবে এবং স্বভাবতই নাট্যামোদীদের নাট্যোৎসাহ দমিত হবে। নাটকের প্রাক্-অনুমোদন যদি প্রতিক্ষেত্রেই আবশ্যিক হয় তবে ঈসকাইলাস, কালিদাস, সেক্সপীয়র থেকে আরম্ভ করে মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, এমন কি রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়ও পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের অনিশ্চিত মর্জির ওপর নির্ভরশীল হবে।

প্রস্তাবিত বিল আইনে পরিণত হোলে কেবল যে অভিনয় আসরের জন্য দু'শ টাকা পর্যন্ত লাইসেন্স ফি এবং নাট্য বিষয়বস্তুর অনুমোদনের জন্য পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত মঞ্জুরী ফি-এর দুর্বহ বোঝা নাট্য-শিল্পীদের কাঁধে চাপবে এমন নয়; পরন্তু আইনের শ্বাসরোধী ব্যবস্থায় নাট্যানুষ্ঠান সঙ্কুচিত হবার ফলে বহু নাট্যশিল্পী, মঞ্চশিল্পী, রূপকার, সজ্জাকর প্রভৃতি বেকার হোয়ে পড়বেন। নাটকের প্রসার কমে যাওয়ার দরুন নাট্যকার এবং নাটক প্রকাশকদের চরম আর্থিক দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। এতদ্ব্যতীত অভিনয়ভাগ্য অর্জনের অনিশ্চয়তা ও দুরূহতার ফলে নাট্য রচনার উৎসাহ নির্বাপিত হ'য়ে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ নাটকের অপহৃব ঘটবে। এই বিলের সামগ্রিক তাৎপর্য অনুধাবন করলে এমন অনুমান হওয়াই স্বাভাবিক যে ভবিষ্যতে রাজ্য সরকার সকল সাহিত্যকর্মের উপরই সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেন।

চিন্তার অসীমতা ও তা' প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা স্বীকার করা গণতন্ত্রের একটি মৌল নীতি। বুদ্ধিজীবীদের সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অর্থই গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা। প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলে নাট্যশিল্পের ওপর প্রত্যক্ষভাবে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়াস প্রকট বলেই বিলটি অগণতান্ত্রিক। একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কতন্ত্র ছাড়া কোনো গণতান্ত্রিক কাঠামোতেই নাট্যকলাকে একান্তভাবে সরকারের কুক্ষিগত করার জন্য এরূপ আইনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কুত্রাপি দেখা যায় না।

শিল্প-সাহিত্যের চূড়ান্ত বিচারক জনসাধারণ। অতএব তার বিচারের ভার জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দেওয়াই গণতন্ত্রসম্মত। শাসকবর্গের অনভিপ্রেত শিল্পকলাও সর্বসাধারণের বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করে ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অশ্লীল, সমাজবিরোধী, জাতীয়স্বার্থহানিকর নাটক জনসাধারণই বর্জন করবে। তাদের শুভবুদ্ধিকে অবিশ্বাস করলে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিতেই কুঠারাঘাত করা হয়। নিতান্ত তাতেও নির্ভর না করতে পারলে উপরোক্ত শ্রেণীর অবাঞ্ছিত নাটক বন্ধ করার জন্য সরকারের হাতে আপৎকালীন অবস্থায় ভারত রক্ষা আইন ও স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতীয় দণ্ডবিধি ও ফৌজদারী কার্যবিধি রয়েছে। সে সব আইনের সাহায্যে সরকার অনায়াসেই যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। তৎসত্বেও নাট্যানুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এরূপ একটি সংবিধানবিরোধী অগণতান্ত্রিক আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হওয়া স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচায়ক। বাংলাদেশের নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও সংস্কৃতিসেবীদের এই সম্মেলনের দৃঢ় মত এই যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলটি অহেতুক, অবিবেচনাপ্রসূত ও বাংলা দেশের সামগ্রিক সংস্কৃতির পক্ষে সর্বনাশকর। অতএব বিলটি সার্বসাকুল্যে অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য এই সম্মেলন সর্বসম্মতভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের নিকট দাবী জানাচ্ছে। 'রাজ্য সরকারের ঘোষিত গণতান্ত্রিক নীতিতে আস্থা রেখে এই সম্মেলনে আশা করে যে, স্বাধীনতা সংগ্রাম, জাতি গঠন ও স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলাদেশের নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও সংস্কৃতিসেবীদের অবদানের কথা স্মরণ করে সরকার এই জনমতের যথোচিত মর্যাদা দেবেন এবং জাতীয় সংস্কৃতির অবাধ অগ্রগতির স্বার্থে জাতীয় সরকার এরূপ কোনো আইন প্রণয়নে বিরত থাকবেন।

এই সম্মেলন আরও প্রস্তাব করছে যে, প্রস্তুতি কমিটি এই প্রস্তাবের

অনুলিপি অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের নিকট পেশ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে পারবেন। বিলটি যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত না হয় ততদিন প্রস্তুত কমিটী কাজ চালিয়ে যাবেন এবং বিলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জনমত গঠন করবেন।

এই সম্মেলন বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা, নাট্যানুরাগী জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদের নিকট আবেদন জানাচ্ছে যে তাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলে সভা সম্মেলনের মাধ্যমে এই অশুভকর বিলের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের নিকট পেশ করুন।

এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পেশাদার-অপেশাদার নাট্যসংস্থা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে বিলটি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যেন তাঁদের আয়োজিত প্রতিটি অনুষ্ঠানেই এই সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাবের মর্ম পাঠ ও আবশ্যকবোধে অন্যবিধ প্রচারের মাধ্যমে বিলটির সম্যক্ প্রতিবাদ করেন।

প্রস্তাবক : গঙ্গাপদ বসু (সভাপতি : বহুরূপী)
সমর্থক : সুধী প্রধান (নবনাট্য আন্দোলন-প্রতিনিধি)

সম্মেলনে প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণ হইতে উদ্ধৃতি

সুধী প্রধান (নবনাট্য আন্দোলন)

....স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে এই বিল রচিত হয়েছে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রিত করার জন্য অথবা সেই সব নাট্যাভিনয় করতে দেওয়া হবে যা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পাবে। সরকার যদি সোজাসুজি সে কথা বলতেন তাহলে কাজটা সহজ হোত। যাঁরা পুলিশ কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটদের মতানুযায়ী নাট্যাভিনয় করতে চাইবেন তাঁরা ছাড়া আর সকলে নাট্যজগৎ থেকে বিদায় নিতেন। দেশের জন্য মেয়েরা সোনাদানা ছাড়ছেন আর ছেলেরা নাটক করা ছাড়তে পারবে না?

কিন্তু সমস্যাটা কেবল রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিকও বটে। বাংলার বহু নটনটী আজ যাত্রা থিয়েটার করেন। মফঃস্বলে ও শহরে ট্যুরিং পার্টি নিয়ে গিয়ে রুজি রোজগার করেছেন। এঁদের সঙ্গে প্রতিপালিত হচ্ছেন যাঁরা মঞ্চ ভাড়া দেন, সাজ-সজ্জা, আবহসঙ্গীত, আলোক নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। বর্তমান বিল কার্যকরী হলে এই সকল নটনটীর সঙ্গে পূর্বোক্ত

সম্প্রদায়গুলির রুজি রোজগারও বন্ধ হবে আমার আশংকা। স্বর্ণশিল্পীদের আত্ম-হত্যার খবর আমরা রোজ সংবাদপত্রে পড়তে পাই—এরপর মঞ্চ-শিল্পীদেরও সেই পথে চলতে বাধ্য করা হবে?

বাংলার নাট্যশালা এখনও সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করেনি। জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের নাট্যশালার সঙ্গে আমাদের রঙ্গমঞ্চ এখনও অনেক বিষয়ে তুলনীয় নয়। কিন্তু জাতির পরিচয় তার রঙ্গমঞ্চে; সুতরাং জগতে বড় জাতি বলে পরিচিত হতে হলে উন্নত নাট্যশালার প্রয়োজন। নাট্যশালাকে উন্নত করতে হলে সর্বাগ্রে মনের ভিতর থেকে নাট্যশালা সম্বন্ধে যে-অমুদার ভাব আছে তাকে দূর করা দরকার। নাট্যশালা জাতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই নাট্যমঞ্চে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্যগীত, অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস—নাট্যে সকলেরই বিকাশ। সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা নাট্যকার। সাহিত্যের মুকুটমণি নাট্য। অভিনয় ব্যতিরেকে নাট্য সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্যশালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন। —শিশিরকুমার ভাদুড়ী

পত্র-পত্রিকার অভিমত: অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬

১৮৭৬ সালের নাট্যাভিনয় আইনটি ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে চালু হলে স্বাধীনভাবে নাট্যাভিনয়ের পথে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করে। ঐ বছরের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকা (তখন বাংলা কাগজ) লিখেছিলেন: "এ আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা গবর্নমেণ্ট আমাদের উপর আর একটি শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে নির্জীব হইয়া আছি। গবর্নমেণ্ট যদি আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক সমুদয় কার্যের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এরূপ স্থানে গমন করিবে যেখানে আর ইংরেজ-শাসনের ভ্রূকুটিতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।"—
অমৃত, ১২ই এপ্রিল, ১৯৬৩।

দৈনিক বসুমতী, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৩। নাট্যকলা নিয়ন্ত্রণ?

....গত ১০ই ডিসেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে ১৯৬২ সালের পশ্চিমবঙ্গ নাট্যাভিনয় বিলের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে আমাদের স্বদেশী কংগ্রেসী শাসকেরা বিদেশী ইংরাজ শাসকের উপরেও এক-

হাত দিয়াছেন। যদিও এই বিলের উদ্দেশ্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে "নাট্যাভিনয়কে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত" করা, তথাপি আসলে ইহার ধারা ও উপধারাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সরকারী মর্জি ও হুকুম ছাড়া এবং সেই সঙ্গে একটা মোটা টাকা লাইসেন্স ফী হিসাবে গণিয়া না দিলে পশ্চিম বাঙলায় আর নাটকের অভিনয় করা যাইবে না। পেশাদার বা অপেশাদার সকলের পক্ষেই বিপদ এবং এই বিপদ আসিতেছে কখন, যখন 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজের' দমকা হাওয়ায় একরাশ ধূলি উড়িয়া অসতর্ক এবং নির্দোষ পথচারীদের অন্ধ হইবার উপক্রম। সাহিত্যের স্বাধীনতাওয়ালারা বাঙালা নাটকের উপর এই আক্রমণের মুখে চুপ করিয়া আছেন কেন? সাহিত্যের উপর সরকারী খবরদারির যাঁরা ঘোরতর বিরোধী, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবীতে যাঁরা পার্ক ও স্কোয়ারের মাঠ বিদীর্ণ করিয়া প্রচুর কর্দমাক্ত জল চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁদের বিশুদ্ধ বিবেক ও সৎসাহস সাহিত্যের উপর কংগ্রেসী সরকারের এই উৎপাত সৃষ্টিতে নিস্তব্ধ ও নির্ব্বাক আছে কেন? সাহিত্য ও শিল্পকলাকে একটা নির্দিষ্ট দলের হাতিয়ার করাই কি পশ্চিম বাংলার নয়া গণতন্ত্রের নতুন লক্ষ্য?....

...বাঙলা দেশে সাহিত্য, শিল্পকলা, সংবাদপত্র ও নাটকের একটি গৌরবময় ভূমিকা আছে। দেশের জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকায় এই শিল্প ও সাহিত্য ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই ঐতিহ্যের সৃষ্টি হইয়াছে শাসন কর্তৃপক্ষের দমন ও ত্রাসনকে লঙ্ঘন করিয়া। আজ সেই বাঙলা দেশে নাটক অভিনয়ের জন্য সেন্সরের প্রবর্তন করা হইতেছে। ইহার চেয়ে লজ্জা ও ক্ষোভের কথা আর কি আছে? আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই যে, সাহিত্য ক্ষেত্রে এই প্রকার সেন্সরের আমরা তীব্র বিরোধী। কারণ, ইহা কমিউনিষ্ট বা ফ্যাসিষ্ট দেশের মত পার্টি ডিক্টেটরির মনোভাব-সঞ্জাত। ইহা কেবল গণতান্ত্রিক আদর্শ ও নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী নয়, ইহা মানবিক আচরণেরও বিরোধী। যে প্রচারধর্মী নাটক বা সাহিত্যের মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে, গভর্ণমেন্ট অনায়াসে দেশের প্রচলিত আইনের দ্বারা উহা দমন করতে পারিবেন। কিন্তু উহার জন্য নতুন করিয়া পুলিশ কমিশনার বা জেলা শাসকদের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া সাহিত্যে, শিল্পকলায় ও অভিনয়ের উপর সরকারী দৌরাত্ম্য আমদানি করিতে চাই না।....স্বাধীন দেশের কল্যাণ রাষ্ট্র কোথায় সাহিত্য ও শিল্পকলার

পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নাট্য উন্নয়নের আন্দোলনে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিবেন,—না, বিপরীত পথ ধরিয়া এক হাতে নাট্যকলার গলা টিপিয়া ধরিতে এবং অন্য হাতে আবার টাকা আদায় করিতে চাহিতেছেন। স্বাধীন সাহিত্য ও স্বাধীন সমাজের লক্ষণই বটে।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

যুগান্তর, ২৭শে এপ্রিল ১৯৬৩। নাটক নিধনের পালা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বাঙ্গালীর একটা ন্যায্য গৌরববোধ আছে। ব্রিটিশ আমলে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও বাঙ্গালীর গণচেতনা সাহিত্য, শিল্প ও অভিনয়ের সুকুমার কলা আশ্রয় করিয়া লালিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। স্বদেশী শাসনে শিল্পবোধ বিকাশের নানা পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অর্থ সাহায্য, পুরস্কার ও সম্মান স্বীকৃতি দিয়া সাহিত্য ও সাহিত্য-ব্রতীদের যে পোষকতা করিতেছেন তাহা নিশ্চয় শ্লাঘনীয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাট্যানুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিল প্রণয়ন করিয়াছেন এবং যাহার খসড়া গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পূর্ণ বয়ান পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ইতিমধ্যে এই বিল পাঠ করিয়া নাট্যকার, নাট্যামোদী ও অভিনেতা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। ইহাদের আশংকা, বর্তমান আকারে এই বিল আইনে পরিণত হইলে নাট্য সাহিত্য ও নাট্যানুষ্ঠান সরকারী নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাঁধা পড়িবে। নাট্য সাহিত্য রচনার স্বাধীনতা কিংবা অভিনয়ের সুযোগ সুবিধাও পুলিশ কমিশনার কিংবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মর্জি অনুযায়ী খর্ব হইবার আশংকা রহিয়াছে। কারণ, এই বিলে তাঁহাদের হাতেই অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, বর্তমান জরুরী অবস্থায় আমরা যখন বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত তখন আকস্মিকভাবে নাট্যানুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার এতটা আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চের কৌলীন্যে এবং নাটক রচনায় বাংলা দেশের একটা গৌরবজনক ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ নীল-করদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দীনবন্ধু মিত্র 'নীল-দর্পণ' রচনা করিয়া শিল্পীর স্বাধীনতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের সামাজিক প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।' নীতি-

ভ্রষ্ট ও উন্মার্গগামী সমাজকে কশাঘাতে জর্জরিত করিয়াছিল। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দানীবাবু, শিশির কুমার ভাদুড়ী প্রমুখের মাধ্যমে নাটক রচনা এবং নাট্যাভিনয়ে উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ ধারা বাংলার নাট্য জগৎকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন এই নাট্যচেতনাকে নাগপাশে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছিল। আধুনিককালে বাংলার নাট্য সাহিত্য ও নাটকাভিনয়ের ধারা সেই জীবন-দর্শন ও শিল্প চেতনাকেই আদর্শ হিসাবে সামনে রাখিয়া দুরূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিযুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান বিল নাটক ও নাট্যকলার স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।....বিলের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা নাট্যানুষ্ঠান নিয়ন্ত্রিতই হইবে, তাহার বিস্তৃতি বা বিকাশের কোন সহায়তা হইবে না।...এতটা ব্যাপক ক্ষমতা ব্রিটিশ আমলের আইনেও সরকার গ্রহণ করেন নাই। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনভাবে শিল্প সৃষ্টির যুগে, সরকারের নিজের হাতে এইরূপ প্রভূত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করা অগণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচায়ক।

প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলা দেশে গত এক দশকে নাট্য জগতে অনেক অপেশাদার নাট্য সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় নাট্য পরীক্ষা করিয়াছেন। স্থায়ী পেশাদার মঞ্চ অপেক্ষা ইঁহাদের কৃতিত্ব ন্যূন নয়। বরং নূতন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ এই এমেচিয়ার নাট্যগোষ্ঠীর নাটক রচনা এবং নাট্য প্রযোজনা আমাদের নাট্য সাহিত্য ও প্রয়োগকলায় নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছে। এই বিল আইনে পরিণত হইলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এই নূতন নাট্য আন্দোলন। ইহাদের অর্থসঙ্গতি সামান্য, স্থায়ী মঞ্চও ইহাদের হাতে নাই। মঞ্চের দক্ষিণা ও সরকারের দপ্তরে দক্ষিণা দিয়া নাটকাভিনয়ের ক্ষমতা এই সমস্ত নাট্য সম্প্রদায়ের থাকিবে না। সরকারী অর্থভাণ্ডারে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য এই ব্যবস্থা পরিণামে বাংলার নাট্য আন্দোলনকে শুদ্ধ করিয়া দিবে। বাংলা সাহিত্যে নাট্যাংশ এখনও অন্যান্য শাখার তুলনায় হীনবল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলের খড়্গাঘাতে তাহাকেও বিনষ্ট করিতে যাইতেছেন। আমরা মনে করি, নাট্যকার, নাট্যামোদী ও বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনা করিয়া প্রস্তাবিত বিলের আপত্তিকর অংশগুলি আমূল

সংশোধন করা উচিত। নতুবা নাট্য নিয়ন্ত্রণের নামে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাটক নিধনের দায়ে অপরাধী হইবেন।

বহুরূপী মে, ১৯৬৩

গণতান্ত্রিক সমাজে সাহিত্য ও শিল্পের প্রকাশ-পথ নিরঙ্কুশ রাখাই দরকার। হুকুম করে বা নিষেধাজ্ঞার অচলায়তনের মধ্যে কোনো দেশেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টি হয়নি। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক বলে আমরা ঘোষণা করি, আমাদের সংবিধানে আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করে নিয়েছি, আমরা শিল্পীর স্বাধীনতা কামনা করি, আমাদের সাহিত্যিকরা গড়ে তুলেছেন স্বাধীন সাহিত্য সমাজ। এই পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে আলোচ্য নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিলটি একেবারেই অসঙ্গত অস্বাভাবিক এবং ব্যক্তি-বিনাশী খড়্গাঘাত। আমরা স্বীকার করি, স্বাধীনতা মানেই যার যা ইচ্ছে তাই করার স্বাধীনতা নয়। সভ্য সংস্কৃতিবান ও প্রজ্ঞাবান মানুষ জীবনদর্শনের কিছু কিছু মূলনীতি মেনেই চলেন—সেটা তাঁর স্বভাবে মিশে আছে, যা তাঁকে চলতে সাহায্য করে, বাধা দেয় না। কিন্তু ওপর থেকে কিছু আরোপ করলেই সেটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্বসমাজ-বিরোধী স্বদেশ-বিরোধী কোনো নাশকতামূলক কাজ, যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই হোক বা অন্যত্রই হোক দেশের প্রজ্ঞাবাদী মন কখনোই সহ্য করবে না। যদি কেউ ওসব করে তারা জনমতের ধিক্কারে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। তাদের দমন করবার জন্যে কোনো বিশেষ আইন করতে গিয়ে আমরা যদি গণতন্ত্রের মূলনীতিকেই হত্যা করি সেটা হবে মারাত্মক অপরাধ। দেশের সাধারণ আইনই যেখানে যথেষ্ট সেখানে বিশেষ আইন করলে মুষ্টিমেয়ের সম্ভাব্য দেশদ্রোহী স্পর্ধার কাছে সমষ্টির কল্যাণকে বলি দেওয়া হবে মনে করে আমরা এ বিল সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে বলি।

স্বাধীনতা, ১০ই মে, ১৯৬৩। বঙ্গ সংস্কৃতির পক্ষে সর্বনাশকর

....গণতান্ত্রিক অধিকারকে সঙ্কুচিত করিয়া গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যায় না, পরন্তু তার প্রসারেই গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। কংগ্রেস ও কংগ্রেস পরিচালিত সরকার ইহা অন্তর দিয়া উপলব্ধি করুন এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোকে বাঁচাইয়া রাখার প্রয়োজনেই এই নাট্যাভিনয় বিল অবিলম্বে প্রত্যাহার করুন।

দেশ, ৪ঠা মে, ১৯৬৩। নাট্যানুষ্ঠান : নতুন আইন

আমার হাতের কাছে যৎসামান্য ওয়াকিবহাল হবার জন্য যে বইটি রয়েছে তাতে দেখছি যে ইংলণ্ডে সেন্সরশিপের প্রথা প্রধানত এবং প্রথমত চালু হয়েছিল রাজস্বের কারণে, ছাপাখানা চালু হবার পর। কিন্তু পরে 'সেন্সরশিপ' বহাল রাখা হয়েছিল—"as an instrument of policy."

উক্ত গ্রন্থেই দেখছি : নাটকের বেলায় "the censorship has been notably different."

নাটকের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র আয়োজন যা ছিল ত' পীড়াদায়ক। ১৮৪৩ সালের সেই 'থিয়েটারস্ অ্যাক্ট' আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে, আক্রমণ হয়েছে—কিন্তু ১৯০৭ সাল পর্যন্ত তেমন করে যেন সমবেতভাবে আক্রোশটা ফেটে পড়েনি। ১৯০১ সালে ৭১ জন লেখক মিলে একটি প্রতিবাদপত্র রচনা করে কাগজে পাঠান, 'সেন্সরশিপ' তুলে দেবার দাবি জানিয়ে। ফলে আবার একটি কমিটিকে নিয়োগ করতে হল। ১৯০৯ সালে কমিট তাদের মতামত জানাল। মতামতটির মূল মর্ম ছিল :

"It should be optional to submit a play for license and legal to perform an unlicensed play, whether it had been sudmitted or not."

বস্তুত, তারপর থেকে ব্রিটেনে যে নিয়মটি চালু রয়েছে তাতে উভয় কাজই বেশ চলে যায়। অর্থাৎ লর্ড চেম্বারলিন-এর অধীনে একটি সালিশী কমিটি আছে, প্রয়োজনে তিনি যে কোনো নাটকের সম্পর্কে এই কমিটিতে জানাতে পারেন, এবং কমিটি নাটকটি সম্পর্কে তাদের অভিমত জানাবে। আর এ-কথাও জেনে রাখা ভাল এই কমিটির বিরুদ্ধে অদ্যাবধি তেমন গুরুতর কোনো অভিযোগ দেখা দেয় নি।

যে নতুন আইনটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করার কথা চিন্তা করছেন তার নানা ত্রুটি আছে। সে সব ত্রুটির কথা আইনজ্ঞরা বলবেন, আমার বলার কথা নয়। আমি শিল্পের দিক থেকে মাত্র এইটুকুই বলতে পারি যে নাট্যকারকে যেন কারবারীর মতন লাইসেন্স নিয়ে কারবার করতে বলার অসম্মানজনক আদেশ না দেওয়া হয়। নাটক শিল্প, নাট্যকার শিল্পী। সরকার যেন এমন ঝোঁক না ধরেন, শিল্প এবং শিল্পীকে সরকারী ছাকাই যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে নেবেন। পুলিশ পুলিশের কাজ করুক; শিল্পী শিল্পের। —বিদুর

লোকমত ১০ই মে, ১৯৬৩

নবনাট্য আন্দোলন নেহাৎ একটা মুখের কথা যে নয় তার প্রমাণ ইতি-মধ্যেই পাওয়া গেছে। সারা বাংলার নাট্য সমাজ সংহত হয়ে দাঁড়িয়েছে এই স্বৈরাচারী বিলের প্রতিরোধে। যদি সরকারের শুভবুদ্ধি জাগ্রত না-ই হয় তাহলে সে চ্যালেঞ্জ নবনাট্য আন্দোলন গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। —গিরিশংকর

দর্পণ ২৪শে মে, ১৯৬৩

সরকার যেখানে শিল্পীর কণ্ঠরোধে নির্লজ্জ ভূমিকা নিয়েছে সেখানে (বিল বিরোধী) এ আন্দোলনের ব্যাপকতা সীমাহীন হওয়া প্রয়োজন।

গণবার্তা ৩০শে মে, ১৯৬৩

এই বিল পাশ হলে পশ্চিম বাংলার নাট্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ওপর অনভিপ্রেত পুলিশী হস্তক্ষেপ সীমাহীন হয়ে উঠবে। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে একথা সুস্পষ্ট যে, এই বিলটি পশ্চিম বাংলার নাট্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকারের ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্র।

[স্থানাভাবে উপরোক্ত পত্র-পত্রিকা থেকে আংশিক উদ্ধৃতি মার্জনীয়। একই কারণে আরও অনেক পত্র-পত্রিকার অভিমত উদ্ধৃত করা সম্ভব না হওয়ায় আমরা আন্তরিক দুঃখিত। আশা করবো, এই আন্দোলনের গুরুত্ব এবং ব্যাপ্তির পেছনে পত্র-পত্রিকার যে অকুণ্ঠ সমর্থন আমরা পাচ্ছি আমাদের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ তাতে আরও শক্তিশালী হবে।] —সম্পাদক

আপ্তবাক্য

....গবর্মেন্ট অত্যন্ত সচকিতভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন।....আমাদিগকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত আয়োজন দেখিলে ন্যায়-অন্যায় বিচার-অবিচারের তর্ক দূরে রাখিয়া একথা স্বভাবতই মনে হয় যে, হয়তো আমাদের মধ্যে একটা শক্তির সম্ভাবনা আছে যাহা কেবল মূঢ়তাবশত আমরা সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না। গবর্মেন্ট যখন চারি তরফ হইতেই কামান পাতিতেছেন তখন ইহা নিশ্চয় যে, আমরা মশা নহি, অন্তত মরা মশা নহি।

আজ যদি অকস্মাৎ আমরা ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হই, রাজকার্যচালনার সহিত আমাদের সমালোচনার ক্ষুদ্র সম্বন্ধটুকুও এক আঘাতে

বিচ্ছিন্ন হয়, এবং হয় আমরা নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি, নয় কপটতা ও মিথ্যা বাক্যের দ্বারা প্রবলতার রাজপদতলে আপন মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ বলিদান করি, তবে [পরাধীনতার] সমস্ত হীনতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাক্যহীন ব্যর্থ বেদনা মিশ্রিত হইয়া আমাদের দুর্দশা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে। —রবীন্দ্রনাথ

নাট্যচর্চার ১৯৬২ সনের হিসাব নিকাশ

দল অনেক, শিল্পী অগণন—গত এক বছরের হিসাবে (১৯৬২ সাল) সমগ্র বাঙলা দেশে অপেশাদার নাট্যাভিনয়ের সংখ্যা (প্রকাশিত ও সংগৃহীত সংবাদ থেকে) দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৮ শত ৬৮। এর মধ্যে কলকাতা শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত হয় ৩, ৯৮৫টি অভিনয়। বাকি ৩, ৮৮৩টি অভিনয় পশ্চিম বাংলার অন্যান্য ছোট বড় শহর এবং পল্লীতে অভিনীত হয়েছে। আনন্দলোক : আনন্দবাজার পত্রিকা

স্বাধীন সাহিত্য সমাজ

"....শিল্পে, সাহিত্যে ও চিন্তায় ডিক্টেটরশিপ পাকা না হলে অন্য কোথাও তার ভিত মজবুত ক'রে গড়া সম্ভব নয়। সমাজের এই ক্ষুদ্র অংশে যদি কিছুমাত্র স্বাধীনতা বজায় থাকে তবে বৃহত্তর অংশে সে স্বাধীনতার বিষ চারিয়ে যাবেই। এই প্রকাশক্ষম ও নিত্যপ্রকাশমান অংশকে বোবা না করলে জনগণের চিত্ত ডিক্টেটরের তৈরী ছাঁচে ঢালাই করা যাবে না। অনিবার্যত এটাই ডিক্টেটরী সমাজের সবচেয়ে অবাঞ্ছিত, অবমানিত ও নির্যাতিত অংশ। অন্যপক্ষে, এঁদের সাহায্যেই ডিক্টেটররা জনগণের চিত্তকে বশে আনেন এবং রাখেন। সুতরাং যে সব শিল্পী, সাহিত্যিক, মননশীল ব্যক্তিরা কর্তাভজা হতে এবং নিজেকে কর্তার হাতের হাতিয়ার করতে ইচ্ছুক, ডিক্টেটরী ব্যবস্থায় তাঁদের পুরস্কার অপরিমেয়, তাঁরাই সেখানে সবচেয়ে প্রসাদলালিত জীব।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র
আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ

...কোনো দেশেই প্রত্যেকে স্বাধীন চিন্তা করে না, কিন্তু সব দেশেই কেউ কেউ করেন, তাঁরাই ক্রমশঃ প্রভাবিত করেন অন্যদের; তাঁদের চিন্তা ও চেষ্টা যেখানে সবচেয়ে কম ব্যাহত হয় সবচেয়ে বেশি স্ফূর্তিলাভ করে সেই সমাজই মানুষের সম্পদ সৃষ্টি ও মঙ্গল সাধনের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল।

আধুনিক ভারত এই পথেই চলছে ; এখানে মানুষের স্বাধীন মনকে অবরুদ্ধ করার অপচেষ্টা নেই। আমাদের বুঝে নিতে হবে যে এই স্বাধীন মন মহামূল্যবান ; তা যদি মাঝে মাঝে দেয় সংশয়ের পীড়া ও দ্বন্দ্ববেদনা, তবু তা মূল্যবান ; তা রক্ষা করতে গিয়ে কোনো সাংসারিক ক্ষতি যদি হয়, তবু তা মূল্যবান ; বুঝে নিতে হবে এই স্বাধীনতা মনুষ্যত্বেরই নামান্তর এবং তার হরণ বা সংকোচনের আশঙ্কা—তা যে কোনো দিক থেকেই দেখা দিক—সেই শক্তি পরাস্ত না হ'লে আমরা মানুষের মতো বাঁচতে পারবো না।" —বুদ্ধদেব বসু

[স্বাধীন সাহিত্য সমাজের ইস্তাহার হইতে সঙ্কলিত। কিন্তু নাট্যাভিনয় বিল সম্পর্কে অদ্যাবধি স্বাধীন সাহিত্য সমাজের নীরবতা বেদনাদায়ক।]

—সম্পাদক

ভারত-ইতিহাস-ভাস্কর ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলটিতে সরকারের হাতে যে সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা খুবই আপত্তিজনক। ইহার ফলে বাংলা নাট্য সাহিত্যের উন্নতির পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি হবে—এবং দেশের স্বাধীন চিন্তা ব্যাহত হবে। যে কোন সাহিত্য রচনার প্রাক্-অনুমোদন বিধি—গণতন্ত্রের বিরোধী ও বিশেষ অনিষ্টজনক। যাতে এই বিলটি সরকার প্রত্যাহার করেন তার জন্য দলবদ্ধভাবে আন্দোলন করা উচিত।

প্রবীণ সাহিত্যিক ও বিখ্যাত ব্যবহারজীবী

ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

নাটকানুষ্ঠান বিলটি দেখিলাম ; সাতান্ন বছর আমি আইন ঘাঁটাঘাটি করিয়াছি এবং দেশ বিদেশের বহু আইন আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু কদাচ এরূপ অস্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন আইন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আমার বিবেচনায় প্রস্তাবিত আইনটি সম্পূর্ণরূপে 'আলট্রা ভাইরস' (ultra vires) বা বে-আইনী।

কেন না, প্রথমত আইনের উদ্দেশ্যে একটি মামুলী 'Statement of Objects and Reasons' দেওয়া হইয়াছে ; তাহাতে বিলের ঠিক উদ্দেশ্য কি তাহা মোটেই বাখ্যা করা হয় নাই এবং আমার মতে প্রস্তাবকরা সূক্ষ্মভাবে ইহা পরীক্ষা করেন নাই যে, যে দোষে দুষ্ট বলিয়া ১৮৭৬ সালের আইন এলাহাবাদ হাইকোর্ট বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন প্রস্তাবিত আইনটি সেইরূপ দোষেই দূষিত কি না।

দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবিত আইনটি প্রত্যক্ষভাবে সংবিধানের ১৯ ধারার বিরুদ্ধ।

তৃতীয়ত, ইহাতে পুলিশ কমিশনার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে 'লাইসেন্স' দেওয়া বা না দেওয়ার অপ্রতিহত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। 'If he is satisfied' কথাটি House of Lords-এর বিষয়ীভূত Defence of the Realm Act-এর ১৮, বি ধারাতেও উল্লিখিত আছে। অথচ শেষ পর্যন্ত House of Lords-এ সাব্যস্ত হইয়াছে যে: 'If he is satisfied' দ্বারা Home Secretary-র ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির প্রয়োজন মাত্র এবং সেই প্রয়োজন যথাযথ কি না তাহা কোর্টের বিচার্য নয়। ইহা ছাড়া আর একটু কৌতুকের বিষয় এই যে, এই আইনের বিধান দ্বারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনারকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে ; অতএব সেই আদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অনর্থক। কেন না, ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনারের সন্তুষ্টি যুক্তিযুক্ত কি না তাহার বিচার যদি আদালতের এক্তিয়ার-বহির্ভূত হয় তবে আপীল আদালত কি বিচার করিবেন। ফলে বিধানগুলি স্ব-বিরোধী ও অর্থহীন।

পরিশেষে, কোন নাটক প্রদর্শনযোগ্য বা অতিশয়দোষযুক্ত কি না তাহার বিচার পাঠক এবং দর্শকগণই করিয়া থাকেন—এবং গুরুতর দোষযুক্ত নাটক তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। যখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আনন্দবিদায়' ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় তখন প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে দর্শকগণ তাঁহাদের বিরক্তি সমভাবে প্রকাশ করিয়া সেই অভিনয় বন্ধ করিয়া দেন। যদি দ্বিজেন্দ্রলালের মত সুপ্রসিদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাট্যকারের নাটক সম্বন্ধে দর্শকরা এইরূপ বিচার করিতে পারেন—তখন নাটকের বিচারের ভার সেই দর্শকগণের উপর না দিয়া পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের উপর দিবার কি প্রয়োজন তাহা আমি বুঝিতে পারি না। পরন্তু যে ব্যক্তিগত ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়াছে—প্রস্তাবিত আইন তাহাকেই খর্ব করিতে চলিয়াছে।

ষ্টুয়ার্টের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে লর্ড ষ্ট্যাফোর্ডের একটি কথা মনে পড়িতেছে—'History repeats itself', কংগ্রেস ক্ষমতা হাতে পাইয়া কি তাহা আরও ভালভাবে প্রমাণ করিতে চায়? ব্রিটিশ সরকারও যে প্রাক্-অনুমোদনের

আইন পাশ করিতে সাহস পায় নাই কংগ্রেস সেই আইন পাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছে কেন ?

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিল (১৯৬২) পড়িয়া বিচলিত ও বিস্মিত হইলাম। মনে হইল গণতন্ত্রের মুখোশ পরিয়া আমাদের দেশে সম্ভবত 'ডিক্টেটরশিপ' ক্রমশ গদি দখল করিতেছে। আশা করি যাঁহারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তাঁহারা সরকারের এই স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রতিবাদ করিবেন। শিল্পীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে আমাদের দেশের আবহাওয়া আবিল ও বিষাক্ত হইয়া উঠিবে। নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীরা চিরকাল দেশের সুস্থ জনমত গঠন করিয়াছেন, চিরকাল রাজনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচার-অন্যায়ের বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ করিয়াছেন, চিন্ময় সত্যশিবসুন্দরের তাঁহারাই সার্থক বাঙ্ময় উপাসক। তাঁহাদের এ অধিকার বিধিদত্ত অধিকার। সে অধিকার হরণ করিবার চেষ্টা হাস্যকর এবং দেশের পক্ষে অনিষ্টকর। আমি সর্বান্তঃকরণে এই বিলের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ জানাইতেছি।

সাহিত্যিক ও ব্যবহারজীবী তারাপদ লাহিড়ী

আইনজীবী হিসাবে একটা কথা বলতে চাই যে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের নজির তুলে যে সাংবিধানিক জটিলতা পরিহার করার অজুহাতে এই নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, নূতন আইনের ফলে সেই সাংবিধানিক জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই আইনে যেভাবে অভিনয়, গান-বাজনা প্রভৃতির উপরে খাঁড়া চালানো হয়েছে, যেভাবে বিপুল পরিমাণ স্ববিবেচনা-নির্ভর ক্ষমতা প্রশাসনিক কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, তা সংবিধান-সম্মত বলে মনে হয় না। —দেশ, ২০শে এপ্রিল ১৯৬৩

শিক্ষাবিদ ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার

পশ্চিম বাংলা সরকার এ সময়ে নাট্যানুষ্ঠান বিলের মত একটি বিল প্রণয়নে কেন উদ্যোগী হলেন, তা ভেবে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। নানান দৈনন্দিন সমস্যায় আমরা জর্জরিত; তার মধ্যে স্বাধীন সৃষ্টিশীল উদ্যোগের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আনন্দ আমরা উপভোগ করে থাকি। কিন্তু নাট্যশিল্প সম্পর্কে সরকার কেন অকস্মাৎ আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন তা বুদ্ধির অগম্য। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এ বিল যদি গৃহীত হয় তো তাতে শিল্প এবং শিল্পী যেমন

খর্বিত হবে, তেমনি খর্বিত হবে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন ও ঐতিহ্য। আর সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক আঘাত হানা হবে ব্যক্তিক শিল্পোদ্যমের স্বাধীনতার ওপর। সেজন্য, প্রত্যেক শিল্পরসিকেরই উচিত এই বিল প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন করা।

বিশ্ববিশ্রুত চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে শিল্প-সংস্কৃতির বেশ একটা প্রসার ও পরিপুষ্টি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। নানান উৎসব-অনুষ্ঠানে পেশাদারী ও অপেশাদারী শিল্পী ও শিল্পগোষ্ঠীসকল প্রচুর উৎসাহ ও সাফল্যের সংগে নৃত্যগীত নাটকাদি পরিবেশন করছিলেন। এ ধরনের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সাংস্কৃতিক উন্নতির বীজ বহন করে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিল আইনে পরিণত হলে এই প্রচেষ্টার পথে দুর্লংঘ্য বাধার সৃষ্টি করবে। আমার মতে যে কোন শিক্ষিত লোকের কর্তব্য এই বিল প্রতিরোধ করা।

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী

প্রস্তাবিত নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল সম্পর্কে নাট্যামোদী জনসাধারণের যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে তার মূলে যথেষ্ট যুক্তি আছে। বিলটি যে অবাঞ্ছিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ এই ধরনের আইন ব্রিটেন, ফ্রান্স বা আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আছে বলে জানি না। ব্রিটেনে লর্ড চেম্বারলেনের উপর এই সম্পর্কে যে দায়িত্ব আছে—তা এত ব্যাপক নয়। অবশ্য কমন্স সভায় কোন প্রশ্ন উঠলে তাঁকেই জবাবদিহি করতে হয়।

ঐ সব দেশে নাটকের বিষয়বস্তুর শ্লীলতার প্রশ্ন নিয়ে সেন্সরশিপের কথা ওঠে। কিন্তু রাজনৈতিক মতামতের বিরোধ নিয়ে সেন্সরশিপের সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে শুনিনি। তবে জাতীয় সংকটের সময়ে অন্যান্য বিষয়ের মত নাটকাভিনয়ের স্বাধীনতাও খর্ব করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। কিন্তু সে শুধু জাতীয় সংকটের সময়ই, অন্য সময় নহে। কারণ বাক্-স্বাধীনতা আর মঞ্চাভিনয়ের স্বাধীনতা একই পর্যায়ের নয়। মঞ্চাভিনয়ের স্বাধীনতা দায়িত্ব অনেক বেশী। অবশ্য এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কি না তা জানার জন্য সরকারকে রুচিবান, সচেতন এবং দেশপ্রেমিক জনসাধারণের সতর্ক প্রহরার উপরই প্রধানত নির্ভর করতে হবে, অন্য কারো উপর নয়।

এই বিলটি আইন সভায় উত্থাপনের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন জন-

সাধারণের মতামত সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করছেন, তখন আশা করা যায় তাঁরা জনসাধারণের সমালোচনাগুলি যথাযোগ্য বিচার বিবেচনা করে দেখবেন।

নটশেখর নরেশ মিত্র

প্রস্তাবিত নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল আমাকে হতবাক করেছে। যিনি এই বিলের খসড়া করেছেন—তিনি একেবারেই উপলব্ধি করেন নি—কি গুরুতর প্রতিক্রিয়া এর দ্বারা নাট্য সাহিত্য ও নাট্য আন্দোলনের উপর হতে পারে। তা ছাড়া কোন দেশপ্রেমিক ভারতবাসী যে নাটক নিয়ন্ত্রণের জন্য এমন কঠোর শৃঙ্খল রচনা করতে পারেন তা চিন্তা করাও যায় না।

নাটকের মাধ্যমে যদি দেশদ্রোহিতা বা দেশের পক্ষে কোন অকল্যাণকর ধ্যান ধারণা প্রচার করা হয় তাহলে তা' বন্ধ করার মত দেশের সাধারণ আইনে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

ব্রিটিশ আইনটি বেশ কিছুদিন আগেই একটি হাইকোর্টের বিচারে স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র-বিরোধী বলে বাতিল করা হয়েছে। এবং অন্য রাজ্য-সরকারগুলি নতুন করে আর সেই ধরণের আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হলেন না। তখন পশ্চিমবঙ্গে এমন কি ঘটনা ঘটেছে যার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আইনটিকে আরও ব্যাপকতর ক্ষমতায় সজ্জিত করে নাট্যশিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করতে চাইছেন?

এই বিল আইনে পরিণত হলে নাটকের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য ব্যক্তি, নটনটী, সাজসরঞ্জাম ও সঙ্গীত যন্ত্র সরবরাহকারী দল, যাত্রা ও ট্যুরিষ্ট শিল্পী সকলেরই রুজি রোজগার বন্ধ হবে।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র সেনকে দরিদ্রহিতৈষী বলে শুনেছি। তিনিই কি শেষে এই বিলটি আইনে পরিণত করে মঞ্চ শিল্পীদের স্বর্ণ শিল্পীদের মত আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেবার দায়ভার নেবেন?

বর্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে দেশাত্মবোধক নাটক অভিনয় কেবল বেতারে সীমাবদ্ধ রাখা চলতে পারে না। তাকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই বিল আইনে পরিণতি হলে সেকাজে প্রধান প্রতিবন্ধক হবে।

কারণ, আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে প্রশাসনিক কর্মচারীরা নাটকের উপযুক্ত বিচারক নন এবং তাঁদের কোন রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে বা কোন বোর্ডের সুবিচার পেতে হলে দীর্ঘ সময় অকারণ ব্যয় হবে। এমতাবস্থায় এই বিলটি

আইনে পরিণত হয়ে যাতে নাটকের উগ্র সংহারক মূর্তি না ধরে, তার জন্ত একে ভ্রূণাবস্থাতেই হত্যা করে সরকার সুবিবেচনার পরিচয় দেবেন এই আশা করি।

কমল মিত্র

সমগ্র ভারতের মধ্যে মাত্র এই কলিকাতা সহরে ৫।৭টি পেশাদার রঙ্গমঞ্চ আছে এবং গত কয়েক বৎসর যাবৎ বেশ কিছু সংখ্যক অপেশাদারী নাট্য সংস্থার প্রসার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলি বহু ঝড়ঝাপ্টা ও আর্থিক অনটনের মধ্যে বরাবর চ'লে এসেছে এবং আর্থিক অসচ্ছলতার জন্ত বহুবার হাতফেরতও হয়েছে। তখন কিন্তু সরকারের এ বিষয়ে কোনও লক্ষ্য পড়েনি বা কোনওরূপ সাহায্য দ্বারা বাংলার গৌরব এই মঞ্চগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাও করেন নি। মাত্র গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলা দেশের দর্শকসমাজও ক্রমশঃ নাট্যপিপাসু হ'য়ে উঠছেন—ঠিক এই সময় যদি 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল' পাশ হয় তবে এই সকল অপেশাদারী নাট্য সংস্থার ও পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলির সমস্ত উৎসাহ ও উদ্যম অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। শুধু তাই নয়—এই সকল অভিনয়ের (পেশাদারী বা অপেশাদারী) মাধ্যমে শিল্পী ছাড়াও কত রকমের কর্মীর অন্ন সংস্থান হয়, সে বিষয়ে সরকার কোনও সংবাদ রাখেন কি? এই বিল পাশ হওয়ার ফলে নাটকের অভিনয় সংখ্যা যে ক্রমে ক্রমে কমে আসবে ইহা নিশ্চিত; কিন্তু তখন এই সমস্ত শিল্পী ও কর্মীর অন্ন সংস্থানের কি ব্যবস্থা হবে এ বিষয়েও ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবহিত হওয়া উচিত।

যে নীতি, যে শৃঙ্খলা দ্বারা সমস্ত শিল্পক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত, তার বাইরে অশৈল্পিক কোন নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব আমি স্বীকার করি না।

এই কারণে, এই প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অভিপ্রায়ের আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

মানব কল্যাণ ও সুস্থ সমাজ জীবনের আদর্শের প্রতি শিল্পী মাত্রেই নিজেকে দায়িত্বসম্পন্ন বোধ করেন। তার বাইরে, শিল্পীর স্বাধীনতাকে খর্ব করে এমন যে কোন দায়িত্বকে—তা সে ব্যক্তি বা দল বা রাষ্ট্র যার প্রতিই হোক না কেন—আমি স্বীকার করি না। কোন দায়িত্বের বন্ধন সংখ্যাধিক্যের জোরে শিল্পীর শিল্পরচনার ওপর চাপিয়ে দেওয়া আমি অগণতান্ত্রিক মনে করি।

এই কারণে, দলীয় স্বার্থ প্ররোচিত এই নিয়ন্ত্রণ বিলের প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ শিল্প রচনার অন্যতম প্রেরণা। সেই দেশপ্রেমকে সন্দেহের চোখে—নজরবন্দী করতে গেলে আমার বিশ্বাস শিল্পসৃষ্টির শ্বাসরোধ করা হবে।

এই কারণে, নাট্য শিল্পের পাহারাদারির উদ্দেশ্যে আনীত এই বিলের আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

তাপস সেন

বাংলা দেশের মতো প্রবল ও ব্যাপক নাট্যচর্চা ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে নেই। গিরিশচন্দ্র-শিশিরকুমারের ঐতিহ্যময় সাধারণ রঙ্গালয়ের নিয়মিত অভিনয়, অগণিত অফিস ক্লাব ও সৌখীন সংস্থার অসংখ্য অভিনয় এবং নবনাট্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা—এ সমস্তই সারা ভারতের আগ্রহ, বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। বাংলা থিয়েটারের সকল ভালো এবং মন্দ নিয়ে এই প্রচণ্ড প্রাণচাঞ্চল্য আমাদের গৌরবের বিষয়। আজ পর্যন্ত বাংলা দেশে বিভিন্নমুখী প্রযোজনা ও প্রয়োগ পরীক্ষা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো হবে। কিন্তু 'নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন' করে সরকার বাংলা থিয়েটারের ওপর যে যবনিকা টানতে চাইছেন তা আজ নাট্য মঞ্চের প্রত্যেক শিল্পী ও কলাকুশলীর ঘৃণা ও ধিক্কারে ভূষিত হয়েছে।

১০ই ডিসেম্বরের (১৯৬২) অতিরিক্ত গেজেট আমার মতো নেপথ্যে-চারীকেও পাদপ্রদীপের সামনে এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছে। এই নতুন আঙ্গিকের নতুন নাটকের প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেনে রাখুন যে এই আইন আমাদের সকল শিল্প প্রেরণা ও শিল্প চেতনার প্রতি চরম অপমান।

দেবনারায়ণ গুপ্ত

আমরা, যারা নাটকের কারবারী তাদের মধ্যে অনেকেই আমরা এই আশা করেছিলাম যে, আজকের সুবিস্তৃত নাট্যানুশীলনের ক্ষেত্রটি সরকারের কল্যাণে আরও উর্বর হয়ে উঠবে। কিন্তু উর্বরতার জন্যে যে আরও পলিমাটির প্রয়োজন, তা পড়লো না। পড়লো শুধু বালি। যাতে কোন ফসলই ফলবে না, উপরন্তু যে চারাগাছ ক'টি গজিয়ে উঠছিল মাথাচাড়া দিয়ে, তাদেরও অকালমৃত্যু ঘটবে। কাজে কাজেই নাট্যানুরাগীরা বিলটি পড়ে অত্যন্ত নিরাশ হয়ে উঠেছেন।

১৮৭৬ সালে বিদেশী সরকার আমাদের বাক্‌শক্তি হরণ করবার জন্যেই

নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন করেছিলেন। কিন্তু বাক্-স্বাধীনতার যুগে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের পর স্বদেশী সরকার যে বিল এনেছেন, তা যদি আইনে পরিণত হয়, তাহলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা বিপর্যয় ঘটবে।

সৃষ্টিধর্মী শিল্পকে বাঁধন দিয়ে বাঁধার চেষ্টা করলে তা শিক্ষা-সংস্কৃতিকে রজ্জু বন্ধনে বাঁধারই সামিল হবে। তাই বলছিলাম, ১৮৭৬ সালে যা ছিল ১৯৬৩ সালে তার থেকেও কি আমরা পেছিয়ে থাকবো ?

সলিল সেন

সরকারী গেজেটে সম্প্রতি প্রচারিত "নাট্যানুষ্ঠান বিলের" বয়ানের মধ্যে একটি অত্যন্ত অবমাননাকর অংশ রয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, সমস্ত নাট্যকাররাই দেশের মধ্যে বিভেদ, অরাজকতা ও মানীদের মান নষ্ট করবার জন্য যেন সচেষ্ট রয়েছেন। এমনি পূর্বকল্পিত ধারণা নিয়ে পুলিশের হেফাজতে তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই ধারণার প্রতি একজন স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমার প্রতিবাদ করবার অধিকার রয়েছে—। যাঁরা বিস্ফোরকের ব্যবসা করেন—তাঁদের ওপরেও এমন ধারণা নিয়ে সরকার অগ্রসর হন না।

দোষ বা গুরুতর অন্যায় যদি ঘটে—তার শাস্তি হোক, বিচার হোক, সেই দূষিত নাটক অনুষ্ঠান বন্ধ হোক—কিন্তু সমস্ত নাটকই অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্টি করবে—এমন একটা মানসিক ধারণা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে শ্রদ্ধা আনতে পারে না।

বহুরূপী

বাংলা দেশে যাতে একটা সৎ নাট্য প্রচেষ্টা গড়ে ওঠে তারই উদ্দেশ্যে আমরা অনেকে অনেক পরিশ্রম করেছি। কিন্তু আমাদেরই জাতীয় সরকার যদি এরকম বিধান তৈরী করেন তা'হলে আমাদের এত দিনের এত কষ্ট পাওয়া একেবারে নিষ্ফল হবে।—শম্ভু মিত্র।

লিটল থিয়েটার গ্রুপ

১৮৭৬ সালের ৮ঠা মার্চ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার কুখ্যাত নাট্যাভিনয় আইন প্রয়োগ করিয়া গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালক উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু এবং মতিলাল সুর প্রমুখ আটজন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করে। বিশেষ দ্রষ্টব্য, পুলিশের এই আক্রমণ যখন আসে তখন অভিনয় চলিতেছিল। সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিল্পীদিগকে এইরূপে লাঞ্ছিত করিবার অজুহাত

ছিল, তাঁহাদের অভিনীত নাটক 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' না কি অশ্লীল। আজ এ বিষয়ে আর কোনোই সন্দেহ নাই যে সেই অজুহাতের পিছনে ছিল নাট্য-শালার স্বাধীনতা হরণ করিবার ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র।

'নীল-দর্পণ' হইতে আরম্ভ করিয়া মন্মথ রায় মহাশয়ের 'কারাগার' পর্যন্ত বারে বারে নাটক নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহার পর মহান গণনাট্য সঙ্ঘ প্রযোজিত একাধিক নাটককে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। শত শত শিল্পী কারাবরণ করিয়াছেন।

১৯৫৪ সালে স্বাধীন ভারতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ১৮৭৬ সালের আইনকে ভারতের সংবিধানবহির্ভূত বলিয়া বর্ণনা করেন ও উহাকে 'লজ্জাকর' আখ্যা দেন। ইহাই স্বাভাবিক। ইহাই এক স্বাধীন দেশের মর্যাদাবোধের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কিন্তু আজ আবার এক নূতন আইন প্রণীত হইতে চলিয়াছে যাহার বলে নাট্যশালা সম্পূর্ণরূপে পুলিশের করায়ত্ত হইবে। উহার বলে নাট্যশালার মতামতের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে। ইহার বলে নাট্যকারের চিন্তার স্বাধীনতার অবসান হইবে। ইহার বলে পেশাদার ও অপেশাদার দুই প্রকার দলই তাহাদের স্বীয় মত পোষণের অধিকার হারাইবেন।

এই নূতন প্রস্তাবিত আইনের কারণ হিসাবে চীনা আক্রমণজনিত জরুরী অবস্থার কথা বলা হইতেছে। আমাদের প্রশ্ন এই—বাংলার নাট্যশালাকে আজ কাহার নিকট দেশপ্রেমের পাঠ্য লইতে হইবে? এই নাট্যশালা দীনবন্ধু মিত্র ও মাইকেল কর্তৃক সংগঠিত, গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদ কর্তৃক লালিত, মন্মথ-শচীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্বুদ্ধ। এই নাট্যশালা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছে। এই নাট্যশালা একদিন বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, লোকমান্য তিলক, নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে প্রেরণা জোগাইয়াছে। এই নাট্যশালা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়াছে এবং বারে বারে নির্যাতন বরণ করিয়াছে। পৃথিবীর কোন দেশে কোন নাট্য-শালার ইতিহাসে এতগুলি নাটকের নিষিদ্ধ হওয়ার নজীর নাই। 'ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান' শাসিত আয়র্ল্যাণ্ডেও না, জার-ধর্ষিত রাশিয়ায়ও না। আজ কি এই নাট্যশালাকে দেশপ্রেমের নূতন পরীক্ষা দিতে হইবে?

এই ঘৃণ্য বিল শুধু মাত্র নাট্য শিল্পী বা নাট্যকারেরই মৃত্যু পরোয়ানা নয়; প্রতিটি লেখক, কবি, সাংবাদিক, চিত্রকরের এখন জেগে ওঠার সময়! কারণ

আজ যদি নাট্য নিয়ন্ত্রণ চালু হয়, কাল হবে কাব্য নিয়ন্ত্রণ, তারপর গ্রন্থ নিয়ন্ত্রণ এবং সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ। অবশেষে দেখা যাবে একদিন সন্ধ্যাবেলা সে সব বই কলেজ স্কোয়ারে পোড়ানোর উৎসব শুরু হয়েছে, লেলিহান শিখায় সমর্পিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, সুসুন এবং কার্ল মার্ক্স-এর গ্রন্থাবলী। ফ্যাশিবাদের এই-ই ধারা। —উৎপল দত্ত।

বঙ্গীয় নাট্য সংসদ

গণতন্ত্রী রাষ্ট্র যখন বাক্যের, চিন্তার বা বক্তব্যের ওপর পাহারা বসাতে চান তখন তার মধ্যে অভিসন্ধির গন্ধ খুঁজে পাই, গণতন্ত্র আদর্শচ্যুত হয়েছে বলে মনে করি। সেজন্য যে নাট্য-নিয়ন্ত্রণের বিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার আনবেন বলে স্থির করেছেন তাকে শঙ্কিত বোধ করছি।....কিছুতেই বুঝতে পারি না যে, Defence of India Rules. Penal Code, Criminal Procedure Code প্রভৃতি এত আইন থাকতেও নতুন করে এই আইন প্রণয়ন করবার কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে।....আমাদের দেশে পরিপূর্ণ adult franchise স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং দর্শকও তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। যাঁরা প্রতিনিধি নির্বাচন করবার জন্য সক্ষম বিবেচিত হয়েছেন, তাঁরা অন্যায় নাটকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করতে পারবেন না, এ কথা মনে করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাই না।

অন্যতম গণতন্ত্রী রাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আজ পর্যন্ত নাট্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোন আইন নেই। গ্রেট ব্রিটেনে Theatre Act ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে পাশ হয় এবং সেখানে লর্ড চেম্বারলেনের ক্ষমতা, নিয়মিত অভিনীত নাটকে ও পেশাদারী নাট্যশালাগুলিতে সীমাবদ্ধ। ব্যাপকভাবে নাটক নিয়ন্ত্রণ করবার কোন ক্ষমতা তাঁর না থাকা সত্ত্বেও ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে House of Lords ও House of Commons-এর সদস্যগণ মিলে যে Joint Committee এই আইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনবার জন্য গঠিত হয়, সেখানে দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাট্যকার এই আইন সংশোধন করবার অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, এই আইন পেশাদারী নাট্যশালা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণয়ন করা হয়— নাটক নিয়ন্ত্রণের জন্য নয়।

এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে, বর্তমানে নাট্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে বিল আনা হচ্ছে তা সর্বতোভাবে অপ্রয়োজনীয়, সুতরাং সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়।—সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী

নাট্য গোষ্ঠী

বাংলার নাট্যশিল্পী ও নাট্যানুরাগী সম্প্রদায় কর্তৃক আহূত গত ১৩ই মে ১৯৬৩ তারিখে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট-এ মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সারা বাংলা নাট্যানুষ্ঠান বিল আলোচনা সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবটি আমরা সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। আশা করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অগণতান্ত্রিক, অযৌক্তিক এবং বাংলার নাটক ও নাট্যশালার শ্বাসরোধকারী নাট্যানুষ্ঠান বিলটি জাতীয় সংস্কৃতির স্বার্থে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করিবেন, এবং ভারতের সংবিধানে ঘোষিত, নাগরিকগণের বাক্যের ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার হরণ হইতে বিরত থাকিবেন।

বিজন ভট্টাচার্য (ক্যালকাটা থিয়েটার), পরেশ ধর (দশরূপক), সুনীল দত্ত (জাতীয় নাট্যকার পরিষদ), রমেন লাহিড়ী (বিদ্যাসাগর নাট্য গোষ্ঠী), উমানাথ ভট্টাচার্য, জোছন দস্তিদার (রূপান্তরী), সুনীত মুখোপাধ্যায় (লোকতীর্থ), কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (শিল্পী মহল), বীরু মুখোপাধ্যায় (প্রান্তিক), কিরণ মৈত্র (অভ্যুদয়)।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি)

…নাট্য নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকারের এই অত্যুৎসাহ দেখে একথা কারোর বুঝতে বাকি থাকে না যে সরকারী প্রচার যন্ত্রে দেশের যে কৃত্রিম চেহারাটা তুলে ধরা হয় আসল চেহারাটা তা থেকে অন্য রূপ; এবং সেই আসল রূপটা নাটকে প্রতিফলিত হয় ব'লেই সেই দর্পণে মুখ দেখতে আমলাতান্ত্রিক সরকার ভয় পান। বলতে দ্বিধা নেই ভীতি থেকেই এই অবাঞ্ছিত নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিধির জন্ম। এই প্রচলন বাক্যটাই রাজ্য সরকার এযুগে আবার আমাদের নতুন ক'রে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে Pen is mighter than sword. তাঁরা আমাদের কলমকে ভয় করেন। না হ'লে চিন্তার স্বাধীনতাকে শ্বাসরোধ ক'রে মারার জন্য তাঁদের এমন উৎকট উৎসাহ কেন?…বাংলার নাট্যশালার প্রাণশক্তি হরণের জন্য যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা কুখ্যাত নাট্যানুষ্ঠান আইনের প্রবর্তন একদা ক'রেছিল সেই নাট্যশালা মরেনি—মরবে না। কিন্তু ভারত থেকে সেই সাম্রাজ্যবাদীদেরই বিদায় নিতে হয়েছে। আজকে ক্ষমতাদর্পে দর্পিত হ'য়ে শাসক গোষ্ঠী যদি বাংলা দেশের নাট্য জগতের কণ্ঠরোধ ক'রতে উদ্যত হন তবে সে কণ্ঠ শতগুণে গর্জে উঠবে।

—দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রান্তিক

"A nation is known by its theatre"—

এ কথা বলেছেন একজন ইংরাজ শিল্পী। দেশের ও জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান বোঝা যায় তার নাটকে, যাত্রাগানে, তরজায়, কবিগানে বা অপেরায়।

আজ দেশ, জাতি ও দেশের সংস্কৃতি বিপন্ন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্প ও সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করতে চ'লেছেন "নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল" পাশে উদ্যোগী হ'য়ে।

দেশের ও জাতির স্বার্থে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, ধনী, মধ্যবিত্ত, চাষী, মজুর, দেশের প্রতি কোণ থেকে এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত ব'লে আমি মনে করি। —জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

থিয়েটার ইউনিট

শিল্প-সৃষ্টি মানুষের বিধি-দত্ত অধিকার—, শিল্পই জাতির সভ্যতার মাপকাঠি। নাট্য-উৎকর্ষ গ্রীক সভ্যতাকে আজও পৃথিবীর চোখে ঈর্ষার বস্তু করে রেখেছে—গ্যেটে, শিলার, শেক্স্‌পীয়ার তাঁদের জাতির গৌরব। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রস্তাবিত নাট্য-নিয়ন্ত্রণ-আইন একটি ইতিহাস বিরোধী ঔদ্ধত্য—জাতির কলঙ্ক। সরকারের চোখে বাংলার মানুষ আজ নির্বুদ্ধি—তাঁদের বিচার বিবেকের ওপর সরকার আস্থা হারিয়েছেন—পশ্চিম বাংলার সমস্ত মানুষ আজ সরকারের চোখে Criminal—তাই পুলিশ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করতে চান তাঁদের বিচার শক্তিকে। মানুষের বিবেকের এত বড় অপমান কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি কি সমর্থন করবেন? পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে এ নিয়ম নেই যে অভিনয়ের পূর্বে পুলিশকে দিয়ে নাটক অনুমোদন করাতে হবে। যে দেশে শিল্পীর স্বাধীনতা নেই—যে দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির অভিভাবক পুলিশ, সে-দেশ কি ক'রে গণতান্ত্রিকতার বড়াই করে? সে দেশ-এর সরকার কি ক'রে অন্য দেশকে বলে Totalitarian?

জাতির সংস্কৃতি আজ বিপন্ন—আমি মনে করি এ' একটা জাতির বিপর্যয় এবং এই বিলের প্রতিরোধ করা যে-কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির পবিত্র কর্তব্য।

—শেখর চট্টোপাধ্যায়

গন্ধর্ব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী ১৫ই জুলাই বিধানসভার অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল (১৯৬২) পাশ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। নাট্যকর্মী হিসাবে আমরা তৎপ্রতি আমাদের অপরিসীম অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা মনে করি, এই বিল বাঙ্গালীর কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক তথা জাতীয় চরিত্রের উপর কলঙ্ক লেপনে উদ্যত। শিল্পীর স্বাধীনতার ও শিল্পের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত রাজ্য সরকারের এই অবিবেচনাপ্রসূত হীন প্রস্তাবের বিপক্ষে হাত মিলাইতেছি।—শ্যামল ঘোষ

নাট্যকার সঙ্ঘ

প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিল বাংলার নাটক ও নাট্যশালার মৃত্যুর পরোয়ানা। নিছক আত্মরক্ষার জন্যই প্রত্যেক নাট্যকারকে এই বিলের প্রতিরোধে সংকল্প নিতে হবে। —কিরণ মৈত্র

শৌভনিক

প্রাদেশিকতা, স্বজাতিবৈর, অশ্লীলতা, রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্ররোচনা ইত্যাদি গর্হিত নীতির অসঙ্গত প্রচার বন্ধ করার অজুহাতে সরকারী প্রচেষ্টা গোটা নাট্যকলাকেই বাংলার বুক থেকে মুছে ফেলতে এবং সেন্সরের জাঁতাকলে ফেলে নাট্যকারের কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত। জাতীয় সংস্কৃতির বাহক ও ধারক কোনো বাঙালী এই বিলের প্রতিবাদ না করে পারেন না। আমরা যারা অপেশাদার শিল্পী, দারুণ অর্থনৈতিক কষ্ট সহ্য করে, প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করে নাট্যকলার উন্নতি ও সুষ্ঠু বিকাশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি তারা একযোগে এই অগণতান্ত্রিক নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল প্রত্যাহারের দাবী করি। —নিবেদিতা দাশ

রূপকার

নাট্যশিল্পীকে নাগপাশে বেঁধে অভিনয় করতে বললে সে অভিনয় হবে না। সেটা হবে শিল্পীর কারাদণ্ড। ব্রিটিশ আমলে এ অবস্থা হ'লে চমকাতাম না। স্বাধীন ভারতে এটা অসহ্য। —সবিতাব্রত দত্ত

চতুর্মুখ

নাট্য উন্নয়নকল্পে ভারত সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত বিলে তার মূলোৎপাটন সূচিত হচ্ছে। আশা করি, এই বিলটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় নীতির বিরোধিতা থেকে বিরত থাকবেন। —শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য, অসীম চক্রবর্তী

ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ

বাংলার সংস্কৃতিজীবনের ওপর সরকারী কলুষ হস্তক্ষেপের অবাধ ছাড়-পত্রের দাবী নিয়ে হাজির হয়েছে প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলটি। এ বিল পাশ হ'লে বাংলা দেশে সমাজসংস্কৃতির ধারা তার স্বচ্ছ, সাবলীল ছন্দ হারিয়ে ফেলবে—এমন আশংকা অমূলক নয়। রাজ্য সরকার ও তার আইনপ্রণেতাদের কাছে সবিনয়ে একটা নিবেদন রাখতে চাই: আষ্টেপৃষ্ঠে শেকল জড়িয়েও কলালক্ষ্মীর মুখে তোতার বুলি ফোটানো যায় না। সে অপচেষ্টা যারা করে তাদের নাম ইতিহাসে কলঙ্কের নায়ক রূপেই চিত্রিত হয়। —ত্রিদিব লাহিড়ী

আমি দেখে এসেছি পিপল্‌স্ ডেমোক্রেসীগুলি নাটকের ও নাট্যশালার মাধ্যমে মানবজীবনকে কেমন সুন্দর করেই না ফুটিয়ে তুলেছে। আমি জানি প্রাচীন ভারত অতীতে তাই করতে সফল হয়েছিল। আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যতের ভারতও তাই পারবে। শুধু রাষ্ট্রকে সুস্থ চিত্তে, সহিষ্ণুতার সঙ্গে, দলগত মনোভাব পোষণ না করে, উদার দৃষ্টি নিয়ে নাট্য-প্রয়োগকে জাতীয় প্লানিংয়ের ভিতরে স্থান দিতে হবে। স্বীকার করে নিতে হবে ডেমোক্রেসী দলগত ক্ষমতার হস্তান্তর বা রাষ্ট্র-কাঠামোর রূপান্তর অস্বীকার করে না বলেই তার মর্যাদা দেওয়া হয়। যে ডেমোক্রেসী তা অস্বীকার করে তা মর্যাদা পাবার অযোগ্য।

মানুষের প্রতিষ্ঠাই নাটুকেদের কামনা। নাটকের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধ মানুষের মনে মনে সহজে বুনে দেওয়া যায়। আমি বিশ্বাস করি মানুষের প্রতিষ্ঠার, মানুষের জয়যাত্রার, প্রতিবন্ধকতা করতে ভারত-রাষ্ট্র কখনো শঙ্কারু-পৃষ্ঠ হবে না। —শচীন সেনগুপ্ত

গন্ধর্ব

ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৬৩

নাট্যপ্রিয় বাংলার জনসাধারণ একবাক্যে রায় দিয়েছেন, পরিবর্তন নয়, সংশোধনের নামে ধাপ্পাবাজি নয়—এই বিল সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হোক। কারণ এই বিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই বিল বাংলার ক্রমবর্ধমান নাট্য আন্দোলনের চরম সর্বনাশ করবে। শিল্পীর স্বাধীনতা হরণ করবে। কাজেই বিল আমরা মানবো না।

তপন সিংহ

প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলটি বাংলার নাট্য জগতে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় এসে পড়েছে। বৈদেশিক অভিযানে আমাদের দেশ যখন বিপর্যস্ত তখন বাংলার শিল্পী সমাজ সে অভিযানের প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তার দলিলচিত্র দেশবাসী দেখেছেন। সরকার এই বিলটি এনে শিল্পী সমাজকে কি তারই পুরস্কার দিচ্ছেন? সরকার অবিলম্বে বিলটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করুন—এ দাবী আমারও।

সরযূ দেবী

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী হয়ে গেল; দ্বিজেন্দ্র লাল জন্মশতবার্ষিকী চলেছে। গোটা দেশ এই দুই মহামনীষীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। কিন্তু প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলে এঁদের নাটকও পুলিশী মঞ্জুরি পেলে তবে অভিনীত হতে পারবে—এ বিধান রয়েছে। বহু কারণের মধ্যে এই একটি কারণেই বিলটি অশ্রদ্ধের বলে গণ্য হতে পারে। বিলটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবী অযৌক্তিক নয়।

জহর রায়

সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ, মূল্যনিয়ন্ত্রণ,—এ সব করতে পারছেন না; নাট্য-নিয়ন্ত্রণ করতে এগিয়ে এসেছেন। এতে যে কত লোক বেকার হবে, সেটা কি সরকার ভেবে দেখেছেন? বেকার শিল্পীদের মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কি সরকার?

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলে নাট্যকলার চর্চাকে পুলিশ কমিশনারের বা জেলা শাসকের নির্দেশনির্ভর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুনিতে পাই, শেষ আবেদনের জন্য পাঁচজন ভদ্রলোককে লইয়া একটি বোর্ড গঠন করা হইবে। তাহাই যদি হয়, তবে মধ্যে পুলিশ কেন? আর যেখানে পাঁচ লক্ষ দর্শকের বোর্ড আছে সেখানে পাঁচজন ভদ্রলোকের বোর্ড রাখার প্রয়োজনই বা কি? এই বিল গণতন্ত্রবিরোধী—সুতরাং এই বিল আমরা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করিতে বলি।

উত্তমকুমার

প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলটি নাট্যমঞ্চকে অমাবস্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেছে। এটা আইনে পরিণত হ'লে মঞ্চে শুধু একটি বৃন্ত থাকবে বলেই

আশংকা। সে দৃষ্টান্ত—কৃষ্ণ যবনিকা। জনমতের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিলটি সম্যক প্রত্যাহারের দাবী আমিও জানাচ্ছি।

সম্পাদকের নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিল বাংলার নাট্য আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক জীবনে আজ যে অপ্রত্যাশিত আঘাতে হানতে উদ্যত হয়েছে, তার প্রতিরোধে সারা বাংলার নাট্যশিল্পী ও নাট্যানুরাগীগণ রাজনৈতিক মতবাদনির্বিশেষে যেভাবে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন তা বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

আপত্তিকর বিলটির খসড়া ১০ই ডিসেম্বর '৬২ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হবার পর ৭ই জানুয়ারী ১৯৬৩ ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাট্যকার মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে বিভিন্ন নাট্য এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। সেই বৈঠকে যথাশীঘ্র পশ্চিমবঙ্গের নাট্য ও সংস্কৃতি জগতের প্রতিনিধিত্বমূলক একটি সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অত্যন্ত আনন্দের কথা, অতঃপর নাট্যকার সঙ্ঘ, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, বিশ্বরূপা নাট্য সাহিত্য সম্মেলন, বঙ্গীয় নাট্য সংসদ, ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ এবং আরো অনেক সংগঠন বিলটি সর্বসাকুল্যে প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তুতির কাজ শুরু হয় এবং নাট্য ও চিত্র জগতের সকল স্তরের কর্মীদের সমর্থন ও সহযোগিতায় কাজ দ্রুত এগিয়ে চলতে থাকে। বহু প্রখ্যাত শিল্পী ও নাট্যকার প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন এবং এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তাঁদের আশ্বাসে বলীয়ান হয়ে মফঃস্বলে বিভিন্ন জেলার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ স্থাপনে সচেষ্ট হই। ১২ ও ১৩ই মে'র সফল সম্মেলন ও প্রকাশ্য অধিবেশনে বিপুল জনসমাবেশ তারই পরিণত রূপ।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব পুস্তিকার প্রথম অংশে প্রকাশিত হয়েছে। প্রস্তাবের নির্দেশ অনুযায়ী সহযোগী সকল প্রতিষ্ঠান তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলে এই প্রস্তাবিত বিলের প্রত্যাহার দাবী জানিয়ে জনমত সংগঠিত করার কাজে ব্রতী হয়েছেন এবং ইতিমধ্যে শহর কলকাতায় এবং গ্রামজনপদে অসংখ্য সভা-সমিতি, পথপরিক্রমা ও আঞ্চলিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিল প্রত্যাহারের

দাবী ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলার জনমত এই বিলের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। আশা করি রাজ্য সরকার জনমতের রায় উপেক্ষা করবেন না।

জাগরণই জীবন আর একতাই শক্তি। —হাবুল দাস

—কৈফিয়ত

প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্বেও সময়ের স্বল্পতা হেতু বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রের সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মতামত আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি। পারলে পুস্তিকার গৌরব বৃদ্ধি পেত। সে জন্য আমরা লজ্জিত, অনুতপ্ত এবং দেশবাসীর নিকট মার্জনাপ্রার্থী।

এই পুস্তিকা প্রকাশে ও আন্দোলন সংগঠনে যাঁরা নানাভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

—সুখময় চক্রবর্তী, প্রকাশন-সম্পাদক

কর্মপরিষদ

সভাপতি—মন্মথ রায়, সম্পাদক—হাবুল দাস, কোষাধ্যক্ষ—চারুপ্রকাশ ঘোষ।

সভ্যগণ

গঙ্গাপদ বসু, সুধী প্রধান, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, তাপস সেন, উৎপল দত্ত, কৃষ্ণ কুণ্ডু, অবিনাশ দাশগুপ্ত, জিতেশ সান্যাল, শিব ভট্টাচার্য, গৌরচন্দ্র ঘোষ, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়।

[যুগান্তরের মহেন্দ্র সরকারের সঙ্গে দীপ্তিকুমার শীলের একটি সাক্ষাৎকার]

নবনাট্য আন্দোলন-এ "যুগান্তর"

১৩৬৩ সাল। বিশেষ করে নব নাট্য আন্দোলনের পর আমাদের দেশের সংবাদপত্র নাট্য আন্দোলনকে উৎসাহিত করে আসছে। নাট্য আন্দোলনের প্রবাহকে আজ দেশের নানা প্রান্তে পৌঁছানোর নেপথ্যে সংবাদপত্রের সহযোগিতা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য।

আজকের কালে "যুগান্তর" একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র। কয়েক বছর আগে এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ শুধু মাত্র নাটকের জন্যই একটি বিশেষ বিভাগ

শুরু করলেন। নামকরণ করলেন "কলাকেন্দ্র"। আজও এই "কলাকেন্দ্র" প্রতি সপ্তাহে নাট্য বিষয়ক সংবাদ পরিবেশন করছে। বর্তমানে এই বিভাগের দায়িত্বে আছেন মহেন্দ্র সরকার।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সরকারকে প্রশ্ন করলাম—কত সালে "কলাকেন্দ্র" বিভাগ শুরু হয়েছিল?

: ১৯৬৩ সালে।

কার পরিকল্পনায়?

: তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়'ই এর পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি যাত্রা, নাটক, গান বাজনা চিরকালই ভালবাসেন সুতরাং নাট্যপ্রীতির বশে এই বিভাগ শুরু করেন বলা চলে।

"কলাকেন্দ্র" বিভাগের শুরু থেকেই কি আপনি এর সম্পাদনা করছেন?

: না। এ-বিভাগের শুরুতে দক্ষিণারঞ্জন বসুর তত্ত্বাবধানে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর সম্পাদনার কাজ করতেন।

"কলাকেন্দ্র" প্রকাশের সার্থকতা কি?

: সার্থকতা আছে বইকি, নাট্য-প্রযোজনার নিরপেক্ষ সমালোচনার ফলে নাট্য-গোষ্ঠীরা তাদের দোষ ত্রুটি শুধরে নেবার সুযোগ পায়। অভিনেতা তার অভিনয়ের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়। সার্থকতা ওইখানে।

এ-বিভাগে কি শুধুমাত্র শহরের নাট্যচর্চার কথা আলোচিত হয়?

: শহর এবং শহর থেকে দূরের সব নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যচর্চার সংবাদই আমরা এ বিভাগে প্রকাশ করি।

"কলাকেন্দ্র"র প্রথম প্রকাশকালে কিছু কিছু নাট্যবিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশ হতে দেখেছি, কিন্তু আর দেখা যায় না কেন?

: শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনাকালে প্রকাশিত প্রায় নিবন্ধই ছিল বিদেশী নাট্যশাস্ত্র আশ্রিত। আমার পরিকল্পনা আছে আমাদের দেশীয় চিন্তাধারায় কিছু নাট্য বিষয়ক তথ্য বহুল নিবন্ধ প্রকাশের। কয়েকটা ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে বিভাগীয় পাতায় জায়গার অত্যন্ত অভাবে নিবন্ধ বা প্রবন্ধ প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। ভবিষ্যতে প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে।

লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ থেকে চলাচল

১৯৬৪ সাল, ২৩ নবেম্বর রঙমহলে একটা হাসির নাটক দেখলাম। ঠিক নিছক হাসি নয় কিছু বক্তব্যও আছে বলা যায়। একটা সার্থক ব্যঙ্গ নাটক। উমানাথ ভট্টাচার্য্যের "ঠগ" প্রযোজনা করলেন চলাচল গোষ্ঠী, নির্দেশনায় ছিলেন এমন একজন শিল্পী যাকে আগে মাঠে ময়দানে উৎপল দত্তর 'স্পেশাল ট্রেন' পোস্টার নাটিকায় ব্যঙ্গ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছি, আবার কখনও দেখেছি 'অঙ্গারে' সনাতনের ভূমিকায় একটি গুরু-গম্ভীর চরিত্রাভিনয়ে। এ হেন সর্বগুণ সম্পন্ন শিল্পী রবী ঘোষই ছিলেন এই নাটকের পরিচালনায়। এই দলে যারা যারা অভিনয় করেছেন সবাই প্রায় সগু এল. টি. জি. থেকে চলে আসা শিল্পীর দল। এরা সকলেই এল. টি. জিতে বহুদিন জড়িয়ে ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক এরা এক সঙ্গে চলে এসে একটি দল গড়লেন, নাম চলাচল। প্রথম দিকে এরা পুরোন হাসির নাটক দিয়েই শুরু করেন, পরে উমানাথ ভট্টাচার্য্যের 'ঠগ' অভিনয় করলেন প্রায় কয়েকশো রাত্রি। এরপর এরা উমানাথ ভট্টাচার্য্যের 'ধনপতি গ্রেপ্তার' অভিনয় করলেন। সেটাও ব্যঙ্গ হাসির নাটক। এইবার এরা বাস্তব জীবনকে ধরলেন ভোলা ঘোষের, 'স্বপ্ন নয়' অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। এবার কিছু একাংক অভিনয় শুরু করলেন, যেমন ভোলা ঘোষের 'কিউবা'।

বিভিন্ন সময়ে অভিনয়ে ছিলেন: তপন রায়চৌধুরী, রবী চক্রবর্তী, বাণী কুমার, প্রণব চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, ভোলা দত্ত, উমানাথ ভট্টাচার্য্য, নিমাই ঘোষ, চিত্রা মণ্ডল, অনুভা গুপ্তা, গোরা চট্টোপাধ্যায়, তপন চট্টোপাধ্যায়, অহিন ভট্টাচার্য্য, রঞ্জিত দেব। মঞ্চব্যবস্থা—শ্যামল সেন, আলো—রবীন দাস, ব্যবস্থাপনায়—প্রেমাশিষ সেন, সুনীল রায়।

নবনাট্য থেকে গণনাট্যের পথে পথিক

১৯৬৪ সাল। তুলসী লাহিড়ীর পথিক মহলা দিতে গিয়ে যে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয় তার-ই ফলাফলস্বরূপ জন্ম নিল পথিক নামে একটি সম্প্রদায়। এদের প্রথম নাটক বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', নাট্যরূপ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম

অভিনয় হয় ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট হলে ১১শে সেপ্টেম্বর। পরবর্তী কালে এই সংস্থা নাটক সম্বন্ধে চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে বিপ্লবীতত্ত্বর ওপর ভিত্তি করে নাটক বাছাই করলেন। গোর্কী শতবার্ষিকীতে এরা গোর্কীর 'মাদার' অবলম্বনে বিষ্ণু চক্রবর্তীর 'মা' অভিনয়ের মাধ্যমে একাধারে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন অন্য ধারে গণশিল্পের পথে বিশ্বাসী হলেন। বিপ্লবী তত্ত্বর ওপর ভিত্তি করে নাটক অভিনয়ের দিকে এদের দৃষ্টি আরো সচ্ছ হয়ে গেল। প্রায় ৫০ রাত্রি এই 'মা' অভিনয় করেন। অবশ্য এরা প্রথম দিকে পরশুরামের 'রামধনের বৈরাগ্য,' দীনবন্ধুর 'জামাইবারিক', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' (নাট্যরূপ) ইন্দ্রনাথের মৌলিক নাটক 'ধূসর অতীত', 'জনযুদ্ধ', 'হাতিয়ার', 'ইতিহাসের পাতায়', উৎপল দত্তর 'সমাধান'। সবশেষে জানা গেল এরা কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকায় বিষ্ণু চক্রবর্তীর 'কাকদ্বীপ' নাটক অভিনয় করছেন। এই সংস্থার নাটক নির্দেশনা করেন জ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'মা' নাটকের নতুন ধরনের নির্দেশনার মাধ্যমে এদের ক্ষমতার পরিচয় আমরা পেয়েছি।

পথিক সংস্থায় যাঁরা নিয়মিত অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন:—সুনীল সুর, গোপাল দে, মনি মানি, সনৎ বসু, শ্যামাসত্য মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বল, কল্যাণ কর্মকার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অনুপম বাগচী, কান্তিময় রায়চৌধুরী, জয়ন্ত মতিলাল, কামাখ্যা ঘোষ, পঙ্কজ গাঙ্গুলী, সত্যেশ মজুমদার, রঞ্জন বসু, তপন মজুমদার, গোপাল পোদ্দার, চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালী দে, অজন্তা চৌধুরী, রাজু রায়, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় এবং জ্যোতিপ্রকাশ।

চতুর্ম্মুখ থেকে মুকুর

১৯৬৪ সাল। এক সময়ে চতুর্ম্মুখের প্রতিষ্ঠাতা বললে যাকে ভুল হবে না এমনি একজন শিল্পী শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য, চতুর্ম্মুখের সঙ্গে মত বিরোধের ফলে দলত্যাগ করে আর একটি দল গড়লেন যার নাম মুকুর। এরা দুটি একাংক দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। যিনি দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে নাট্য সাধনা করছেন এমনি একজন নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'কামধেনু কবচ' ও 'অর্কেষ্ট্রা' এদের প্রথম প্রযোজনা বলা যায়। এরপর এরা আসরে নামলেন অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের

'থানা থেকে আসছি' নিয়ে। এরা প্রায় কয়েক শো রাত্রি এই নাটকটি অভিনয় করেছেন। 'থানা থেকে আসছি'র একটি সমালোচনা আমি এখানে ছেপে দিলুম।

'থানা থেকে আসছি'

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'থানা থেকে আসছি'কে একটি মৌলিক নাটক বলেই ভ্রম হয়। যে-ব্যবহারকে আপাতদৃষ্টিতে একটি ছোট অবিচার বলে মনে হয়, তাই সময় সময় স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রাকে কি অভাবনীয়ভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে সেই কথাই তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকটির মাধ্যমে। বৃহত্তরভাবে দেখতে গেলে এই নাটকটি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে—বর্তমানের সামাজিক অব্যবস্থার দোষে সমাজের নীচের তলার জনসাধারণকে যে অবিচারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার প্রতি।

নবগঠিত 'মুকুর' নাট্যসংস্থার শিল্পীবৃন্দ পরিচালক শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য্যের নির্দেশে বিভিন্ন ভূমিকায় চরিত্রোচিত নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রথম অভিনয়রজনীসুলভ দ্বিধাগ্রস্তভাব প্রথম প্রথম কোনো কোনো শিল্পীকে ধিক্কার করলেও শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই স্বাভাবিকভাবে নিজ নিজ চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন। ইন্‌স্পেক্টার তিনকড়ি হালদার, তাপস সেন, লীলার পাণিপ্রার্থী অমিয় বসু, আধুনিকা শীলা এবং পরিবারের কর্তা ও গৃহিণীর ভূমিকায় যথাক্রম বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, সন্তোষ নন্দী, দীপা হালদার, শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য (পরিচালক) ও সবিতা মুখোপাধ্যায়—প্রত্যেকেরই অভিনয় প্রশংসাযোগ্য। থিয়েটার সেণ্টারে স্বল্পায়তন মঞ্চে একটি বহিরাগত সম্প্রদায়ের পক্ষে যতখানি সুষ্ঠু উপস্থাপনা সম্ভব তা' করতে শিল্প-নির্দেশক পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থ হয়েছেন।

মুকুর-সংস্থার 'থানা থেকে আসছি' দেখে নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দ একটি সচরাচর অনাস্বাদিত তৃপ্তি অনুভব করবেন।

বিভিন্ন সময়ে মুকুর নাট্য সংস্থার অভিনয়ে অংশ যারা গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে আছেন শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য, সবিতা মুখার্জী, দীপা হালদার, কমল বরণ, পঙ্কজ মেটিয়া, সন্তোষ নন্দী, অশোক চ্যাটার্জী। মুকুরের সংগঠকদের মধ্যে আছেন গায়ত্রী ভট্টাচার্য, ধীরেন বন্দোপাধ্যায়, ভাস্কর ভট্টাচার্য, ঝর্ণা দাস, কমল দাস, শিবনাথ মুখার্জী, শিবপ্রসাদ দাস, দেবদত্ত ভট্টাচার্য, সন্তোষ নন্দী, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, নমিতা নন্দী, অরুণ মজুমদার, আমজদ আলী, (এম. পি. হয়েছেন) সমরেশ পাল, শ্যামাদাস রায়, সমর সরকার। পরিচালনায় শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য, শিল্প নির্দেশনায় পঙ্কজ বন্দোপাধ্যায়। এরা অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নির্বোধ'





উপরে : সারা বাংলা নাট্যসম্মেলনে উপবিষ্ট ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য ও বক্তৃতারত প্রধান অতিথি ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। নীচে : প্রতিনিধি মণ্ডলীর একাংশ।

নাটক ও নাট্য শতবার্ষিকীতে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ' মঞ্চস্থ করছেন। এছাড়া শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্যের 'পরিক্রমা' নাটকও এরা এর আগে মঞ্চস্থ করেছেন।

জলি ক্লাব

জলি ক্লাব এর প্রতিষ্ঠা আড়িয়াদহ বিবেকানন্দ সংসদ থেকে। সংসদের কয়েকজন উৎসাহী শিক্ষিত তরুণ তৈরী করলেন 'জলি ক্লাব'। এই ক্লাবের প্রথম নাটক 'বারভূতে'। অভিনীত হয় ১৯৬৪ সালে।

ঐ সালেই এঁরা অভিনয় করেছেন 'নিষ্কৃতি' ও 'ছেলেটা'। তারপর থেকে এই দলের প্রযোজনায় পরপর অভিনীত হয়েছে 'কলেজ হোস্টেল', 'হারাণের নাতজামাই', 'নাটক নয়', 'গুঞ্জন', 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'আবাদ', 'আজকাল', 'রাইফেল', 'হত্যা পাপ নহে' ও 'রক্তকরবী'।

দলের মধ্যে নাট্যকার কেউ নেই তবে নাট্যরূপ অনেকে দেন। তাদের মধ্যে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীল কোলে অন্যতম। নাট্য নির্দেশনা নিজেরাই দিতেন। তার মধ্যে বীরেশ্বর ভট্টাচার্য, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সুনীল কোলে ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করার মতন। ১৯৬৮ সালে ইলাবন্ত ঘোষ (সদস্য নন) নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব নেন।

বর্তমানে এই দলের সদস্যসংখ্যা ৩০ জন এবং এই সংখ্যা ত্রিশের মধ্যেই এঁরা সীমিত রাখতে চান। দল প্রতিষ্ঠায় যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁদের মধ্যে গণেশ চট্টোপাধ্যায়, হারাধন গাঙ্গুলী, পঞ্চানন হাজরা, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল মণ্ডল আর রাজার নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

ইউরেকা

১৯৬৪ সাল, একটি পুরোনো সংগঠন দীপালি সঙ্ঘের নতুন নামকরণ হলো ইউরেকা। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন তরুণ ঘোষ। এরা পরে শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ', 'শিল্পী চাই', অমর গাঙ্গুলীর 'জীবন যৌবন', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাহার নামটি রঞ্জনা' এবং 'গুরু বাক্য', 'সূর্য্যগ্রহণ', 'নানা

রংয়ের দিন', 'কার দোষ', তরুণ ঘোষের 'ইব্রাহিমার বিচার', 'মিলন মধুর' নাটকগুলি সার্থকভাবে অভিনয় করেন।

অবশ্য এদের জন্ম আরো আগে। ১৯৫৮ সালে দীপালি সঙ্ঘর নামে 'কাজের ছেলে' অভিনয় করেন। পরিচালনায় তরুণ ঘোষ। এই দলের নাট্যশিল্পীদের মধ্যে আছেন কমল গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ চক্রবর্তী, অজয় কোলে, শিশির রায়, সমীর দাস, সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যপ্রযোজনার সাথে সাথে ইউরেকার সদস্যরা নানারকম নাট্য আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত। প্রমোদকর উচ্ছেদ, স্থানে স্থানে মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ স্থাপন ইত্যাদি দাবীতে এরা এখনও সোচ্চার।

নাট্য আন্দোলন ও সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন

১৯৬৪ সাল একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর বলা যায়। এই বৎসরে অনেক কিছুই ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন।

বিগত ৬২ থেকে ৬৪'র এপ্রিল মাস অবধি নাট্যজগতে একটা দারুন দুর্যোগের কালো ছায়া পড়েছিল। অনেক প্রগতিশীল নাট্য সংগঠন মুখ খুলতে পারছিলেন না। প্রগতিশীল নাটক অভিনয়ও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যেমন লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের অঙ্গার চাপে পড়ে বন্ধ করতে হয়েছিল।

এইরকম একটি দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে নাট্যকার সুনীল দত্ত, সলিল সেন, রবেন লাহিড়ী, কিরণ মৈত্র, নাটকের উন্নতির কথা ভেবেই নাট্য সম্মেলন করার উদ্যোগী হয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায় মহাশয়। লক্ষ ঐ একটাই, নাট্য সংকট থেকে উদ্ধার পাবার আশা। এখানে কংগ্রেস-বা কমিউনিস্ট বা আর. এস. পি. নামে কেউ ছিল না বা কোন দলের টাকাতেও এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। কিছু নাট্য শিল্পী এক হয়েছিলেন নাট্য ভাবনার আদান প্রদান করার জন্তে মাত্র। এ সংগঠন যে বরাবর টিকতে পারে না এটা আমরা ভালভাবেই জানতুম। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কারুর কোন নেতৃত্ব কেড়ে নেবারও অভিপ্রায় উদ্যোক্তাদের কারুরই ছিল না। অবশ্য অনেকেই সেই সময়ে ভুল বুঝলেন, বোধ হয় কোন পাল্টা সংগঠন তৈরী করল এরা। আমরা সেদিনও বলেছি আজও বলছি এর উত্থান যেমন

হঠাৎ ঘটে গিয়েছিল, মুছেও গেছে স্বাভাবিক অবস্থাতেই. একে মোছার জন্যে কারুর কিছুই করতে হয়নি। শুধু রেখে গেছে কিছু স্মৃতি। যা আজও প্রতিটি নাট্যকর্মীরই মনে পড়ে যায়। একথা বললে ভুল হবে না যে এই প্রথম এইটেই একমাত্র গণতান্ত্রিক নাট্য সম্মেলন যেখানে দলমত নির্বিশেষে নির্ভয়ে নাটক নিয়ে খোলা মনে আলোচনা করতে পারছেন। কি পেয়েছি জানিনা. কি পাবার আশা ছিল তাও জানিনা। শুধু এইটুকু জানি কিছু ভাবনায় আদান প্রদান ঘটেছে মাত্র। তৎকালীন অবস্থাটা বিচার করে নাট্য সম্মেলনকে বিশ্লেষণ করলে বোধহয় কিছু পাওয়াই যায়। তাই এই সম্মেলনের গুরুত্ব বুঝে আমি ঐ সময়ে সম্মেলনের যে স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ হয়েছিল, সেই স্মারক গ্রন্থটির পুরোটাই ছেপে দিলুম।

সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন
স্বাগত সম্ভাষণ

১৯৬৪ সালের এই সম্মেলনের শুরুতে প্রথমেই তাঁদের কথা মনে পড়ছে— যাঁরা নাটকের জন্যেই জীবন উৎসর্গ করেছেন—যাঁদের আজীবনের সৃষ্টিকর্ম, আমাদের কাছে হয়ে আছে চিরন্তন প্রেরণা। তাঁদের অমর স্মৃতির প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সম্মেলনে সমবেত সমগ্র নাট্যশিল্পী ও বিদগ্ধজনকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং সভাপতিমণ্ডলী. সংস্থাসমূহ ও প্রতিনিধিমণ্ডলীকে আমরা আন্তরিক-ভাবে জানাচ্ছি, যেন এই সম্মেলনে তাঁরা নাটকের সামগ্রিক মূল্যায়ণ করতে পারেন।

আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি—কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, অথবা দলের নির্দেশ বা অনুরোধে আমরা এই সম্মেলন আহ্বান করিনি। জাতীয় নাট্যকার পরিষদের প্রাথমিক আহ্বানে—একটি সর্ববাদীসম্মত ও বিভিন্ন মত—পথ-চিন্তার প্রতিনিধিদের নিয়ে—সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি প্রস্তুতি কমিটির মাধ্যমে কাশিমবাজার রাজভবনে ৮টি সভার নির্দেশ গ্রহণ করে এই সম্মেলন গঠন করা হয়েছে। সমগ্র প্রতিনিধিদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, স্বাধীন চিন্তার কোনরকম ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তাঁরা নাটকের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দিক্-নির্দেশ করুন। এবং একমত হয়ে এই সম্মেলনের পটভূমিকায় একটি

সর্ববাদীসম্মত "ভাণ্ডার" দ্বারা নাটকের ভবিষ্যত জয়যাত্রার পথ সুনিশ্চিত করুন।

এই সুযোগে আমরা শ্রদ্ধা জানাই পৃষ্ঠপোষক সদস্যদের এবং কৃতজ্ঞতা জানাই সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতাদের। এবং অভিনন্দন জানাই বাংলা দেশের সমস্ত পেশাদার ও অপেশাদার নাট্য সংস্থাদের যাঁরা, প্রতিনিধি পাঠিয়ে এই সম্মেলনকে চিন্তা বিনিময়ের পীঠস্থান করে তুলেছেন। আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ হয়ে যে প্রতিনিধিরা পূর্ব-পাকিস্তান, ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে এই সম্মেলনে শরিক হয়েছেন—তাঁদেরও আমরা অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুনীল দত্ত ও রমেন লাহিড়ী

যুগ্ম সম্পাদক

আহ্বায়ক—নাট্যশিল্পী, নাট্যসংস্থা, নাট্যকর্মী ও নাট্যকারবৃন্দ। মূল উপদেষ্টা—মন্মথ রায়। কার্য নির্বাহক সমিতি—সলিল সেন, কিরণ মৈত্র, বীরু মুখোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য, সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, বিমল রায়, নির্মল ঘোষ, হাবুল দাস। যুগ্ম সম্পাদক—সুনীল দত্ত ও রমেন লাহিড়ী। কার্যালয়—১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ফোন—৩৪-৬২১৮।

পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ—ডঃ নীহার রঞ্জন গুপ্ত, হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী সরকার, সলিল মিত্র, সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, অসিত চৌধুরী, পি. সি. চৌধুরী, বিভূতি সরকার, বাণীকান্ত গুহ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আলোক চিত্র গ্রহণে—অধ্যাপক স্নেহাংশু বিকাশ সেন। অঙ্কন শিল্পে—প্রণব কুমার শূর। মঞ্চ সজ্জায়—সজল রায় চৌধুরী, পরিমল দত্ত, প্রশান্ত রায় চৌধুরী।

মূলপ্রস্তাব / প্রস্তাবক—সলিল সেন

সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন-এর ঘোষণাপত্র সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব—সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন শৈল্পিক সুস্থতার সম্পর্কিত ও দলমত নির্বিশেষে নবীন প্রবীণ নাট্যকার, নাট্যশিল্পী, নাট্যকর্মী, নাট্যসংস্থা এবং নাট্যসেবীবৃন্দের আহ্বানে সুসংবদ্ধ এক নাট্যবিষয়ী সার্বিক আলোচনা অভিপ্রায়ী ও সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নির্ণয় প্রয়াসী সংগঠন।

যার প্রেরণা হ'ল :—

প্রাক্-স্বাধীনতাকালে সমাজ-সংস্কার চেতনা, স্বদেশপ্রাণতা ও মানবতা-বোধের উজ্জ্বলতায় ভাস্বর বাংলা নাট্য-ঐতিহ্যের অমূল্য উত্তরাধিকার।

যার উদ্দেশ্য হ'ল :—

সাম্প্রতিক বাংলা নাট্যধারার মননবাহী চেতনায় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালীন রাষ্ট্রীক, আর্থিক, সমাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা ও কর্মের প্রভাব বিশ্লেষণ, ব্যর্থতা, সার্থকতার বিচার, নবজাগ্রত সমাজচেতনা ও দার্শনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে চল্লিশোত্তরকালের নাট্যমানসিকতা ও শিল্পরুচির বিশ্লেষণ, সাহিত্যগত সৌষ্ঠব এবং যুগমুখীন সততার মান নিরূপণ।

যার লক্ষ্য হ'ল :—

ঐতিহ্যগত অনুপ্রেরণা ও সমকালীন অনুভাবনা, দার্শনিকতাগত উপলব্ধি, আদর্শগত বিশ্বাস ও জীবনবোধসঞ্জাত সাধনা ও সিদ্ধির নিরিখে আমাদের এতাবৎ আচরিত সামগ্রিক নাট্যপ্রয়াসকে ঐতিহাসিক মূল্যবোধের উপর সংস্থাপন, আগামীকালের নাট্যসম্ভাবনার সম্মুখে নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বপ্রকার আর্থিক ও আত্মিকপীড়নে জর্জরিত আপামর দেশবাসীর একান্ত কাম্য, শোষণপীড়নহীন প্রকৃত সমাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার পত্তন ত্বরান্বিত করার জন্য নাট্যকর্মের মাধ্যমে প্রেরণা সঞ্চার করা।

সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন মনে করে, বিঘোষিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সার্থকতম রূপায়ণের জন্য প্রতিটি নাট্যব্রতীকে প্রকৃত জীবনমুখীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে; আপন সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে; আদর্শগত বিশ্বাসে ও দার্শনিকতাগত উপলব্ধিতে স্থিতনিষ্ঠ হতে হবে এবং আপন মানবপ্রেমিক সত্তাকে সদাজাগ্রত রাখতে হবে। নাট্যসাহিত্যের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে নাট্যব্রতীকে যুগ ও জীবন সম্পর্কে কঠোরতম বাস্তবতার সম্মুখীন হ'তে হবে এবং সকল প্রকার ভয় ও কুণ্ঠা পরিহার করে আপন চিন্তায় ও কর্মে অভিন্ন-চিত্ত হ'তে হবে, সমাজতন্ত্র, শান্তি সাম্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে যা কিছু সৌন্দর্য-হন্তারক, অন্যায়, অনাচার ও বিকারগ্রস্ত তা সবের বিরুদ্ধে, যত কিছু প্রতিক্রিয়াশীল ও দমনাত্মক প্রয়াসের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ ও সংগ্রামী সংকল্পকে আপন আপন মাধ্যমে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করতে হবে।

প্রতিটি নাট্যপ্রযোজকগোষ্ঠীকে নাট্য প্রযোজনা ক্ষেত্রের সামগ্রিক মান উন্নয়নের প্রয়োজনে বাস্তব চিন্তাসম্মত, রুচিসঙ্গত ও নাট্যভাবানুসারী প্রযোজনা রীতি গ্রহণ করতে হবে; নাট্যপ্রযোজনা সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে নব উন্মেষশালিনী

প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজনে মঞ্চ আঙ্গিক ও অভিনয়রীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সাযুজ্য ঘটাতে হবে।

প্রতিটি নাট্যশিল্পীকে মনে প্রাণে আপন উদ্দেশ্য, কর্তব্য ও আদর্শ সম্পর্কে একনিষ্ঠ হ'তে হবে; মানুষের মনে যথার্থ সৌন্দর্যচেতনা ও নৈতিক প্রেরণা সঞ্চারের এই শৈল্পিক মাধ্যমকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে; অনুশীলনের আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার স্বাক্ষর রাখতে হবে আপন সৃষ্টির মধ্যে এবং মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের মধ্যেকার আপাতদূরত্বকে ঘোচাতে হবে অভিনয়কলার মাধ্যমে একটি সর্বাঙ্গীন ভাবপরিমণ্ডল রচনা করে।

প্রতিটি মঞ্চ-কারুকর্মীকে আপন কর্তব্যে অবিচল নিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখতে হবে, আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে, নাট্যের সামগ্রিক স্বার্থে আত্ম-নিয়োজিত থেকে সকলপ্রকার বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও বিশৃঙ্খল ভাবনাকে সংহত ও সুছন্দিত রূপে মূর্ত করে তুলতে হবে।

প্রতিটি নাট্যসমালোচককে নাট্যসমালোচনার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ও মানোন্নয়নের প্রয়োজনে সামগ্রিকভাবে নাট্যরচনাধারাকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি-ভঙ্গিতে বিচার করতে হবে; নাট্যঐতিহ্য, সমাজভাবনা ও নাট্য প্রতিবেশের সম্পর্কযুক্ত করে সমালোচনা উপস্থিত করতে হবে; নাট্যসমালোচনায় প্রকৃত গবেষকসুলভ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে হবে; সকল প্রকার বদ্ধ-মূল ধারণা ও সংস্কারজাত গণ্ডিবদ্ধতাকে পরিহার করতে হবে; ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিনিষ্ঠ দার্শনিকতার সমন্বয়ে নাট্যসমালোচনার একটি অধিক-জন গ্রাহ্য মানদণ্ড রচনা করতে হবে।

প্রতিটি নাট্যসেবীকে নাট্যরচনা ও প্রযোজনা তথা নাট্যের সামগ্রিক স্বার্থে অধিকতর সজাগ হ'তে হবে, সংবেদনশীল ও সহযোগিসুলভ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে; স্বচ্ছ, গঠনমূলক ও উদার-দৃষ্টিভঙ্গিতে নাট্যকর্মসমূহের পর্যালোচনা করতে হবে এবং নাটক, নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও কর্মীর মনে উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চারের জন্য সর্বপ্রকার আর্থিক ও আত্মিক আনুকূল্য দান করতে হবে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও ভিন্ন রাষ্ট্র বিশেষতঃ পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা গড়ে তুলতে হবে।

যেহেতু সকল প্রগতিশীল ও প্রকৃত গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের সরকার নাট্যকেই জনশিক্ষা বিস্তারের, জাতির সাংস্কৃতিক বিকাশের ও জাতীয় ঐক্যবোধ ও মানবতাবোধ সঞ্চারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে মান্য করেন এবং নাট্যরচনা

ও প্রযোজনা ক্ষেত্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতির স্বার্থে সকল প্রকার সহযোগিতা দান করেন। আমাদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকেও বাংলা নাটক ও প্রযোজনা তথা বাংলা নাট্যসাহিত্যের সামগ্রিক উন্নতির প্রয়োজনকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে ; নাটক রচনা ও প্রযোজনার মানোন্নয়নের পথে অন্তরায়স্বরূপ সৃষ্ট সকল প্রকার পীড়নমূলক আর্থিক ও অন্যান্য বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করতে হবে ; নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও নাট্য কর্মীদের আপন সাধনায় অবিচল থাকতে সাহায্য করার প্রয়োজনে তাঁদের জীবন ও জীবিকার পথ নিরুদ্বেগ করতে হবে ; সরকারী পর্যায়ে সকলপ্রকার শিল্প সাহিত্য সংশ্লিষ্ট গঠন মূলক প্রয়াস ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও নাট্যকর্মীদের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে ; নাট্যের মানোন্নয়নের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অধিকতর সংখ্যক ও সুলভে প্রাপ্য মঞ্চগৃহের ব্যবস্থা করতে হবে ; বাংলা নাট্যসাহিত্যকে বিশ্বনাট্য সাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে সরকারী ব্যবস্থায় বিদেশীভাষায় বাংলা নাটকের অনুবাদ প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে ; নাট্যঐতিহ্য ও আধুনিক নাটক সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা, আগ্রহ ও গৌরববোধ জাগ্রত করার প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যিক পাঠ্যতালিকায় বাংলা একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটককে উপযুক্তভাবে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন বিশ্বাস করে :—

আপন অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে তথা বাংলা নাট্যসাহিত্য ও প্রযোজনার সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে সকল নাট্যকার, নাট্যশিল্পী, নাট্যকর্মী, নাট্যসংস্থা ও নাট্যসেবী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের বিঘোষিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সফল করতে এগিয়ে আসবেন।

মূল সভাপতি মন্মথ রায়ের ভাষণ :—

'সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন' দলমত নির্বিশেষে সকল নাট্যকার, নাট্যশিল্পী, নাট্যসংস্থা, নাট্যকর্মী ও নাট্যসেবীর মিলিত আহ্বানে সঙ্ঘবদ্ধ নাট্য সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে আলোচনাকামী ও দিক্ নির্ণয় প্রয়াসী এক সংগঠন।

এই সম্মেলনে যে সত্য আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে, তা হ'ল একদিকে আমাদের অসীম ঐশ্বর্যমণ্ডিত নাট্য ঐতিহ্যের গৌরবময় উত্তরাধিকার, অপর—

দিকে আজকের পরিবর্তিত যুগ ও সমাজভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যশিল্পীবৃন্দের আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবার, ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের মধ্যে আত্মনিয়োগ করবার দুর্বার তাগিদ।

সামগ্রিকভাবে আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক আর্থিক তথা সাংস্কৃতিক জীবন আজ এক ক্রান্তিকালের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আমরা যেমন ঐতিহাসিক কারণেই স্বীকার করে নিয়েছি শোষণ পীড়নহীন প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পত্তন ভিন্ন জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনের আর দ্বিতীয় পথ নেই, তেমন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সেই নতুন সমাজচিন্তাকে সার্থক করার উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট, বিজ্ঞানসম্মত ও সুশৃংখল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটানোর অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। জাতিকে সর্বপ্রকার দৈন্যদুর্দশা থেকে মুক্ত করে যথার্থ উন্নতি ও প্রগতির পথে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে জাতীয় জীবনে গভীর দেশপ্রাণতা, সুস্থ নীতিবোধক ও বিজ্ঞান সম্মত জীবনদর্শনের স্থির প্রত্যয় থাকা দরকার। নতুবা কি অর্থনৈতিক কি সাংস্কৃতিক কোনও ক্ষেত্রেই কোনও প্রগতিচিন্তা সম্পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করতে পারে না।'

আজকের সমাজ-জীবন, আজকের সাংস্কৃতিক জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আমরা আর একবার জাতীয় সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছি। একদিকে আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য, অপরদিকে ধনবৈষম্য; একদিকে নিরঙ্কুশ কালোবাজারী ব্যবসা, অপরদিকে সেই কালোবাজার দমনে সরকারের অক্ষমতা। স্বাধীনতার এই সতের বৎসরে জাতি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে সাধারণ মানুষ 'প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত' হচ্ছে। জাতীয় জীবনের আদর্শবিচ্যুতির অবস্থা এবং তজ্জনিত নৈতিক অধঃপতন আমাদের জীবনে এক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে তা 'সকল গুণরাশিনাশী' হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনের মান উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা যে কোন কারণেই হোক, দেশে তেমন উৎসাহ সৃষ্টি করতে না পারায় বাঞ্ছিত ফলপ্রসবে অসমর্থ হয়েছে। 'রাজার পাপে রাজ্য নাশ' একথাও যেমন ঠিক, 'you get the Government you deserve' একথাও তেমনি ঠিক। শাসনযন্ত্রের অনাচার এবং দুর্নীতি আজ যে কতটা প্রকট তার ফলশ্রুতি কামরাজ পরিকল্পনা এবং বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দার দুর্নীতি দমন পরিকল্পনা। কিন্তু, জাতীয় চরিত্রের অবনতির জন্যই শাসনযন্ত্রের অনাচার দমিত তো হচ্ছেই না, বরং প্রশ্রয় পাচ্ছে।

সুতরাং একথা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আমরা শুধু এক জাতীয় সঙ্কটের সম্মুখীন নই, এক সভ্যতার সঙ্কটেরও সম্মুখীন হয়ে পড়েছি।

সমাজজীবন রাজনীতি এবং সমাজনীতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। রাজনীতি এবং সমাজনীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আমাদের সমাজজীবন এবং এই সমাজজীবনকে কখনই অবহেলা করতে পারে না আমাদের নাটক ও নাট্যশালা। জাতির এবং সমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও স্বপ্ন যদি নাটক ও নাট্যশালায় প্রতিফলিত না হয়, তবে সে নাটক ও নাট্যশালা লক্ষ্যভ্রষ্ট। নাটক ও নাট্যশালা জ্ঞানাঞ্জনশলাকারূপে জাতির চেতন ও অবচেতন মনে অধঃপতনের দুষ্টক্ষতগুলি সম্পর্কে চৈতন্য সঞ্চার করে জাতিকে যদি সঙ্কট উত্তরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত না করে, তবে সে নাটক ও নাট্যশালা পথভ্রষ্ট। আদর্শহীনতা ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে জাতিকে যেভাবে নীচে টেনে নামাচ্ছে, তাতে জাতীয় সংস্কৃতির বড়াই আর বেশিদিন চলবে মনে হয় না। বরং নৈতিক মূল্যবোধের এই নিম্নগামিতা জাতীয় সংস্কৃতিকে এমন নিম্নস্তরে টেনে নামাচ্ছে যে ভাবতেও হৃৎকম্প হয়।

কাজেই আজ এই চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে আমাদের ভাববার সময় এসেছে আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি এবং কোথায় চলেছি। যুগের রঙ যেমন পাল্টাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে হবে আমাদের চিন্তার ধারা। ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম আমরা সতের বৎসর আগে। কিন্তু, সত্যিকার ধর্ম সেদিনই বা কোথায় ছিল এবং আজই বা তা কোথায়! বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে, কি বিরাট এক রাজনৈতিক খাপ্‌পাবাজিতে আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি। ধর্মের নামে এতবড় অধর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের ঘরবাড়ি অনর্থক ভেঙে গেছে, শান্তির সংসার পুড়ে গেছে, তাদের রক্তপাতে মাতৃভূমি আজ এখনও সিক্ত। ধর্মের নামে এই যে ব্যভিচার এবং অনাচার—একি আমরা এখনও সহ্য করব! যে অমানুষিকতার তাণ্ডব চলছে, তাকে কি আমরা এখনও মেনে নেব! মানুষ হয়ে মানবিকতা কি আমরা বিসর্জন দেব! এই মিথ্যা ধর্মের মেকী বেদীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার সময় কি আজও আমাদের আসে নি! এখনও কি ঘোষণা করব না আমরা—'যা সমগ্রের শ্রেষ্ঠ হিত সাধন করে, তাকে অনুসরণ করাই আজ আমাদের একমাত্র ধর্ম। আর কোন ধর্ম ধর্ম নয়'! দুইটি মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা ও শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করে 'আর যুদ্ধ নয়'—এই সঙ্কল্প নিয়ে

বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন কি আজও আসে নি! ধনবৈষম্য ঘুচিয়ে প্রচুরতর লোকের প্রভূততম হিতসাধনের জন্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পে স্থিতনিষ্ঠ হতে কি এখনও আমরা বিলম্ব করব! আমাদের নাটক ও নাট্যশালা এই সব চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত থাকতে পারে কি এখনও? সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই যখন প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক নাট্যচেতনায় কেন উদ্বুদ্ধ হবে না আমাদের আজকের নাটক ও নাট্যশালা, আর কেনই বা উদ্বুদ্ধ করবে না দেশবাসীকে?

দেশের ও সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করে ব্যক্তিগতভাবে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আজকের নাট্য আন্দোলনের ধারাটি যে নতুন খাতে প্রবাহিত করা আবশ্যক, সেটি হচ্ছে সমাজতন্ত্রের খাত! একটি সমাজতন্ত্রী নাট্য দলের প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পারলে আমার এই অস্তায়মান জীবন তৃপ্ত হ'ত। অবশ্য আমি একথা জানি যে, শুধুমাত্র আন্দোলন করলেই যে আমরা মহৎ নাটক বা মহৎ নাট্য প্রযোজনা পাবো তা নয়। প্রতিভার স্পর্শ ছাড়া মহৎ সৃষ্টি হয় না। কিন্তু, সেই প্রতিভা যদি সমাজতন্ত্রের রসে অভিষিক্ত হয়, তবে জাতীয় জীবনে সমাজতন্ত্রের অভিষেক ত্বরান্বিত হবে সন্দেহ নেই। আমি ভুলি নি যে, 'সব সাহিত্যই প্রচার, কিন্তু প্রচার মাত্রই সাহিত্য নয়।'

কিন্তু তবু বলব জাতীয় সঙ্কট এবং সভ্যতার সঙ্কটকে রুখতে গিয়ে যুঝতে গিয়ে সুদর্শন চক্রের অথবা দিব্য অস্ত্রের প্রতীক্ষায় থাকবো বটে, কিন্তু হাতের কাছে যে অস্ত্র যে হাতিয়ার পাবো তাকেও অবহেলা করবো না, কাজে লাগাবো। আমাদের নাটক, কমেডিই হোক আর ট্রাজেডিই হোক, রোমান্টিক-ই হোক আর রিয়ালিস্টিক-ই হোক, হোক না কেন স্যাটায়ার অথবা এ্যাবসার্ড, আমরা যেন লক্ষ্যটি না ভুলি। প্রত্যেক নাটকেরই থাকে একটি বক্তব্য। প্রকাশ্যই হোক আর প্রচ্ছন্নই হোক, কিন্তু সে বক্তব্য আজ যেন সমাজতান্ত্রিক সুরে বাঁধা হয় আর তাতেই তা হবে জীবনধর্মী। সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করে আমাদের সুস্থভাবে বাঁচতে হলে, জগৎ সভায় আসন নিতে হলে, সমাজতন্ত্রের আশু প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আর কোন পথ নেই; এতে যত বিলম্ব হবে, জীবনযন্ত্রণা তত বাড়বে। অনস্বীকার্য এই পরম সত্যটিকে জাতির চিন্তা ভাবনায় দীপ্যমান রেখে সমাজতন্ত্রের সংকল্প ও সাধনাকে অকুণ্ঠ সাহায্য করাই আজকের নাটক ও নাট্যশালার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এবং ধর্ম। নাটক আর

বিলাস নয়, আত্মরক্ষার হাতিয়ার। আমাদের বংশধরগণ যেন একথা না বলতে পারে যে দেশ যখন পুড়ছিল আমরা তখন বসে বসে বাঁশী বাজিয়েছি।'

মূল সভাপতি—মন্মথ রায়, সম্মেলনের সভাপতি মণ্ডলী—ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, চারু প্রকাশ ঘোষ, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র।

সম্মেলনের কার্যসূচী। প্রথম অধিবেশন : শনিবার ২৭শে জুন, ষ্টুডেন্টস হল : সন্ধ্যা ছ'টায়। বাংলা নাটকের ভাব ও চিন্তা।

বিষয় ও উপস্থাপক :—

১। বাঙলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় নাটকের দান॥ বিভূতি মুখোপাধ্যায়, ২। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি নাটক ও নাট্যকারের দায়িত্ব॥ মনোরঞ্জন বিশ্বাস, ৩। নাটকে দর্শনের সমস্যা॥ রমেন লাহিড়ী, ৪। নাটকের প্রতি সমাজ ও দর্শকের দায়িত্ব॥ সুনীল দত্ত, ৫। নাটক বিচারের মানদণ্ড॥ দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। কাব্য নাটক॥ কৃষ্ণ ধর, ৭। নাট্য আন্দোলনে যাত্রার স্থান॥ বীরু মুখোপাধ্যায়, ৮। আজকের নাটক॥ কৃষ্ণ কুণ্ডু।

প্রকাশ্য অধিবেশন হয় ২৯শে জুন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। সভাপতি—মন্মথ রায়, প্রধান অতিথি—ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, উদ্বোধক শম্ভু মিত্র। বক্তা—ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, রাধামোহন ভট্টাচার্য, নীরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত স্মৃতি সম্মানী দ্বারা বিজন ভট্টাচার্য, কালী সরকার, সতু সেন-এর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় অধিবেশন

রবিবার, ২৮শে জুন—সকাল ন'টায় ষ্টুডেন্টস হল

নাট্য প্রযোজনায় আবেগ ও চরিত্র

বিষয় ও উপস্থাপক :—

১। আধুনিক নাট্য প্রযোজনায় আলোকের স্থান॥ তাপস সেন, ২। মঞ্চশিল্পীর সীমাবদ্ধতা॥ জহর রায়, ৩। আধুনিক নাটকে শিল্পীদের দায়িত্ব ও সমস্যা॥ মঞ্জু দে, ৪। নবনাট্যে সঙ্গীতের স্থান॥ সবিতাব্রত দত্ত, ৫। আধুনিক নাটক প্রযোজনায় মঞ্চ স্থাপত্যের স্থান॥ নির্মল গুহ রায়, ৬। নবনাট্যের কালে পুরানো নাটকের পুনরুজ্জীবনের সার্থকতা॥ শেখর চট্টোপাধ্যায়, ৭। ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা॥ সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। নাট্যকার, প্রযোজক ও পরিচালকের অন্তর্দ্বন্দ্ব॥ তরুণ রায়।

তৃতীয় অধিবেশন

রবিবার ২৮শে জুন বিকাল পাঁচটায় ষ্টুডেন্টস হল

পেশাদার মঞ্চ ও অপেশাদার গোষ্ঠীর সমস্যা

বিষয় ও উপস্থাপক :—

১। মঞ্চ-সজ্জায় পতিময়তা ॥ রাসবিহারী সরকার, ২। পেশাদার মঞ্চে পরিচালনার সমস্যা ॥ দেবনারায়ণ গুপ্ত, ৩। অপেশাদার গোষ্ঠী পরিচালনার সমস্যা ॥ বাণীকান্ত গুহ।

নাটক রচনা ও প্রযোজনার পর্যালোচনা :—

১। নাট্য সমালোচকের দৃষ্টিতে সাম্প্রতিক নাটক ও নাট্য প্রযোজনা ॥ ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য, ২। দর্শকের দৃষ্টিতে আধুনিক বাংলা নাটকে সার্থকতা ও ব্যর্থতা ॥ নারায়ণ ভট্টাচার্য, ৩। বাংলার বাইরে বাংলা নাটক ॥ সুকৃতি রায় (বোম্বাই), পরেশ দাস (দিল্লী), স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায় (পূঃ পাকিস্তান), ৪। ঘোষণাপত্র উপস্থাপন ॥ সলিল সেন।

২৫ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১ সালে,সম্মেলন উপলক্ষে একটি লেখা বসুমতী পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল আমি সেই লেখাটি এখানে ছেপে দিলুম।

নাটক ও সমাজ-চেতনা

সুনীল দত্ত

নদীর স্রোতের মত কালও এগিয়ে চলেছে। মানুষের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতিও এগিয়ে চলেছে সময়ের স্রোতের সঙ্গে তাল রেখে।

এই বিবর্তনশীল সমাজের এক একটা স্তরকে এক একটা বিশেষরূপে চিহ্নিত হ'য়ে উঠতে দেখি স্রষ্টার সৃষ্টিতে। বিগত কালের স্রষ্টারা পৌঁছে দেন কালের বার্তা বর্তমানের হাতে, যে বার্তা বর্তমানের প্রগতিশক্তিকে প্রেরণা জোগায়, সামর্থ যোগায় মানুষকে নতুন করে বাঁচার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করার।

নাটক জীবন শিল্প। নাট্যকারের ভাবনা আর বোধের রঙে রঞ্জিত হয়ে যে সৃষ্টি রূপ পায় তা একান্তভাবেই জীবনাশ্রয়ী। বহমান কালস্রোতের সঙ্গে নাট্যকারের সৃষ্টিধারাও চলমান। কালের বার্তাকে বহন করে নাটকও এগিয়ে চলে, প্রশস্ততর করে মানুষের প্রগতি চিন্তাকে। নাট্যকারের দায়িত্ব তাই দুরূহ, সাধনার পথও বন্ধুর।

শিল্পের ক্ষেত্রে এমন মতও চালু আছে, স্রষ্টা সৃষ্টি করবেন নিজের অন্তরের তাগিদে, একান্ত নিজস্ব ভাবনার জগতে বিচরণ করবে তাঁর চিন্তা এবং সেই তাঁর একক চিন্তার জগতে ক্ষণে ক্ষণে রঙ ফেরার সূত্রে নানান রঙের যে ভাবনা মূর্ত হবে তাঁর শিল্প কর্মের মধ্যে, সেই শিল্প হবে সম্পূর্ণভাবে বস্তু সম্পর্কহীন, উদ্দেশ্যহীন। সেই শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে রসসৃষ্টি করা, কারো মনোরঞ্জন করা নয়, কোনও বিশেষ আদর্শ বা বক্তব্যের বাণী বহন করা তো নয়ই।

এই মতের প্রবক্তা'র সংখ্যাও যেমন অল্প, সমর্থকের সংখ্যাও তেমনি সামান্য। স্রষ্টার পেছনে যদি কোনও উদ্দেশ্য কাজ না করতো তাহলে আদিম বর্বরতার যুগ থেকে আজকের সুসভ্য বিজ্ঞানসমৃদ্ধ যুগে এসে পৌঁছান সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

বস্তু জগতে যেমন মজুর গড়ে সহর নগর, চাষী ফলায় ফসল শস্য, শ্রমিক করে পণ্য উৎপাদন মানুষের বাঁচার উপায়কে সমৃদ্ধতর সুলভতর করতে; মনোজগতে তেমনি কবি লেখেন কাব্য, শিল্পী আঁকেন ছবি, সাহিত্যিক করেন সাহিত্য সৃষ্টি। মানুষের সেই বাঁচার চেতনাকে সুন্দরতর, প্রশস্ততর, মহত্তর করতে, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মানুষের এই যা কিছু 'কৃতি' বা কর্ম তাকেই বলা হয় সংস্কৃতি।

একালের সংস্কৃতি যদি পরবর্তীকালের সামনে প্রগতির পথকে প্রশস্ততর করতে না পারে, তবে সেই ব্যর্থতার কালকে বলবো 'বন্ধ্যা' কাল। একালের শিল্পী-স্রষ্টা যদি আগামীকালের ভাবনাকে পরিস্ফুট করতে না পারে তার সৃষ্টির মধ্যে, তবে সেই শিল্পীকে বলবো ব্যর্থ শিল্পী। তাই স্রষ্টার প্রধান দায়িত্ব তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমানের যা কিছু অন্যায়, যা কিছু অত্যাচার অনাচার বলে স্বীকৃত, যা কিছু প্রগতির পরিপন্থী, মনুষ্যত্বের বিদ্বেষী তা সবেরই বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদে মুখর হওয়া। নিপীড়িত মানব আত্মার সমর্থনে দাঁড়িয়ে যে শিল্পী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারবেন মানবতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে তার প্রচণ্ড প্রতিবাদ—তিনিই হবেন সার্থক শিল্পী। শুধুমাত্র ভাবজগতে বিচরণ করলে মাটির মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যাবে না। বোঝা যাবে না মানুষের সুখ দুঃখ, আশা হতাশা, চাওয়া পাওয়ার বেদনা আনন্দকে। প্রগতির বাণী বহন করতে হলে শিল্পী স্রষ্টাকে নেমে আসতে হবে প্রগতিকামী জনতার সরণীতে। যত কিছু প্রতিক্রিয়ার বাধা ঠেলে অমিত বিক্রমে তাকে এগিয়ে চলতে হবে নিজস্ব সৃষ্টির মাধ্যমে। তবেই সেই সৃষ্টি হ'য়ে উঠবে যথার্থ অর্থে 'সৃষ্টি'।

আজকের নাট্যকারকে এই প্রগতি চিন্তাকে তাঁর প্রত্যয়ের সিদ্ধিতে ভাস্বর করে তুলতে হবে। যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু প্রগতির চিন্তার পরিপোষক, নাট্যের মাধ্যমে সেই কথাকে তুলে ধরবার প্রচেষ্টায় তৎপর হ'তে হবে আজকের নাট্যকারকে। আজকের নাটককে একান্তভাবেই শোষিত, পীড়িত, বঞ্চিত মানুষের স্বপক্ষে থেকে আগামীকালের প্রগতি চিন্তার বাহক হ'য়ে উঠতে হবে। গণনাট্যের কাল থেকে নবনাট্যের কালের এই কুড়িটা বছর ধরে প্রতিটি সমাজ সচেতন নাট্যকার এই একই ভাবনাকে তাঁদের প্রত্যয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। আগামীকালের প্রতিটি জীবনপ্রেমী, সমাজ সচেতন নাট্যকারকেও এই একই প্রগতিচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তাঁদের নাটকের মাধ্যমে বলতে হবে 'চরৈবেতি', এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

রঙ্গশ্রী

১৯৬৪ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে একটি নাটক দেখতে গেলাম। শ্রদ্ধেয় নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'বন্যা' অভিনয় করলেন হাওড়ার একটি দল 'রঙ্গশ্রী'। গঙ্গার ওপার থেকে এসে টিকিট বিক্রি করে একটি নয় বেশ কয়েকটিবার অভিনয়ের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এরা, দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাছাড়া নাটকটি অভিনয় করাও যে খুব সহজ একথা বলা যায় না। মন্মথদার এই নাটকটি ৬০ সালে লেখা। বন্যায় দেশ ভেসে গেছে, কিছু মানুষ ভেসে এসে জড়ো হয়েছে একটি দ্বীপের ওপর। তারপর সেই মানুষগুলোর জীবনের 'সাধ-স্বপ্ন' সব ওলট পালট হয়ে গেল। স্বাভাবিক অবস্থায় যাকে যেভাবে দেখা যায়, অস্বাভাবিক পরিবেশে পড়ে তার পরিণতি কোনদিকে যাবে কেউ কি আগে থেকে বলতে পারে? এই প্রশ্নটি নাটক দেখার পর ভাবিয়ে তুলেছিল আমায়। ঐদিন জানা গেল ১৯৫৭ সালেই এই দলের যাত্রা শুরু হয় নীহার রঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা', সলিল সেনের 'মৌচোর' ও আরও অনেক নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে। এই সংস্থাকে যারা জীবনপণ সংগ্রাম করে টিকিয়ে রেখেছেন ৬৪ সাল পর্যন্ত, তাদের মধ্যে নাম করা যায় পাঁচকড়ি অধিকারী, নিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেষ্ট দাস, শুভেন্দু সিংহ। দেখতে দেখতে ১৯৬৫ সাল এলো। রমেন লাহিড়ীকে এরা পেলেন নাট্যকার পরিচালকরূপে। নাট্যকারের 'আরো প্রাণ চাই' দিয়ে শুরু করল রঙ্গশ্রী নতুন পথের যাত্রা। শুধু হাওড়ায় নয়, শুধু

কলকাতায় নয় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সবত্র অভিনয় শুরু করলেন। আজও করে চলেছেন।

'আরো গান চাই' বিশ্বরূপায় ৮ই জানুয়ারী ৬৬ সালে দেখতে গেলাম। বন্যা দেখেছিলাম, একটি অসংগঠিত সংগঠনের ছাপ ছিল প্রযোজনার মধ্যে। 'আরো গান চাই'তে সুসংগঠিত নাট্য প্রযোজনার ছাপ পাওয়া গেল। কৃতিত্বটা বুঝলাম পরিচালক রমেন লাহিড়ীরই।

রঙ্গশ্রীর সূচনা হ'ল এক নতুন অভ্যুদয়ের। নাট্যকার সমালোচক দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ নাটক দেখে যুগান্তর পত্রিকায় লিখেছেন—'বিকৃত রাজনীতি চিন্তাভঙ্গী সর্বস্ব কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন অসংলগ্ন নাটক দেখতে দেখতে যখন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম ঠিক সেই সময়েই একটি বলিষ্ঠ, সুচিন্তিত ও স্বাভাবিক মৌলিক নাটক ও তার অভিনয় দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল।" ৬৭ সালে আবার দেখতে গেলাম বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত নাট্যোৎসবে জে বি প্রিষ্টলের 'দে কেম টু এ সিটি' অবলম্বনে রমেন লাহিড়ীর 'এলেম নতুন দেশে' ওরা ডিসেম্বর। একটি নতুন ধরণের নাটক দেখে মনে হল এরা প্রযোজনার ক্ষেত্রে আর এক ধাপ এগিয়েছেন। এরপর এরা ঐ নাট্যকারের ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন 'নেতারঙ্গ' অভিনয় করলেন। এরপর ওরা সেপ্টেম্বর এরা সংস্থার নাট্যকারের 'মরণ খেলা' অভিনয় করলেন। ৬৭ সালে রমেন লাহিড়ীর নতুন জীবনের নাটক 'বেনজু' নিয়ে এরা থিয়েটার সেন্টারে নিয়মিত অভিনয় শুরু করলেন। এক যুদ্ধ পলাতক তরুণের করুণ জীবন কাহিনী নিয়ে লেখা এই নাটক। আরো সহজ করে বলা যায় নিহত মানবাত্মার কান্না 'বেনজু'। বহু সংবাদপত্র তখন উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করেছে এই নাটকের।

বেনজু'র পর রঙ্গশ্রীর অন্যতম উল্লেখ্য প্রযোজনা গোর্কির 'মা' (১৮. ১. ৬৯) এবং অলিভার গোল্ডস্মিথের শী স্টুপস্ টু কংকার অবলম্বনে রচিত অনাবিল হাসির নাটক 'পান্থশালা' (প্রথম অভিনয়—১০. ৫. ৭০)। পরবর্তী বড় নাটক নিগ্রো নাট্যকার ল্যাংস্টন হিউজের বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী নাটক মুলাটোর বঙ্গানুবাদ 'কালোরক্ত' (প্রথম অভিনয়—২১. ৯. ৭০) এবং বর্তমান যুব সমাজের হতাশা, বিভ্রান্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্তরিক সংগ্রামের মর্মস্পর্শী কাহিনী নিয়ে মৌলিক নাটক 'জন্মমৃত্যু' (প্রথম অভিনয়—২৫. ২. ৭২)। দুটি নাটকেরই অভিনয় এখন চালু রয়েছে।

দ্বিতীয় নাটকটির আলোক সম্পাত ও মঞ্চ কারিগর তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত। আবহসঙ্গীত উপদেষ্টা ও নির্দেশনা ভি বালসারা ও অরুণ দাসের।

বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে অভিনয়ের জন্য এঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন রমেন লাহিড়ীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'শততম রজনীর অভিনয়' নিয়ে। উল্লেখ করা যায় এই নাটকটি ১৯৬০ সালের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক হিসাবে বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ কর্তৃক পুরস্কৃত হয় এবং সর্ব-ভারতীয় নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বাংলা নাটক হিসাবে এই নাটকটিকে পুরস্কৃত করেন দিল্লীর ভারতীয় নাট্য সঙ্ঘ।

উপরিউক্ত নাটকগুলি ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের সং এণ্ড ড্রামা ডিভিসনের অনুমোদনক্রমে এবং আমন্ত্রণে গ্রাম সহরের বহুজায়গায় রঙ্গশ্রী গোষ্ঠী রমেন লাহিড়ীর 'সংসার' নাটকটির নিয়মিত অভিনয় পরিবেশন করে চলেছেন।

বহু একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আমেন', 'ষড়যন্ত্র', 'মনোবিকলন', 'অমর', 'জয়ের মন্ত্র', 'রাজযোটক' ও 'আমিই লেনিন'। 'আমিই লেনিন' নাটকটি লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত। আর সব কটি নাটকেরই রচয়িতা ও পরিচালক রমেন লাহিড়ী।

রঙ্গশ্রীর বর্তমান কর্মকর্তাবৃন্দ হলেন পান্নালাল সিংহ (সভাপতি), অঞ্জলি লাহিড়ী (সহ সভাপতি), স্বর্ণ দাস (সম্পাদক), রামেন্দু সিংহ (কোষাধ্যক্ষ) এবং সভ্যবৃন্দ—কেষ্ট দাস, নিশিথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর মুখার্জি।

অনুশীলন সম্প্রদায় থেকে গ্রীন এ্যামেচার গ্রুপ

১৯৬৪ সালের আগষ্টে শৈলজানন্দের 'রতন' (একাঙ্ক) নাটক নিয়ে গ্রীন এ্যামেচার গ্রুপ প্রথম দর্শক সাধারণের সামনে উপস্থিত হয়। ৬৫-র শেষ ভাগে হাওড়া বিদ্যার্থী সমাজ আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় অরুণ সরকারের 'বিবাদ নিবারণী মহৌষধ', প্রথম স্থান অধিকার করে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অরুণ সরকার ইনিই এই গ্রুপের নায়ক বলা যায়। ইনি আগে অনুশীলন সম্প্রদায়ে ছিলেন। ওই বছরেই রামরাজাতলা, শ্রীরামপুর, ইন্টালী প্রভৃতি স্থানে নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। ৬৬ তে "রামকৃষ্ণ" যাত্রাভিনয় করে গ্রুপের নাম ছড়িয়ে পড়ে। যে নাটকগুলি নাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করে সেগুলি যথাক্রমে—বিমল গুপ্তের 'সাইকোথেরাপী (২য়),

অয়স্কান্ত বক্সীর 'খুনী' (২য়), মন্মথ রায়ের 'যোগাযোগ' (২য়), ব্রেখট অবলম্বনে 'ভুবন পুরের পথে' (১ম), জেরি লুইসের 'আর হাসি নয়' (১ম), অরুণ সরকারের 'অথ-মর্ত্য-সংবাদ কন্যা' (২য়), 'ম্যাডাগাস্কার' (১ম), সুব্রত মুখার্জীর 'স্পিকিং' (৩য়), 'জবাব চাই' (৩য়)। এ ছাড়া হৃষিকেশ মুখার্জীর 'আনন্দ সংবাদ' (খড়্গপুর), অয়স্কান্ত বক্সীর 'খুনী' (নিউ এম্পায়ার) ও মোঁপাসা অবলম্বনে 'দুটি ফুলের মৃত্যু' (মুক্তঅঙ্গন), দর্শক সাধারণের অকুণ্ঠ প্রসংসা লাভ করে। এ বছরে (১৯৭২) নাট্য শত বৎসর পূর্তি উৎসব রঙমহল রঙ্গমঞ্চে উৎযাপিত হবে। তারাশঙ্করের 'কবি' নাটকটিকে নতুন আঙ্গিকে মঞ্চস্থ করার আয়োজন চলছে। প্রখ্যাত গায়ক ও চিত্র মঞ্চাভিনেতা রবীন মজুমদার সম্প্রতি গ্রুপে যোগদান করেছেন। বহুকাল পর 'কবি' নাটকে তাঁকে নিতাই কবিয়াল চরিত্রে দেখা যাবে।

নাট্য পরিচালক—অরুণ সরকার, সভ্যবৃন্দ—রবীন মজুমদার, নন্দলাল মল্লিক, গৌর কর, সুকুমার ঘোষ, শ্রীশঙ্কর, রবি ঘোষ, প্রণব মিত্র, জয়ন্ত চৌধুরী, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী, পরিতোষ রক্ষিত, যূথিকা ভট্টাচার্য, শেলী পাল।

৮ এ্যাবসার্ড নাটক / বঙ্গীয় নাট্য সংসদ

১৯৬৪ সাল, নাট্য আন্দোলনে নতুন সংযোজন হল। এ্যাবসার্ড নাটক নিয়ে এলেন নিউ এম্পায়ার মঞ্চে বঙ্গীয় নাট্য সংসদ। যদিও এদের জন্ম আরো আট বছর আগে ১৯৫৬ সালে। রবীন্দ্রনাথের আর্য অনার্য দিয়ে এঁরা প্রথম যাত্রা শুরু করেন। এরপর সোমেন্দ্র নন্দীর পূর্ণাঙ্গ নাটক 'ছায়া বিহীন', বিশ্বরূপায় মঞ্চস্থ করেন। ১৯৬১ সালে নিউ এম্পায়ারে তিন দিন ব্যাপী নাট্য উৎসবে এঁরা নামলেন সোমেন্দ্র নন্দীর 'সমান্তরাল', 'ছারপোকা' নিয়ে। ১৯৬২ সালে এঁরা আবার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে সোমেন্দ্র নন্দীর 'জনক', রমেন লাহিড়ীর 'পান্থশালা' মঞ্চস্থ করেন। ১৯৬৩ সালে বঙ্গীয় নাট্য সংসদের প্রযোজনায় ইউজ ইউনেস্কোর রাইনোসেরাস অবলম্বনে 'গণ্ডার' নাটক মঞ্চস্থ করলেন।

ইউজ ইউনেস্কোর Rhinoceros নাটকের বঙ্গীকরণ করেছেন সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

গ্রীষ্মকাল, রবিবার সকালে সর্বত্র অলসভাব বিরাজিত। সহরের লোকজন প্রয়োজনমত যে যার কাজে চলেছে। এমন সময় রাস্তা দিয়ে একটা গণ্ডার ছুটে গেল। পরদিন হতে সহরে গণ্ডারের সংখ্যা ক্রমে বেড়েই যেতে লাগল এবং দেখা গেল ক্রমে সকলেই গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে। নাটকের প্রধান চরিত্রের বন্ধু এবং অন্তরঙ্গ সকলেই একে একে গণ্ডার হয়ে গেল, তার প্রিয়বান্ধবীও বাদ পড়ল না। সেই শুধু একা রইল মানুষের প্রতীক হয়ে। তার তখন মনে হতে লাগল সেই সেই বুঝি অপ্রকৃত অস্বাভাবিক চিরাগত নিয়মের ব্যতিক্রম। শেষ পর্যন্ত গণ্ডারের জগতে তার এই ভিন্ন অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে সে নিজের অধিকারকে রক্ষা করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করল।

বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার ইউজ ইউনেস্কোর নাটক এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের কলকাতা সহরে বঙ্গীয় নাট্য সংসদ গত বছর ১২ এপ্রিল প্রথম প্রদর্শন করে। গণ্ডার নাটক বাংলভাষায় তখনই অভিনীত হয়।

ইউনেস্কোর গণ্ডার প্রসঙ্গে সোমেনবাবুর একটি লেখা আমি ১৯৬৪ সালের বঙ্গীয় নাট্য সংসদের স্যুভেনির থেকে ছেপে দিলাম।

ইউনেস্কো আর তাঁর গণ্ডার

সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী

একটি নাম শুনতে ও লিখতেও অদ্ভুত—ইউজ ইউনেস্কো। প্রথমে মনে হয় বুঝি ইউনাইটেড নেশন্‌স-এর সোস্তাল ক্যালচারাল বিভাগ—সেও আর-এক ইউনেস্কো। কিন্তু নাট্যকার ইউনেস্কোর নামের বানান অন্য। Ionesco, কিন্তু উচ্চারণ আয়নেস্কো নয়—ইউনেস্কো। ইউনেস্কো স্বয়ং ঠাট্টা করে বলেন যে রাষ্ট্রপুঞ্জের ইউনেস্কোর অনেক আগে উনি জন্মেছেন এবং অনেক পরে মরবেন সুতরাং ওঁর দাবিই জোরদার।

১৯৫০ সনের মে মাসের আগে নাট্যকার ইউনেস্কোর নাম কেউ শোনেনি, কিন্তু আজ ১৯৬১ সালে তিনি কেবলমাত্র পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নন, সমস্ত নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে তাঁর রচনা একটা বিপ্লব এনে দিয়েছে। পুরনো বাঁধা নিয়ম ভেঙে দিয়ে তিনি নতুন করে নাটকের পরিধি বিচার করেছেন। অদ্ভুত অসঙ্গত আজগুবি ঘটনাকে নাটকের মধ্যে মিশিয়ে গম্ভীর ভাবের সঙ্গে হাল্কা রস জুড়ে দিয়ে ইউনেস্কো পৃথিবীতে এক নতুন যুগকে নিয়ে এসেছেন।

ইউনেস্কোর নাট্যগতি নেতিবাচক। তাঁর নাটকের রূপনির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—অ-নাটক (অ্যান্টি-ড্রামা) তাঁর নায়কও অ-নায়ক (অ্যান্টি-হিরো)। তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুগুলিও তেমনি অ-কর্মী। Amedee নাটকে গল্প হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা মৃতদেহ শুধু বেড়ে চলেছে ক্রমে তাদের ঘরের দু'পাশে আটকে ফেলল। 'বল্ড প্রাইমাডোনা'তে মিঃ ও মিসেস স্মিথ আর তাদের অসম্ভব ক্রিয়াকলাপ। কিন্তু বলা বাহুল্য, এইসব অসম্ভব ও অদ্ভুত ঘটনাক্রমের পিছনে অত্যন্ত তীব্র বক্তব্য আছে। আর সেই তীব্র বক্তব্যের সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রকাশভঙ্গিমা ইউনেস্কোর খ্যাতির কারণ, তাঁর বিরাটত্বের নিদর্শন এবং তাঁর শক্তির পরিচয়। 'গণ্ডার' নাটকের আলোচনার সময় এই গুণগুলিকে বিশেষভাবে দেখাতে চেষ্টা করব। আজকের ইউরোপের নবনাট্যের জগতে ইউনেস্কোর প্রভাব স্যামুয়েল বেকেটের থেকে বেশী হবার কারণ, হাসির আবরণে অন্তঃসলিলা দুঃখের প্রকাশ, নিদারুণ হাল্কা ঘটনার মাধ্যমে অত্যন্ত শক্ত সত্যের রূপারোপ দেখবার পক্ষে ইউনেস্কোর রীতি অত্যন্ত উপযোগী। বেকেট কেবল মনঃশীতলতাকে নাড়া দেন। ইউনেস্কো রূপ আর শব্দ দিয়ে মনকে প্রথমে চমকে দেন, তারপর প্রভাবিত করেন। ইউনেস্কোর রীতির তাই একটা নূতনত্ব হচ্ছে বাক্যের শব্দগুলিকে দিয়ে অদ্ভুত সুরতরঙ্গ তোলা। ধ্বনিকে যন্ত্র-সঙ্গীতের মত ব্যবহার করেছেন ইউনেস্কো। ভাষান্তর হবার পরে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধ্বনিতরঙ্গ হারিয়ে গিয়েছে কিন্তু ফরাসী ভাষার অভিনয়ে এই ধ্বনিতরঙ্গ এবং তাঁর নাটকীয় প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। গদ্যময় ইংরেজি ভাষাতে এই ধ্বনিতরঙ্গ আনবার চেষ্টা করেছেন হ্যারল্ড পিন্টার তাঁর 'কেয়ারটেকার' নাটকে। সফল হয়েছেন বলে মনে হয় না।

ইউনেস্কোর নাটক নবীন যুগের খবর এনেছে—এ কথা অনস্বীকার্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলতে হয় যে, অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা এই নূতন যুগের সাথী হয়ে এসেছে। এমন কি স্বয়ং ইউনেস্কোর সব নাটক তাঁর 'গণ্ডার' নাটকের মত স্পষ্ট নয়। এবং অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট নাটকগুলিও কি মানে হতে পারে তা নিয়ে বহু মত, বহু তর্ক এবং বহু বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। একদল সমালোচক ইউনেস্কো এবং তাঁর নাটকগুলি সম্পর্কে যেসব বিশেষণ দিয়েছেন, তার মধ্যে একটিকেও সহানুভূতিশীল বলা যায় না। আমেরিকার জন চ্যাপম্যান ইংলণ্ডের প্রীস্টলী ও ল্যাম্বার্ট, ফ্রান্সের জঁা গতে ও রুদ বেইনের প্রভৃতি খ্যাতনামা সমালোচকরা ইউনেস্কোকে নাট্যকারের মর্যাদা দিতেও রাজী নন। গতে

লিখলেন, 'ইউনেস্কো ভাবেন যে ওঁরা দর্শকরা সব একদল উজবুক।' 'জাকুই' নাটকে যখন বিবাহের সাজে সাজা মাত্র, নায়িকার মুখ কঙ্কালে রূপান্তরিত হয়ে গেল—বেইনের লিখলেন, 'ইউনেস্কে আমাদের নিয়ে তামাশা করার জন্যে নাটক লেখেন।'

ইউনেস্কোর নাটক ফ্রান্সে অভিনীত হয় প্রথম ১৯৫১ সনে। 'দি লেসন' নামে একটি একাঙ্কিকা দিয়ে তাঁর অভিযান শুরু হল। তাঁর এক বন্ধুকে লেখা পত্রগুচ্ছ থেকে আমরা এই অভিনয়গুলির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য জানতে পারি। প্রথম পত্রে ইউনেস্কো লিখেছেন, "এঁরা আমার নাটক করবেন স্থির করেছেন। হিসেব করে দেখা গেল প্যারিতে চল্লিশ লক্ষ লোক বাস করেন, আমাদের মাত্র দৈনিক চার শো লোক চাই।" আরও কিছুদিন পরে লিখলেন "মহানন্দে আমার নাটক চলছে। দৈনিক দর্শকসংখ্যা চার। আমি, আমার স্ত্রী, আর দরজার দারোয়ান। চতুর্থ জনকে ওই দারোয়ানই রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে আসে।" আরও কিছুদিন পরে কিছু কিছু লোক আসতে শুরু করলেন বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে চার-পাঁচজন নাটকের মাঝে উঠে চলে যেতেন। অবশেষে ১৯৫৪ সনে Amedee ও 'জাকুই' একাঙ্কিকা দুটি দর্শকের সহানুভূতি পেল। ইউনেস্কো তাঁর বন্ধুকে লিখলেন, "আজকাল কিছু একটা ঘটেছে, আমি পর্যন্ত বসবার জন্য একটা খালি আসন পাই না—দারোয়ান বেচারার কথা বাদ দাও।" এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জঁা অনুইল নাটক দুটি দেখে 'ফিগারো' পত্রিকাতে লিখলেন, "প্রত্যেকের উচিত ইউনেস্কোর নাটক দেখা। স্টিণ্ডবার্গ ও মলেয়ারের এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ যে কোন নাট্যকারের মধ্যে হতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এর পর আবার 'দি লেসন' ও 'বল্ড সোপার্নো' একাঙ্কিকা দুটি চালু করা হল। এবারে এই দুটি নাটক একাধিক্রমে তিন শো রাত্রি চলল। ১৯৫৭ সনের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ইসরাইল ও ফিনল্যাণ্ডে ইউনেস্কোর নাটকগুলির অভিনয় হল। ইউনেস্কোর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটকও অভিনীত হল ১৯৫৭ সনে 'ল' ট্যুর স' গাগ'। এই 'ল' ট্যুর স' গাগ' নাটকে আমরা ইউনেস্কোর অ-নায়ক "বেরেঞ্জার"-এর দেখা পাই। এই 'বেরেঞ্জার' চরিত্রটিই ইউনেস্কোর নানা নাটক ও ছোটগল্পের মাধ্যমে পরিপুষ্ট হয়ে 'গণ্ডার' নাটকের প্রধান চরিত্ররূপে দেখা দিয়েছে। বেরেঞ্জাকে কেন্দ্র করেই 'গণ্ডার' বা 'ল' রাইনোসারাস্' নাটকটি গড়ে উঠেছে। গল্পটি অদ্ভুত। বেরেঞ্জার

একজন অতি সাধারণ লোক। মদ খেতে ভালবাসে, মাতাল হতেও তার মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না। তার উঁচুমনের অতি ভদ্র বন্ধুরা সেজন্য তাকে ঘৃণা করে। বেরেঞ্জার একজন অতরুণ কেরাণী, সেই অফিসের একটি মেয়েকে ভালবাসে। ইচ্ছা অর্থের স্বচ্ছল অবস্থা হলেই তাকে বিয়ে করবে। এমন সময় এক কাণ্ড হল। এক রবিবার সকালবেলা বেরেঞ্জার রাস্তার পাশের দোকানে মদ খাচ্ছে, তার উন্নাসিক বন্ধু তাকে মদ খাওয়ার অপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছে, নৈয়াকিক ন্যায়ের আলোচনা করছেন অন্য দিকে, এমন সময় রাজপথ দিয়ে একটি গণ্ডার ছুটে চলে গেল। প্রথম বিস্ময় কেটে যাবার আগেই আবার গণ্ডার ছুটে চলে গেল, এবার কিন্তু যাবার পথে যে বিড়ালটা রাস্তা পার হচ্ছিল, তাকে পিষ্ট করে দিয়ে গেল। বিড়াল-শোকাতুরা মহিলাকে শান্ত করার আগেই তর্ক বাধল প্রথম ও দ্বিতীয় গণ্ডার একই গণ্ডার কি না। আর তারা কোথা থেকে এল তাই নিয়ে। এর পর ঘটনা কম। দেখা গেল সকলে গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে। রোগ যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি গণ্ডার হওয়া ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বেরেঞ্জারের অফিসের কর্তা, বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী কেউ বাদ পড়ল না। উচ্চাকাঙ্খী আর হতাশধর্মী উভয়েই গণ্ডার হয়ে গেল। বেরেঞ্জারের প্রিয় বান্ধবীও শেষ পর্যন্ত গণ্ডার হয়ে গেল। বেরেঞ্জার একা শুধু রইল মানুষের প্রতীক হয়ে। তার তখন মনে হতে লাগল, সেই বুঝি অপ্রকৃত, সেই অস্বাভাবিক, চিরায়ত নিয়মের জাজ্জল্যমান ব্যতিক্রম। এই গণ্ডারের জগতে তার অবস্থান দানবীয়, সেই একমাত্র আলাদা—ভিন্ন জাতি, ভিন্ন গোত্র। ধীরে ধীরে বেরেঞ্জার সেই অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে নিজের অধিকার রক্ষা করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করল।

এ নাটকটি তিনটি দেশের শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রতিষ্ঠান ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য সব আগে ফ্রান্সে অভিনয় হয় থিয়েটার দ্য ফ্রঁাসে। প্যারিতে ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা জঁ লুই বারল্ট নাটকটির পরিচালনা করেন এবং বেরেঞ্জার চরিত্রে অভিনয় করেন। লণ্ডনে অরসন ওয়েলস নাটক পরিচালনা করেন এবং সার লরেন্স অলিভিয়ার 'বেরেঞ্জা'র ভূমিকায় নামেন। জার্মানির ডুসলডর্ফে Schauspieltans দল অভিনয় করেন। লণ্ডনের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। নাটকের শেষে যখন বেরেঞ্জার 'আমার চারিদিকে গণ্ডার' বলতে বলতে পায়ে পায়ে পিছু হাঁটেন, তখন মনে হয় বুঝি আমরা সত্যি করেই সবাই গণ্ডার হয়ে গিয়েছি।

প্রত্যেকটি দর্শক ঘাড় শক্ত করে বসে থাকেন পাছে পাশের ভদ্রলোক বুঝে ফেলেন যে, তাঁর নাকে হাত দিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে—সত্যি সেখানে খড়্গ উঠেছে কি না। চিরকাল মনে রাখার মত অনুভূতি।

'গণ্ডার' নাটকে ইউনেস্কো গোষ্ঠীবদ্ধতার ইচ্ছাকে ব্যঙ্গ করেছেন, ধিক্কৃত করেছেন, মনের পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিপূর্ণভাবে অনাবৃত করেছেন, বর্তমান পৃথিবীতে মোক্ষ গোষ্ঠীবদ্ধতায়। রাজনৈতিক, সামাজিক, শুভ এবং অশুভ কাজে গোষ্ঠী গঠনই একমাত্র লক্ষ্য এবং গোষ্ঠীকরণ বর্তমান জগতের কেবলমাত্র কর্মকাণ্ড নয়, সেটাই আমাদের ক্রমবিবর্তন ও নির্বান, সভ্যতার মানদণ্ড এবং শক্তির মাপকাঠি। ইউনেস্কো তাই মূল ধরে নাড়া দিয়েছেন। আজগুবি ঘটনার পরিণতিতে নিজেদের আবিষ্কার করি, অসম্ভবের সম্ভাবনায় আমাদের আসল রূপটা ধরা পড়ে, আবোলতাবোল ঘটনার ধাক্কায় রঙ মাটি ভেঙে গিয়ে ভেতরকার খড়ের শুষ্কতা প্রকাশ পায়। তাই আজ ইউনেস্কো অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। 'গণ্ডার' তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি। দুই একজন ইউনেস্কোকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, এত জীব থাকতে গণ্ডারের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল কেন? উত্তরে ইউনেস্কো বললেন, যূথবদ্ধ কোন জীব তাঁর প্রয়োজন ছিল প্রতীক হিসেবে। তিনি হাতি, বাইসন, জলহস্তী এবং বুনো ষাঁড়েদের জীবনধারণপদ্ধতি অনুধাবন করেন। এমন সময় গণ্ডারের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে এবং তিনি গণ্ডারকেই প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করবেন স্থির করেন। মোটা চামড়া, বদরাগী, ক্ষীণদৃষ্টি, অদূরদর্শী, নাকে খড়্গ, জঙ্গী এবং বিধ্বংসী অর্থাৎ সম্পূর্ণ পাশবিক কিংবা এক কথায় পূর্ণ মানবিক বলা চলে।

'গণ্ডারে'র অভিনয় বিভিন্ন দেশে আদৃত হয়েছে। নাটকটিকে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে কেউ কেউ অভিহিত করেছেন। এই বিবদমান সভ্যতার বিরুদ্ধে মানুষের উপযুক্ত উত্তর ধ্বনিত হয়েছে। ইউনেস্কো কারও প্রতি সামান্যতম দয়া দেখাননি। অত্যন্ত উগ্রভাবে মানুষের হীনতার রূপকে, সভ্যতার অহংকারকে প্রকাশিত করেছেন। এই সংস্কারবিরুদ্ধতা এই আপোস-বিরোধিতা ইউনেস্কো'র রচনার শ্রেষ্ঠ গুণ। কেবল সভ্যতা নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক কোন অন্যায়ই তাঁর হাতে নিষ্কৃতি পায়নি। প্রেম এবং বুদ্ধি, সমালোচক এবং অধ্যাপক ইউনেস্কো'র হাতে সমানভাবে তাড়িত হয়েছে। তাঁর নাটকগুলিকে অনেকে 'অ্যান্টি-রোমান্টিক' আখ্যা দিয়েছেন। 'নেগেটিভ-প্যাসিভিটি' ইউনেস্কোর নাটক রচনার প্রধান রীতি। অতি-আধুনিক নাটকের

জনক হলেও ইউনেস্কোকে ঠিক আধুনিক বলা যায় না। বরঞ্চ আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি বুখারেষ্টে জন্মান ১৯১২। খ্রীষ্টাব্দে পরের বছর তিনি ফ্রান্সে আসেন এবং সেখানেই শিক্ষা সমাপ্ত করেন। রুমানিয়াতে ফিরে গিয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কিছু সুনাম অর্জন করলেও ফ্রান্সের টান প্রবল হল। ১৯৩৮ সনে সস্ত্রীক রুমানিয়া ত্যাগ করে ফ্রান্সে এসে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন।

এই ছোট্ট মানুষটি সম্বন্ধে আলোচনার শেষ নেই। কেউ বলেছেন উনি হলেন ষ্ট্রিণ্ডবার্গ ও মলেয়ারের সংমিশ্রণ; অন্যেরা বলেছেন, পাগল, খেয়ালী, কিন্তু নাট্যকার নন। সব থেকে আশ্চর্য হচ্ছে যাঁকে উদ্দেশ্য করে এই সব বলা হয়েছে—তাঁর কাছে নিন্দাস্তুতি কিছুই পৌঁছায় না। তিনি বলেন 'আমি যেদিন দরজা খুললাম—আমার তিন বছরের মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার জীবনে যেন প্রথম দরজা খুলল। আমি এইরকম সহজসত্য বলতে চাই। নিজেকে ঘুম থেকে জাগাতে চাই—অন্যকে জাগিয়ে দিয়ে।' মোটা ভ্রুর নীচে বড় বড় চোখ। তাকালে মনে হয় তাঁর দৃষ্টিটা বহুদূর চলে যাচ্ছে, আমাদের দেহ, ওই দূরের গাছ, লাল রঙের ফুলে রাঙা পথ পার হয়ে। মাথার সামনের দিকটায় টাক পড়ে গিয়েছে—কপালের রেখাগুলো গভীর। ইউনেস্কো বলেন, 'আমি জীবনটা মানিয়ে নিতে পারিনি। জীবনটা তাই আমার অসঙ্গতির মত লাগে। অন্যের সঙ্গেও মেলে না—বহির্জগতের সঙ্গে তো মেলেই না। আমার মনে হয় রূপের মধ্যে বস্তু নেই। তাই রূপ মিথ্যা অসার। শব্দ শুধু আওয়াজ—স্থায়িত্ব সত্ত্বেও সত্য নেই তার মধ্যে, আর ওই বাড়িগুলো ওই আকাশের দিগ্‌দর্শনে খানিক কারণহীন আঁকাজোখা। মানুষ চলে—মানে নেই তার কিছু। নিয়মমত ফাঁকা (স্পেস) ভরাট করছে মাত্র। আমার মনে হয় হঠাৎ একদিন সব উবে যাবে। মজা হচ্ছে আমি এ সত্ত্বেও বেঁচে থাকি। এই সব নানা রঙের গন্ধ শুঁকি। মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরে যাবার ব্যথা অনুভব করি। জানি না কেন, আমার সবকিছু বার বার হারিয়ে যায়।'

এছাড়া মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এ্যাবসার্ড নাটক প্রসঙ্গে রূপকারের ১৯৬৯ সালের স্যুভেনির থেকেও একটি লেখা ছাপছি, কারণ এ্যাবসার্ড নাটক নিয়ে আজ নানাভাবে তর্কবিতর্ক চলছে। আমি সেই তর্কে না গিয়ে যা যোগাড় করতে পেরেছি ছেপে দিচ্ছি।

এ্যাবসার্ড নাটক

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

দুটি মহাযুদ্ধের বৈনাশিক খড়্গাঘাতে বর্তমান সভ্যতা ছিন্নমস্তার রক্তাক্ত মূর্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত এক বিকট ধূম্রপুঞ্জ ধূপাধারের পবিত্র গন্ধ নিশ্চিহ্ন করে পিঙ্গল মেঘ-খণ্ডের মতো উন্মত্ত ঝটিকার ফণা তুলে আছে। শুভ ও সুন্দর দুজন আহত সৈনিকের মতো জীবনের রণক্ষেত্রে একাকী শয়ান। একদল বর্বর এবং ক্ষমতায় মদমত্ত মানুষ চতুর্দিকের আলো পাথর ছুঁড়ে ভাঙছে। প্রচলিত নীতির সুস্থ পদক্ষেপ, স্বাভাবিক ধ্যান-ধারণার সাধন-পিঠ শয়তানের কুচক্রে বিপর্যস্ত। শূন্যতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অর্থহীনতা এবং ঔদাসীন্যের ক্ষয়রোগ একটি বিপুল মানব-গোষ্ঠী রক্ত বমন করছে। এককথায় মানবিক মূল্যবোধের রুগ্নতা এবং অবক্ষয়ের শ্বাসকষ্ট সাম্প্রতিক পৃথিবীতে একটি নৈরাজ্য রচনা করেছে। ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই ব্যাধি ও বীজাণুর পরিচয় বিশেষ স্পষ্ট। নিঃসন্দেহে এ জাতীয় মানবিকতা বিপজ্জনক এবং অশুভ; তাহলেও এ-প্রকার মানসিকতা যে সামাজিক—রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত থেকেই জন্মেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভয়ের কথা, এই শূন্যতাবোধ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে প্রায় রাজত্ব করছে এবং সেই ভয় আরো ভয়ংকর এ-কারণেই যে, প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর উপজীব্য হলেই সব থেকে বড় সংকটের উদ্ভব। যে এ্যাবসার্ড নাটক ও-দেশে দিগ্বিজয় করছে তার উপজীব্য এই বৈনাশিক হতাশা এবং শূন্যতাবোধ। আশঙ্কার কথা, উল্লেখযোগ্য প্রতিভাবান নাট্যকারগণ এর স্রষ্টা। ঈশ্বর আলো দিয়ে পুতুল গড়েন, সেখানে শিল্প আর আলো দুই-ই থাকে, ঈশ্বর যদি অন্ধকার দিয়ে পুতুল গড়তে চান, তাহলে শিল্প হয়ত থাকে কিন্তু আলোর মৃত্যু এবং সম্ভবত স্রষ্টা ঈশ্বরেরও পদস্খলনের সূচনা ঘটে। হতাশা এবং বিষন্নতার অন্ধকার নিয়ে যে ক্ষমতাবান এ্যাবসার্ড নাট্যকার-সমাজ আচ্ছন্ন, তাঁদের লেখা পড়ে এই বিপন্ন বেদনা বারংবার অনুভব করি। মানব-জাতির ভবিষ্যৎ ললাট-লিপি পাঠের রাজজ্যোতিষী এঁরা নন, বর্তমানের কৃষ্ণ মৃত্তিকায় মৃত্যুর কূপ খনন ক'রে জীবনের মূলগত অর্থ খুঁজছেন। বৃহৎ আকাশটাকে একটা ছোট্ট রুমালের মতো মুঠোয় নিয়ে হঠাৎ কখন ডাস্টবিনে ছুঁড়ে দিচ্ছে। এদের ফুলবাগান জন্তু-জানোয়ারে চিবিয়ে খায়। পৃথিবীময় এক ক্যানিবালের রাজত্ব কল্পনা ক'রে এঁরা সেই উৎকট দেশের নাগরিকত্ব

নিচ্ছেন। এ্যাবসার্ড নাটকে এই দুঃস্বপ্নের পৃথিবী প্রকট। জীবনের সব কিছুকে অর্থহীন এবং অবিন্যস্ত ভেবে এক অর্থহীনতার দর্শনে এঁরা নিবদ্ধ। জীবনের প্রতিটি স্তরের এম্পটিনেস এবং নন-কমিউনিকেশনে ভুগতে ভুগতে এই নাটকের মধ্যে এসে আমরা যে 'আউট-সাইডার' সে-সত্য টের পাই।

অবশ্য 'এ্যাবসার্ড' নাটক অর্থহীনতা এবং আবোলতাবোলকে প্রকাশ করে যে অর্থহীনতা তা নয়। হতাশাব্যঞ্জক হলেও একটা সামাজিক রাজনৈতিক রূপকে এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে দেখি। বক্তব্যের প্রকাশক কোন বিশেষ 'ইমেজ' এই নাটকে এলোমেলো ঘটনা এবং অসংবদ্ধ চরিত্রের মধ্যে একধরণের সূক্ষ্ম ঐক্য রচনা করে। 'সারফেস রিয়ালিটি' থেকে সরে এসে এ-নাটক 'সাইকোলজিকাল রিয়ালিটি,' 'ইনার রিয়ালিটি' বা 'সাবকনসাস্ ট্রুথ'কে প্রকাশ করে। মানুষের বাহ্য পরিচিতিকে উপেক্ষা করে অবচেতন রহস্যের উন্মোচন এখানে প্রবল। এক-জাতীয় 'শক্' বা আঘাত সৃষ্টি করে এইসব রচনা আমাদের এতকালের লালিত স্বস্তির মধ্যে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি করে, বাইরে ছুটে বেরুতে গিয়ে চতুর্দিকের শূন্যতা, অর্থহীনতা এবং অবান্তরতার উচ্চ-হাস শুনতে পাই—নিজেকে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একজন অর্থহীন অবান্তর সন্তান বলে মনে হয়। এই ধরণের নাটক সমাজের একটা বিশেষ সত্যকে প্রকাশ ক'রে সমাজ সচেতনতার প্রমাণ দিয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু সেই সচেতনতা কেবল অন্ধকার এবং শূন্যতা সম্পর্কেই। সচেতন-এর বিরুদ্ধে তাঁদের কোন বিরোধী মনোভাব প্রকট নয়। কখনো কখনো কোন কোন নাট্যকার হতাশাকে আর্তনাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ ক'রে এমন একটি ভাবমণ্ডল রচনা করেন যার প্রভাবে পাঠকের মনও ক্রমশঃ নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ হয়ে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবশ এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এঁরা হতাশাকে যদি পছন্দ নাও করেন তাহলেও পাঠককে হতাশাতেই বিশ্বাসী কখনও বা মুগ্ধ করে তোলেন। ইউনেস্কোর 'রাইনোসেরাস' নাটকে সহরবাসীরা ক্রমশ গণ্ডারে বদলে যাচ্ছে। নাটক বেরেনজার প্রচণ্ড আত্মরক্ষার চেষ্টা সত্বেও গণ্ডারে পরিণত হোল। ফ্যাসি-জিমের ভয়ংকর, শক্তিশালী এবং ক্ষিপ্তপশুত্বের রূপ এ-নাটকে 'সিম্বলিক ইমেজ' ফুটিয়ে নাট্যকার সমাজ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ফ্যাসিজিমের বর্বর শক্তির কাছে সভ্যতার অমোঘ আত্মসমর্পণকেও যেন নিয়তি ভাবছেন। এখানে এই এ্যাবসার্ড নাট্যকার সমাজসচেতন হয়েও 'ফাটালিস্ট'—মানব সভ্যতার পরাজয়ের অমোঘ ভবিতব্যকেই যেন প্রত্যক্ষ ক'রে পাঠককে

প্রভাবিত করার বিপজ্জনক ঝুঁকি নিচ্ছেন। জঁ জেনের নাটকেও ফুটে ওঠে মানুষের 'আইডেনটিটি' সম্পর্কে কোন স্থির নির্ভরতার অভাব। মানুষ তাঁর দৃষ্টিতে মুখোশ থেকে মুখোশের আত্মগোপনকারী একটা স্পষ্ট চরিত্র-বিচ্যুত অস্তিত্ব। তাঁর নাটকে পেয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতোই ক্রমশ মানুষকে খুলতে থাকলে শূন্যে পৌঁছে যেতে হবে। প্রবল প্রতিভা, কবিত্ব, সূক্ষ্ম দার্শনিকতা এবং পর্যবেক্ষণের প্রচণ্ড প্রতিভাদীপ্ত শক্তি পাঠককে অভিভূত করে, এই ভাবনাকে প্রায় বিশ্বাস্য ক'রে তোলে, জীবনকে একটা 'স্যাডে'-প্লে' বলে ভাবতে শুরু করে। ভয় এখানে। স্যামুয়েল বেকেটের নাট্য-সংসারে প্রবেশ করলেও বৃত্তাকার জীবনের একঘেঁয়েমি, অন্ধকারের ফাঁসে জড়িয়ে শ্বাসকষ্ট বোধ হয়। অথচ তাঁর সামাজিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কবিত্ব, দার্শনিক বীক্ষণ এবং নাট্য-শক্তির পরাক্রান্ত প্রভাব অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য। ভয় এখানে। অ্যালবির কথাই ভাবুন না, যিনি ছবিশূন্য একটা ফ্রেম-কে আজকের জীবনের প্রতীক হিসাবে দেখান। মানুষের নৈঃসঙ্গ, সর্বশূন্যতার আর্তনাদ এবং সিজোফ্রেনিয়ার উদভ্রান্ত চিত্র-উৎক্ষেপকে বিশেষ ক্ষমতায় প্রকাশ করে দিগ্বিদিকে বিজয়-পতাকা তুলছেন। ভয়তো এই বিজয় উৎসবে।

'এ্যাবসার্ড' নাটকের এই হতাশা-ব্যঞ্জক পরিণামকে যদি শুভ ও সুন্দরের দিকে পরিচালিত করা যায় তাহলে কিন্তু এই ধরণের নাটকের কাছ থেকে মূল্যবান কিছু মিলতে পারে। এই নাটকের মধ্যে পূর্বতন প্রথাসিদ্ধ নাটকের বিরুদ্ধে আঙ্গিকগত বিপ্লব রয়েছে। আমরা সেই বিপ্লবের অগ্নিকণা গ্রহণ করে আমাদের যজ্ঞকাণ্ডের উপযোগী প্রেরণা পেতে পারি। আদি, মধ্য এবং অন্তে বিন্যস্ত, বৃত্তাকার কাহিনী-প্রধান এবং পরিপাটি করে গুছানো গাণিতিক সূত্রে রচিত নাটককে এরা ভেঙেচুরে পুনর্নির্মাণ করে নূতন স্বাদ উপহার দিয়েছেন। এঁরা নাটককে এলোমেলো ক'রে ভিতরে একটি ঐক্যগত অদৃশ্য 'ইমেজের' সূত্র রাখেন। দর্শক ঐ সূত্রটি সন্ধান করে নিজেই নাটকটি গুছিয়ে নেন। ফলে দর্শক নিজেও নাটকের একজন সহকর্মী হয়ে ওঠেন, বুদ্ধি ও আবেগগত সংযোগে নাটকের সঙ্গে আরো আন্তরিক হয়ে ওঠেন। তাছাড়া জীবনের এলোমেলো চরিত্রও এ-জাতীয় উপস্থাপনে বাস্তবতা পায়। কবিত্বের বিশেষ অবকাশ এ-শ্রেণী রচনায় থাকে। কবিতার লীলা রচনাকে কি পরিমাণ দ্যুতি ও দ্বির্থক অনুভবের সামগ্রী করে তোলে তা আমাদের প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতায় সমর্থিত। ঘটনাকে কমিয়ে আইডিয়াকে এ-ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম উপস্থাপন বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ করা

হয়ে থাকে। কখনো কখনো অনেক উদ্ভটের প্রকাশ এ্যাবসার্ড নাটকে আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু রচনাটির অন্তর্গত ভাবনার 'ইমেজ'টির সন্ধান পেলে ঐ উদ্ভট আশ্চর্য ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে। এই নাটকের জগতে কোন নারী অনায়াসে তার স্তনদ্বয় খেলার সামগ্রী বেলুনের মতো স্বর্গে ভাসিয়ে দেয়, কোন মৃতদেহ ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে এঘর থেকে ওঘর পর্য্যন্ত এগিয়ে চলে, কারুর হয়ত একাধিক নাক, মানুষ অনায়াসে হয় গণ্ডার ইত্যাদি উদ্ভটের অন্ত নেই। আমাদের বাংলা দেশের নাটকে এই উদ্ভট যদি জীবনের সত্যকে স্বীকার করে কোন নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হয় তাতে আপত্তি না থাকাই সঙ্গত। আমাদের রূপকথা, পুরাণ, মহাকাব্যের গল্পে উদ্ভটের বিপুল সমাবেশ অথচ তার মধ্য থেকে গভীরতর অর্থ আবিষ্কার সম্ভব। আমাদের দেবদেবীর মূর্তিকল্পনাকেও বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এক অসম্ভবকে তৎপর্য্যময় মহিমার ব্যাখ্যার অবকাশ রচনা করা হয়েছে; দশভূজা দুর্গা, ত্রিনয়ন ঈশ্বর ও ঈশ্বরী, চতুর্মুখ ব্রহ্মা—এঁদের প্রত্যেকটি রূপকল্পনা আমাদের উপলব্ধির মধ্যে শ্রদ্ধেয় এবং বিশ্বাস্য। অর্থাৎ আমার মনে হয়, আমাদের দেশের উদ্ভটকে বিশ্বাস্য করে তোলার চিত্তভূমি বহুকাল ধরে প্রস্তুত। এই ঐতিহ্যের বোধ পাঠক-দর্শকের মনে জাগ্রত করে আমরা নব্য-নাট্যরীতিতে অগ্রসর হতে পারি। বাস্তবধর্মী নাটক লেখা হতে থাকুক, অন্য-ধরণের যে কোন নাটকই রচিত হোক। জীবনকে স্বীকার করে যে কোন আঙ্গিকই অভিনন্দিত হবে। 'এ্যাবসার্ড' নাটক যদি জীবন সম্মত হয়, তাহলে এই নাটকও আমন্ত্রণযোগ্য। এই ধরণের নাটক একটি বিশেষ 'ড্রামা-ল্যাঙ্গোয়েজ'কে আশ্রয় করে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে বলে নাটক ও দর্শকের মধ্যে দূরত্ব কিছুকাল থাকবে। কিন্তু উভয়ের আন্তরিক সহযোগিতা বঙ্গীয় নাট্য-সংস্কৃতিকে সুনিশ্চিত উন্নীত করবে। শুভ ও সুন্দর—এই দুজন আহত সৈনিক রক্ত মুছে, নতুন শক্তিতে বারংবার সংগ্রামে অগ্রপথিক। আমাদের নাটক এই যুদ্ধের কথা বলুক, এই যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা ও সত্যকে তীব্রতর করুক। সুস্থ দৃষ্টির এ্যাবসার্ড নাটক এই কর্মকাণ্ডের সহযাত্রী হতে পারে—এই আশাই জয়ী হোক।

বঙ্গীয় নাট্য সংসদের কার্য্য নির্বাহক সমিতির সভ্যদের মধ্যে ছিলেন সভাপতি—সোমেন্দ্র নন্দী, পরিচালকদ্বয়—ষোড়শী কুমার মজুমদার, ধীরেন্দ্র নাথ রায়, যুগ্ম সম্পাদক—গোবিন্দ ভূষণ ঘোষ, আরতি রায়, কোষাধ্যক্ষ—গৌরচন্দ্র ঘোষ, সভ্যগণ—উমা দাসগুপ্ত, রমেন লাহিড়ী, আদিৎ কুণ্ড। অভিনয়েক্ষ

শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন আদিৎ কুণ্ডু, সৌমেন্দ্র নন্দী, দিলীপ ঘোষ, প্রদীপ গুপ্ত, চিন্ময় গোস্বামী, মায়া রুদ্র, অম্বুজাক্ষ সেন, অতুল পণ্ডিত, মিনতি ঘোষ, রমেন লাহিড়ী, দিলীপ রুদ্র, গোবিন্দ ঘোষ, ইন্দু চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু। দৃশ্য পরিকল্পনায় থাকতেন বিভিন্ন সময়ে অমর ঘোষ, বিশ্বকল্যাণ দাস। আলোয় অমর ঘোষ, রূপসজ্জায় অমর দত্ত আবার সঙ্গীত সত্যব্রত গুপ্ত। এঁরা আরো যেসব নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, সৌমেন্দ্র নন্দীর 'সকাল বেলার এক ঘণ্টা', 'যার যা ভাবনা', 'অগুজ', 'যে নিজের কথা ভেবেছিল', 'কেবলি ছবি পটে লিখা', 'চাঁদের হাট'। পিরান দেল্লোর 'যতো রূপকথা', 'চেয়ার', 'সুন্দরম্', বার্নাড শ'র 'দুটি চরিত্র', 'একটি সভা', 'জটায়ু', 'কাসাইংশাথী'। রমেন লাহিড়ীর 'মনোবিকলন', 'ধূসর দিগন্ত', 'জীবন বিতৃষ্ণ', 'রাজযোটক'। মন্মথ রায়ের 'অর্কেষ্ট্রা'। দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমি কলা খাই নাই'। অমল মজুমদারের 'স্বরূপ ও পারিবারিক'। এছাড়া নাটকের উন্নতির ক্ষেত্রে আরো কিছু অবদান বঙ্গীয় নাট্য সংসদের আছে। ৩০২ আপার সার্কুলার রোড সংসদ কার্য্যালয়ে একটি মিনিয়েচার মঞ্চ স্থাপিত করেন। সেই মঞ্চে বহু দল নাট্য গবেষণার জন্য একাংক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, বহু নাট্যকারের নাটক পাঠ করা হত এবং পরে সেই সব নাটক নিয়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা হত। ১৯৫৮ সালে ঐ মঞ্চেই নাট্যকার পরিষদের প্রথম অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে নাট্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় নাট্যকার নাট্য তত্ত্ববিদরা নাটকের উন্নতি নিয়ে নানাভাবে আলোচনা করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য্য, ডাঃ কালীদাস রায়, শচীন সেনগুপ্ত, ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

গণনাট্য আন্দোলনে / কলাকার

১৯৬৪ সাল, প্রগতিশীল নাটক করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এলেন আর একটি দল, যাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ছিল গণনাট্য সঙ্ঘের আদর্শ। গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্কারি শাখা থেকে এসে জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, সীতা মুখার্জী ও বাসুদেব বসুর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা পায় কলাকার। এদের আমরা প্রথম দেখতে পাই ১৩ই জুলাই ৬৪ সালে উৎপল দত্তর 'মধুচক্র' নাটকের মাধ্যমে। অল্প কিছুদিন মধুচক্র চলার পরেই এরা মনোরঞ্জন বিশ্বাসের কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় ভাবান

নিয়ে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই 'ভাসান' অভিনয়ের মাধ্যমে এরা শহরে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন। নাটক অভিনয় চলাকালীন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন কলাকার কিছুক্ষণের জন্য। ঘটনাটা ঘটেছিল ধানবাদে, ভাষান নাটক আরম্ভ হবার কিছু আগে রেলওয়ে সিকিউরিটি অফিসার জানালেন—আরো সহজভাবে বলা যায় আদেশ জারি করলেন ভাসান নাটক অভিনয় করা চলবে না। কি করবেন অভিনেতারা, মেকাপ নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। দলের শিল্পীরা ঠিক করলেন বইয়ের নাম পাল্টে দিতে হবে। তখন এরা 'শিব চতুর্দশী' নাম ঘোষণা করে অভিনয় আরম্ভ করলেন।

কলাকার গোষ্ঠী কৃষক জীবনকে জানার পর শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমরেশ বসুর ছোটগল্প অবলম্বনে বাসুদেব বসুর হিন্দী নাটক 'কিমলিস' হিন্দী ভাষায় অভিনয় আরম্ভ করলেন। এই প্রথম নাটক হিন্দী ভাষায় কিমলিস নিয়ে বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলে এরা অভিনয় আরম্ভ করলেন। শ্রমিক শ্রেণী তাদের নিজেদের জীবনকে নিজ ভাষায় অভিনীত হতে দেখে খুবই উৎসাহিত বোধ করলেন। হলে কি হবে! সময়টা হবে ১৯৬৮ সাল। এবার শুরু হল মঞ্চ ভাঙ্গার পালা। বিহারের পাঞ্চেতে কিমলিস অভিনয় চলাকালীন একদল পেশাদারী গুণ্ডা কার নির্দেশে বলা কঠিন, দর্শককে অগ্রাহ্য করে মঞ্চে প্রবেশ করল। তারপর সমস্ত কিছু ভেঙ্গে তছনছ করে দিল। তাদের দাবী একটাই কমিউনিস্ট নাটক করতে দেওয়া হবে না। সেদিনের দর্শক হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে গেল। এরা কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি। আরো সরাসরি কমিউনিস্ট প্রচারে এগিয়ে গেল। ১৯৫৭ সালের কেরালার প্রথম কমিউনিস্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেবার রাজনৈতিক চক্রান্তের পটভূমিকায় বাসুদেব বসুর 'মুক্তির অন্তরালে' মঞ্চস্থ করেন। ১৯৬৬ সালে এরা ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সাথে যুক্ত হলেন। তারপর এরা গণনাট্য সঙ্ঘেরই শাখা হিসাবে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে নাটক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে জনগণের কাছে সুস্থ নাটক পরিবেশন করে, একটা রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। নাটকের মধ্যে দিয়েও যে কিছু বলা যায়, কিছু করা যায়, সে কথা এরা পুনরায় প্রমাণ করলেন বাসুদেব বসুর কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকার লেখা 'জোয়ার' নাটকের মধ্যে দিয়ে। এরা বরগুলে সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের সাংস্কৃতিক মঞ্চে দশ হাজার দর্শকের মধ্যে 'জোয়ার' অভিনয় করে সাড়া জাগালেন। খেটে খাওয়া কৃষকই ছিল ওখানকার দর্শক। তারা নিজেদেরকে মঞ্চে দেখতে পেয়ে

অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর ভালবাসা জানালেন কলাকার গোষ্ঠীকে। এহেন জনপ্রিয় নাটক অভিনয় করতে গিয়েও বাধা। সমস্তিপুরে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে অভিনয় করতে গিয়ে হল ছাপা। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানালেন-ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের নামে নাটক করা চলবে না। তখন জনগণের কাছে নাটক দেখাতে হবেই একথা ভেবে ওরা শুধু কলাকার নামেই 'জোয়ার' নাটক অভিনয় করলেন এবং সার্থক হলেন।

১৯৭১ সালে এরা নিপীড়িত মানুষের অনেক কাছাকাছি যাবার জন্যেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারাণের নাত জামাই' (অরুণেশ মুখার্জীর নাট্যরূপ) যাত্রা নিয়ে মাঠে নামলেন, গ্রামে গ্রামে এই যাত্রা নিয়ে গেলেন।

এই সংস্থায় যারা অভিনয় করেন তারা হলেন অনাদি বসু, অশোক মুখার্জী, কল্যাণব্রত চন্দ্র, গোকুল দে, সুপ্রিয় সর্ব্বাধিকারী, অজয় চন্দ্র, সুব্রত পালচৌধুরী, অমিতাভ চৌধুরী, সনৎ রায়, কিশলয় সেন, পরাণ ব্যানার্জী, সুজিত বরণ রায়, প্রদীপ সুর, সুনীল বসু, বাসুদেব বসু, শম্ভু দে, দুলাল গাঙ্গুলী, রণ্টু মিত্র, জয়ী বন্দোপাধ্যায়, নারায়ণ বাগচী, হরিচরণ মিত্র, চন্দন সেন, ভাস্কর ব্যানার্জী, শ্যামাপদ গাঙ্গুলী, শিবেন্দ্র ঘোষ, চন্দন সেন, পুরন্দর বসু, নীরোদ দাস, দীপক ভট্টাচার্য, মধুসূদন হালদার, নন্দেশ্বর চ্যাটার্জী, রুদ্রতেজ ঘোষ, প্রবীর পাল, ব্রজ দত্ত বণিক, সুনীল বসু, ভারতী বসু, হলা সবাধিকারী। পরিচালনায় বাসুদেব বসু, সংগীতে দিলীপ সেনগুপ্ত, আবহ সংগীতে ধনগোপাল গাঙ্গুলী, মঞ্চ সজ্জায় অনিল সর্ব্বজ্ঞ ও আলো রনজিৎ মিত্র।

গন্ধর্ব থেকে/ ঋতায়ন

গন্ধর্ব নাট্যগোষ্ঠীর কিছু সদস্য নীতিগত কারণে সংগঠন ত্যাগ করে, আরো কিছু নাট্যোৎসাহী বন্ধুদের সহযোগিতায় ১৯৭৪'র ১২ শে নভেম্বর ঋতায়ন-এর গোড়াপত্তন করেন। নাট্যকার মনোজ মিত্রের পরিচালনায় ঋতায়ন প্রথম মঞ্চস্থ করলেন 'অবসন্ন প্রজাপতি' এ এক প্রসন্ন। বিষাদের নাটক, আবরণের হাসি নিটোল হয়েছে অন্তরের কান্নায়। এই নাটকের মুখ্য নারী চরিত্রে অন্যতমা মঞ্চাভিনেত্রী মমতা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অবিস্মরণীয়। বিদগ্ধ দর্শক, তীক্ষ্ণধী সমালোচক সেদিন অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এই প্রয়াসটিকে।

দ্বিতীয় প্রযোজনা ছিলো অতনু সর্বাধিকারীর 'লঘুগুরু' ও মনোজ মিত্রের 'মৃত্যুর চোখে জল'। প্রথমটি শান্ত হাসির, কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ক্ষুরধার। দ্বিতীয়টি বহু-প্রশংসিত একাঙ্ক। দুটি নাটকের পরিচালনায় ছিলেন মনোজ মিত্র। তেমনিই এক দুঃসাহসিক প্রয়াস ছিল 'সিংহদ্বার'। অভিনয়ে: প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলাল ঘোষ। বিগত আট বছরে ছোট বড় মিলিয়ে অনেক নাটকই প্রযোজনা করেছে ঋতায়ন। মনোজ মিত্রের 'কাল বিহঙ্গ', 'ফেরা' 'পাখির চোখ', 'কামধেনু', 'নেকড়ে', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এ্যাবসার্ডধর্মী নাটক 'গন্ধরাজের হাততালি' (মঞ্চ স্থাপত্য; অজয় দত্তগুপ্ত; সুর: অমল চক্রবর্তী); উমানাথ ভট্টাচার্যের 'জল' (পরিচালনা: সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনয়ে: সুমিতা চক্রবর্তী, বিনয় কুমার বাথরা প্রভৃতি)।

এর মধ্যে উল্লেখ্য নাটক 'নেকড়ে' (অভিনয়ে: অধিপ বিশ্বাস, চিত্রিতা মণ্ডল, অশোক চক্রবর্তী)। এই নাটকের বক্তব্যের সমাজ-সচেতনতা, প্রয়োগ পরিকল্পনা, দলগত অভিনয়ের উৎকর্ষতা নাট্য রসিকদের প্রচুর প্রশংসা অর্জন করে।

মঞ্চস্থাপত্যে ঋতায়নের প্রয়াসহীন সাফল্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কেবল সরু কাঠের ফ্রেম, ফিতে, হালকা বোর্ডের কাগজ, কালো পর্দার এক কোণে একটি মাত্র লাল আলো ('সিংহদ্বার')—এই সব মিলিয়ে স্টেশনের ওয়েটিং রুম, অথবা নানা রঙের ফিতে দিয়ে তৈরী, কাঠের ফ্রেমে সুসজ্জিত ড্রইংরুম (গন্ধরাজের হাততালি)—নাটকের অঙ্গ হিসেবে যেমন পরিপূরক হয়ে উঠেছে তেমনিই সামগ্রিক কল্পনা রসিকজনের প্রশংসা পেয়েছে।

নাট্যচর্চা কেবলমাত্র মঞ্চাভিনয়ে সীমিত না রেখে ঋতায়ন গোষ্ঠীর একটি বড় অবদান 'নাট্য পাক্ষিক' (সম্পাদক: দীপক শর্মাচার্য) পত্রিকা। নাট্য প্রসঙ্গে একমাত্র প্রথম পাক্ষিক পত্রিকা।

ঋতায়ন এ পর্যন্ত যে কটি নাটক প্রযোজনা করেছে একটি বাদে সব কটিই মৌলিক। অনূদিত নাটক সম্বন্ধে যে কোন অনীহা আছে তা নয়। ভালমন্দ মিশিয়ে একান্তভাবে মৌলিক নাটক হোক—ঋতায়নের এটাই একান্ত কামনা।

নাট্য আন্দোলনের দৃপ্ত পদক্ষেপ/কল্লোল

১৯৫৫ সাল, নাট্য আন্দোলনে যখন নতুন আলোর রেখা দেখা গেল, তখন দেশ জুড়ে কল্লোলিত হচ্ছে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের কল্লোল। মিনার্ভা থিয়েটার আবার প্রাণ ফিরে পেল। একদিন গিরীশ ঘোষের প্রতিষ্ঠিত মিনার্ভা থিয়েটারে যে ঐতিহ্য ছিল, সেই ঐতিহ্যকে নতুন চিন্তাধারায় উৎপল দত্ত নতুনভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি আজকের জীবন সংগ্রামের নাটক হাতে নিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারকে রক্ষা করবার জন্যে এগিয়ে গেলেন। যদিও এই থিয়েটারকে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ হাতে নিয়েছেন আরো অনেক আগে, প্রথম নাটক সেক্সপীয়ারের 'ওথেলো' দিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করেন ওরা। পরে উৎপল দত্তর 'অঙ্গার' নাটক নতুন পথের সন্ধান দেয়। নিপীড়িত শ্রমিকদের বাঁচার সমস্যা নিয়ে এই প্রথম আমরা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে নাটক দেখতে পেলাম। এই কোলিয়ারী সমস্যা নিয়ে আমরা আজ থেকে ২০ বছর আগে দেখেছিলাম, শচীন সেনগুপ্তর 'স্বামী স্ত্রী' সেটা ছিল নিছক মালিকের গৃহ সমস্যা, শ্রমিক সেখানে ছিল কতকগুলি টাইপ ক্যারেক্টার, অঙ্গারে আমরা দেখতে পেলাম সেই কোলিয়ারীর খেটে খাওয়া মানুষগুলো তাদের জীবনের কথা বলছে। অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রাণপণে বাঁচবার চেষ্টা করছে। বাঁচার জন্য সংগ্রাম করছে।

১৯৬৫ সালের ২৮শে মার্চ কল্লোল আত্মপ্রকাশ করল। নাট্য আন্দোলনে এটা একটা ঐতিহাসিক স্মরণীয় দিন বললে ভুল বলা হবে না। কারণ এই কল্লোল নিয়ে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো পর পর দেখলেই বোঝা যাবে বছর খানেকের মধ্যে কতো কি না ঘটে গেল।

কল্লোল সম্বন্ধে বিদগ্ধজনেরা কি ভাবতেন তার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাক।

"ভারতীয় নৌবিদ্রোহের পট-ভূমিকায় কল্লোল নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করে উৎপল দত্ত আশ্চর্য সাহস ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন....কল্লোল-এর মঞ্চ-কলায় ধ্রুপদী ও নব্যরীতির সফল সমন্বয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। টেকনিকের চমকপ্রদ ব্যবহার এতে অনেক আছে, কিন্তু টেকনিক সর্বস্বতার অপবাদ দেওয়া চলে না, কারণ টেকনিক বিষয় বস্তুকে ছাপিয়ে কখনও উগ্রপ্রাধান্য লাভ করেনি। সব শেষে উৎপল দত্তের অন্যান্য নাটকের মতই কল্লোলের সামগ্রিক অভিনয় মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করার মত। এক কথায় "কল্লোল" সার্থক নাটক।

—সত্যজিৎ রায়।



ময়দানে "কল্লোল" বিজয় উৎসব। ডানপাশে গণ-শিল্পী সংস্থার সভাপতি উৎপল দত্ত ও সম্পাদক জোছন দস্তিদার।



৬৬-তে স্থশীল সিংহের উদ্যোগে নাট্যসম্মেলনের নেতৃত্বে পুলিশ প্রহরাধীন রবীন্দ্রসদনের দরজা খোলার দাবীতে বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিকগণ পথে অনুষ্ঠান করছেন।

"উৎপল দত্ত ইতিহাস চিত্রিত করেছেন। এই ইতিহাস লিখিত হয়নি। তা রয়েছে আমাদের স্মৃতিতে, তা আছে বিক্ষিপ্তভাবে সরকারী গোপন রিপোর্টে, খবরের কাগজের পাতায়। কল্লোল সেই নিন্দিত ইতিহাসে মুখর। ব্রিটিশ রাজ্যের ভাষায় যা ছিল বিদ্রোহ, আমাদের চোখে তা ছিল মুক্তির উত্তোলিত নিশান। ভারতবর্ষের নেতৃত্ব যদি সেই বিজয় পতাকাকে কাঁধে তুলে নিতে পারতো তাহলে আজকের ইতিহাস হত অন্যরকম। উৎপল দত্ত ইতিহাস উপস্থাপনে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন।"

—কৃষ্ণ ধর।

"এমন এক বলিষ্ঠ নাটক, এমন পৌরুষদৃপ্ত রূপ এবং এমন এক দুর্দান্ত বিদ্রোহীর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষমাণ ছিলাম। কেবল বর্তমান লেখক নয়, সারা বাংলার চিত্ত এই গতানুগতিক বন্ধনের বিরুদ্ধে সমাজ ও সভ্যতার নতুনের জন্য অপেক্ষমাণ। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে কিম্বা গভীর রাত্রে কান পাতিলে যেন সেই জরাগত সমুদ্র কল্লোল শুনা যাইবে, যে কল্লোলের মধ্যে লুকানো আছে অবিচার, অন্যায় ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে এক মহৎ বিক্ষোভ ও দৃঢ়সংকল্পিত ক্রোধ। ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহের কল্লোল তারই বিস্ময়কর নাটকীয় অভিব্যক্তি।"

—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

কল্লোলের শো চলছে। সবে ১০৯টি অভিনয় পূর্তি হয়েছে। হঠাৎ জানতে পারা গেল ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সালে নট নাট্যকার উৎপল দত্ত ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছেন। অভিনেতা শিল্পীরা হতবাক হয়ে পড়েছেন, চতুর্দিকে সভা সমিতির মধ্যে দিয়ে এই অন্যায় গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হচ্ছে তীব্র ধিক্কার। ২৪ সেপ্টেম্বর সমস্ত সংবাদপত্র আদেশ দিলো কল্লোলের বিজ্ঞাপন ছাপা হবে না। কল্লোল কিন্তু বন্ধ হল না, আরো দ্রুতগতিতে চলতে থাকল। বাংলা দেশের শহর গ্রাম ভেঙ্গে পড়লো কল্লোল দেখার জন্যে। কল্লোল অভিনয়ের সময়েই উৎপল দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জোছন দস্তিদার, নির্মল ঘোষ, বিদ্যুৎ বসুর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা ৩১শে আগষ্ট ১৯৬৫, দল হিসাবে যারা আহবায়ক ছিল: লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, উত্তরী গ্রুপ থিয়েটার, রূপান্তরীর শিল্পীগণ, লোক সংস্কৃতি সঙ্ঘ, থিয়েটার ইউনিট, মাস থিয়েটার্স। পরে এই সংস্থার কলকাতার দল ছিল ২০টা। সারা বাংলার নাট্য দল এসে যোগ দিয়েছিল প্রায় ১০০টি। এই সংস্থা চলাকালীন উৎপল দত্ত গ্রেপ্তার হবার ঠিক

একমাস পরে নাট্যকার জোছন দস্তিদারকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয় ১৮ই অক্টোবর ১৯৬৫ সালে। এই দুই নাট্যকারের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বহু সভা সমিতি হয়। ১৪ই মার্চ ১৯৬৬ সালে দেশে গণ আন্দোলনের চাপে এই দুই নাট্যকার মুক্তি পেলেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ সালে কল্লোল ২০০ রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেল। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ কলকাতার শহীদ মিনারের পাদদেশে বিজয় উৎসব উদযাপন করলেন ৭ই মে ১৯৬৬ সালে। নৌ-বিদ্রোহের সেই খাইবার জাহাজটি যেন শহীদ মিনারে এসে হাজির হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ জমায়েত হয়েছে। সদ্যমুক্ত উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদার এসে দাঁড়ালেন সেই মানুষের মাঝে। লক্ষ লক্ষ মানুষ করতালির দ্বারা ঘোষণা করলেন তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। তারপর অভিনয় আরম্ভ হল, কল্লোলের দৃশ্য অভিনয়। জনতা মুগ্ধ হয়ে গেল, বার বার করতালির দ্বারা অভিনন্দন জানাল উৎপল দত্তকে যিনি লিখেছেন এই কল্লোল। যিনি অভিনয় করেছেন এই কল্লোলে আর অভিনন্দন জানাল সালের ভূমিকায় অভিনেতা শেখর চ্যাটার্জিকে। সেই সঙ্গে তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত যাদের প্রচেষ্টায় এই দুধর্ষ সেট ও আলোর কারুকার্য দেখান হয়েছে। তাদেরও জানালেন আন্তরিক শুভেচ্ছা।

গণনাট্যের আদর্শে শিল্পীমন

১৯৬৫ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে আমন্ত্রিত হয়ে একটা নাটক দেখতে গেলাম, সিরাজ চৌধুরীর 'দিগন্ত রক্তিম,' পরিচালনা করলেন বিদ্যুৎ বসু, প্রযোজনায় ছিল শিল্পীমন।

—মধ্যবিত্ত জীবনের আনন্দ আর এই দলের মধ্যে দিয়ে কিভাবে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠেছে এবং অনেক অত্যাচার সত্ত্বেও প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। এই হচ্ছে নাটকের মূল কথা। প্রযোজনাটি খুব-ই ভাল লেগেছিল, তাই সেদিন জানিয়ে দিলাম আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এই নতুন দলের এতো ভাল প্রযোজনা কেমন করে সম্ভব? এক জন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন সেদিন। দলটা ঐ নাটক নিয়েই শুরু হয়নি। আরো ১০ বছর আগে পেছিয়ে যাওয়া যাক, দেখা গেল শিক্ষক জীবনের সুখ-দুঃখ ও

সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লেখা সুনীল দত্তর 'হরিপদ মাস্টার' অভিনয়ের মাধ্যমে ১৯৫৫ সালে এই শিল্পীমনের জন্ম, কিছু গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীই এই দলের জন্মদাতা বলা যায়। তারপর এরা অভিনয় করেন দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোকাবিলা'। শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের পটভূমিকায় লেখা এই নাটক।

এই দশ বছর কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটার পর একটা নাটক অভিনয় করে গেছেন এরা। যেমন ধীরেন রায়ের 'নবজন্ম' এটা গণনাট্য সঙ্ঘে অভিনীত নাটক। ভানু চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য'।

গোপীকানাথ রায়ের 'সম্রাজ্ঞী', তুলসী লাহিড়ীর 'নববর্ষ', ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল'। ১৯৫৮ সালে এদের নতুন পদক্ষেপে বেকার সমস্যার উপর ভিত্তি করে বিজনকুমার গোস্বামীর মূল কাহিনীকে অবলম্বন করে বিদ্যুৎ বসুর 'লার্নিং ফ্রম দি বার্নিং ঘাট', একটি অনবদ্য ব্যঙ্গ নাটক। শ্লেষের মধ্য দিয়ে সমাজের একটা বিরাট সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। হাসির মধ্যে দিয়ে একটা করুণ সুর বেজে ওঠে, যে সুরটা আমাদের মনের তন্ত্রিতে গিয়ে আঘাত করে। এই নাটক নিয়ে ওরা ১৯৫৯ সালে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরি কল্পনা পরিষদের আহ্বানে গিরীশ নাট্য প্রতিযোগিতায় যোগ দেন এবং সেখানে সাফল্যের সঙ্গে পুরস্কৃত হন।

এরপর এরা ১৯৬১ সালে উৎপল দত্তর "ঘুমনেই" শ্রমজীবী মানুষের গভীর জীবনের নাটক অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেন, গিরীশ নাট্য প্রতিযোগিতায় এই নাটক অভিনয় হয়েছিল এবং পুরস্কৃতও হয়েছিল। কিন্তু শিল্পীমন সে পুরস্কার নেয়নি বলে আমরা জানি। কারণ জানিনা। তবে একটা গণ্ডগোল হয়েছিল এটুকু জানি।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে ওরা ভানু চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' ও রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' মঞ্চস্থ করলেন। ১৯৬২ সালে উৎপল দত্তর 'বিচারের বানী', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি যুদ্ধের ইতিহাস' ও 'নব স্বয়ম্বর', তুলসী লাহিড়ীর 'নরক' অভিনয় করলেন।

এবার আধুনিক থেকে একটু পেছনে গেলেন, সালটা হবে '৬২, সে সময়ে দেশে একটা দারুন সংকট। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিবাহ বিভ্রাট', ক্ষীরোদ প্রসাদের 'ভূতের বেগার' ও 'দাদা দিদি' মঞ্চস্থ করলেন।

১৯৬৩ সালে আবার ফিরে এলেন আধুনিক ও চিরায়ত নাটকের দিকে।

রবীন্দ্রভারতী নাট্যমঞ্চে এদের ৭দিন ব্যাপী নাট্য উৎসবে আমরা দেখলাম মানিক সরকারের 'স্বপ্নের রঙ', গিরিশ ঘোষের 'আবু হোসেন', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হ্যামলেট' বাংলায় জগন্নাথের রথ। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ রবীন্দ্রনাথের 'সে', মানিক সরকারের 'কালের বিপ্লব', মন্মথ রায়ের 'একটি রাজকীয় মৃত্যু'।

এবার গদ্য ছেড়ে এলেন কাব্যে, রাম বসুর সেই রাজকীয় পদশব্দগুলি 'নীল কণ্ঠ' সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন।

এই সময়ে এরা একটি নাট্য পত্রিকা বের করতেন প্রসেনিয়াম নাম দিয়ে, পরবর্তীকালে এই পত্রিকাকে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, উৎপল দত্তর সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। ১৯৬৪ সালে এরা সিরাজ চৌধুরীর 'সূর্য্য ওঠার সময়' অভিনয় করলেন মিনার্ভা থিয়েটারে। একই সময়ে উৎপল দত্তর 'দ্বীপ' অভিনয় করলেন।

১৯৬৫ সালে যখন সিরাজ চৌধুরীর 'দিগন্ত রক্তিম' অভিনয় হচ্ছে সেই সময়ে সংযুক্ত গণশিল্পী আর বিপ্লবী নাটক অভিনয় করছেন এবং সংস্থার সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন এরা। উৎপল দত্তর 'রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া', সিরাজ চৌধুরীর 'বিস্ফোরিত বিবর' অভিনয় করেছেন ১৯৬৭ সালে। আবার পূর্ণাঙ্গ নাটক সিরাজ চৌধুরীর 'তুফান' অভিনয় করলেন।

১৯৬৮ সালে বিশ্বরূপা মঞ্চে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের বহু পুরাতন নাটক মালয়ের মুক্তি যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা 'মালয়ে মায়ের ডাক' আমরা দেখলাম, তারপরই সিরাজ চৌধুরীর 'সশস্ত্র কঙ্গো' ও রবীন পোদ্দারের পরিচালনায় অভিনয় করলেন। এর পর এরা ভীমচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'প্রতিপক্ষ' ও সিরাজ চৌধুরীর 'নবতরঙ্গ' অভিনয় করলেন। ঐ সালেই 'অগ্নিকোণ' কার লেখা জানি না মঞ্চস্থ করলেন এরা। ১৯৭২ সালে ওরা উৎপল দত্তর একটি 'তলোয়ারের কাহিনী' অভিনয় করলেন মিনার্ভা থিয়েটারে।

এই গ্রুপে যারা বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেছেন :—সমর মিত্র, জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল রায়, সুনীল ঘোষ, হিমাংশু দাস, বিদ্যুৎ বোস, শংকর শীল, বাসুদেব দত্ত, বাসুদেব পাল, বিমল দাশগুপ্ত, সুদর্শন বসু, দুলাল ব্যানার্জী, তপেন ভট্টাচার্য, কেদার মল্লিক, আশীস দাসগুপ্ত, রবীন, নৃপেন ব্যানার্জী, মধু ঘোষাল, নিতাই বিশ্বাস, গঙ্গা মুখার্জী, শেলী ভট্টাচার্য্য, তরুণ ভট্টাচার্য্য, অসীম মৈত্র, নিখিলেশ রায়, রণজিৎ ব্যানার্জী, জগদীন্দ্র মজুমদার, সমর ঘোষ, সুনীল

বসু, পান্নালাল ঠাকুর, দেবব্রত রায়, সুবোধ চক্রবর্তী, বাণী দাসগুপ্তা কল্যানী দাসগুপ্তা, সবিতা মজুমদার, নমিতা চ্যাটার্জী, ডলি চ্যাটার্জী, স্বপ্না, প্রতিমা পোদ্দার, শ্রীমতী ব্যানার্জী, বীনা পোদ্দার, সীমা ভট্টাচার্য্য, সানন্দা ভট্টাচার্য্য। আরো অনেক শিল্পী এসেছেন চলেও গেছেন তাদের নাম পাওয়া যায় নি।

শিল্পীমনের মূল পরিচালক বলা যায় বিদ্যুৎ বোসকে। তিনি সব নাটকেই প্রায় নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

মুক্তধারা

১৯৬৫ সাল, আর একটি নতুন সংস্থা জন্ম নিল—নাম 'মুক্তধারা'। ১১ই জুলাই এদের প্রথম নাটক রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন', সুশ্যামল শর্মার 'চিন্ময়ী' ও 'অথজড় কথা' এই তিনটি নাটক এক সঙ্গে রঙমহলে আমরা দেখলাম, পরিচালনায় ছিলেন সুশ্যামল শর্মা।

১৯শে ডিসেম্বর প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে সলিল সেনের 'দর্পণ', সুশ্যামল শর্মার 'নির্বাণ' সন্তোষ দাসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল।

২৪শে এপ্রিল ১৯৬৬ সালে কিরণ মৈত্রের 'বারোঘণ্টা' ও 'নির্বাণ' নিশ্চিন্তপুরে অভিনয় হলো। ৫ই জুন ১৯৬৬ সালে এরা সুশ্যামল শর্মা রচিত ও পরিচালিত 'অনাটকীয়' করলেন এ. বি. টি. এ হলে। এরপর এরা মুক্তাঙ্গনে পর পর সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ডিসেম্বরে পূর্ব অভিনীত নাটকগুলোর পুনরাভিনয় করলেন। ৬ই আগস্ট ওরা সুশ্যামল বাবুর নতুন নাটক 'পরাজিত রক্তসূর্য' অভিনয় করলেন। ২৪শে নভেম্বর প্রতাপ মেমোরিয়ালে অগ্নিমিত্রের 'কোনদিন যদি'র পর পর দুটি অভিনয় করলেন।

২১শে ডিসেম্বর সুশ্যামল শর্মার 'কুবেরের মৃত্যু', শেখর চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রতিধ্বনি' শীকঙ্কর চিত্রনাট্য তিনটি একাঙ্কিকা এ. বি. টি. এ হলে অভিনয় করলেন।

৭০ সালে মুক্তাঙ্গনে শেকসপীয়রের জুলিয়াস সীজার (অনুবাদ সুশ্যামল শর্মার) মঞ্চস্থ হয়। ৭১ সালে ২৮শে সেপ্টেম্বর মুক্তাঙ্গনে সুশ্যামল শর্মার 'বেঁচে থাকার মহাকাব্য', 'অথজড় কথা' অভিনয় করলেন।

মঞ্চের ভাড়া বেড়ে যাবার ফলে এদের খুবই অসুবিধে হয়।

নাটকে অংশ গ্রহণকারী সদস্য শিল্পী :—

সুশ্যামল শর্মা, ছন্দা শর্মা, নিমাই দাস, প্রশান্ত কুমার, প্রণব ভট্টাচার্য, শোভনা বসু, রীতা চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দাস, রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, অতীন দাস, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলক মল্লিক, তপন বিশ্বাস, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সলিল রায়, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অসিত ভট্টাচার্য, কল্পনা রায়, শান্তি ঘোষাল, যাদব মজুমদার, শ্যামল সরকার, সরিৎ রায়, রণজিত দত্ত, অলোক দাস, সুবীর রায়, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, সুকুমার সেনগুপ্ত, অশোক চট্টোপাধ্যায়, মলয় ভট্টাচার্য, অমলেশ মৈত্র, লীলা মিত্র, কাশীনাথ পাল, নীহার দাঁ, দিলীপ সাহা, নিতাই বর্দ্ধন, অসিত ঘোষ, অনিল দে, দেবকুমার নন্দী, কমল রায়, শ্রীপদ রায়, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য দাস, তপন ঘোষ, শর্মিষ্ঠা শীল, এস. এম. এহিয়া, সলিল মজুমদার, রবীন রক্ষিত, তাপস গোস্বামী, নিমাই সাহা, প্রাণ চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব ঘোষ, কালীগোপাল পাল, ভবেশ কুণ্ডু ও ৺পরিতোষ শী।

অভ্যুদয় থেকে প্রতিভা

১৯৬৫ সালে শহর কোলকাতার বুকে একটা নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা হলো, নাম 'প্রতিভা'। সেই সালেই এরা বিশ্বরূপায় অভিনয় করলেন বিমল রায়ের 'শেষের পরে'। নাট্য নির্দেশনাও বিমল রায়ের। তারপর থেকে প্রতিভার প্রযোজনায় পর পর অভিনীত হয়েছে 'প্ল্যানমাষ্টার', 'অন্তরালে', 'অভিনয়', 'বিশুর বিয়ে', 'অসমাপ্ত,' 'দি নিউ শ্রীহরি অপেরা,' 'ভাঙ্গা বাঁশির সুর,' ইত্যাদি নাটক। উল্লেখিত সব নাটকই এই দলের নাট্য-নির্দেশক বিমল রায়ের রচনা। এছাড়া এরা রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি,' ও দেবব্রত রেজের 'ছন্দরাগ,' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেছেন। এই দলের মূল গায়েন বিমল রায়, ইনি আগে ছিলেন অভ্যুদয়ে। মত বিরোধের ফলে চলে আসেন। নাট্য প্রযোজনার সাথে সাথে প্রতিভার শিল্পীরা অন্যান্য নাট্য আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত। সারা বাঙলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে যে কটি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে তার সবগুলোতেই এরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

দলটি এখনও আছে, কিন্তু সেই নামটি আর নেই। ১৯৭১-এর অক্টোবরে 'প্রতিভা'র নতুন নাম হয়েছে 'শুভ্রক'।

রূপচক্র

১৯৬৫ সাল, কলকাতার অলিতে গলিতে বহু পোষ্টার ছেয়ে গিয়েছিল একটি নাটকের নামে। 'নায়িকার নাম নিয়তি', দলের নাম রূপচক্র। কলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ, নৈহাটি থেকে ত্রিবেণী বহু জায়গায় এই নাটক ওরা অভিনয় করেছেন। লক্ষ্ণৌ আর পলতা, পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় এই দল প্রথম স্থান অধিকার করে। যিনি 'দ্বান্দ্বিক' একাংক লিখে অমর হয়ে আছেন সেই একটি তীক্ষ্ণ গাঢ়াল নাম অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নায়িকার নাম নিয়তি' প্রযোজনার মাধ্যমে যে দলকে সকলেই চিনল সে দলের জন্ম আরো অনেক আগেই। ১লা অক্টোবর ১৯৫৮ সালে ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল' দিয়ে ওরা যাত্রা শুরু করেন। তারপর ১৯৭২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী অবধি ৫৯টি নাটক ওরা অভিনয় করেছেন। কুমার রায়ের 'স্মৃতি থেকে' নাটকটিও ওরা অনেক রাত্রি অভিনয় করেছেন। ১৯৭১ সালে ওরা রঙ্গনায় একটি নাট্য উৎসবের আয়োজন করেন, তাতে কুমার রায়ের 'স্মৃতি থেকে', মনোজ মিত্রর 'কোথায় যাবো' অভিনয় করেন। আলোতে ছিলেন অজিত মিত্র, রূপসজ্জায় দেবনারায়ণ ঘোষ, ব্যবস্থাপনায় অবন্তী প্রসাদ, সত্যনারায়ণ ঘোষ, পরিচালনায় গৌর কৃষ্ণ ভদ্র। অভিনয়ে সুজিত বসু, সন্তোষ মান্না, তারক কুণ্ড, রতন দে, শম্ভুনাথ রায়, সুনিত রায়, সঞ্জয় দত্ত, পরেশ ঘোষ, মাধব চট্টোপাধ্যায়, দেবী প্রসাদ দে, অবন্তী প্রসাদ, আনন্দময় বিশ্বাস, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, সন্তোষ পণ্ডিত, গৌর ভদ্র, সত্যনারাণ ঘোষ, মমতা চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎ বসু, কান্তি বসাক, নারায়ণ কুমার, গৌর পাল, প্রীতম পাল, শীতল দাস, অবনীশ দত্ত।

মঞ্চপ্রভা

১৯৬৫ সাল, মঞ্চপ্রভা নামে একটি সংগঠন প্রবোধবন্ধু অধিকারীর 'জনক জননী' মুক্ত অঙ্গনে মঞ্চস্থ করেন। পর পর আরো ছটি অভিনয় হয়। নির্দেশনায় ছিলেন বিদ্যুৎ গোস্বামী, আলোয় কনিষ্ক সেন, আবহ সঙ্গীতে সুনীল দত্ত, প্রচার সচিব প্রদীপ গুহ ঠাকুরতা। অভিনয়ে বিদ্যুৎ গোস্বামী, কেতকী দত্ত, মনোজ বিশ্বাস, মমতা চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, মীনা ভট্টাচার্য, সুনীল দত্ত, মাঃ কিশোর।

বহু আলোচিত এই নাটকটির একটি সমালোচনা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেই লেখাটির কিছু অংশ এখানে ছেপে দেওয়া হল।

একটি আধুনিক নাটক

জন্ম-পরিচয় রহস্য উদ্ঘাটিত হবার পর পাণ্ডব জননীকে কর্ণ বলেছিলেন—তিনি সূতপুত্র, রাধা তাঁর মাতা; তার চেয়ে অধিক গৌরব তাঁর কাম্য নয়। গত রবিবার সকালে রঙমহল প্রেক্ষাগৃহে একটি বিশিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠী প্রযোজিত 'জনক-জননী', নাটকের অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, মুহূর্তের জন্য কর্ণের ওই উক্তির কথা তাঁদের মনে এসে থাকতে পারে।

সুখ্যাত লেখক প্রবোধবন্ধু অধিকারী রচিত ওই নাটকটির (প্রবোধবাবুর লেখা প্রথম নাটক এটি) কিশোর চরিত্র চিরঞ্জীবের সমস্যার সঙ্গে বাইরের দিক দিয়ে কর্ণের সমস্যার কিছু মিল আছে। অন্যথা মহাভারত চরিত্রটির সঙ্গে চিরঞ্জীব অবশ্যই তুলনীয় নয়। কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতও এখানে স্বতন্ত্র। এবং বলা যেতে পারে এখানে সমস্যাটিও জটিলতর নাট্য প্রযোজনার আঙ্গিক বাহুল্য বর্জিত। মঞ্চ উপকরণ, আবহসঙ্গীত এবং আলোক সম্পাতের প্রয়োগ পরিমিত। এখানে অভিনয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রধান দুটি চরিত্রের (মোহিনীমোহন ও ভ্রমর) শিল্পী বিদ্যুৎ গোস্বামী ও কেতকী দত্ত। দুজনেরই অভিনয় স্বতঃস্ফূর্ত সুন্দর! মোহিনীমোহনের প্রচণ্ড আবেগ শ্রীগোস্বামীর অভিনয়ে প্রতিফলিত। ভ্রমরের গোপন বেদনা অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সেই সঙ্গে স্বামীর প্রতি তার গভীর ভালবাসা শ্রীমতী দত্তর সংবেদনশীল অভিনয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যান্য চরিত্রের যথাযথ রূপ দিয়েছেন: মমতা চট্টোপাধ্যায় (মাধুরী), মনোজ বিশ্বাস (রতিকান্ত), সমরেশ মজুমদার, মীনা ভট্টাচার্য, মাঃ কিশোর ও সুনীল দত্ত। নাট্য পরিচালনার কৃতিত্ব বিদ্যুৎ গোস্বামীর।

ইংগিত

১৯৬৫ সাল, শ্যাম স্কোয়ারে যে নাট্য সম্মেলন হয়েছিল সুশীল সিংহর নেতৃত্বে সেই নাট্য সম্মেলনে অনেক নাটকের মধ্যে একটি নাটক দেখা গেল। যেটা ভোলার নয়। কারণ এই প্রথম নাটক যে নাটকে সৃষ্টি হয়েছে হাসির মধ্যে দিয়ে কান্নার পরিণতি। সত্যজিত রায় এই নাটক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছেন—

"সম্প্রতি যেসব বাংলা নাটক আমি দেখেছি তার মধ্যে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত "শেষ থেকে শুরু" একটি শ্রেষ্ঠ মৌলিক ও উপভোগ্য নাটক। নাটকের বিস্ময়কর মৌলিক চিন্তাধারাটি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর ঘটনা ও নতুন নতুন চরিত্রের মাধ্যমে অপরূপভাবে গড়ে তুলেছেন। নাটকটিতে কখনও অফুরন্ত হাসির ঢেউ, কখনও গভীর দুঃখের ছায়া এসে পড়েছে, কিন্তু পাশাপাশি এই দুটি ভাবকে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই সুন্দর সামঞ্জস্য রেখে সাজিয়েছেন।"

এইদিন জানা গেল ৬৩ সালে ইংগিত গোষ্ঠী সত্য বন্দোপাধ্যায়ের নির্লজ্জ নাটক রঙমহল মঞ্চে প্রথম অভিনয় করেন। ৬৯ সালে সত্য বন্দোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে সন্তোষ সেনের নাট্যরূপ 'এরাও মানুষ' অভিনয় করেন। এরপর সত্যবাবুর 'একটি নাটক লিখেছি', 'আনক্লেম বডি', ও 'বিল্বের জাহাজ' অভিনয় করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এরা অভিনয় করেছেন। কিছুদিন আগে এরা 'নহবত' নামে একটি সিরিও কমিক নাটক অভিনয় করলেন।

৭২-এ এসে এরা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঙ্গপাল' অভিনয় করতে গিয়ে বার বার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়লেন। ঐ নাটকের স্টেজ রিহারসাল হচ্ছে বিশ্বরূপায়। নাট্যকার পরিচালক সত্য বন্দোপাধ্যায় ৪ঠা জুলাই মঞ্চ থেকে পড়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন একমাস। থাকার পর হাসপাতালে সত্যদাকে জিজ্ঞেস করলাম এরপরও কি আপনারা আর এই নাটক করবেন? উনি বিছানায় শুয়ে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন। হ্যাঁ এই নাটক মঞ্চস্থ করব, আমার বিশ্বাস এই নাটক বাংলা দেশের জনগণের আরো বেশী ভাল লাগবে। কোন আঘাতই আমাকে এই নাটকের অভিনয় থেকে সরাতে পারবে না। সত্যদাকে আজকের কালে বাংলা রঙ্গমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা বললে বোধ হয় ভুল হবে না। এরপর সত্যদা বললেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকীতে আমরা পুরোন মেজাজে গিরীশ ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটক অভিনয় করব। সত্যদা যোগেশের চরিত্রে নামছেন এটাও হাসপাতালে শুনে এলাম। এই গোষ্ঠীতে বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেছেন—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, দীপক বসু, গোলক রায়, তরুণ ভট্টাচার্য, ভবতারণ ঘোষ, দিলীপ চ্যাটার্জী, গৌর ভট্টাচার্য, হরিপদ রায়চৌধুরী, মিহির দাশগুপ্ত, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত দাস, অনিল গঙ্গোপাধ্যায়, মধুসূদন সাঁতরা, হরিসাধন রায়, রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল চ্যাটার্জী, রবীন দাস, নিখিল ভট্টাচার্য, মনু মুখোপাধ্যায়,

বীরেন কুণ্ডু, বিমল বোস, শৈলেন মুখার্জী, গিরীশ চক্রবর্তী, শুভ্র ঘোষ, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মঃ শংকর, কৃষ্ণা সেন, লতিকা দাসগুপ্ত, রত্না ঘোষাল, শুভাশীষ ভাদুড়ী, স্বপন মুখোপাধ্যায়, স্বপন বিশ্বাস, গণেশ চন্দ্র দে (পাঁচু), রামাপদ মণ্ডল, শৈলেন কর, মানব চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর ঘোষাল, গীতা নাগ, ইরা মিত্র, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, উত্তাল চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু দাস, মধু সিং, ফনি রায়, উশীনর বিশ্বাস, হারু রায়, অলকা মুখোপাধ্যায়, সাধনা দেবী, সুনন্দা দাস। আলো—বিমল বোস, রূপসজ্জায়—মাঃ সত্তার, পর্যবেক্ষণ—মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরারোপ—দুলাল ঘোষ।

বহুমুখী

১৯৬৫ সাল। নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আরেকটি সংস্থার অভিনয় দেখলাম। সংস্থাটির নাম বহুমুখী। এবছরে ওঁরা পরপর অভিনয় করলেন 'রত্নদীপ', 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'ব্যায়সা-ক্যা-ত্যায়সা'। অবশ্য এঁদের জন্ম ১৯৫৮ সালে। সাংস্কৃতিক সম্পাদক জিতেশ গাঙ্গুলী জানালেন, শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অভিনয় করেছেন ৪৮ বার। সম্প্রতি লোকনাট্যের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বেছে নিয়েছেন 'পাদুকা' ও 'গন্ধর্ব দুহিতা' যাত্রা পালা। এঁদের প্রথম নাটক বীরেন পাল চৌধুরীর 'আজ অভিনয় বন্ধ'। ৭ই জানুয়ারী ৫৯ রঙমহলে অভিনীত ওই নাটকের পরিচালনায় ছিলেন বাদল গাঙ্গুলী। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন সন্তোষ রায়, সুভাষ আচার্য, প্রভাস চ্যাটার্জী, অনিল চ্যাটার্জী, সুধীন গুহ, ননী হালদার, প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ গাঙ্গুলী, গোরা ওঝা প্রভৃতি।

১৯৫৯ থেকে ৭২-এর এ পর্যন্ত ওঁদের অভিনীত নাটকগুলো হলো:— 'বনহংসী' (৩ বার), 'হীরাঝিল', 'মা' (২ বার), 'শরৎচন্দ্র', 'বিরাজ বৌ', 'ঝড়', 'রীতিমত নাটক', 'ন্যায়দণ্ড' (২ বার), 'ইরাণের রাণী', 'রত্নদীপ' (২ বার), 'মোটেই নাটক নয়', 'পরিণীতা', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'দুটি প্রাণ একটি মন', 'অভিজ্ঞান', 'আগন্তুক' (২ বার), 'ব্যায়সা-ক্যা-ত্যায়সা' (৭ বার), 'ভোলা মাস্টার', 'না-না-গো-না', 'ভীমপলশ্রী', 'তরণীসেন', 'কন্যাকুমারী' (৩ বার), 'সাহিত্যিক', 'পাদুকা' (১০ বার)। বিশ্বরূপায় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় 'অভিনয়' নাটক উপস্থাপনা করে এঁরা দলগত, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা

ও শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পান। আগামী প্রযোজনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রঘুবীর' (পরিচালনা—শঙ্করনারায়ণ) ও বাংলা নাট্যমঞ্চের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে 'দেবদাস'। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী, শাসন বিভাগীয় সম্পাদক অনিল ঘোষ, অর্থ বিভাগীয় সম্পাদক হীরেন মুখার্জী নিরলস প্রচেষ্টায় সংস্থাকে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বর্তমানে যাঁরা যাঁরা অভিনয়াংশে আছেন :—হীরেন মুখার্জী, মুকুল রায়, প্রভাস চ্যাটার্জী, সুভাষ আচার্য, অনিল মুখার্জী, লালমোহন ব্যানার্জী, সন্তোষ দে, সন্তোষ রায়, দীপক গুহ, রঞ্জিত মুখার্জী, ননী সরখেল, বিনয় দে, নীলকণ্ঠ ব্যানার্জী, দিলীপ দত্ত, সুধীর রায় চৌধুরী, নীলু ব্যানার্জী, জিতেশ গাঙ্গুলী, সন্তোষ চ্যাটার্জী, অনিল সরকার, পাঁচু বিশ্বাস ও গীতশ্রী দেবী। বিভিন্ন সময়ে এঁদের নাটক পরিচালনা করেছেন ও করছেন সাধন সরকার, অনিল সরকার, বিদ্যুৎ গোস্বামী, দেবব্রত সুর চৌধুরী ও শঙ্করনারায়ণ।

নাট্যকার পরিষদ

১৩৬৫ সাল, আধুনিক নাট্যকারদের একটি সংগঠন নাট্যকার পরিষদ। তারা মুক্তাঙ্গন মঞ্চে চারটে রবিবার সকালে নাট্যোউৎসবের আয়োজন করেন। উৎসবের প্রথম দিন ছিল ১৭শে ডিসেম্বর। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন, ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম দিনের নাটক ছিল অমিতা রায়ের 'নাম না জানা তারা'। যে সময়ে রুমানিয়ার নাট্যপ্রবাহ বিদেশী কারুচাতুর্যের অনুকরণে বিভ্রান্ত ও ক্ল্যাসিক নাট্য-সাহিত্য অবহেলিত ঠিক সেই সময়ে এক বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এলেন মিহাইল সেবাস্তিয়ান। তিনি দেখালেন যে আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভাববস্তুর প্রতি ঔদাসীন্য বা অপেক্ষা করার কোন সার্থকতা নেই। 'নাম না জানা তারা' নাটকটি সেবাস্তিয়ানের Steau fara nume নামক নাটক থেকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন অমিতা রায়।

বৈচিত্র্যহীন জীবনের বদ্ধ পরিবেশের অর্গল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায় আমাদের ভিতরকার সহজ, সবল, উচ্ছ্বসিত অদম্য ইচ্ছেগুলো। জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সৌন্দর্য্যের মুহূর্তগুলো আবার ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। মন তখন আবেগের উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছয়। সামান্য মাটির স্পর্শে ঘাসের মাদকতাময় গন্ধে অথবা পাখির গানে উদ্বেল হয়ে ওঠে মন তখন নতুন করে নতুনভাবে বেঁচে থাকার অশান্ত সত্তা ঘিরে ধরে সহস্র বেষ্টনীতে।

এমনি একটা মেয়ে যে আধুনিক সমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা হতে খুঁজে পায় এক ভিন্ন স্বাদের মানুষকে। যে দীপ্ত বিহ্বল চোখে খুঁজে বেড়ায় আকীর্ণ আকাশে কোন এক অবিদিত তার'—খুঁজে পায় এক নতুন তারা—এক নাম না জানা তারা। যেখানে জীবনের যত বিফল প্রয়াস, যত ভেঙ্গে যাওয়া স্বপ্ন, যত নিষ্ফল ভালবাসা। ধরা ছোঁওয়ার যত অনুভূতি সব সহজ সুন্দর রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। নায়ক তাকে কাছে পেয়েও ধরে রাখতে পারে না, তারাটি ফিরে যায় তার নির্দিষ্ট কক্ষে। কারণ তারা যে কোনদিন নির্দিষ্ট পথের বাইরে আসতে পারে না।

দ্বিতীয় দিনের নাটক ছিল সুনীল দত্তর 'দোলা,' তৃতীয় দিনে তিনটি একাংক, চতুর্থ দিনেও তিনটি একাংক। এর মধ্যে কিরণ মৈত্র, রবীন ভট্টাচার্য, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, অশোক সরকার-এর একাংক নাটক ঐ উৎসবে অভিনীত হয়।

অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন বিভূতি মুখোপাধ্যায়, কিরণ মৈত্র, সুনীত মুখোপাধ্যায়, অরুণ সরকার, অশোক সরকার, রমেন লাহিড়ী, অঞ্জলী লাহিড়ী, শমিতা বিশ্বাস, রবীন ভট্টাচার্য, সুনীল দত্ত। 'নাম না জানা তারা' ও 'দোলা' নাটক দুটো পরিচালনা করেন বিদ্যুৎ গোস্বামী। আলো স্বরূপ মুখোপাধ্যায়।

নাট্যকার পরিষদ ৬১তে মিনার্ভা থিয়েটারে সুনীল দত্তর 'খর নদীর স্রোতে' অভিনয় করেন। তাতে ঐ শিল্পীরা ছাড়াও নির্ম্মল ঘোষ, জোছন দস্তিদার, অমর গাঙ্গুলীও অভিনয় করেন।

শৌভনিক থেকে আই টি-এ

১৯৬৫ সাল, ১লা মে সেই পুরাতন নাটক গোর্কীর মাদার অবলম্বনে বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'মা' ময়দানে লক্ষাধিক দর্শকের মাঝে অভিনয় হচ্ছে দেখলাম, সংগঠনের নাম ইণ্ডিয়ান থিয়েটার এসোসিয়েশন। অভিনয়ে ছিলেনঃ—নিবেদিতা দাস, বীরেশ মুখোপাধ্যায়, রঞ্জীন ঘোষ, সমীর দাস, সুমিত্র গুপ্ত, সুধীর দে, রুমা গোস্বামী, প্রণতা নন্দী, সুপ্রিয়া দত্ত, পতাকা মুখার্জী, গিরিন চ্যাটার্জী, মুকুল ব্যানার্জী, সুনীল মুখার্জী। এরা সকলেই শৌভনিকে ছিলেন। শৌভনিক গড়ার ব্যাপারে এদের অবদান যেমন, আই টি-এর গড়ার ব্যাপারেও এরা

ততোধিক উৎসাহী। কেন শৌভনিক থেকে এলেন এ প্রশ্নের উত্তরে যিনি শৌভনিকের প্রতিষ্ঠাতা সেই বীরেশ মুখোপাধ্যায় জানালেন—আমাদের মূল লক্ষ্য এবং আদর্শ অনুযায়ী শৌভনিকে আর কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না, অথচ লক্ষ্যে আমাদের পৌছুতেই হবে—তাই আবার নতুন করে গড়ছি নতুন দল। কিন্তু সেই পুরোন নাটক দিয়েই নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছি। অনেক বাধা সত্ত্বেও আমরা আজ এই ঐতিহাসিক ১লা মে তে জনতার মাঝে এসেছি, তারো যাব জনতার নাটক নিয়ে জনতারই মাঝে। সেই লক্ষ্যে পৌছবার উদ্দেশ্যেই ওরা গোর্কী শত বার্ষিকীতে 'মা' নাটকের ২৫ টি অভিনয় করেছেন। লেনিন শতবার্ষিকীতে নিবেদিতা দাসের 'অক্টোবর বিপ্লব' ও 'লেনিন' অভিনয় শুরু করলেন। সোভিয়েত দেশ পত্রিকাতে সমালোচকরা বললেন, বাংলা রঙ্গমঞ্চে লেনিনের প্রথম আবির্ভাব।

অবশ্য ইতিমধ্যে এরা জার্মান নাট্যকার ফ্রেডারিক ডুরেন মাটের "দি ভিজিট" নাটকের রূপান্তর ভবানী প্রসাদ ঘোষের 'শ্রীমতী যশোনিশান' অজ্ঞ হলে অভিনয় করেন, পরে ঐ নাটকের নাম পাল্টে 'কালোচিতা' নামে ৬৭-সালে থিয়েটার সেণ্টারে প্রতি শনিবার বৃহস্পতিবার ত্রিশটা শো করেন। ওদের আসল উদ্দেশ্য নিজস্ব মঞ্চ, তাই বার বার চেষ্টা করেছেন, বিমুখ হচ্ছেন আবার এগোচ্ছেন, গড়িয়ার মোড়ে ১১ কাঠা জমি ভাড়া নিয়ে মঞ্চ তৈরী করলেন ১লা বৈশাখ ১৯৬৯ সালে। ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য্য উদ্বোধন করলেন, ডঃ অজিত কুমার ঘোষ বক্তৃতাও করলেন মাঠ ভরা দর্শকের মধ্যে। তারপর রাজনৈতিক দলাদলির ফলে আর অভিনয় করা সম্ভব হল না। ওরা পিছু হাটতে বাধ্য হলেন। আরো যারা এই দলে অভিনয় করেন অতুল ভট্টাচার্য্য, বিশ্বকল্যাণ দাস, অশোক ঘোষ, গোপী মুখার্জী, মোহন মেহরোত্রা, প্রভাকর গড়াই, বৈদ্যনাথ ঘোষ, দীপক ভট্টাচার্য্য, হেরম্ব শর্ম্মা, গোবিন্দলাল বসু। পরিচালনায়—বীরেশ মুখার্জী।

নাটমহল

১৯৬৫ সাল, ২৭শে মে ষ্টার থিয়েটারে একটি নাটক দেখলাম। নাটকটি পুরোন, দলটি নতুন হলেও পুরোন নাটকের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল দেখে ভাল লাগল। নাটকটা ছিল দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোকাবিলা'। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। এই নতুন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা

করে যারা বিভিন্ন সময়ে অতিথি শিল্পী হিসাবে অভিনয় করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন তুলসী লাহিড়ী, তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়, কালী সরকার, চারুপ্রকাশ ঘোষ, সত্য রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, সবিতাব্রত দত্ত, লীলা মুখার্জী। এই সংস্থা আরো আগে দিগিনদার বহু নাটক অভিনয় করেছেন। ১৯৫৮ সালে সোমেন নন্দীর বাড়ীতে নাট্যকার সংঘের উদ্যোগে 'দাম্পত্য কলহ চৈব' অভিনয় করেন। এই সময়ে দিগিনদার 'কেউ দায়ী নয়', অভিনয় করে এরা যথেষ্ট সুখ্যাতি পেয়েছেন, নাটমহলের স্যুভেনিরে একটি ছোট্ট চিঠি দেখলাম। লোভ সামলাতে না পেরে ছেপে দিলাম। দিগিন, তোমার 'কেউ দায়ী নয়' পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলেছি। সাবাস। আধুনিক নাটক কাকে বলে তুমি দেখিয়ে দিয়েছ। শেষ দৃশ্যটি বিশেষ করে অপূর্ব। দিগিন, তোমার জয়যাত্রা আজো অব্যাহত। চরৈবেতি! আরো এগিয়ে যাও। মন্মথ রায়, ১৫. ৪. ৭২। নাটমহল দিগিন দার যে সব নাটক অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে-'অন্তরাল', 'পাকা দেখা', 'ছুএর পিঠে এক শূন্য', 'সীমান্তের ডাক', 'পাণ্ডুলিপি'। রবীন্দ্রনাথের 'গুরুবাক্য' ও রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরি' নাট্যরূপ দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়। এরা অধিকাংশ নাটকই অভিনয় করেছেন, রঙমহল, আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট প্রভৃতি মঞ্চে। এই গোষ্ঠীর নাট্য পরিচালক দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সহযোগিতায়—অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্চ—সুভাষ সিংহ রায়, প্রদীপন—মনোরঞ্জন ঘোষ, সঙ্গীত—অপর্ণা চক্রবর্তী, অভিনয়ে—অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহার তালুকদার, সলিল ঘোষ, সুনির্মল ঘোষ, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, চিত্রিতা মণ্ডল, মায়া ঘোষ, মঞ্জুসা মুখার্জী, প্রভা চৌধুরী, মমতা চট্টোপাধ্যায়, মুকুল বসু, পুলক অধিকারী ও বর্ণালী চৌধুরী।

নাটক করলে ট্যাক্স দিতে হবে

১৯৬৬ সাল, নাটকের উপর এলো নতুন হামলা, কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন নাটক অভিনয় করতে হলেই প্রতিটি শোয়ের জন্য চল্লিশ টাকা কর দিতে হবে। নাট্য শিল্পীরা কিন্তু নাটকের উপর কণ্ঠরোধ নীরবে মেনে নিলেন না। তারা গর্জে উঠলেন, শুরু করলেন তীব্র আন্দোলন। ১১ই এপ্রিল ১৯৬৬ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায়, সর্বপ্রথম একটি নাট্য শিল্পীদের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হল, কে কি ভাবছেন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আমি সেই লেখাটি ছেপে দিলাম।

পৌর করের বাড়তি চাপে নাট্যলোক বিক্ষুব্ধ

কলকাতার নাট্যমহল বিস্মিত, ক্ষুব্ধ। পেশাদারী আর অপেশাদারী নাট্য দলের মাথার ওপর নেমে এসেছে করপোরেশনের বাড়তি করের বোঝা। প্রতিটি অভিনয়ের জন্য নির্ধারিত লাইসেনস দক্ষিণা এক লাফে হয়েছে দ্বিগুণ। অর্থাৎ একেবারে চল্লিশ টাকা।

কয়েকটি সংস্থার বক্তব্য

নাট্যকার পরিষদের সভাপতি কিরণ মৈত্র বলেছেন—'করপোরেশনের এই সিদ্ধান্ত মূলতঃ এক ষড়যন্ত্র। সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উপেক্ষণীয় এই অঙ্গ, নাটক, যখন প্রকৃত মানোন্নয়নের দিকে দ্রুত ধাবমান, নাট্য সাহিত্য ও অভিনয়কলা যখন চরম উৎকর্ষের গণ্ডিতে পা দিয়েছে ঠিক সেই সময় করপোরেশনের এই বাড়তি চাপ সুতীক্ষ্ণ খড়্গের মতন আমাদের মাথার উপর এসে পড়ল।' পরিষদের অন্যতম সম্পাদক সুনীল দত্ত বলেছেন, 'নাট্যামোদী বাঙলা করপোরেশনের এই চাপকে চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করেছেন। এর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী।'

দশরূপক গোষ্ঠীর সদস্যদের পক্ষ থেকে পরেশ ধর বলেছেন, 'সুদীর্ঘকালের অনুশীলন ও চর্চা এবং ব্যাপক উন্নয়ন প্রয়াস যখন নাট্যক্ষেত্রকে কুসুমাস্তীর্ণ করেছে ঠিক সেই মুহূর্তে করপোরেশনের এই চাপ নিন্দনীয়। প্রবল অর্থাভাব এবং প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করেও বাঙলার প্রতি প্রান্তরে নাট্যসংস্কৃতি আজ পল্লবিত। গণশিক্ষার শ্রেষ্ঠতম বাহন সেই নাটকের অগ্রগতি রোধের এই চক্রান্ত নতুন এক আন্দোলন সৃষ্টি করবে।'

রঙবেরঙের পক্ষ থেকে এই চাপের প্রতিবাদ করে বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত রায় বলেছেন, 'নির্বিরোধ, নীরবে আমরা নাট্যসাধনায় রত। সরকারী সাহায্যের করুণা আমাদের প্রতি বর্ষিত হয় নি, চাঁদা তেমন ওঠে না, আমাদের সদস্যদের সকলে সব রকমের ব্যয় সঙ্কোচ করে, ধার দেনা করে আমাদের অনুশীলনের খরচ জোগান। আকাঙ্ক্ষা আমাদের অনেক কিছু, আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ প্রবল ইচ্ছা আর বাসনাকে আমরা চেপে রেখেছি। বছরে দু'একটির বেশি পরীক্ষামূলক নাটক করবার সাধ্য আমাদের নেই। সেক্ষেত্রে করপোরেশনের এই নির্মম চাপ আমাদের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিপন্ন করবে।'

'আমাদের সংস্থার বয়স প্রায় বারোর ওপর। এর মধ্যে শতাধিক অভিনয় আমরা পরিবেশন করেছি করছিও। কর্মজীবনের সামান্যতম অবকাশে আমাদের আনন্দটুকু সীমিত রয়েছে নাট্যচর্চা ও অনুশীলনের মধ্যে। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করেও করপোরেশনের লাইসেনসের টাকা আমরা নিয়মিত দিয়েছি। আর পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সরকারের মতন কোনো সাহায্যের ব্যবস্থা করপোরেশন করেন নি, এমন কি শহরে রঙ্গগৃহের প্রচুর অভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা একটি মঞ্চ গড়ে আমাদের উৎসাহিত করেন নি। অথচ শিল্পকলার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি করার জন্য তাঁদের চেষ্টার কমতি নেই। যে করপোরেশন আমাদের সুখ দুঃখের ভাগী নয়, সংস্কৃতিকে রুদ্ধশ্বাস করাই যাঁদের উদ্দেশ্য তাকে ক্ষমা করাও আমাদের পক্ষে অপরাধ·····।' কালচারাল সেমিনার গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সমর মুখোপাধ্যায় এ মন্তব্য করেন।

ঠিক একই প্রশ্ন তোলেন অভ্যুদয়। এই সংস্থার পক্ষ থেকে শান্ত সান্যাল বলেন, 'আমাদের সংস্থার ১৭ বছরের ইতিহাসে লাইসেনস বাবদ কম টাকা আমরা দিই নি। করপোরেশন জল, শিক্ষা, পথ প্রভৃতি কর নিয়ে এ বিষয়ে শহরবাসীকে সুবিধা দিয়ে থাকেন। কিন্তু জানি না অভিনয়ের লাইসেনসের বাবদ গৃহীত বিশাল অর্থ কোথায় যায়? করপোরেশনের চেষ্টায় একটি ভাল নাট্য পাঠাগার গঠিত হয় নি, একটি মঞ্চও না—তবে কেন এই করের বোঝা? আমাদের উচিত বাড়তি কর তো নয়ই, এমন কি করপোরেশন যদি এর কৈফিয়ৎ না দেন তবে পুরনো লাইসেনস ফী দেওয়াও বন্ধ করতে হবে।

আনন্দম গোষ্ঠী ও দিশারী সংস্থার পক্ষ থেকে যথাক্রমে শিশির ভট্টাচার্য ও রমেন ঘোষ প্রায় একই কথা বলেছেন। 'নাটক ও নাট্যকলার উন্নতির জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বহু সংস্থাকে অর্থ সাহায্য করেন। পঃ বঙ্গ সরকার প্রমোদকর মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন রবীন্দ্র ভারতীর অনুমোদনে। উভয় সরকারই চান নাট্যশিল্প উন্নত হোক, এর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাক—অনুশীলনকর্মের সুবিধার জন্যে সরকার আরও কিছু ব্যবস্থা রেখেছেন। অথচ তারাই পাশা-পাশি করপোরেশনের কার্যক্রম নাট্য-শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। দৃঢ়কণ্ঠে আমরা এর প্রতিবাদ জানাই'—এ-কথা বলেছেন শিশির ভট্টাচার্য। রমেন ঘোষ বলেন, 'করপোরেশনের মূল নীতিটি কেবল নেওয়ার। আমার মনে আছে এক সময় বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর পক্ষ থেকে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল,



উপরে : ডানধারে 'গণশিল্পী সংস্থার' সম্মেলনে বক্তৃতারত উৎপল দত্ত ও উপবিষ্ট নির্মল ঘোষ ; বামপাশে বক্তৃতারত জ্ঞানেশ মুখার্জী। নীচে : সারা বাংলা নাট্যসম্মেলনে বক্তৃতারত সুনীল দত্ত ও রমেন লাহিড়ী।



উপরে : আমেরিকান রেফ্রিজারেটর রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত 'দমকল' নাটকের মহলার দৃশ্যে এস. কে. দাস, ইন্দিরা দে, এ. কে. দাস, এস. সি. গুপ্ত, এস. এন. সেনগুপ্ত, এম. এম. রায়, পি. চাকী, বীথি গাংগুলী এবং নাট্যকার পরিচালক শৈলেশ গুহ নিয়োগী। নীচে : থিয়েটার ইউনিট-এর নতুন নাটকের মহলায় অরবিন্দ ভট্টাচার্য, সমর ব্যানার্জী, প্রবীর বসু ও নির্দেশক শেখর চট্টোপাধ্যায়।

করপোরেশন যেন প্রতিটি বড় পার্কে একটি করে মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ স্থাপন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয়নি। নাট্যকলা ও সংস্কৃতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে করপোরেশনের কোন কার্যক্রম এমনকি দানও নেই। সকল নাট্যসংস্থার উচিত করপোরেশনের এই চাপকে অস্বীকার করা।'

এ্যামেচার ইউনিটের পক্ষ থেকে অমর ভট্টাচার্য বলেন, 'করপোরেশনের এই রায় নাট্য সংস্কৃতির প্রবল প্রতিবন্ধক। অর্থ কষ্ট আর প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে আমরা প্রায় মুমূর্ষু—এ সময়ে করপোরেশনের এই রায় আমাদের মাথার ওপর বজ্রপাতের মতন ফেটে পড়েছে। এর ফলে নাট্যপ্রবাহের ধারাটি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে।'

২১শে এপ্রিল ১৯৮৬ সালে আর একটি রিপোর্ট আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছিল সেটা এখানে ছেপে দেওয়া হলো।

গত ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টায় সারা বাংলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির এই প্রথম প্রতিনিধি সভা ৪৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীটস্থ 'বহুমুখী' নাট্য সম্প্রদায়ের মহলা ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন বিশিষ্ট নাট্য-সাংবাদিক বিজন দত্ত। সভায় প্রায় ৫০টি নাট্যদলের প্রতিনিধি ছাড়াও বহু নাট্যকার, শিল্পী, কলাকুশলী ও নাট্যমোদীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভার সূত্রপাতে সুনীল দত্ত কলকাতা করপোরেশনের এই বিমাতৃ-সুলভ মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'অপেশাদারী নাট্যদলগুলি দীর্ঘকাল ধরে আর্থিক অনটনের সঙ্গে লড়ছে। অথচ করপোরেশন নাট্য-সংস্কৃতির এই পথকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেবার ষড়যন্ত্রে মেতেছেন। আমরা যদি নীরবে এই অন্যায় জুলুম মেনে নিই, তবে ভবিষ্যতের কাছেও আমরা অন্যায় করব।' বহুমুখী সংস্থার নাট্যশিল্পী সুভাষ আচার্য বলেন, 'এখন প্রতিটি সংস্থার উচিত কেবল বাড়তি কর নয়, করপোরেশনের পূর্ব- নির্ধারিত কর দেওয়াও বন্ধ করা।'

নাট্য সংগ্রাম সমিতির অন্যতম আহ্বায়ক কিরণ মৈত্র বলেন, 'সমস্যাকীর্ণ জনজীবনের শেষ আনন্দের জমিটুকু কেড়ে নেবার অধিকার আমরা কাউকে দেব না।' এই সমিতির অন্যতম আহ্বায়ক ও বিশিষ্ট নাট্য-পরিচালক দীপক রায় তাঁর ভাষণে সংগ্রাম সমিতির সকল সদস্যকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'এই আন্দোলন সকল রকম রাজনীতি বর্জিত আন্দোলন। সুতরাং আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যে, কোনো সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক দলের প্রভাব যেন এর মধ্যে না পড়ে।'

সভায় বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে নাট্য-সংগ্রাম সমিতির এই কর্মসূচী সমর্থন করে বক্তৃতা করেন দেবকুমার ভট্টাচার্য (গন্ধর্ব), সজল ঘটক (প্রতিরূপ), নাট্যকার সুজিত সেন (আরোহী), শান্ত সান্যাল (অভ্যুদয়),শৈল চট্টোপাধ্যায় (আন্তরিক), নাট্যকার বসন্ত ভট্টাচার্য (কল্পতরু), লক্ষ্মীজনার্দন মুখোপাধ্যায় (মিতালী), বিমল সরকার (প্রতিভা), নাট্যকার অশোক সরকার, নাট্যকার বিমল রায়, নাট্যকার রমেন লাহিড়ী, জগন্নাথ ভট্টাচার্য (নট ও নাট্য) প্রভৃতি।

সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে ছিল, 'অবিলম্বে নাট্যাভিনয়ের ওপর সকলপ্রকার পৌর-কর আদায় বন্ধ করতে হবে' ও 'নাট্য-সংস্কৃতির বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য পৌরকর্তৃপক্ষের উদ্যোগে পারকে পারকে মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ নির্মাণ করে দিতে হবে।'

সভাপতি বিজন দত্ত তাঁর ভাষণে নাট্য-সংগ্রাম সমিতির কর্মসূচীর প্রশংসা করে বলেন, 'আগামী ২৯ এপ্রিল এই সমিতির নেতৃত্বে একটি মিছিল করপোরেশন কার্যালয়ে উপস্থিত হবে।'

২৬শে এপ্রিল আবার আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বিক্ষোভ মিছিলের সংবাদ প্রকাশিত হল।

নাট্যশিল্পী ও কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল

কলকাতা, ২৫শে এপ্রিল—সারা বাংলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির উদ্যোগে ২৯শে এপ্রিল নাট্যকার, শিল্পী ও নাট্যকর্মীগণ, মিছিল করে কর্পোরেশন ভবনে অভিযান করবেন।

কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষ অপেশাদার নাট্যাভিনয়ের উপর চল্লিশ টাকা হারে এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চের উপর বার্ষিক চারশ' টাকা হারে সম্প্রতি যে কর চাপিয়েছেন, তারই প্রতিবাদে সমিতির উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হবে।

পঞ্চাশাধিক নাট্য সংস্থার প্রতিনিধি ও নাট্যকারদের উপস্থিতিতে ২৩শে এপ্রিল এখানে অনুষ্ঠিত এক প্রতিনিধিমূলক সমাবেশে অভিযান, মিছিল এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নাট্যকার রমেন লাহিড়ী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২৮শে এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সারা বাংলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির বিজয় সংবাদ প্রকাশিত হল।

পৌর কর থেকে নাট্য সংস্থাদের অব্যাহতি

'নাট্যসংস্থাগুলির উপর থেকে পৌর কর তুলে নেওয়া হোক' : সারা বাঙলা নাট্যসংগ্রাম সমিতির এই দাবী কলকাতা করপোরেশন মেনে নিয়েছেন।

করপোরেশনের পক্ষ থেকে ফিনানস এ্যানড এসটাবলিশমেনট কমিটির চেয়ারম্যান গোবিন্দ দে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আগামী এক বৎসরের মধ্যে তারা একটি মুক্ত অঙ্গন নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে দেবেন। হিন্দ প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখস্থ করপোরেশনের মডেল স্কুলটি তুলে দিয়ে, সেখানে নাট্যমঞ্চটি গড়ে তোলা হবে।

নাট্যসংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে বুধবার বেলা তিনটায় কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী, সুনীল দত্ত ও দীপক রায় গোবিন্দ দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং স্থির হয় যে, রবীন্দ্রভারতী অনুমোদিত প্রমোদকরমুক্ত সংস্থাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে থিয়েটার লাইসেনস ফী থেকে মুক্তি দেওয়া হল। এবং যে সকল সংস্থা টিকিট বিক্রয় করে অভিনয় করেনা, পূর্ব নিয়মানুযায়ী তারাও এই লাইসেনস ফী থেকে মুক্ত।

অধ্যাপক অপরেশ ভট্টাচার্য এবং অনিল দেও এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন।

(পৌরকরের বিষয়টি সংবাদ সম্পাদকীয় ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সর্বপ্রথম আনন্দবাজার পত্রিকাতেই প্রাধান্য পায়।)

এই পৌর করের বিরুদ্ধে নাট্য সংকট প্রতিরোধ কমিটিও আন্দোলনে নেমেছিলেন। এই প্রসঙ্গে নাট্য সংগ্রাম সমিতির সঙ্গে একটা মত বিরোধও ঘটেছিল সেই সময়ে। ৬ইমে বসুমতী পত্রিকায় নাট্য সংকট প্রতিরোধ কমিটির একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়, আমি সেই বিবৃতিটি হুবহু ছেপে দিলাম।

নাট্য আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা

নাট্য সঙ্কট প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি মন্মথ রায় ও যুগ্ম আহ্বায়ক তাপস সেন ও সবিতাব্রত দত্ত নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন।

নাট্যাভিনয়ের উপর পৌরকর প্রত্যাহার সম্পর্কে সারা বাংলা নাট্য সংগ্রাম সমিতি গত ২রামে দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় যে বিবৃতি প্রকাশ করেছেন তার জবাবে আমরা জনসাধারণের কাছে কিছু তথ্য পেশ করছি।

নাট্যাভিনয়ের উপর পৌরকর গত ১লা এপ্রিল ১৯৬৬ সালে প্রবর্তিত হয়। সেইদিনই আমরা শ্রাম স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত নাট্য সম্মেলনে এই সমস্তা এবং নাট্য জগতের অন্যান্য সমস্তা দূর করার জন্য ৬০টি নাট্য সংস্থার প্রতিনিধিদের সভায় নাট্য সংকট প্রতিরোধ কমিটি গঠন করি। উক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে 'বহুরূপী, 'লিট্‌ল থিয়েটার', 'রূপকার', 'নান্দীকার', 'শোভনিক', 'চতুর্মুখ', 'চলাচল', 'ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ', 'গণনাট্য সঙ্ঘ' প্রভৃতি বাংলার সুপরিচিত নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলি আছে। ২রা এপ্রিল তারিখে এই কমিটির একটি প্রতিনিধি দল সবিতাব্রত দত্ত, কৃষ্ণ কুণ্ডু, বিমল গুপ্ত, শান্তনু ঘোষ ও তাপস সেন মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কমিটির পক্ষ থেকে অন্যায় কর ধার্যের প্রতিবাদ জানিয়ে আসেন এবং মেয়রও এই বিষয়ে অনুসন্ধান এবং বিবেচনার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের কমিটির সদস্য এবং করপোরেশনের কাউন্সিলার কৃষ্ণ কুণ্ডু কয়েকজন বিরোধী দলের কাউন্সিলার সহযোগে ১৯৬৫ সালের ২২শে ডিসেম্বর করপোরেশনে একটি প্রস্তাব আনেন যার দ্বারা নাট্যাভিনয়ের উপর পৌর কর কুড়ি টাকার পরিবর্তে আরো হ্রাস করার দাবী করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস শাসিত করপোরেশন সেই প্রস্তাব নাকচ করে বর্তমানের চল্লিশ টাকা কর ধার্য করে। যাহা হউক মেয়রের সঙ্গে দেখা করার পর ৫ই এপ্রিল দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে নাট্য সম্মেলনের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আমরা পৌরকর প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প করি। এই সঙ্কল্প অনুযায়ী আমরা যখন কর্মপদ্ধতি নিরূপণে ব্যস্ত ছিলাম তখন আনন্দবাজার পত্রিকার এক সংবাদে জানা যায় যে, ১২শে এপ্রিল সারা বাংলা নাট্য সংগ্রাম সমিতি গঠিত হয়েছে এবং এই সমিতি স্থির করেছেন, "নাট্যাভিনয়ের উপর সকল রকম পৌরকর তুলে দেবার জন্য তারা তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবেন। তবে এ আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে নীতিবর্জিত। নাট্যকলার স্বার্থ রক্ষাই হবে এর মূল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় প্রস্তাবে দাবী করা হয় পৌর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে পার্কে পার্কে মুক্তাঙ্গন প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয় নাট্যাভিনয়ের উপর পৌর কর খাতে আদায়ীকৃত সমগ্র টাকার হিসাব দিতে পৌর কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে" এবং চতুর্থ ও সর্বশেষ প্রস্তাবে বলা হয়, "যদি এই দাবীগুলি কলকাতা করপোরেশন মেনে না নেন তবে নাট্য সংগ্রাম সমিতি আগামী ২৯শে এপ্রিল একটি মিছিল সহ পৌর কার্যালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন।"

স্বভাবতঃই সংগ্রাম সমিতির এই দাবীগুলি আমরা আমাদের কমিটিতে আলোচনা ও অনুমোদন করি এবং ২৩শে এপ্রিল আমরা একটি পত্রযোগে সংগ্রাম সমিতিকে অভিনন্দন জানাই এবং ২৬শে এপ্রিল আমাদের কমিটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের একটি জনসভায় সংগ্রাম সমিতিকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাই। তদনুযায়ী সংগ্রাম সমিতির আহ্বায়ক কিরণ মৈত্র প্রমুখ সভায় আসেন। আমাদের কমিটির উদ্দেশ্যে লিখিত একটি পত্র সভায় পেশ করেন যাতে আমাদের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত উদ্যমের প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা এই যে, ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হতে না হতেই সংগ্রাম সমিতির নেতারা তাঁদের ঘোষিত পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত উদ্যমের প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করে ২৭শে এপ্রিল তারিখেই করপোরেশনের ফিনান্স কমিটির কংগ্রেসী চেয়ারম্যান গোবিন্দ দে-র সঙ্গে একক প্রতিষ্ঠানরূপে দেখা করেন এবং সম্মিলিত দাবীগুলির যে মৌখিক আপোষ রফা করেন এবং পরের দিন বিক্ষোভ মিছিলের পরিবর্তে মহাবোধি সোসাইটিতে যে বিজয় উৎসবের 'আনন্দ ঘোষণা' করেন তাতে আমরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ না হয়ে পারি নি। কারণ সংগ্রাম সমিতির কথায় ২৭ এপ্রিল আমরা সারাদিন ধরে তাঁদের আহূত মিছিল সফল করার জন্য সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন (বসুমতীতে ২৮শে এপ্রিল প্রকাশিত হয়), ইস্তাহার ছাপানো, ফেষ্টুন প্রভৃতি করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সংগ্রাম সমিতির নেতারা সংবাদপত্রে সংবাদ দেবার সময় পেলেন, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের বাড়ী টেলিফোন থাকা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার কোন চেষ্টা তারা করেন নি।

সংগ্রাম সমিতির ১৯শে এপ্রিল তারিখে সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। এখন জনসাধারণ বিচার ক'রে দেখবেন যে, সেই দাবীগুলি আদায় হয়েছে কি না। নাট্যাভিনয়ের উপর সকল প্রকার পৌর কর তুলে দেবার প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে। ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান মুখে জানিয়েছে যে কয়েকটি ধরণের প্রতিষ্ঠানকে এই বর্ধিত কর থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে। কিন্তু চল্লিশ টাকা কর আজও বর্তমান এবং আদায় করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ পার্কে পার্কে মুক্তাঙ্গনের বদলে হিন্দ সিনেমার সামনে মঞ্চ করার যে প্রতিশ্রুতি সংগ্রাম সমিতি আদায় করলেন বলে আনন্দ ঘোষণা করেছেন তা এত বাসি সংবাদ যে কোন ভদ্রলোকের পক্ষে তা নূতন বলে পরিবেশন করছে

লজ্জা পাওয়া উচিত। ১৯৬১ সালে কেশবচন্দ্র বসু যখন মেয়র ছিলেন তখন তিনি ওখানে রবীন্দ্র সরণী নামে একটি হল করবেন বলে প্রস্তর ভিত্তি স্থাপন করেন এবং আজ ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সেই ভিত্তি সেই অবস্থায় রয়েছে। তৃতীয় নাট্যাভিনয়ের উপর আদায়ীকৃত পৌরকরের হিসাব সম্পর্কে যে দাবী সংগ্রাম সমিতি করেছিলেন তার কি হল জনসাধারণ জানতে পারে কি? কাজেই জনসাধারণ বিচার করবেন সংগ্রাম সমিতি এই আপোষ রফাকে সংযুক্ত নাট্য আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে আমরা যে অভিযোগ এনেছি তা অন্যায় কি না।

এ ছাড়া আমরা নাট্য আন্দোলনকে গোষ্ঠী স্বার্থে এবং দলীয় রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত ক'রছি বলে যে অভিযোগ কিরণবাবুরা এনেছেন, তা ২৮শে এপ্রিলে কিরণদার প্রদত্ত পূর্বোক্ত চিঠিতে সেখানে তাঁরা আমাদের সহযোগিতা ও সম্মিলিত উদ্যমের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাতে নেই। তাই হঠাৎ গোষ্ঠী স্বার্থ, দলীয় রাজনীতি এবং দুটি পেশাদার মঞ্চের মালিকের যোগসাজসে কোথা থেকে আবিষ্কৃত হল তা জনসাধারণকে বোঝাতে হবে। সর্বশেষে এই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে পোষ্টারের উপর যে সকল কর ও বাধানিষেধ আছে তার কোন পরিবর্তন হয়নি। বর্তমান অবস্থায় দেওয়ালে পোষ্টার মারা বে-আইনী। করপোরেশন জুন-আন্দোলনের ভয়ে এই আইন কাজে লাগাতে সাহস করে না। তা ছাড়া পার্কে, পোলে, হোর্ডিং প্রভৃতিতে বিজ্ঞাপন দিতে হলে কমিশনারের অনুমতি কর এবং এডভার্টাইজিং কোম্পানীর মারফৎ কর দিতে হয়।

বাংলার নাট্য শিল্পীরা এতদিন দলমত নির্বিশেষে একযোগে প্রতিটি নাট্য সংকটে মোকাবিলা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে জয়ীও হয়েছেন। পঃ বঙ্গ সরকার এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষক কোন কোন প্রতিষ্ঠান শিল্পীদের এই ঐক্য পছন্দ করেন নি, বরং তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে শিল্পী সমাজকে হীনবল করতে চেয়েছেন। সারা বাংলা নাট্য সংগ্রাম সমিতি তাদের ২রা মে তারিখের বিবৃতিতে "একক আলোচনায় বসা এবং নিজ সিদ্ধান্ত মত চুক্তি করার" অধিকার ঘোষণা করে সেই বিভেদের পথ তৈরী করলেন এবং তার জন্য সরকার ও তাদের পৃষ্ঠপোষকগণ যে তাতে খুসী হয়েছেন তার প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা পুনরায় ঘোষণা করি যে নাট্য শিল্পের উন্নতির জন্য এবং

প্রতিক্রিয়ামূলক ষড়যন্ত্র দমনের জন্য শিল্পীদের ঐক্য নিতান্ত কাম্য। আমরা পৌরকরের বিরুদ্ধে আগামী ১৩ই তারিখে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বেলা ৪টায় সমবেত হয়ে যে মিছিল পৌরসভা ভবনে নিয়ে যাব আশা করি নাট্য সংগ্রাম সমিতি সাময়িক বিভেদ বিস্মৃত হয়ে সেই মিছিলে যোগ দেবেন। জনসাধারণের সঙ্গে আমরা তাঁদেরও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। দ্বিতীয়ত, ৯ই মে সকাল ৭-৩০ টায় আমরা ডি. এন. মিত্র স্কোয়ারে সমবেত হয়ে রবীন্দ্র সরণি স্বয়ংশাসিত জাতীয় নাট্যশালায় পরিণত করার দাবীতে একটি সমাবেশ ও মিছিল রবীন্দ্র সরণি অভিমুখে নিয়ে যাব। জনসাধারণের সঙ্গে আমরা নাট্য সংগ্রাম সমিতিকেও এই মিছিলে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আর এই বিবৃতির জবাবে ১৬ই মে বসুমতী পত্রিকায় নাট্য সংগ্রাম সমিতির একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয় সে লেখাটিও এখানে ছেপে দেওয়া হল।

নাট্যাভিনয়ের উপর পৌর কর বৃদ্ধি

প্রত্যাহার সম্পর্কে সংগ্রাম সমিতির বিবৃতি

সারা বাংলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির পক্ষ হইতে কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী ও দীপক রায় নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

আমাদের বিবৃতির জবাবে ৬ই মে তারিখের বসুমতী পত্রিকায় নাট্য সংকট প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদকের বিবৃতি আমরা পড়িয়াছি। বারংবার বিবৃতি প্রকাশ করিতে তাঁহাদের অপরিসীম উৎসাহের আমরা প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে, ১লা এপ্রিল তারিখে তথাকথিত সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান সমেত ৬০টি (আমরা তো জানিতাম ৩০টি। রাতারাতি দ্বিগুণিত হইল কি করিয়া)? সংস্থার উপস্থিতিতে গঠিত কমিটি ২৬শে এপ্রিলের আগে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে একটি সভা ডাকা ছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য কাজের নিদর্শন জনসমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিলেন না কেন?

তাহাদের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের কমিটির অন্যতম সভ্য জনৈক কংগ্রেসী কাউন্সিলার কর্পোরেশনের কাছে কুড়ি টাকার কম কর ধার্যের দাবী করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তাঁহাদের কমিটি কেবলমাত্র বর্ধিত কর হ্রাসের অর্থাৎ চল্লিশ টাকা হইতে কুড়ি টাকা করার দাবী তুলিলেন কেন? কর্পোরেশনের সঙ্গে ঐ কংগ্রেসী কাউন্সিলার মারফৎ কমিটির কি ইতিমধ্যে কোনও অতি যোগাযোগ ঘটিয়া গিয়াছিল? মেয়রের সঙ্গে আলোচনায়

যখন প্রতিরোধ কমিটি বসিয়াছিলেন, শ্রীদে'র সঙ্গেও আলোচনায় বসিতে নিশ্চয়ই তাঁহারা আপত্তি করিতেন না, কারণ পৌর কর প্রত্যাহার বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার অধিকার শ্রীদের আছে কি নাই সে কথা তাঁহারা ইতিপূর্বে অস্বীকার করিলেও বর্তমানে নিশ্চয়ই সে সংশয় তাঁহাদের আর নাই।

মিছিল আয়োজন করিবার জন্য প্রতিরোধ কমিটির অপেক্ষা আমাদের কিছু কম পরিশ্রম করিতে হইয়াছে না তাহা ভাবিবার কোনও দরকার নাই। তবু সুস্পষ্টভাবে একথা আমরা জানাইতে চাই যে, মিছিল ডাকিবার ও তাহা প্রত্যাহার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের ছিল এবং আছে। পার্কে পার্কে মুক্ত অঙ্গন মঞ্চের দাবী আমরা করিয়াছি এবং সেই দাবী কার্যকরীভাবে বিবেচনার আশ্বাসও আমরা পাইয়াছি। পেশাদার মঞ্চের অশোভন ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধে সংগ্রাম সমিতি যে আন্দোলনের আহ্বান জানাইয়াছেন, সেই সম্পর্কে প্রতিরোধ কমিটির নীরবতাই তাহার প্রমাণ দিতেছে।

পোষ্টার কর সম্পর্কে আমাদের দাবী সুস্পষ্ট। আমরা মনে করি, এই কর অন্যায়, অযৌক্তিক ও অগণতান্ত্রিক এবং এই কর রোধের জন্যে আমরা যে-কোনও আন্দোলনের সামিল হইতে ইচ্ছুক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকগণ যে আমাদের বিভেদে আনন্দিত হইতেছেন তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই বিভেদের জন্যে দায়ী কারা? গত বছর রবীন্দ্র সরণীর ব্যাপারে আন্দোলন করিয়াছিলেন নাট্য সম্মেলন নামক একটি সংস্থা। এখন একটা নতুন সংগঠন করা হইল কেন? গণশিল্পী সংস্থা নামে অপর একটি সংস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে কাহারা?

একথা আমরাও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে চাই যে, শিল্পীদের ঐক্য আজ অপরিহার্য। একটু খোলা মনে খোলা চোখে অগ্রসর হইতে পারিলে আমরা অনায়াসেই একটি মিলনের ক্ষেত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। কিন্তু একই নিঃশ্বাসে আমরা ঐক্য ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলিতে পারি কি? তবে ঐক্যর প্রয়োজনেই আমরা আর প্রকাশ্য বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাই না এবং একে অপরের প্রতি দোষারোপ করা হইতে আমরা নিবৃত্ত হইব।

পরিশেষে প্রতিরোধ কমিটি ও অন্য সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, পৌর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পৌর-কর প্রত্যাহার সম্পর্কে যে চুক্তি আমাদের হইয়াছে তাহা ১লা মে, ১৯৬৬ হইতে কার্যকরী হওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি আমরা পাইয়াছি।

মৌসুমী

১৯৬৬ সাল, বাগবাজারের কিছু উৎসাহী নাট্যামোদীদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে 'মৌসুমী' গ্রুপ। সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থার জন্ম লগ্নের প্রেরণায়ই মৌসুমীর আত্মপ্রকাশ। উৎপল দত্তের 'কাকদ্বীপের এক মা' দিয়ে এঁরা যাত্রা শুরু করলেন। পরবর্তীকালের কয়েকটা বছর রাজনৈতিক টানা পোড়েনের ভিতর দিয়ে চলবার পর ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে এঁরা নতুন করে সংস্থাটি সাজালেন। উক্ত বছরই নাট্যকার স্বপন সেনগুপ্ত স্থায়ীভাগে যোগদান করলেন। এঁরা ওঁরই লেখা 'যাত্রাবদল' দিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাটকের যাত্রা শুরু করলেন। প্রথম অভিনয় করেন ১৯৬৯ সনের ১৬ই এপ্রিল মিনার্ভা মঞ্চে। আমার যতদূর মনে হয় এটাই বোধহয় প্রথম নাটক যে নাটকে 'শ্রমিক-কৃষক' যৌথ সংগ্রামী ঐক্যের উপর লিখিত হয়। 'যাত্রাবদল' সাফল্য এনে দিলো, গ্রাম নগরে একের পর এক 'শো' করলেন এঁরা। মৌসুমী প্রমাণ করলেন নাট্য আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে। বর্দ্ধমানের একটা শো-র কথা মনে আজও হয়, শিল্পীরা অভিনয় করতে গেছেন। কৃষক অঞ্চল, নাটক শুরু হতে বেশ একটু দেরী হওয়া সত্ত্বেও প্রায় সাত হাজার দর্শকের সামনে শুরু হলো 'যাত্রাবদল'। প্রতি মুহূর্তে দর্শক কখনো ক্রোধে কখনো উল্লাসে ফেটে পড়ছে, শেষ দৃশ্যর অভিনয় শেষ হতেই উচ্ছল জনতা বাঁধ ভাঙা জলের মতো মঞ্চের ভিতরে উঠে এসে শিল্পীদের জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করলেন। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! সেদিনের শিল্পীদের ভেতর ছিলেন—সলিল চ্যাটার্জী, দিলীপ মাঝি, গোরা ঘোষ, উৎপল ঘোষ, স্বপন সেনগুপ্ত, মঞ্জুলা দাস, দীপিকা ভট্টাচার্য, তরুণ ঘোষ, কৃষ্ণ দাস, শম্ভু মিত্র, পার্থ চৌধুরী, সুবোধ রায়, রতন সাহা প্রভৃতি বহু শিল্পী। পরবর্তীকালে এঁরা অভিনয় করেন, স্বপন সেনগুপ্তের 'হিরো' নাটকটি। বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পটভূমিকার উপর রচিত বর্তমান নাটকটি। আজকের নাট্য আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে লেনিন জন্ম শত-বার্ষিকীতে একটি নাট্য পুস্তিকায় স্বপন সেনগুপ্ত যা বলেছেন—মৌসুমী গ্রুপের স্যুভেনির থেকে সেই লেখাটি উল্লেখ করছি বর্তমান নাট্য আন্দোলন সম্বন্ধে।

আজকের নাট্যআন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকা

গত চল্লিশোত্তরে যে বাস্তববাদী নাট্য আন্দোলনের যুগ শুরু হয়েছিল এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে যে নাটক আজ মানুষের জীবন ও জীবিকার

প্রশ্নে, শতকরা পঁচানব্বইজন মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে, শোষণ-শাসন, পীড়ন-নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সুস্থ সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে কাজ করে চলেছে—এর যদি বাস্তব বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, ইদানীং কালের নাট্যানুশীলনের ক্ষেত্রে যা কিছু সার্থকতা তা সবটাই দিয়েছে এইসব অপেশাদার নাট্যদলগুলি।

গণনাট্য আন্দোলন অর্থাৎ চল্লিশ দশকের আগে পেশাদারী নাট্যশালায় যে সব নাটক অভিনীত হত সেগুলো ছিল নেহাৎই প্যাতপেতে একঘেয়ে। নাটকগুলোর ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল আদর্শে বলিষ্ঠ, জীবন দর্শনে সুস্থ যে নাটকটি তার নাম—'নবান্ন'। নাট্য আন্দোলনের প্রথম মাইল ষ্টোন বলা যেতে পারে। সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য্য রচিত এবং গণনাট্য সঙ্ঘ প্রযোজিত নবান্নর জন্ম চল্লিশ দশকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী নিষ্পেষিত বাংলাদেশে প্রযোজনা, দৃশ্যসজ্জা, আলোক-নিয়ন্ত্রণ, যৌথ অভিনয় এবং ভাবনা চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত এনে দিলেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য্য এবং গণনাট্য সঙ্ঘ। আজ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে দেখতে পাই সেদিন যারা গণনাট্য আন্দোলন করেছিলেন, তাদের ভিতর অনেকেই আজ দল-ছুট্। অনেককেই আজ দেখতে পাই গণনাট্য আন্দোলনের মঞ্চ থেকে সরাসরি টালিগঞ্জের ষ্টুডিও পাড়ায় সেলুলয়েডের ফ্রেমে তাদের শিল্পী-জীবনের সার্থকতাকে খুঁজে পেয়েছেন। যে সেলুলয়েডের ফ্রেমে জীবন নামক বস্তুটি সব সময়ে অনুপস্থিত। কিন্তু এতে কি নাট্য আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়েছে? আমি বলব, না, হয়নি। উত্তরোত্তর গণনাট্য আন্দোলনের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। আজকের গণনাট্যের পতাকার তলে চওড়া কাঁধের বহুজন জমায়েত হয়েছেন। নাট্যরচনা, প্রযোজনা এবং অভিনয় ক্ষেত্রে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছেন।

এ কথা ভুললে চলবে না যে, শাসকশ্রেণী আজ এক গভীর সংকটে নিমজ্জিত হবার সাথে সাথে যেমন তার আক্রমণকে জনগণের বিরুদ্ধে নগ্ন করে তুলেছে তেমনি আজ অপ-সংস্কৃতিকে বেশি করে জনগণের সামনে তুলে ধরবার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই গণনাট্যের প্রতিটি কর্মীর কাছে আজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে এটাই উপস্থিত হয়েছে, আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিষয়গুলিকে জনগণের মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গণনাট্যের যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে সেটা আরো বেশি করে উপলব্ধি করতে হবে এবং

জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঘনিষ্ঠ সাথী হিসেবে গণনাট্য কর্মীদের দ্বিধাহীনভাবে কাজ করে যেতে হবে।

আজ যারা শিল্পসংস্কৃতির নামে একদিকে যেমন সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বীভৎস চিত্র তুলে ধরছে, অপরদিকে কুৎসিত যৌন উত্তেজনা ও নিম্নস্তরের পশু-প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলবার চেষ্টায় মগ্ন, তাদের হটানোর ব্যাপারটা গোটা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টার সাথে জড়িত বলেই আমার বিশ্বাস।

নাট্য আন্দোলনে মাস থিয়েটার্স

১৯৬৬ সাল ১লা মে, মুক্তাঙ্গনে একটি নাটক দেখতে গেলাম। নাটকের নাম 'এরিনা', নাট্যকার পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। সার্কাস পার্টিতে যারা কাজ করে তারাও যে শিল্পী, তাদেরও মধ্যে যে আছে ব্যথা-বেদনা, আশা-নিরাশা, প্রেম-ভালবাসা একথা আমরা জানতুম না, আমরা জানতুম না তারও প্রয়োজনে এক হয়, প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। সেই ছন্নছাড়া মানুষগুলোকে মঞ্চে দেখতে পেয়ে ভাল লাগল। মাস থিয়েটার্স-এর অভিনয় আগে কখনো দেখিনি। ঐ দিন জানা গেল ১৯৬০ সালে অসিত রায়চৌধুরীর 'কাঁচঘর' নাটকের মাধ্যমে এদের প্রথম আত্মপ্রকাশ হয়। এই গ্রুপের নির্দেশক যিনি, তিনি গণনাট্য সঙ্ঘের রাহুমুক্তর-রাজা, সংক্রান্তির-রতন, নীলদর্পণের-তোরাপ অভিনয় করে খ্যাতির চূড়ায় উঠেছেন সেই বিখ্যাত অভিনেতা পরিচালক জ্ঞানেশ মুখার্জী। ৬৭ সালে রঙ্গসভা আয়োজিত শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজনা বলে বিবেচিত হয়েছে মাস থিয়েটার্স-এরই 'এরিনা'। নাটকটি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রায় ৬০ রাত্রি অভিনীত হয় এই নাটক।

ইতিমধ্যে ওরা ইবসেনের হেডা গ্যাবলার অবলম্বনে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শকুন্তলা রায়' অভিনয় করেন। ৬১ সালে গতানুগতিক প্রথা ছাড়িয়ে ব্রেকটের পদ্ধতি অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' প্রায় ৫৩ রাত্রি অভিনয় করেন। ৬২ সালে নিকোলাই গগলের অবলম্বনে প্রমথনাথ বিশীর 'গভর্মেণ্ট ইন্‌সপেক্টর' প্রযোজিত হয়। উচ্চ হাস্যরসের মাধ্যমে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। প্রায় ২০০ রজনী এই নাটক অভিনীত হয়েছে। ৬৩ সালে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'চার প্রহর' ৬৩ বার বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়। ৬৪ সালে

দুটি একাংক সৌমেন মিত্রের 'কেবলই ছবি পটে লিখা' ও অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিষণ্ণ প্রহসন' অভিনয় করেন।

১৯৬৫ একটু পেছিয়ে গিয়ে নতুন ভঙ্গীতে পুরোন নাটক মঞ্চস্থ করলেন। জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত'কে গ্রীক পর্য্যায়কে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে প্রায় ১১ বার মঞ্চস্থ করেছেন। ৬৬ সালে এসে আবার রবীন্দ্রনাথের হাসির নাটক 'শেষরক্ষা' অভিনয় করলেন। পরিচালনায় ছিলেন মিঠু ভট্টাচার্য। ৬৭ সালে গোর্কীর বৈপ্লবিক গল্প অবলম্বনে 'সূর্য চেতনা' রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ বছরেই মনোজ মিত্রর 'ব্যাধি', মিঠু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনয় করেন।

১৯৬৯ সালে গোর্কীর বিপ্লবী উপন্যাস অবলম্বনে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মা', এবং উৎপল দত্তর 'মে দিবস' এই নাটক দুটি জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় অভিনীত হয়! এই নাটক এরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রায় ১৫৭ রাত্রি অভিনয় করেন। ৭১ এ এসে রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি', বীরু মুখোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ অভিনয় করেন। এই বৎসরে উৎপল দত্তর 'ইতিহাসের কাঠগড়ায়', মিঠু ভট্টাচার্যর পরিচালনায় হয় ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গাত্মক নাটক 'বুমেরাং' মঞ্চস্থ করেন।

১৯৭২ সাল। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাস থিয়েটার্স অভিনয় শুরু করেছেন। যে নাটক দিয়ে সাধারণ নাট্যশালা হয়েছিল সেই মহান নাটক দীনবন্ধু মিত্রর 'নীলদর্পণ'। ওরা আরো প্রস্তুত করছেন গিরীশ ঘোষের 'বলিদান', ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ',।

মাস থিয়েটার্স-এ বিভিন্ন সময়ে যারা অভিনয় করেন :—জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সিধু ভট্টাচার্য, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সনাতন ঘোষ, নরসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন সেনগুপ্ত, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, অনিমেশ চক্রবর্তী, বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রবর্তী, রঞ্জিত রায়, গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, সোমনাথ সরকার, সিতাংশু চক্রবর্তী, সূর্য সামন্ত, আর্য রায়চৌধুরী, ফনী দাস, মীনা জানা, শুক্লা দাস, দীপিকা দাস, শমিতা বিশ্বাস, গীতা সেন, আইতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা সমাদ্দার, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাধা রায়, কল্যানী অধিকারী, শ্যামলী চক্রবর্তী। সঙ্গীতে—অমল মুখোপাধ্যায়। মঞ্চ—সিধু ভট্টচার্য্য। আলো—তাপস সেন। শব্দ—আর্য রায়চৌধুরী। রূপসজ্জা—মনোতোষ রায়।

স্পন্দন

১৯৬৬ সাল, নাট্যজগতে 'স্পন্দন' একটি উল্লেখযোগ্য নাম। নাট্যসংস্থা হিসেবে খুব বেশী দিন আত্মপ্রকাশ করেনি কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বহু নাট্যামোদীর মন কেড়ে নিয়েছে।

১৯৬৬ সালের মে মাসে 'স্পন্দন' ভূমিষ্ঠ হয়েছে, বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়েই সে প্রতিষ্ঠিত। নাট্যসংস্থাটির গঠনের নেপথ্যে যার নিরলস ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস তিনি হলেন 'স্পন্দনের' প্রতিষ্ঠাতা ও তরুণ পরিচালক অজিত কৃষ্ণ সরকার। বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি এ প্রসঙ্গে আর একজনের নাম না করা হয়। ইনি হলেন মণ্টু ভট্টাচার্য্য। ওঁর উপদেশে সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার সংস্থাটির উন্নয়নে প্রভূত সাহায্য করেছে। সন্তোষ কুমার মিত্রের নাম এবং স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করছি। 'স্পন্দন'-এর মঞ্চসফল নাটকের মধ্যে যেগুলো উল্লেখ করবার দাবী রাখে সেগুলো হচ্ছে 'রামবাবু শহীদ হলেন,' 'নির্বাসিত হৃদয়', 'ব্ল্যাক আউট', 'সাইরেন'এবং 'মুক্তির সূর্য্য'।

'রাম বাবু শহীদ হলেন' এবং 'মুক্তির সূর্য্য' অজিতবাবুর লেখা, 'নির্বাসিত হৃদয়', 'ব্ল্যাক আউট' এবং 'সাইরেন', মণ্টু ভট্টাচার্য্যের লেখা। উক্ত সব নাটকগুলিই অজিতবাবু পরিচালনা করেন। নাটকগুলি কলকাতা, হাওড়া, চন্দননগর ও শ্রীরামপুরের বিভিন্ন মঞ্চে প্রদর্শিত হয়। এইসব নাটকে যারা কুশীলব ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার মিত্র, বিশ্বনাথ কর, নেপাল পাল, গৌরীশঙ্কর রায়, সীতারাম ধর, অরুণাভ গুহ, রতন কুমার দাস, সুভাষ রাহুত, পরেশ রায়, গায়ত্রী সরকার, চন্দনা চ্যাটার্জী, এবং রীতা ব্যানার্জী।

রাজাসাজা

১৯৬৬ সাল, দেশে চলছে ব্ল্যাক আউট। যুদ্ধের জন্যে সমস্ত কিছু প্রায় অচল হয়ে আছে। সন্ধ্যের পর কেউ বেরোতে চায়না, তাই রঙ্গমঞ্চগুলোতে দর্শক আসেনা। সব যখন অচল নিস্তব্ধ প্রায় সেই সময়ে একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল, মুক্তাঙ্গনে 'রাজাসাজা'র, তিনটি একাংক অভিনয় হবে। দর্শক হাঁপ ছেড়ে

বাঁচল। শিল্পীরাও তথৈবচ। প্রবীর মুখোপাধ্যায়ের তিনটি একাঙ্ক 'বাঁশী', 'কু-ঝট-পট-ঝটিকা', 'প্রেম একটি কবিতা' তিনটে ভিন্ন স্বাদের নাটক ভালই লাগল। অনেক দিন পরে বলেই আরো ভাল লাগল বোধ হয়। এই দিন বুঝলাম যারা নাটক দেখে বা অভিনয় করে তারা নাটক ছাড়া থাকতে পারে না। সে যুদ্ধই হোক বা তাণ্ডবই হোক।

এরপর এরা একটু পেছিয়ে গেল। রসরাজ অমৃত লালের 'নব যৌবন' অভিনয়ের প্রস্তুতি চলল। অন্ধকারে দলের ভাঙনও শুরু হল। গ্রুপ ছেড়ে অনেকে চলে গেল। তাই ২ বছর আর অভিনয় সম্ভব হলনা। তবে ওরা দমে যায়নি। ৬৮ সালে প্রবীর মুখোপাধ্যায়ের 'দীপান্বিতা', নাটক নিয়ে নতুন নতুন শিল্পী যোগাড় করে নতুনভাবে সংগঠন তৈরী করে 'দীপান্বিতা'র যে আলো জ্বালল ওরা আজও সে আলো নেভেনি।

এর পর বেশ কয়েকটি ছোট বড় নাটক মঞ্চস্থ করলেন। একই নাট্যকারের 'বিষণ্ণ নায়ক', 'এখানে অরণ্য তোমায় ভালবাসি', 'আলো এসেছে' ও 'হেনরী' অবলম্বনে মিনি নাটক 'তিলোত্তমা', 'নতুন অধ্যায়', চণ্ডী সেন গুপ্তর 'মৃত জনে দেহ প্রাণ', 'অন্ধ জনে দেহ আলো'। ওরা কিন্তু অমৃতলালকে ছাড়ল না। যখন ওদের আবার নবযৌবন ফিরে এলো তখনই অভিনয় শুরু করল 'নব যৌবন'।

রাজাসাজার বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেছিলেন ও এখনও করছেন— তাঁদের মধ্যে প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবদাস মুখোপাধ্যায়, দীলিপ সাহা, সনত মুন্সী, কালী চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন কুণ্ডু, গৌর সোম, বিবেক সেনগুপ্ত, ছবি তালুকদার, বিথি গঙ্গোপাধ্যায়, মমতা রায়, মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা বসু, শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়, সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়, বুলা সেনগুপ্তা, শতাব্দী বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত নন্দন, অনিল পাল, বেবী মুখোপাধ্যায়, চায়না পাল, মাধবী সরকার প্রভৃতি। এখনও যারা আছেন প্রবীর মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ ঘোষ, দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, প্রভাত চক্রবর্তী, বিলীন দাস, শ্যামানন্দ দাশগুপ্ত, শিশির দাস, প্রবীর চক্রবর্তী, সাধন রায়, ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিত গাঙ্গুলী, সুবীর দাসগুপ্ত, অতনু মিত্র, সুশীল দাস, অজয় ঘোষ, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, স্বপ্না মুখার্জী (১ম), করুণা সিনহা, স্বপ্না মুখোপাধ্যায় (২য়), কুশল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। নির্দেশনায় প্রবীর মুখোপাধ্যায়।

জাতীয় নাট্যশালা ও রবীন্দ্র সদনের দরজা খোলা

১৯৬৬ সাল, জাতীয় নাট্য শালার দাবীতে শিল্পী সাহিত্যিকরা পথে নামলেন। এ প্রসঙ্গে একটি প্রচার পত্র সেই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল আমি সেই প্রচার পত্রটি হুবহু ছেপে দিলুম। সেই সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় ১০ই মে ১৯৬৬ সালে একটি সংবাদ ছাপা হয়েছিল সেটাও এখানে ছাপা হল।

জাতীয় নাট্যশালার দাবী

গত ২৫শে বৈশাখের রবীন্দ্র স্মরণীর উদ্বোধন শুধুই লোক দেখান আমলাতান্ত্রিক অনুষ্ঠান ?

গত ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবে রবীন্দ্র সরণীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন জহরলাল নেহেরু। উদ্যোক্তা ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে রবীন্দ্র সরণী এক বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে শতবার্ষিকী উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করবে। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একথাও ঘোষণা করেছিলেন যে রবীন্দ্র সরণী জাতীয় নাট্যশালা হয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর বহুকালের আশা ও স্বপ্ন সার্থক করবে।

১৯৬১ সন থেকে ১৯৬৪ সন পর্য্যন্ত রবীন্দ্র সরণী নির্মাণ কার্য্য অসম্পূর্ণ ছিল। যখন ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে রবীন্দ্রস্মৃতি সৌধের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে তখনো কবিগুরুর নিজ জন্ম নগরীতে রবীন্দ্র সরণীর নির্মাণ কার্য্য উপেক্ষিত হওয়ায় দলমত নির্বিশেষে বাংলার শিল্পীদল বিক্ষুব্ধ হল এবং ১৯৬৫ সালে রবীন্দ্র জন্মদিবসে এক বিরাট শোভাযাত্রা করে অসমাপ্ত রবীন্দ্র সরণীর প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠান করবার জন্য সরকারের কাছে অনুমতি দাবী করেন। সরকার সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় শিল্পীগণ এবং এক বিরাট জনতা রবীন্দ্র স্মরণীর সম্মুখস্থ পথে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করেন এবং রবীন্দ্র সরণীর নির্মান কার্য্য ত্বরান্বিত করে অবিলম্বে দ্বারোদ্‌ঘাটন দাবী করেন। সরকার জনমতের চাপে তখন ঘোষণা করেন যে এই বৎসর অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে রবীন্দ্র জন্মদিবসে এই স্মৃতিসৌধের দ্বারোদ্‌ঘাটন অবশ্যই হবে।

তা অবশ্য হয়েছে। কিন্তু এই দ্বারোদ্‌ঘাটন এখন বোঝা যাচ্ছে সম্পূর্ণ লোক দেখান আমলাতান্ত্রিক ব্যাপার। কারণ দ্বারোদ্‌ঘাটন করেই সরকার পুনরায়

দ্বার বন্ধ করেছেন। তাছাড়া রবীন্দ্র সরণীকে জাতীয় নাট্যশালারূপে ঘোষণা করে তার পরিচালনার ভার একটি নির্বাচিত স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে সমর্পণ করার জন্য সরকারের নিকট দলমত নির্বিশেষে শিল্পীদলের যে দাবী ছিল সে সম্পর্কে সরকার এখন পর্য্যন্ত নির্বিকার রয়েছেন। উপরন্তু গত রবীন্দ্র-জয়ন্তী দিবসে এই দাবী-পত্র নিয়ে বিরাট এক শিল্পীদল রবীন্দ্র সরণী প্রাঙ্গণে উদ্বোধক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা করে ও সরকারী নির্দ্দেশে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। শুধু তাই নয় বিরাট এক জনতা ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত রবীন্দ্র সরণী স্মৃতিসৌধ দর্শনের জন্য সেখানে সমবেত হলে পুলিশ তাদের উপর লাঠিচার্জ করে এবং এই লাঠিচার্জ হয় তখন যখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রবীন্দ্র সরণীর অভ্যন্তরে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এ সম্পর্কে আর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে বাংলার শিল্পীদের সঙ্গে কোন সংযোগ না রাখায় ইতিমধ্যে রবীন্দ্র সরণীর মঞ্চস্থাপত্য এবং প্রাচীরচিত্র রচনায় যে কারুকর্ম প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে তা শিল্পী মহলে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। আমরা দাবী করে এসেছি এবং আজও করছি, যে রেজেষ্টারীকৃত নাট্য, নৃত্য ও সঙ্গীত সংস্থাগুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা এই জাতীয় নাট্যশালার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং পরিচালন নীতি নির্মিত হোক। পরিচালক মণ্ডলীতে নাটক, নৃত্য ও সঙ্গীতের দেশবিখ্যাত প্রতিভাধারীদেরও সদস্য নির্বাচন করা হোক।

সরকার সমগ্র দেশের আস্থাভাজন নির্বাচিত সংস্থার হাতে জাতীয় নাট্যশালা পরিচালনা ভার ন্যস্ত করে জাতীয় নাট্যশালার আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ করুন। একমাত্র audit করা ভিন্ন সরকারের এ সম্পর্কে আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। দেশের শিল্পমানসের উপর এই আস্থা সরকারের নিকট দেশবাসী অবশ্যই দাবী করতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে সম্প্রতি বিশ্বরূপা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ৮ম বঙ্গনাট্য সম্মেলনে ডঃ সুকুমার সেনের সভাপতিত্বে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। শিল্পসর্বজনীন। সরকার কোন একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি মাত্র। শিল্পের বিকাশ এবং উন্নতি কোন একটি রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে দলমত নির্বিশেষে অব্যাহত থাক আমাদের এই কামনা এবং দাবী।

মন্মথ রায়, ডঃ ত্রিগুণা সেন, সত্যজিৎ রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ও. সি.

গাঙ্গুলী, বিষ্ণু দে, শৈবাল গুপ্ত, ডাঃ নীহার মুন্সী, উৎপল দত্ত, সরযু দেবী, সুচিত্রা মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত, চারুপ্রকাশ ঘোষ, অহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, নির্মল চৌধুরী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেশ দত্ত, দ্বিজেন চৌধুরী, সুব্রত সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, গীতা দে, শেখর চট্টোপাধ্যায় নীলিমা দাস, সুভাষ মুখার্জী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, সময় সেন, দক্ষিণা রঞ্জন বসু, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, জোছন দস্তিদার, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, হাবুল দাস, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, কৃষ্ণ কুণ্ডু, সুশীল সিংহ, অসীম চক্রবর্তী, বরুণ দাশগুপ্ত, জ্যোতি ভট্টাচার্য, ডাঃ মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস, কালী ব্যানার্জী, রবি ঘোষ, তাপস সেন।

বিক্ষোভ : প্রতিবাদ/সংঘর্ষ

এইদিন রবীন্দ্র সরণীকে জাতীয় নাট্যশালা হিসাবে ঘোষণার দাবীতে নাট্য সংকট প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা এক বিক্ষোভ মিছিল বার করে রবীন্দ্র সরণীর দিকে অগ্রসর হন। সরণীর সম্মুখে আচার্য জগদীশ বসু রোড ও হরিশ মুখার্জী রোডের মোড়ে পুলিশ তাঁদের পথরোধ করে। বিক্ষোভকারীরা সেখানে বসে পড়েন। বৃষ্টি উপেক্ষা করে সেখানে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁরা সেখানে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে থাকেন ও রবীন্দ্র সরণীর অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা করেন।

এঁরা আরো দাবী করেন, সরণী উদ্বোধনের আগে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের প্রতিনিধিদের দেখা করতে দিতে হবে। কিন্তু তাঁদের সে দাবী গ্রাহ্য হয় না।

অপর দিকে উদ্বোধন অনুষ্ঠান চলাকালে এক বিরাট জনতা পুলিশ বেষ্টনী ভেঙ্গে ভবনের ভিতর ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে।

জনতার অভিযোগ, পুলিশ লাঠি চার্জ করে। সংঘর্ষের সময় একজনের চশমা ভেঙে যায়। কয়েকজনের সামান্য চোট লাগে। পুলিশ দ্রুত অবস্থা আয়ত্তে আনে।

নাট্য সংকট প্রতিরোধ কমিটির বক্তব্য

নাট্য সংকট প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রবীন্দ্র সরণীর ঘটনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন :—

'রবীন্দ্র সরণীর' দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তার পৃষ্ঠপোষকবর্গ শিল্পীদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের প্রতি যে আচরণ করেছেন তা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি চরম অপমানকর। কারণ এই মিছিলটি ছিল কলকাতার প্রায় সব কটি খ্যাতনামা নাট্য ও যুব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের মিছিল। মিছিল যখন হরিশ মুখার্জী ও সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে এল তখন এক বিরাট পুলিশ বাহিনী এই মিছিলের গতিরোধ করে দাঁড়ায়। আমরাও পুলিশকে জানাই যে এখানে ১৪৪ ধারা জারি নেই বা আমরা রবীন্দ্র সরণী বে-আইনীভাবে দখল করতেও যাচ্ছি না। আমরা উদ্বোধক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একটি দাবী পেশ করতে যাচ্ছি এবং সেখানে আমাদের এই মিছিলের সকলের স্থান না হলে আমরা একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই। এই প্রসঙ্গে জনসাধারণকে জানানো দরকার, যে আমদের মিছিলে এমন সব নাট্যকার প্রযোজক ও অভিনেতা ছিলেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের এবং অন্যান্য নাট্যকারের নাটক অভিনয় করে বাংলার জন্য সুনাম অর্জন করেছেন, কিন্তু তাঁরা আজকের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সরকারী আমন্ত্রণ পাননি। যাই হোক পুলিশ আমাদের বক্তব্য যথাস্থানে পৌছে দেওয়ার জন্য ভিতরে লোক পাঠান। আর ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল যে, আর একদল পুলিশ মিছিলের পূর্বদিকের জনতার ওপর লাঠিচার্জ করতে আরম্ভ করার ফলে কয়েকজন আহত হলেন এবং উপস্থিত জনতার মধ্যে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হল। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পূর্বেই এই লাঠিচার্জ এবং তার আগে বোমা ফাটানোর উদ্দেশ্য যে মিছিলটি নষ্ট করা, একথা উপস্থিত জনসাধারণকে আমরা বোঝাতে সমর্থ হই, তখন তাঁরা অসীম ধৈর্য, সাহস ও একতার সঙ্গে পুলিশের উদ্যত লাঠির সামনে শান্তিপূর্ণভাবে বসে পড়েন এবং রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে থাকেন। ইতিমধ্যে পুলিশের লোক এসে আমাদের জানান যে, আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় দিয়েছেন। সমবেত শিল্পী ও জনতা সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

গন্ধর্ব থেকে নক্ষত্র

১৯৬৬ সালে জন্ম নিল আর একটি গ্রুপ থিয়েটার। নাম নক্ষত্র, মহাকাশের দিকে তাকালে আমরা যেমন জানতে পারি অনেক গ্রহ নক্ষত্রের পরিচয়, নাট্য জগতেও তেমনি একটি নক্ষত্রের আবির্ভাব হল। ৮ই নভেম্বর রঙমহল

মঞ্চে সকালে মনোজ মিত্রের 'নীল কণ্ঠের বিষ' নিয়ে এলেন ওরা। এই গ্রুপের প্রধান উদ্যোক্তা বলা যায় শ্যামল ঘোষ। ইনি আগে গন্ধর্ব গোষ্ঠীতে ছিলেন। মত পার্থক্যর ফলে উনি গন্ধর্ব থেকে চলে এসে, আর এক নক্ষত্রের আবিষ্কার করলেন। এই গ্রুপ সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে ১৯৭০ সালের একটা স্যুভেনিরে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের একটি লেখা আমি উল্লেখ করছি।

আমার গ্রুপ থিয়েটার

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

যাঁরা থিয়েটার ভালোবাসেন, তাঁদের অনেকের মতো আমিও একটা 'গ্রুপ' গড়বার কথা ভাবি। আমার সেই গ্রুপ থিয়েটারে অভিনেতারা আসেন, নির্দেশক এসে দাঁড়ান, সহযোগী কলাকুশলীদের আন্তরিক কয়েকটি মুখ ভেসে ওঠে। এঁরা আমার বন্ধু, এঁদের নিয়ে আমার গ্রুপ থিয়েটার। অদূরে অসংখ্য দর্শক। তাঁদের ভালোবাসায় আমাদের আনন্দ, তাঁদের সমর্থনে আমাদের প্রত্যয়, তাঁদের চিত্তের উদ্বোধনে আমাদের সার্থকতা। সবাইকে নিয়ে একটি একান্নবর্তী সংসার।

আমি জানি, আমাদের এই থিয়েটারের মিলিত সংসারে অনটনের অভাব নেই। মঞ্চ পাব না, অর্থও নেই, মহিলা শিল্পী প্রায় দুর্লভ, টিকেট বিক্রীতে কুলোয় না। কিন্তু আশ্চর্য, কয়েকজন তরুণ এ সব কিছু উপেক্ষা ক'রে কোন্ এক গভীর পিপাসায়, অদম্য কোন্ ইচ্ছার আলোড়নে গ্রুপের ঘরে রোজ এসে মিলিত হয়। ব্যক্তিগত প্রয়োজন, পারিবারিক কর্তব্য, সন্ধ্যার পরে শহরের আড্ড', সব কিছুর মধ্যে কষ্টসাধ্য আপোস ক'রে অথবা উপেক্ষা জানিয়ে এঁরা থিয়েটার করতে আসেন। না এসে উপায় নেই, কারণ এঁরা থিয়েটার ভালোবাসেন। থিয়েটার এঁদের সঙ্গী। থিয়েটার এঁদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিলে যেতে চলেছে।

কিন্তু আমার গ্রুপে কেবল থিয়েটার ভালোবাসলেই সদস্যপদ মিলবে না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে—থিয়েটার আপনি কেন করতে চান? উত্তম অভিনেতা হলেও প্রশ্ন আসবে—আপনার এই ক্ষমতা থিয়েটারকে নিয়ে কি করতে চায়? এর উত্তর যদি হয়, ভালো থিয়েটার করব, এটা একটা আর্ট—আর্টের চর্চা করব। পাল্টা প্রশ্ন আসবে, আর্ট দিয়ে কি করবেন? উত্তর যদি হয়—আর্ট দিয়ে আমার কি হয়—জাতির শিল্পচেতনা দৃঢ় হয়। প্রশ্ন

হবে—তাহলে জাতির সমস্যাটাকে আপনার মনে রেখেই কিন্তু থিয়েটার করতে হবে। যে মুহূর্তে জাতি এবং জীবন থেকে আলাদা ক'রে শিল্প নামে মহৎ কিছুকে আপনি গুরুত্ব দেবেন, আপনার সদস্যপদ খারিজ। অর্থাৎ প্রতিটি অভিনেতা এই গ্রুপে স্মরণে রাখবেন, প্রত্যেকটা নাটকে তাঁকে যে ভূমিকাটি দেওয়া হবে সেটি ছাড়া তাঁর আরো একটি ভূমিকা থাকবে। প্রত্যেক অভিনেতা দুটি করে 'রোল' করেন—একটি নাট্যকাহিনীর, অপরটি এই নাটকটি ক'রে তিনি যে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন তার। এই দুটি রোলে যিনি সার্থক, তিনিই শিল্পী এবং আমাদের সহযোগী।

নির্দেশক যদি মঞ্চযোগ্যতা যাচাই ক'রে নাটক খোঁজেন, তাকে বলা হবে—দয়া ক'রে ভালো নাটক খুঁজবেন না। নাটক হিসাবে উৎকৃষ্ট—এরকম অনেক রচনা পৃথিবীতে কম নেই, এদেশেও কিছু মিলবে। নির্দেশককে নাটক নির্বাচন করতে হবে। আর তাঁর নাটক নির্বাচনের মধ্য দিয়েই তাঁর সামাজিক চরিত্র চিনে নেব।

সমাজের দায় দায়িত্ব এড়িয়েও তিনি যদি নাটক খোঁজেন—নানা তাড়নায় আহত আমাদের মতো সামাজিক মানুষ এ-নির্দেশককে নিয়ে ঘর করতে পারবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া তাঁর নির্দেশিত নাটকগুলো যদি নির্দেশকের বিশেষ কোন সুস্থ জীবনদর্শনের সঙ্গে যুক্ত না থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কেবল শিল্পসার্থক নির্দেশনার দৃষ্টান্ত হয়—আমাদের হাততালিতে কিন্তু শব্দ হবে না, বরঞ্চ নিঃশব্দে তাঁকে চলে যেতেই অনুরোধ করা হবে।

আর নাট্যকার? গ্রুপের নিজস্ব সামাজিক ভূমিকার দায়িত্ববোধের সঙ্গে, তার পদক্ষেপের ছন্দের সঙ্গে এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের তরঙ্গের সঙ্গে যে নাট্যকারের বক্তব্যের মিল থাকবে, কেবল তাঁর নাটকই নির্বাচন করা হবে। অন্য লেখকরা বড় হলেও আমাদের আত্মীয় নন। অবশ্য আমাদের এই লেখক কেবল বক্তব্যের একাত্মতাতেই আমন্ত্রণ পাবেন না—তিনি শিল্পী, তাঁর শিল্প ও স্বভাবের যেখানে সিদ্ধি আমাদের অনুরাগও সেই কেন্দ্র থেকে হাত বাড়াবে।

এই আমার গ্রুপ থিয়েটার। চতুর্দিকে গড়ে উঠছে। কে থামায়?

১৯৭১ সাল নভেম্বর পর্যন্ত যতদূর হিসাব পাওয়া যায়, একাংক ও পূর্ণাঙ্গ বহু নাটক এরা মঞ্চস্থ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক হিসাবে নাম করা যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'মৃত্যু সংবাদ', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' এছাড়া ছোট নাটক অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যার রঙ', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনার

চাবি', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রঙের দিন', শ্যামল ঘোষের 'প্রেতায়িত স্বপ্ন,' পানুপালের 'বিচার'। বেতারে অভিনয় করেছেন বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী তরঙ্গিনী', 'কালসন্ধ্যা', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনার চাবি', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড'। নক্ষত্রগোষ্ঠী এখানেই থেমে যাননি। এঁরা বিদেশী অনুকরণে রিচার্ড হ্যাসের নাটক অবলম্বনে অসিত দে-র রূপান্তর 'বৃষ্টি বৃষ্টি', এই নাটকটি সাধারণ মানুষের কাছে নতুন স্বাদ এনে দিয়েছিল, এই নাটকের প্রয়োগ প্রধান ছিলেন শ্যামল ঘোষ। বিশ্বরূপায় নাট্য উৎসবে এটি প্রথম অভিনয় হয়।

নক্ষত্র গোষ্ঠি ১৯৭১ সালে একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হলেন থিয়েটার সেণ্টারে প্রতি শনিবার নবেন্দু সেনের 'নয়ন কবিরের পালা'। নিয়ে মাত্র দুটি চরিত্রের প্রায় দেড় ঘণ্টার অভিনয়ে দর্শককে মুগ্ধ করে দিয়েছেন, আর মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্যাপ্টেন হুর্‌রা,' এরা অভিনয় করেন। 'ক্যাপ্টেন হুর্‌রা' প্রসঙ্গে নক্ষত্রের স্যুভেনিরের বক্তব্যটি তুলে দিচ্ছি।

ক্যাপ্টেন হুর্‌রা প্রসঙ্গে

প্রাগৈতিহাসিক শ্বাপদের সামান্যতম স্মৃতি হয়তো যাদুঘরে মিলবে—মানুষের জন্য পথ ছেড়ে তারা সব কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু ঐ সব বিকট লুপ্ত প্রাণীর অতৃপ্ত আত্মা কিছু মানুষের উপর আজো ভর করে আছে। তাই মানুষের বৃহত্তম শত্রু আজো সম্ভবত মানুষ—এই কলঙ্কিত অপরাধে সভ্যতা আর কতকাল অভিযুক্ত থাকবে? 'ক্যাপ্টেন হুর্‌রা' নাটকটিতে মানুষের এই কলঙ্কমুক্তির উদ্যোগ ও অভিযানের দায়িত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এই কাহিনী একটি পথের মানচিত্র। আজকের ইতিহাস গড়েছে এই পথের উপর, আজকের নাটক গড়ে উঠেছে এই পথের দু ধারে। এইখানে দেখা মিলছে স্বজন-বন্ধুর, এইখানে পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে নষ্ট নায়ক। সংঘর্ষের হাত থেকে নিস্তার নেই। এই কম্পমান প্রহরে আমরা এখনো অনেকেই বড় স্থির, অদ্ভুত উদাসীন কিংবা আলস্যে মন্থর। এই স্থবির মুহূর্তে একটি জাহাজ কিন্তু ঠিকই ভেসে আসে—সব অনাড়ম্বতা চুরমার করে এগিয়ে যাবার বাঁশী বাজায়—দেরী করলেই ভুল হবে। নিজের দায়িত্বের মুহূর্তটি গ্রহণ করার মধ্যেই তো সঠিক বাঁচার পথ।

নক্ষত্র গোষ্ঠিতে যারা বিভিন্ন সময়ে অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন :—সুরঞ্জনা

ঘোষ, মানব সেন, শ্যামল ঘোষ, মানস মুখার্জী, শ্যামলবরণ ঘোষ, অসিত দে, তপন গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক সোম, রাজকুমার উপাধ্যায়, দীপেন সেনগুপ্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মানস মুখোপাধ্যায়, রেবা রায়চৌধুরী, শর্মিষ্ঠা ঘোষ, কৃষ্ণা দাস, অমল চক্রবর্তী, দেবল সেনগুপ্ত, তিমু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষ, স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়। মঞ্চস্থাপত্য—তাপস বসু, আবহসৃজন—রাজকুমার উপাধ্যায়, দীপচিত্রণ—স্বরূপ মুখোপাধ্যায়, প্রয়োগ প্রধান—শ্যামল ঘোষ। নক্ষত্রের কার্যকরী সমিতি: সভাপতি—অসিত দে, সহসভাপতি—অমল চক্রবর্তী, সম্পাদক—শ্যামল চক্রবর্তী, দিলীপ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ—নিতাই দে, সদস্য—স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নক্ষত্রের ১৯৭২ সালের নাটক 'খনন কাহিনী' নাটক ও নির্দেশনায়—নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত মূল—'দ্য ডেভলি গেম'। ফ্রিড্‌রিশ ডুরেনমাট। প্রথম অভিনয়, ২১ এপ্রিল ১৯৭২ মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় হয়েছিল।

সৃজনী

১৯৬৬ সালে কয়েকজন সৃজনশীল ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' (নাট্যরূপ বীরু মুখোপাধ্যায়) নিয়ে বিভিন্ন স্থানে দিনে দিনে এক অভিনব খ্যাতির সোপান তৈরী করলেন সৃজনী সংস্থার বলিষ্ঠ প্রযোজনার মাধ্যমে। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে দীর্ঘদিন পরে আবার মিলিত হয়েছিলেন নতুন উদ্যমে নাট্য প্রয়াসে এগিয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে। তপনকুমার ঘোষালের 'রক্তাক্ত নখর' একাঙ্ক নাটকটি নিয়ে সুদূর মধ্য প্রদেশের বিলাসপুরে সারা ভারত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন। সেখানে পেল সর্ব ভারতীয় স্বীকৃতি। তপন বাবুর রচিত—'শিল্পীর চোখে জল' (পূর্ণাঙ্গ) ও 'ফেরার বেলা' (একাঙ্ক) নাটক দুটি মঞ্চস্থ করল 'মুক্ত অঙ্গন', থিয়েটার সেণ্টার ও চ্যাপেল্ চার্চ রঙ্গালয়ে। কলকাতা এবং মফঃস্বলে অভিনয় করে আশাতীত সাড়া এরা পেলেন। এ ছাড়া বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের কর্মসূচীতেও নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। সৃজনীর শিল্পীবৃন্দ:—রামপ্রসাদ দাস, নীলু গোমেস, স্ট্যানিস্‌লস্ গোমেস, জেরাল্ড্ গোমেস, রবীন গোমেস, রনজয় সর্দার, মোহনলাল মণ্ডল, অনাথ সাহা, সুবোধ ভট্টাচার্য্য, মহঃ আনসার আলি, পিটার আলভারেজ, পি. এস. রাও, টি. সিং. ও অন্যান্য অনেকে।

নান্দীকার থেকে থিয়েটার ওয়ার্কশপ

১৯৬৭ সাল। ১৩ই জুন মুক্তাঙ্গন মঞ্চে একটি নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। ঘটনাটা এদেশের নয়, বিদেশের। ভিয়েতনামের কুয়াং ত্রি প্রদেশের একটি বৃদ্ধা কৃষক রমণী ও তার একমাত্র সন্তানের আত্মত্যাগের কাহিনী। এক কথায় বলা যায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের পোষা দঃ ভিয়েতনামের সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ ধিক্কার।

বিভাস চক্রবর্তীর ভিয়েতনামই আমি প্রথম দেখেছিলাম। অবশ্য পরে জানতে পারলাম ১৯৬৭ সালে নান্দীকার থেকে ১৪ জন শিল্পী এক সঙ্গে বেরিয়ে এসে এই দল গড়লেন, এই দল গড়ার কাজ যারা করেছেন তাদের মধ্যে বিভাস চক্রবর্তী, মায়া ঘোষ, ইনি 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্রে' মেয়ের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করতেন, যে অভিনয় আজও ভোলা যায় না। অজয় গাঙ্গুলী ইনিও বাবার চরিত্রে অভিনয় করে খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন। চিন্ময় রায়, অশোক মুখার্জী, মানিক রায়চৌধুরী, তাপসী গুহ, নিমাই ঘোষ, বিমলেন্দু ঘোষ, গোপাল দত্ত, অজিত সরকার, মহেশ সিংহ, অশোক দাসগুপ্ত।

এদের প্রথম নাটক ৬৭ সালের ৮ই নভেম্বর মুক্তাঙ্গনে শনওকেসীর জুনো এণ্ড দ পেরক্-এর বাংলা রূপান্তর অশোক মুখোপাধ্যায়ের 'ছায়ার আলোয়' অভিনয় হয়। পরপর এই নাটক এরা ৫০৬টি শো করেন।

১৯৬৯ সালে এরা ৬ই জুন উৎপল দত্তর 'হাঁড়ি ফাটিবে' রাতের অতিথিকে নাম পাল্টে মুক্তাঙ্গনে অভিনয় করেন। ৭১ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজ-রক্ত' অভিনয় করেন মুক্তাঙ্গনে। প্রায় ৪২টি শো করেন এই নাটকের। ৭২ সালে এরা রঙ্গনায় মনোজ মিত্রের গ্রাম্য জীবনের পটভূমিকায় লেখা নাটক 'চাকভাঙা মধু' অভিনয় করেন।। ৭২ সালের ২১শে জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকার একটি সমালোচনার কিছু অংশ উল্লেখ করা হল।

চাক ভাঙা মধু

মনোজ মিত্রের চাক ভাঙা মধু আদপে মধুই না, মুখবাঁধা হাঁড়ির মধ্যে লুকনো এক বিষধর সাপ। নাটকের শুরুতেই মাতলা ওঝা তার মেয়ে বাদামীর সঙ্গে ওই হাঁড়ি নিয়ে মর্মান্তিক রসিকতা করেছে; অনন্যোপায় পোয়াতি মেয়েটা তার চেয়েও মারাত্মক রসিকতা করতে গিয়েছিল মহাজনের সঙ্গে। ফল হল

ঠিক উল্টো। দেখা গেল অপ্রয়োগের জ্যান্ত সাপেরা, প্রয়োজনের কালে আর জীবিত থাকে না—এই মহাসত্য নিয়েই চাক ভাঙা মধুর যাত্রা শুরু।

তবু আলাদা করে বিচার করলে বলতে হয় চাক ভাঙা মধুর 'জটা' তুলনা-রহিত। বিভাস চক্রবর্তী কেবল বাঁচনিক অভিনয়-কৌশল দিয়ে একে ভরিয়ে দেননি, তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন সুচতুর বৃদ্ধের খল মনোবাসনাকে জীবন্ত করে তুলেছে। এ চরিত্রের চাপল্য রসিকতা ও লোভ সমগুরুত্বে অঙ্কিত। মানিক রায় চৌধুরীর 'শঙ্কর' একটি বিশেষ ধরনের অভিনয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করায়। এবং তা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সংকোচ থাকার কথা নয়। চরিত্রটি কোথাও ভাল ঝিলিকের কাজও করেছে। মালা নাথের 'দীক্ষা' উপভোগ্য। বিমলেন্দু ঘোষ অঘোর চরিত্রের রূপকার।

প্রয়োগ পরিকল্পনা যেখানে অসামান্য, সেখানে পরিচালনার কথা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বিভাস চক্রবর্তী এই দায়িত্ব বহন করেছেন। শেষক্ষণে তার প্রতি আমাদের বক্তব্য : পরিণতির দৃশ্যের বিশেষ কম্পোজি-শনের মোহে নাটকটিকে বিশেষ উদ্দেশ্যের সীমায় টেনে না নিলেও বোধহয় ক্ষতি ছিল না। তাপস সেনের আলো, মহেশ সিংহের মঞ্চ পরিকল্পনা এবং সৌরেশ দত্তর সংগীত ও ধ্বনির প্রয়োগ পরিমিত ও যথাযথ।

এছাড়া চেখভের দ্য বেয়ার অনুসরণে সত্যেন মিত্রর 'জংলী' একাংক ও সত্যেন মিত্রর মৌলিক একাংক 'চাই হৃদয় চাই', নাটকও এরা অভিনয় করেন। আরো যারা যারা বিভিন্ন সময়ে এদের সঙ্গে অভিনয় করেন, রাম মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ গুহঠাকুরতা, প্রীময় সরকার, সমীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শেঠ গৌরাঙ্গ গুহঠাকুরতা। আলোয়—বিমলেন্দু ঘোষ। তাপস সেনও ওদের আলো করেন। সঙ্গীত—সৌরেশ দত্ত, রূপসজ্জায়—গণনাট্যের প্রখ্যাত শিল্পী শক্তি সেন, নির্দেশনায় বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে, বিভাস চক্রবর্তী, চিন্ময় রায়, মহেশ সিংহকে।

উত্তর দরবারী

১৯৬৭ সাল, মুক্তাঙ্গন মঞ্চে ২১শে অক্টোবর একটি নতুন ধরণের নাটক দেখলাম, অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের,'আগ্নেয়গিরি'। একটা দেশে যখন ফ্যাসিস্ট শক্তি চাগার দিয়ে ওঠে সেই শক্তি দেশের অশুভ জনসাধারণের উপর

যে ফ্যাসিষ্ট তাণ্ডব চালায় সেই বীভৎস অত্যাচারের শেষ স্তরে দেশের সকল মানুষ এক হয়, রুখে দাঁড়ায়। এ নাটক তারই একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত বলা যায়। একটা বিদেশী কাহিনী স্টেন বেক-এর মুন ইস ডাউন অবলম্বনে অমরদা এই আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করেন। ৬৭ সালে এই নাটকের অভিনয় দেখে উত্তর সরবারী গোষ্ঠী রানু রায়কে সেই বছরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মহিলা শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই নাটক এর পরে এরা বিশ্বরূপায় অভিনয় করেন ও ১২টি শো পর পর করেন। এই দলের সার্থকতা দেখে ভাবার কোন কারণ নেই এইটেই এদের প্রথম নাটক। এর আগে প্রায় দীর্ঘ ৬ বছর ধরে নাটকের উপর নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে এরা এগিয়ে এসেছেন। এদের প্রথম নাটক ভবেন্দু ভট্টাচার্য্যের 'কুশীলব'। তারপর এরা করেন অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্ধকারের আয়না', তারপর এরা করেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ নারী'। এই নাটক পরিচালনা করেন রঞ্জিত দত্ত। এর পর করেন সঙ নাটক। পরিচালনায় ছিলেন জয়ন্ত ভট্টাচার্য। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে কিছু একাংক নাটকও এরা অভিনয় করেন। যেমন—'তুমি শুধু ছবি', 'ঠাকুর দা', '৪২ এর বেকুব', 'রৌদ্রাভিসার', 'গ্রন্থি'। এই সংস্থায় অভিনয় করেন অজিত লাল দাস, কৃষ্ণ চ্যাটার্জ্জী, দেবী চ্যাটার্জ্জী, চন্দন গাঙ্গুলী, জয়ন্ত ভাট্টচার্য্য, শ্যামল ভট্টাচার্য্য, তাপস বোস, দেবু বোস, রঞ্জন চক্রবর্ত্তী, দীপু চক্রবর্ত্তী, এস শেঠ, সত্য ঘোষ, কল্যাণ মিত্র, পবিত্র ঘোষ, পরিমল রায়, রানু রায়, মঞ্জুশ্রী রায় চৌধুরী। এদের বেশির ভাগ নাটকই পরিচালনা করেছেন ভবেন্দু ভট্টাচার্য্য।

ঘরোয়া

১৯৬৭ সাল, বহু আশা আকাঙ্খা নিয়ে জন্ম নিল আর একটি দল নাম ঘরোয়া, এরা প্রথম যাত্রা শুরু করেন উৎপল দত্তর "দ্বীপ" নাটক দিয়ে। তারা এর পর জগমোহন মজুমদারের 'করুণা কোরো না,' চিত্তরঞ্জন দাসের 'সমুদ্রের স্বাদ' অভিনয় করেন। তারপর এরা করেন ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা', বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'ইচ্ছা মৃত্যু', রমেন লাহিড়ীর 'আমিই লেনিন', রবীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'আলোর আলোয়'। এরপর এরা পূর্ণাঙ্গ নাটকে হাত দিলেন। প্রথম নাটকই কৃষক জীবনের পটভূমিকায় সমরেশ বসুর গল্প অবলম্বনে বরুণ দাসগুপ্তর 'আবর্ত্ত'। এরপর গেলেন শ্রমিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে

গোর্কী অবলম্বনে শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সামান্য অসামান্য'। নাটক নিয়ে। আবার গেলেন কৃষক জীবনে মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আমার মাটি' নিয়ে। এই সব নাটক অভিনয় করে এরা বহু পুরস্কার ও বহু প্রশংসা লাভ করেন। চিত্তরঞ্জন দাস, সন্তোষ বসু, তরুণ লাহিড়ী, শংকর গাঙ্গুলী, দীলিপ বসু, ফড়িং সরকার, অনিল মণ্ডল, বিষ্টুপদ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বরঞ্জন পাল, দীপেন মুখার্জ্জী, পূর্ণচন্দ্র মুখার্জ্জী, শিবু চক্রবর্তী, মদনমোহন গুপ্ত, মাঃ দৌলত, মাঃ চিন্ময়, মাঃ সন্টু, শংকর মুখার্জ্জী, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বপন গাঙ্গুলী, বাসুদেব সেনগুপ্ত, প্রদীপ সরকার, জ্ঞান দাস, বাবলু বোস, বাবলু ভট্টাচার্য্য, হীরেন ঘোষ, মিলন চক্রবর্তী, দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায়, রমাপতি চট্টোপাধ্যায়, নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মুখার্জ্জী, বেবী সরকার ও উমা প্রামাণিক বিভিন্ন সময়ে অভিনয়ে অংশ নেন।

নবরত্ন

১৯৬৮ জুলাই মাসে নবরত্ন জন্মগ্রহণ করে। বিভিন্ন নাটক ও অভিনেতাগণ :

কামধেনু—রচনা : নবকুমার গরাই, নির্দেশনা : মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান যুগের মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের চাকুরিজীবী এক নারীর সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্খার কাহিনী নিয়ে হাসিকান্নার নাটক। **অন্তরালে**—রচনা : নবকুমার গরাই, নির্দেশনা : শম্ভু কর্মকার।.....সৌখিন মঞ্চ জনতাকে কেন্দ্র করে বিচিত্র টাইপ চরিত্রের সমাবেশে নাট্যসংস্থাদের নানা সমস্যা, অভিযোগ সুকৌশলে তুলে ধরা হয়েছে, আগামী দিনের আশার কথাও ফুটে উঠেছে, সেই সঙ্গে এক অভিনেত্রী ও নাট্যকারের জীবন-অন্তরালের রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। **জিন্দের বন্দী**—রচনা ও পরিচালনা : নবকুমার গরাই। **লালবাঁধ**—রচনা : নবকুমার গরাই, পরিচালনা : তারাশঙ্কর বক্সী।..... **গুপ্তচর**—রচনা : নবকুমার গরাই, নির্দেশক : মলয় মহান্ত।.....পাক হামলার পটভূমিতে তিনটি পুরুষ চরিত্র নিয়ে রহস্যঘন আধ ঘণ্টার একাঙ্ক নাটক। সদস্য শিল্পীবৃন্দ : নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল সাহা, চিত্ত ঘোষ, অমর গোস্বামী, সুবোধ দাস, দীন মহম্মদ খাঁ ও নবকুমার গরাই। সংস্থা সাফল্যের সঙ্গে বিশ্বরূপা, রঙমহল, মিনার্ভা থিয়েটার ও নেতাজী সুভাষ ইন্সটিটিউটে তাদের নাটক মঞ্চস্থ করেছে। অতিরিক্ত মঞ্চভাড়া ও অর্থনৈতিক কারণ নাট্য প্রচেষ্টাকে

অসুবিধার সৃষ্টি করে। সংস্থার কর্তৃপক্ষ স্বল্পব্যয়ে স্বল্প আয়াসে মঞ্চস্থ করবার মত নাটক প্রস্তুত করার কথা চিন্তা করছেন। সম্পাদক শম্ভুনাথ কর্মকার, মলয় মহান্ত, পরান মহান্ত।

সুদর্শনম

১৯৬৮ সাল, ২৬শে জুন মুক্তাঙ্গনে একটি হাসির নাটক দেখতে গেলাম। পরনিন্দা পরচর্চা, আর অহেতুক কৌতূহল এর যে একটা বিয়োগান্তক পরিণতি থাকতে পারে এ কথা সেদিন বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'নিতাই গড়গড়ির বৌ' দেখে মনে হল। হাসতে হাসতে নিজের অজান্তেই কেমন করে গম্ভীর হয়ে যাওয়া যায় সুদর্শনম গোষ্ঠী প্রযোজিত নিতাই গড়গড়ির বৌ দেখে অনুভব করলাম। অবশ্য এর আগে ১৯৫৪ সালে এরা বনফুলের 'কঞ্চি' দিয়েই যাত্রা শুরু করেন। মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা,' 'গুরু বাক্য', গিরিশ ঘোষের 'য্যায়সা কা ত্যায়সা', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'থানা থেকে আসছি', শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'বৌদির বিয়ে', 'ঝর্ণা', মনোজ মিত্রের 'আরক্ত গোলাপ', কিরণ মৈত্রের 'তেলে জলে', 'নাম নেই', বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'তিলোত্তমা' সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'সামনে অন্ধকার' অভিনয় করেন। এরপর এরা টেনেনস র‍্যাটিগান এর "ব্রাউনি ভার্সন" এর রূপান্তর সাংবাদিক নাট্যকার জ্যোতির্ময় বসুরায়ের একটি নতুন ধরণের নাটক 'একা একা' অভিনয় করেন। একা একা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একথা বলা যায়, স্বামীর অনেক বড় হবার স্বপ্ন কিন্তু বাধা অনেক। আর স্ত্রী যে স্বপ্ন দেখে সুখী জীবনে একেবারেই রূঢ় বাস্তব। তাই দুটো মনের মধ্যে কোথায় যেন চির খেয়ে যায়। মাঝপথে এলো এক স্ফুটন্ত যৌবন, যার ফলে সব গেল ওলট পালট হয়ে। সব ভেসে যায় স্রোতের মতন। এই নাটক বিভিন্ন সময়ে এরা অভিনয় করেন। সংস্থার নাট্য নির্দেশক কুমার শোভন, শব্দ সংযোজক মনতোষ চৌধুরী, আলোয় শিবসুন্দর দাস। আর অভিনয়ে ছিলেন সীমা বিশ্বাস, সমীর মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত ঘোষ, অলোক বসু, দীপেন চন্দ্র, অনুরূপ সরকার, গণেশ পাল, জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্ব ভট্টাচার্য্য, পরিমল ভট্টাচার্য্য, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু, শেখর, তরুণ দত্ত, দেবব্রত রায়, জিতেন দত্ত, মায়া রায়, মন্দিরা দাস, রঞ্জনাথ মুখোপাধ্যায় ও কুমার শোভন।

অনুভব

১৯৬৮ সাল। বাংলা নাট্যশালার ঐতিহ্যের পথ চেয়ে কতকগুলো নাট্য সচেতন ছেলের নাট্যবোধ থেকে জন্মনিল একটা নতুন দল 'অনুভব'। প্রগতিশীল নবনাট্য আন্দোলনের সংগে আর একটি নাম জড়িত হলো। বেহালার অধুনালুপ্ত 'অহীন্দ্র মঞ্চে' (অমর গাঙ্গুলী প্রতিষ্ঠিত) ৭ই ফেব্রুয়ারী '৬৮, এরা প্রথম সাধারণ্যে অভিনয় করলেন দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের মৌলিক নাটক 'দ্বিতীয় পৃথিবী, আনাতোলে ফ্রাঁর কাহিনী অবলম্বনে দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত হাসির নাটক 'নিহত নিয়তি'। ঐ মঞ্চেই '৬৮ সালে অভিনীত হল চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'দাও ফিরে সে অরণ্য', আন্তন চেকভের 'দি প্রপোজাল' অবলম্বনে দীপেন্দ্র সেনগুপ্তর 'শুভ প্রস্তাব', লেডী গ্রেগরীর নাটক অবলম্বনে 'ঝড়ের খেয়া'। '৬৮ সালেই অনুভব দীপেন্দ্র সেনগুপ্তর পূর্ণাঙ্গ নাটক 'শনিবারের বিকেল' মঞ্চস্থ করলেন অহীন্দ্রমঞ্চে, রঙমহলে। নাটকটি বহু পত্র পত্রিকায় প্রশংসাধন্য হয়েছিল এবং পরে 'আকাশবাণী কলিকাতা' থেকে প্রচারিত হয়। এই নাটকটি এখনও পর্যন্ত বহুবার মুক্ত অঙ্গনে, বিশ্বরূপায়, রঙমহলে, অঙ্গন হলে অনুভব গোষ্ঠী অভিনয় করেছেন। '৬৯ সালে চেকভের 'সোয়ান সং', অবলম্বনে দীপেন্দ্র সেনগুপ্তর 'পূরবী' নাটকটি প্রযোজিত হলো। '৭০ এ এরা প্রযোজনা করলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে দীপেন্দ্র সেনগুপ্তর'হাবানের নাতজামাই', প্রদীপ রায়ের কিশোর নাটক 'শক্তিশেল', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ'। তিনটিই পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং সুপ্রযুক্ত। এরপর '৭১ সালে অনুভব-এর বহু বিতর্কিত নাটক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত 'সওয়াল' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ২৮শে সেপ্টেম্বর মুক্ত অঙ্গনে। নাটকটি বহুবার মুক্ত অঙ্গনে এবং অ্যাকাডেমী অফ্ ফাইন আর্টস মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে। পাঁচ বছরের স্বল্প পরিধিতে এরা এপর্যন্ত মঞ্চস্থ করেছেন এগারোটি নাটক। অনুভবের গতি এখনও অব্যাহত। মহান নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তর পুত্র দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত এই গোষ্ঠীর পরিচালকের দায়িত্বে আছেন। ইনি 'নান্দীকার' এবং অনুকার' গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই সংস্থার বিভিন্ন সময়ের অভিনেতা এবং কলাকুশলীরা হলেন—দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত, তাপস দাসগুপ্ত, সত্যপ্রিয় ঘোষ, মিহির গাঙ্গুলী, শিবনাথ গাঙ্গুলী, অজয় বসু, অসীম ভাদুড়ী, ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বিবেক সেনগুপ্ত, রতন চক্রবর্তী, অরুণ ভাদুড়ী, দিলীপ

চক্রবর্তী, অনিন্দ্য নন্দী, অলক চ্যাটার্জী, শান্তজিৎ সেনগুপ্ত, অজিত গুপ্ত, চিত্ত ভাদুড়ী, অনিল দাস, কৃষ্ণ রায়, সুনীল ঘোষ, মায়া ঘোষ, মঞ্জুশ্রী বসু, মন্দিরা দাস, মীনা চ্যাটার্জী, নবেন্দু ব্যানার্জী, সুনীল বসু, পিণ্টু বসু প্রভৃতি।

সৌভ্রাত্রিক

১৯৬৮ সাল, আর একটি নাট্য সংস্থার উদয় হলো যাদের শুরু একাংক নাটক দিয়ে। এরা অল্পদিনেই বহু নাটক অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে বিমল রায়ের 'অভিনয়,' অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'এক অধ্যায়', অনিল মুখার্জীর 'বিয়ে মাইনাস বৌ,' শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ক্যাম্পথ্রী', 'অনশন ভঙ্গ,' জোছন দস্তিদারের 'নবাক্কন', সলিল সেনের 'ডাউন ট্রেন,' কিরণ মৈত্রের 'যা তারা পারেনি', চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'দেবরাজের মৃত্যু', নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এমনও দিন আসতে পারে,' রতন কুমার ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে', সলিল চৌধুরীর 'অরুণোদয়ের পথে,' প্রভৃতি। এই সংস্থার পরিচালক অশোক চ্যাটার্জী, অমর দাস ও অমিতাভ রায় মুখার্জী। সংস্থার সম্পাদক প্রলয় কুমার মিত্র। বহু জায়গায় নাটক অভিনয় করে মর্যাদা পেয়েছেন ও পুরস্কৃত হয়েছেন।

নাটক বাঁচাও আন্দোলন

১৯৬৯ সাল, নাটক বাঁচাও আন্দোলন শুরু করলেন নাট্য সংগ্রাম সমিতি। এই উপলক্ষে নাট্য কর্মীদের সংঘবদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন শুরু করলেন, সভা সমিতির মাধ্যমে প্রচারে নামলেন, বিভিন্ন সময়ে তার কিছু খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেই খবরগুলো আমি ছেপে দিলুম।

প্রমোদকর উচ্ছেদের দাবী সোচ্চার

নাট্যাভিনয়ের ওপর থেকে প্রমোদকর উচ্ছেদের দাবী ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠছে। গত শনিবার পলতায় সারা বাঙলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির চতুর্থ আঞ্চলিক অধিবেশনে ১১৮টি দলের প্রতিনিধি উচ্চকণ্ঠে এই দাবী তোলেন। সভায় কয়েকশত নাট্যশিল্পীর উপস্থিতিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন বক্তা বলেন, এ কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, নাটককে বাঁচাবার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা আছে। সভায় জনগণের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সংগ্রাম সমিতি সমগ্র বাঙলাদেশব্যাপী এই আঞ্চলিক অধিবেশন করছেন।

এঁদের পরবর্তী সভা : ২৮ জুন লক্ষ্মীকান্তপুরস্থ ঘটেশ্বরে, ৬ জুলাই নৈহাটিতে, ১২ জুলাই বহরমপুরে, ১৩ জুলাই জিয়াগঞ্জ, ১৭ জুলাই হাওড়ায়। আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে এরা আঞ্চলিক সভার কাজ শেষ করে কলকাতায় প্রকাশ্য সভা ডাকবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

দক্ষিণে 'নাটক বাঁচাও' আন্দোলনের সভা

নাট্যাভিনয়ের ওপর থেকে প্রমোদ কর তুলে নেবার দাবীতে আগামী শনিবার লক্ষ্মীকান্তপুর এলাকায় এক বিশাল সভার আয়োজন করেছেন ত্রিয়াস সংস্থা। সমগ্র দক্ষিণ এলাকার সকল নাট্য সংস্থার প্রতিনিধিরা এতে যোগ দেবেন। সভাস্থল ঘটেশ্বর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। উল্লেখ থাকে যে, সারা বাঙলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির এটি পঞ্চম আঞ্চলিক অধিবেশন। ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে নৈহাটিতে, যাত্রিক গোষ্ঠীর উদ্যোগে।

নাটক বাঁচাও আন্দোলন রবিবার নৈহাটিতে

সারা বাঙলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির ষষ্ঠ আঞ্চলিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে আগামী রবিবার নৈহাটিতে। উদ্যোক্তা যাত্রিক সংস্থা। বিকেল থেকে ওই অঞ্চলের শতাধিক নাট্যসংস্থা মিছিল করে, 'প্রমোদকর বন্ধ কর' এই ধ্বনি তুলে সভায় যোগদান করবেন। সভাস্থল স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হল, সময় সন্ধ্যা ৬॥টা। এক প্রশ্নোত্তরে সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কলকাতার প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁরা বিশ হাজার নাট্যকর্মীর সমাবেশ ঘটাবেন।

প্রমোদ-কর উচ্ছেদের দাবী সর্বত্র

পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় নাট্যাভিনয়ের উপর থেকে প্রমোদকর উচ্ছেদের দাবীতে এ-সপ্তাহে বিভিন্ন স্থানে বহু সভা ডাকা হয়েছে। সারা বাঙলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির এই 'নাটক বাঁচাও আন্দোলন'কে জোরদার করে তোলবার জন্যে আগামী ২৫ জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় এক 'সাংবাদিক সম্মেলন'-এর আয়োজন করা হয়েছে ৬৫ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯-এর ত্রিতলে, সাহিত্য ভবনগৃহে। আগামী ২৭ জুলাই ৫টায় হাওড়া জেলা আঞ্চলিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে হাওড়ার ৮২, জয়নারায়ণ সাঁতরা লেনে। এর উদ্যোক্তা কৃষ্টি ও রঙ্গশ্রী দল। ২৭ জুলাই বিকেল পাঁচটায় দমদমে আঞ্চলিক অধিবেশনের আয়োজন করেছেন চেনা অচেনা গোষ্ঠী। সভাস্থল মতিঝিল ইনসটিটিউট, দমদম।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই সভাগুলিতে বহু নাট্য সংস্থার প্রতিনিধি ও শিল্পীরা যোগ দিয়ে প্রমোদকর উচ্ছেদের দাবী তুলবেন।

কোন মহামান্য রাজপুরুষের বাণী শোনবার উদ্দেশ্য নয়, কোন রাজনৈতিক নেতার আলাময়ী ভাষণ শোনবার জন্যও নয়, বাঙলাদেশের মুমূর্ষু নাট্যসংস্কৃতিকে বাঁচানোর তাগিদে লক্ষীকান্তপুরের ঘটেশ্বর বাজার সংলগ্ন ময়দানে সেদিন (২৮ জুন) বিকেলে ছুটে এসেছিলেন প্রায় শতাধিক নাট্যদলের কয়েক হাজার সদস্য। মিছিলে বিভিন্ন দলের ফেসটুন ছিল, মুখে ছিল শ্লোগান: 'প্রমোদকর তুলতে হবে, তুলতে হবে': 'সংস্কৃতির উপর করের বোঝা—সইব না, সইব না' 'গ্রামে গ্রামে আন্দোলন—গড়ে তোলো, গড়ে তোলো': 'নাটক বাঁচাও আন্দোলন—জিন্দাবাদ'! নাট্য সংস্কৃতির যাঁরা পূজারী তাঁরাই কেবল এলেন না, এলেন আশ-পাশ থেকে, এমন কি কয়েক মাইল দূর থেকেও দলে দলে সাধারণ মানুষ।

যে আন্দোলনটিকে সার্থক করে তুলতে এই হাজার হাজার লোকের সমাবেশ, সে আন্দোলনটির নাম 'নাটক বাঁচাও আন্দোলন'। আন্দোলনের ডাক দিয়েছে 'সারা বাঙলা নাট্য সংগ্রাম সমিতি।' এটি তাঁদের পঞ্চম আঞ্চলিক অধিবেশন। পৌরহিত্য করলেন স্থানীয় নাট্যকর্মী হৃদয়রঞ্জন হালদার। প্রধান অতিথি ছিলেন নাট্যকার বিমল রায়।

অধিবেশনের উদ্বোধন করে নাট্যকার সুনীল দত্ত বললেন, 'সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার প্রমোদকরের বোঝা চাপিয়েছিল নাটকের ঘাড়ে, সেই চাপে নাট্যসংস্কৃতি আজ দম বন্ধ হয়ে মরতে বসেছে। জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক যুক্তফ্রন্ট সরকার গত ৯ মাসের রাজত্বে হয়তো এ ব্যাপারে সবিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নি। আমাদের হাজার হাজার কণ্ঠের সমবেত আবেদনে এবার তাঁরা নিশ্চয় সাড়া দেবেন এবং নাটকের উপর প্রমোদকর রহিত করে তাঁরা যে জনদরদী তার প্রমাণ দেবেন।'

মথুরাপুর ভদ্রপাড়া বাণী সঙ্ঘের গঙ্গাগোবিন্দ গায়েন বললেন, 'আমরা সুন্দরবনের মানুষ। এমনিতে শান্তিপ্রিয়, কিন্তু প্রয়োজন হলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতই ভয়ংকর হতে পারি। এই আন্দোলনে, প্রয়োজন হলে আমাদের সে রূপ আপনারা দেখতে পাবেন।' তাঁতিরহাট সবুজ সাহিত্য মন্দিরের বঙ্কিমচন্দ্র দাস বললেন, 'নাটক শিক্ষা প্রসারের অন্যতম মাধ্যম। তার উপরেও করের বোঝা!' তিয়াদি নাট্য সংস্থার সত্যেন মুখার্জী

বললেন, 'নাটকের উপর প্রমোদকর চাপানোর অর্থ সংস্কৃতির অগ্রগতি রোধ করা।'

নাট্য সংগ্রাম সমিতির অংশুমান প্রামাণিক বলেন, 'এ আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, সুস্থ ও সহজ জীবনচর্চার আন্দোলন। প্রমোদকর রহিতের দাবী সারা বাঙলার দাবী।' পুন্নাম নেতাজী সঙ্ঘের রণজিত পুরকাইত বললেন, 'নাটক বাঁচাও আন্দোলন সংস্কৃতিকে বাঁচানোর আন্দোলন।' চ্যারিটি শোতে নাটক করে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল গঠনে সাহায্য করা হয়। সুতরাং নাটক বাঁচাতে জীবন পণ করতে হবে।'

চোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অনাদিরঞ্জন বেরা বললেন, 'আগেকার নীলকর আর আজকের প্রমোদকরে কোন তফাত নেই।' গড়িয়া মঞ্চরথের পক্ষ থেকে স্মৃতিময় ব্যানার্জী বললেন, 'প্রমোদ কর এতদিন কেন ওঠেনি—এটাই আশ্চর্য! যে কোন প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম মাধ্যম নাটক। তার উপরেও কর! এ অন্যায় আর সহ্য করা চলবে না।'

প্রধান অতিথি বিমল রায় বললেন, 'স্থায়ী মঞ্চের ব্যবসায়িক উদ্যোগ, পেশাদারী সংস্থার অভিনয় যদি প্রমোদকর থেকে মুক্তি পায়, তবে আর সব অভিনয় কেন রেহাই পাবে না সেটাই আমাদের বক্তব্য।'

সভাপতির ভাষণে হৃদয়রঞ্জন হালদার বললেন, 'এ আন্দোলন শহরে ও গ্রামে একযোগে গড়ে তুলতে হবে। সারা বাংলা জুড়ে এ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ রাইটারস বিলডিংস-এর দুয়ারে ঘা দিয়ে দাবী আদায় করবে।'

এছাড়া শতরূপা সংস্থার ললিত মোহন হালদার, বিদ্যাধরপুর মিলন ক্লাবের অনঙ্গমোহন মুখার্জী, গাববেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগারের শীতেন্দু বিকাশ হালদার ও রাসব ভারতীর কানাইলাল নস্কর সভায় ভাষণ দেন।

অধিবেশনে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় তার সারমর্ম: সমাজকে সচেতন ও জনসাধারণকে আন্দোলনের জন্য গ্রামে গ্রামে আরও বেশী অপেশাদার নাট্য সংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম মাধ্যম নাটকের উপর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার যে কর আরোপ করেছিলেন বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার তা মুকুব করে তাঁরা যে জনদরদী তার প্রমাণ দিন।

'আমরা কোথায় বাস করছি ক্রমওয়েলের যুগে না ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে? নাটক বাঁচাও আন্দোলনের ষষ্ঠ আঞ্চলিক অধিবেশনে বিখ্যাত পালাকার

১৯৬০ সালে রঞ্জি স্টেডিয়াম উৎসবে সাংবাদিক সম্মেলনে
ভাষণরত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।



না মঞ্চে বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ উৎসব। ভাষণরত : গীতশ্রী দেবী
সন্তোষ সিংহ। উপবিষ্ট : (বাম থেকে ডানে) মন্মথ রায়, ডঃ সুকুমার সেন (সভাপতি)



চতুরঙ্গ আয়োজিত বনফুল-সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠান। ভাষণরত : প্রেমেন্দ্র মিত্র
উপবিষ্ট : (বাম থেকে ডান) বনফুল, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়,
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও বরুন দাশগুপ্ত।



বঙ্গ ভারত সাংবাদিক নাট্যকার সন্তোষকুমার ঘোষ।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে নৈহাটি টাউন হল-এ আয়োজিত সভার ভাষণদানকালে এ-কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য : শিল্প সাহিত্য বাদ দিয়ে সংস্কৃতিকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে কোন জাতি বাঁচতে পারে না। অথচ আশ্চর্য অতীতের সেই লজ্জাকর 'প্রমোদ কর' এখনও নাট্যাভিনয়ের উপর বোঝার মতন চেপে রয়েছে। তা যদি থাকে তবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আর বর্তমান জনদরদী সরকারে তফাৎ কোথায়?

নৈহাটী টাউন হলে গত ৬ই জুলাই নাট্য সংগ্রাম সমিতির এই আঞ্চলিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। নানাবিধ ফেস্টুন হাতে দূর ও কাছের নাট্যসংস্থার শিল্পীরা মিছিল করে সভায় যোগ দেন। প্রমোদকর মুক্তির দাবী তুলে বক্তৃতা করেন আরও অনেকে : কুশীলব দলের শ্যামলতনু দাশগুপ্ত, মুকুট সংস্থার জীবনরতন বসু, জাগৃতির সনৎ ঘোষ, রূপালোকের মিহির চ্যাটার্জী, আদি মৈত্রী সঙ্ঘের মুনীশ গুপ্ত, রূপ রঙ্গ দলের সতীরঞ্জন কুণ্ডু, এবং যাত্রিক-এর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রায় ৮০টি নাট্যদলের প্রতিনিধি সভায় যোগ দেন।

সভার উদ্বোধন করেন সুনীল দত্ত। নাট্য সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে ভাষণ দেন স্মৃতিময় ব্যানার্জী, অংশুমান প্রামানিক, সত্যেন মুখার্জী, বিমল রায় প্রভৃতি।

সভায় জনগণের সরকার যুক্তফ্রন্টের প্রতি আবেদনের আকারে কয়েকটি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছে।

হাওড়ায় নাটক বাঁচাও আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গে যাবতীয় নাট্যাভিনয়ের উপর থেকে প্রমোদকর তুলে নেবার দাবী তুলেছেন হাওড়ার শত শত নাট্যসংস্থাও। এ-দাবীকে আরও জোরদার করবার জন্য সারা বাঙলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির ডাকে এরা হাওড়া আঞ্চলিক অধিবেশনে যোগ দেবেন আগামী ২৬শে জুলাই। সভাস্থল ৮২ জয়নারায়ণ সাঁতরা লেন, হাওড়া। সময় সন্ধ্যা ৬টায়। উদ্যোক্তা রঙ্গশ্রী ও কৃষ্টিগোষ্ঠী।

বারাসতে নাটক বাঁচাও আন্দোলন

পঃ বঙ্গের যাবতীয় নাট্যাভিনয়ের উপর থেকে প্রমোদ-কর উচ্ছেদের দাবীতে এ সপ্তাহে সারা বাঙলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির যে কয়েকটি আঞ্চলিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো তার মধ্যে হাওড়া ও দমদম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সমিতির পরবর্তী আঞ্চলিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৯ আগষ্ট বারাসতে। উদ্যোক্তা স্থানীয় রূপম নাট্য সংস্থা।

কলকাতার কড়চা

বাঙলা দেশে কত নাটকের দল আছে? প্রায় ২২ হাজার। বছরে গড় অভিনয়ের সংখ্যা কত হতে পারে? ৬৫ হাজারের মত। অবাক হবেন না, 'সারা বাঙলা নাট্য সংগ্রাম সমিতি' জেলাওয়ারি গোনা-গুনতি করে করপোরেশন, কালেকটরেট এবং অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করে যে মোটামুটি পরিসংখ্যান তৈরী করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, শহর ও শহরতলিতে বছরে পরিবেশিত হয় ২৯ হাজার অভিনয়, মফঃস্বলে ৩৬ হাজার। এই চিত্র পরবর্টির ইংলণ্ডকেও হার মানিয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতির উন্নয়ন চড় চড় করে বাড়ছে বলে আনন্দলাভের কোনো কারণ নেই। আসলে নাট্যশিল্পের অবস্থা যে কত ভয়ঙ্কর, তার অস্তিত্ব যে মুমূর্ষুর মত, সেই মর্মন্তুদ চিত্রই গত ২৫ জুলাইয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত করেন 'নাট্য সংগ্রাম সমিতি'। সমগ্র পঃ বঙ্গের যাবতীয় নাট্যাভিনয়ের উপর থেকে প্রমোদকর প্রত্যাহারের দাবীতে এঁরা রাজ্যব্যাপী 'নাটক বাঁচাও আন্দোলন'-এর কাজ করছেন বেশ কিছুদিন ধরে। শহর ও মফঃস্বলে আঞ্চলিক অধিবেশন করে এঁরা এরই মধ্যে ৮৭২টি সংস্থার সঙ্গে জড়িত। ১২ হাজার নাট্যকর্মীর কাছে ওঁদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে গিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছেন।

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত, তাহলো এই যে নাট্যকর্মের সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪০ হাজারের মত। নাটক আছে বলেই ৮৭ হাজার মানুষের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। এই পথে অন্ন-সংস্থান হয় প্রায় ১৭ হাজার পরিবারের। এ-ছাড়া মুদ্রণ, কাগজ, বস্ত্র, লৌহ, পাট, কাষ্ঠ, প্রসাধন, টিন, বৈদ্যুতিক, স্টেশনারি, বাদ্যযন্ত্র, ডেকরেটর, সীবন প্রভৃতি বহু শিল্পই এর সাহায্যে বেঁচে আছে। অর্থাৎ বহু শ্রমিক, কর্মীও। নাট্যশিল্প যদি মৃত-প্রায়, তবে এঁদের অবস্থা কী হতে পারে?

সংগ্রাম সমিতি বলছেন আজকের অর্থনৈতিক দুরবস্থায় প্রমোদকরের বোঝা যদি তুলে নেওয়া না হয়, তবে নাট্য-সংস্কৃতির মৃত্যু অনিবার্য। বেশির ভাগ সভ্য দেশে এবং ভারতের বহু রাজ্য এ-কর তুলে নিয়েছেন। কিছু সত্য ঘটনার উল্লেখ করে ওঁরা নিগ্রহ ও সরকারী দুর্নীতির প্রভাবের দৃষ্টান্তও রাখলেন।

না, সত্যি এই করের দ্বারা সরকারের আয় খুব লোভনীয় নয়। এ থেকে বৎসরে আনুমানিক আয় ৫০ হাজারের বেশি নয়। কারণ ব্যবসায়িক মঞ্চ-

উদ্যোগ, শহর ও শহরতলির রবীন্দ্র-ভারতী অনুমোদিত পেশাদারী সংস্থা এই কর যুক্ত। তাই নাট্য সংগ্রাম সমিতি আজকের জনগণের সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন, ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত সেই কলঙ্কময় কর তুলে নিয়ে তাঁরা যেন মুমূর্ষু নাট্য-সংস্থাগুলিকে টিকে থাকার ভরস' দেন। অন্যথায় এঁরা প্রত্যক্ষ বিক্ষোভ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। বাকি ৪৭টি আঞ্চলিক অধিবেশন শেষ করেই সে কাজ এঁরা শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন।

দিকে দিকে বজ্রনির্ঘোষ

সারা বাংলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির আহ্বানে প্রমোদকর মুক্তির দাবীতে 'নাটক বাঁচাও আন্দোলন' ক্রমশই জোরদার হচ্ছে। শহরতো বটেই, দূর মফঃস্বলেও এ-আন্দোলন দিনে দিনে উত্তাল হয়ে উঠেছে। প্রায় প্রত্যহই বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী দলে দলে এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসছেন। গত ১৩ই জুলাই মুরশিদাবাদের জিয়াগঞ্জে 'সংযম' নাট্য-সংস্থার ব্যবস্থাপনায়, ২৬শে জুলাই 'কৃষ্টি' ও 'রঙ্গশ্রী'র উদ্যোগে হাওড়ায় এবং ২ শে জুলাই দমদমে 'চেনা-অচেনা' গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে তিনটি আঞ্চলিক অধিবেশন হয়েছে।

জিয়াগঞ্জের অধিবেশনের উদ্বোধন করতে গিয়ে নাট্যকার অংশুমান প্রামাণিক (রূপতরঙ্গ) বলেন, 'প্রত্যেকটি নাট্য-সংস্থাকে একতাবদ্ধ হয়ে প্রমোদকরের মূলোৎপাটন করতে হবে।' সজল ঘটক (প্রতিরূপ) বলেন, 'আমাদের প্রথম ও প্রধান দাবী হচ্ছে প্রমোদকর থেকে মুক্তি।' প্রধান অতিথির ভাষণে পশুপতি পণ্ডিত (বালুচর নাট্য-ভারতী) বলেন, 'যদি গ্রাম বাংলার কোণে কোণে প্রমোদকর রহিতের দাবী সোচ্চার হয়, তবে আমরা নাট্য-সংস্কৃতিকে রক্ষায় যে স্বপ্ন দেখছি, তা সত্যি করতে পারব।' সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক প্রশান্ত রায় বলেন, 'সংস্কৃতির উপর থেকে এই অযৌক্তিক করমুক্তির প্রশ্নটি যুক্তফ্রন্ট সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করবেন।' এ ছাড়া স্বরাজ সেনশরমা (বহুমুখী), অলক চ্যাটার্জী (মিতালী সংঘ), সৌমেন রায় (নীলতারা), স্বপন রায় (জাগরী), স্বস্তিময় ব্যানার্জী (মঞ্চরথ), প্রীতিময় বিশ্বাস (সংযম), সমীর ঘোষ, সত্যেন মুখার্জী, প্রীতিকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতি বক্তাগণ আন্দোলনের সমর্থনে ভাষণ দেন। অধিবেশনে বহুমুখী, নীলতারা, অগ্রগামী, ইয়ং স্টার, গৌরাঙ্গ নাট্য সঙ্ঘ, করুণাময়ী, জাগরী, অভিযান সঙ্ঘ, বালুচর, রেনেসাঁস ক্লাব, নাট্যমোদি, নাট্যরসিকতা, মহিলা সংস্কৃতি সঙ্ঘ, শাস্ত্রী সঙ্ঘ ইত্যাদি সংস্থার প্রতিনিধিগণ যোগ দেন।

দমদমে আঞ্চলিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সুরেশ হালদার। অধিবেশনের উদ্বোধন করেন সজল ঘটক। সত্যেন মুখার্জী (তিরাস) বলেন, 'স্বাধীন দেশের মানুষ আমরা, আসুন, সংস্কৃতিকে মুক্তধারা করে দিতে সঙ্ঘবদ্ধ হই।' অসীম গুহ (চেনা অচেনা) বলেন, 'রাজনীতিগত মতামতকে এড়িয়ে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' স্মৃতিময় ব্যানার্জী (মঞ্চরথ) বলেন, 'গ্রাম বাংলার জন-জাগরণের ধারক-বাহক যে সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে, সেই সংস্কৃতিকে কায়েমী স্বার্থ থেকে মুক্ত করতে হবে।' সভাপতি সুরেশ হালদার বলেন 'নাটককে বাঁচানো মানে শিল্পকে বাঁচানো।' এছাড়া বিমল রায়, নৃপেন দেব, অংশুমান প্রামাণিক, স্বভাব দাস (খেয়া), তপন গুপ্ত (আমরা সবাই), যামিনী মিত্র (নবশুভ্রী) নৃপেন দেব (করবী) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ভাষণ দেন।

২৩শে জুলাই হাওড়া শাখার আঞ্চলিক অধিবেশনের আয়োজন করেছিলেন কৃষ্টি ও রঙ্গশ্রী যুগ্মভাবে। এই অধিবেশনের উদ্বোধন করতে গিয়ে নাট্যকার সুনীল দত্ত বলেন, 'বাংলা দেশ ছাড়া ভারতের আর কোথাও প্রমোদকর নেই। আমাদের নিজেদের সরকার এ বিষয়ে অবহিত হবেন কি?' নাট্যকার রণজিৎ দত্ত বলেন, 'আশা করি, যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রমোদকর তুলে দেবেন। ট্যাক্স তুললে অভিনয়ের সংখ্যা বাড়বে এবং সেই সঙ্গে নাটকের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।' সভাপতির ভাষণে নাট্যকার রমেন লাহিড়ী বলেন, 'নাট্য কর আমাদের ঘাড়ে জোয়াল হয়ে চেপে রয়েছে। এর ফলে দুর্নীতির প্রসার ঘটেছে। এই আন্দোলন সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করতে হবে।' এই অধিবেশনেই বিভিন্ন নাট্য-সংস্থার প্রতিনিধি রমেন লাহিড়ী, অরবিন্দ সিংহ, ডাঃ নির্মলকুমার সরকার, রণজিৎ দত্ত, চন্দ্রকান্ত মুখার্জী, অজয় চক্রবর্তী, সমর মুখার্জী, পীলু মুখার্জী, শ্যাম ভট্টাচার্য, দিলীপকুমার বাগ, অজিতহরি দত্ত, সন্দীপ বসু এবং কল্যাণী সিংহ প্রভৃতিকে নিয়ে সারা বাংলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির হাওড়া জেলা শাখা গঠিত হয়েছে।

ঋতুরাজ নাট্য সংস্থা

১৯৬৮ সাল-এ উত্তর কলকাতায় 'ঋতুরাজ' নাট্য সংস্থার জন্ম। নাটকাভিনয় ও নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকল স্তরের মানুষকে আনন্দদানকল্পে ও পশ্চিমবঙ্গের নবনাট্য আন্দোলনের শরীক হয়ে আধুনিক নাট্য প্রযোজনায়

নব ধারা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে এই ঋতুরাজ সংস্থা। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠার পুরোভাগে নাট্যকার দীপ্তিকুমার শীলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং কয়েকজন নাট্য প্রেমিক ও নাট্য উৎসাহী মানুষের অদম্য উৎসাহের কথা অনস্বীকার্য্য। যাদের মধ্যে দিলীপ বসাক, ডঃ বিমল কুমার চন্দ্র ও প্রশান্ত মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য।

ঋতুরাজ-এর সবচেয়ে গর্বের বিষয়, এই সংস্থার সংগে প্রখ্যাত নাট্য শিল্পী, নাট্যবিদ ও নাট্যকার বিশেষভাবে জড়িত। নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী সংস্থার প্রধান নাট্য-উপদেষ্টা। নাট্যবিদ ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, নাট্যকার মন্মথ রায় ও নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তকে নিয়ে সংস্থার নাট্য-উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত। যার ফলে এঁদের নাট্য প্রযোজনায় এক পরিচ্ছন্ন ও পরিণত অভিনয়ধারার প্রকাশ দেখা যায়। শুধু তাই নয়; এঁরা নাটকে প্রাতটি সদস্যের একটা মোটামুটি ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে নাট্য তত্ব ও তথ্য বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করেন। সেই সংগে নাট্য প্রযোজনা ক্ষেত্রে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রচেষ্টাও অব্যাহত আছে। স্বল্প কয়েক বছরে যে কটি সৌখীন নাট্য-সংস্থা নাট্য রসিকদের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে ঋতুরাজ সংস্থা তাদের মধ্যে অন্যতম।

১৯৬৮ সালে ২৫শে ডিসেম্বর বানীপুর লোক-উৎসবে ঋতুরাজ নাট্যকার দীপ্তিকুমার শীলের "উত্তম পুরুষ" নাটকটি প্রথম অভিনয় করেন। এবং এঁরা ওই ২৫শে ডিসেম্বর দিনটিকেই প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে গণ্য করে। যদিও সংস্থার সংগঠন এর বেশ কিছুদিন পূর্বেই শুরু হয়েছিল।

ঋতুরাজ দীপ্তিকুমার শীল রচিত 'উত্তম পুরুষ' নাটকটি পরবর্তীকালে কলকাতায় বিশ্বরূপা মঞ্চে এবং অন্যান্য জায়গায় কয়েকবার অভিনয় করেন। এরপর এঁরা দীপ্তিকুমার শীল রচিত 'অজানা কাহিনী' নাটকটি রঙমহলে ১৩ই ফেব্রুয়ারী ৭২ অভিনয় করে। এবং ওই দিন এঁরা বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজনও করেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী ৭২ ওই "অজানা কাহিনী" নাটকটি এরা বানীপুর লোক উৎসবে পুনরাভিনয় করে। দীপ্তিকুমার শীল সংস্থার নাট্য পরিচালকের দায়িত্বও বহন করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঋতুরাজ সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত।

যাঁদের নিয়ে এই নাট্যসংস্থা তাঁরা হলেন মিহির লাল চন্দ্র, অশোক চন্দ্র, প্রভাত কুমার শীল, রঞ্জিত বসাক, যাদব ব্যানার্জী, বিশু রায়, শুভময় গুপ্ত, মদন মজুমদার, প্রদীপ শীল, আবিরা চন্দ্র, নমিতা বসাক, ঝর্ণা বসাক, নবকুমার শীল।

নাট্য আন্দোলন/রাইফেল

১৯৬৮ সালের এক স্মরণীয় সন্ধ্যায় পেশাদারী যাত্রার দেহে সঞ্চারিত হল নূতন প্রাণ। সাড়ে তিনঘণ্টাব্যাপী এই প্রাণ সঞ্চারণ পর্বে মূক আসর ফিরে পেল তার বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া ভাষা—যা হারিয়ে গিয়েছিল সস্তা সেন্টিমেন্ট আর বস্তাপচা রোম্যান্টিক চিন্তার আবর্তের মধ্যে। সেই দুঃস্বপ্নময় আবর্তের ভয়াবহ মায়াজাল ছিন্ন করে পৌঁছে দিল যাত্রাকে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীর কাছে, মিলন ঘটাল স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া দুই অবিচ্ছেদ্য সত্তার, অবসান ঘটাল দুই সমধর্মীর অনভিপ্রেত বিরোধের। মেকী আনন্দের উপকরণকে পরিণত করল সংগ্রামের হাতিয়ারে। নবসূর্য্যের উদ্ভাসিত কিরণচ্ছটায়, তমসাচ্ছন্ন রাত্রির অবসানের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদের তাপকে পাথের করে এবং জনতা আর আসরের দুস্তর ব্যবধানকে মুছে ফেলে ঘোষিত হল মহান মিলন সংবাদ, ধ্বনিত হল জনতার বিজয়বার্ত্তা, মূর্ত হল অগ্নিযুগের কথা।

উৎপল দত্ত বিরচিত "রাইফেল" যাত্রায় ধিকৃত হল স্বাধীনতার এই বহুল প্রচারিত সংজ্ঞাটি যে—স্বাধীনতা এসেছে বিনা রক্তপাতে, অহিংস সংগ্রামের দৌলতে। দেশ নাকি স্বাধীন হয়েছে খদ্দর পরার ফলে, আমরা একমনে চরকা কেটেছি বলে।

১৯৬৮ সাল, কলকাতার একপ্রান্তে গড়িয়াতে কৃষক জীবনের উপর একটা নাটক অভিনয় হল। মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আমার মাটি'। হায় মাঠের চাষী, সম্বৎসরের জমা চোখের জলের নদীর ধারে থাক তুমি। বাঁধ ভাঙা বন্যায় সর্বস্ব খুইয়ে থাকে শুধু তোমার বুকভরা নিশ্বাস! তাই তোমার বাঁচার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে লড়াই করে। প্রতিদিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেঁচে

থাকতে হবে তোমাকে। ৬৯ নবেম্বর স্থানীয় দর্শক 'আমার মাটির' মধ্য দিয়ে এই কথাই শুনতে পেল কয়েকটি কৃষক চরিত্রের মুখ দিয়ে। 'আমার মাটি' নাটকটি ইতিপূর্বে বিশ্বরূপায় গিরীশ নাট্য প্রতিযোগিতায় পাণ্ডুলিপি থাকাকালীন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। দিল্লীতেও সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই সংস্কৃতি গোষ্ঠীর প্রধান উদ্যোক্তা হচ্ছেন রঞ্জিত মিত্র। ইনি আগে শৌভনিক গড়ার সময়ে নাট্যাধ্যক্ষ ও আলোক শিল্পী ছিলেন। এছাড়া রূপশিল্পতেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে। মেকাপের উপর ইনিই সর্ব্বপ্রথম একটি বই লিখেছেন। 'অঙ্গরচনার রূপ রীতি ও প্রয়োগ'। ৬৯ সালে সংস্কৃতি একটি নাট্য উৎসব করলেন তাতে উপেন্দ্রনাথ সেনের 'পার্থ সারথি' ও পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'ছায়া নায়িকা' অভিনয় হল। ৭০-এ এসে আবার কৃষক জীবনে গেলেন, মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আবাদ' অভিনয় করলেন। এই বছরেই রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' ও মুলুকরাজ আনন্দ-র 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' (নাট্যরূপ রঞ্জিত মিত্র) মঞ্চস্থ করলেন। এই সব নাটক নিয়ে এরা বাংলা বিহার উড়িষ্যায় বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেছেন। নাটকগুলির চরিত্র চিত্রণে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন :— রঞ্জিত মিত্র, হেমরঞ্জন চক্রবর্তী, শংকর রায়, স্বদেশ চক্রবর্তী, সমর চক্রবর্তী, সুভাষ বসু, সুরেশ বসু, অরুণ চ্যাটার্জী, গৌরাঙ্গ বল, শিবু দাস, মালা দাস, শাশ্বতী রায়, সবিতা মিত্র, আলপনা ব্যানার্জী, মনীষা চ্যাটার্জী, শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী, মিনতী চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে।

১৯৭২ সালের নাট্যোৎসব উপলক্ষে ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'ব্যাণ্ডেল লোকাল' ও রঞ্জিত কুমার মিত্র নাট্যকৃত 'পদ্মা-নদীর মাঝি'—নাটক দুটির প্রস্তুতি চলছে।

লিট্‌ল থিয়েটার থেকে লোকায়ন

১৯৬৯ সাল, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের আর এক শিল্পী অরুণ রায়, এল. টি. জি. থেকে চলে এসে নিজের ভাবনাকে রূপ দেবার ইচ্ছায় দল গড়ার স্বপ্ন দেখলেন, কয়েকটি উৎসাহী যুবক তাকে ঘিরে দলও গড়লেন নাম 'লোকায়ন'।

দলের প্রথম সম্পাদক হলেন চয়ন রায় চৌধুরী। ৩১শে জুলাই আমরা মুক্ত অঙ্গনে দেখলাম মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বীপের রাজা'। মানবতার ওপর আরোপিত বর্বর নির্যাতন ও তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির স্বপ্ন-ই দ্বীপের রাজার প্রেরণা বলা যায়। ওই নাটকের সঙ্গীতে ছিলেন ভূপেন হাজারিকা, পরিচালনায় অরুণ রায়। ১৯৭০ সালে ১০ এপ্রিল মিনার্ভা থিয়েটারে লোকনাথ ভট্টাচার্য্যের 'কলকাতা-কলকাতা-কলকাতা' নাটক করলেন। কলকাতার মানুষের সুখ দুঃখের নাটক বলা যায় এই নাটককে। এই নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা করেছিলেন রাজেন তরফদার। ১৯৭০ সালে এঁরা তুলসী লাহিড়ীর চৌর্য্যানন্দ, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বাজপাখী করেন। ১৯৭১ সালে ১৯শে জানুয়ারী থবন মহলে আমরা দেখলাম মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'গন্ধ রাজের হাততালি'। ১৯৭১ সালে এরা রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' রবীন্দ্র জন্ম উৎসব উপলক্ষে ১০মে মুক্ত অঙ্গনে মঞ্চস্থ করলেন। ৭০ সালের সূচনাতেই নতুন পথের সন্ধান পেলেন। প্রতি বৎসর নাট্যউৎসব করতে হবে। নিজেদের স্মারক গ্রন্থ পুস্তিকায় প্রচার শুরু করলেন। আরো নাটক দেখুন, ভাল নাটক দেখুন। ১৯৭২ সালের সূচনাতেই নাট্যোৎসবে সঙ্গে নাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন পর্ব শুরু করলেন, সেই সঙ্গে প্রচার পরিকল্পনার সাথী সংস্থাদের নাম ও নাটক জুড়ে দিলেন। ওঁরা বিশ্বাস করেন সাথী সংস্থা বাঁচলে ওঁরাও বাঁচবেন। সততা আর বিশ্বাস পাথেয় করে এগিয়ে যাবার শপথ নিলেন। ওঁদের সঙ্গে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অংশ নিয়েছেন তাঁরা হলেন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, দীপক চক্রবর্ত্তী, চয়ন রায়চৌধুরী, অতনু রায়, বাদল সেন, মানিক চক্রবর্ত্তী, পরিতোষ সরকার, অজয় দে, দিলীপ দাস, তুষার মিত্র, রতন মুখার্জ্জী, দেবনাথ অধিকারী, মায়া ঘোষ, সীমা দাস, স্বপন, শুভাশিষ মুখার্জী, বীরেন দাস, অমল ঘোষ, অজয় ভট্টাচার্য্য, শান্তি সিনহা, অরুণ রায়, পরে জয়ন্ত মুখার্জী, প্রদীপ সেনগুপ্ত, পিনকী সাহা, রঞ্জন দাস এবং দিলীপ ভট্টাচার্য্য, রূপসজ্জায় অনন্ত দাস, আলো পিণ্টু বসু, নৃত্য শক্তি নাগ। এই সঙ্গে ওদের স্মারক গ্রন্থে বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে আজকের নাটক প্রযোজনা ও অভিনয় সম্বন্ধে কয়েকটি ভাল লেখা প্রকাশ হয়েছিল, আমি সেই লেখা থেকে চারটে লেখা এখানে ছাপলাম। আশাকরি নাট্যকর্মীদের কাছে এই প্রশ্ন উত্তরগুলো অনেক প্রশ্নেরই সমাধান করতে পারবে।

এই মুহূর্তের নাট্য চর্চা

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় এই মুহূর্তটির মূল্যায়ণ বড সহজ নয়। চল্লিশের দশকের শেষাশেষি কিংবা পঞ্চাশের দশকে কিংবা ষাটের দশকের একেবারে শুরুতে যে নাট্যগোষ্ঠীগুলি কাজ শুরু করেছিলেন, আমরা বহুদিন তাঁদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে এসেছি। অথচ যা অনিবার্য, এতদিনে আমাদের অজান্তে তাই ঘটে গেছে। অর্থাৎ বার্ধক্যের ক্লান্তি অধিকাংশ গোষ্ঠীকেই আচ্ছন্ন করেছে। এত বছরের দীর্ঘ চেষ্টায় দর্শকের কাছে প্রত্যাশিত সাড়া ন পেয়ে কোন কোন নাট্য-নির্দেশক নিরুৎসাহ। আবার অন্য কেউ কেউ সাফল্যে পেঁছে আর ঝুঁকি দিতে নারাজ। অথচ ভাগ্যক্রমে প্রকৃতি শূন্যতা ভরে অনিবার্যভাবেই। তাই গত বছর দেডেক ধরেই লক্ষ্য করেছি, নতুন নাট্যকার ও নতুন নাট্যগোষ্ঠী আবিষ্কার করছি অতর্কিতে বারংবার। এই সময়ের মধ্যেই লোকনাথ ভট্টাচার্য ও নভেন্দু সেনের প্রথম নাটক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে পর্বান্তর ঘটেছে। সিল্যুয়েটের 'আবৃত্ত দশমিক', কোরাসের 'এক যে রাজা' (বিশ্বাসযোগ্য সূত্রের খবরে মনে হয় ক্লাস থিয়েটারের 'শৃঙ্খল' নাটকেও), নতুন নাট্যগোষ্ঠীর সাহসিক আবির্ভাব দেখেছি। অর্থাৎ ভরসা রাখা যায়, কিছুই থেমে যাবে না।

নতুন নাটক বা প্রযোজনাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য, প্রচলিত নাট্যরীতি বর্জন করে অন্য নাট্য-রীতির সন্ধান এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশে প্রত্যক্ষতা অর্জনের চেষ্টা। এই প্রত্যক্ষতায় পৌছবার চেষ্টায় সুর ও ছন্দের ভূমিকা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই উপলব্ধি যেন আমরা সহসা লাভ করেছি যে, রাজনীতি আমাদের এই বাংলা দেশে যতই তীব্রভাবে জীবন মরণের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে, নাটকের উপর ততই দায় এসে পড়ছে, তাকে এই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে দেওয়া-নেওয়ার জটিলতর সম্পর্কে জড়াতে হবে। নয়তো হয়তো নাটকই অবান্তর হয়ে পড়বে।

সংকট ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পূর্বনির্দিষ্ট সম্পর্ক নেই জানি। তবুও মনে হয়, এই সংকটের মধ্যেই বাংলা নাট্যচর্চার অন্যতম ভূমিকার উন্মেষ ঘটছে, এক তরুণতর থিয়েটারের সূচনা হচ্ছে। এখন থেকে এই নতুন নাট্যকর্মীদের দিকেই আরো আগ্রহে তাকিয়ে থাকার সময়।

নাট্যকারের ধর্ম

রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত

প্রঃ—এক বিশেষ নাট্যসংস্থার জন্য নাটক রচনায় নাট্যকারের কার্য্যক্রম কি ?

উঃ—নাটক সাহিত্যও বটে আবার ফলিত সাহিত্যও বটে। নাটকের শেষ সাফল্য আসে মঞ্চস্থ হবার পরই। নাটকের অপর আনুসঙ্গিক প্রসঙ্গ অর্থাৎ মঞ্চ, শব্দ, আলো, অভিনয় যথাযথভাবে যুক্ত হবার পর। সমকালীন নাটকের উপযুক্ত জাতীয় পরিবেশের কথা ভেবেই নাট্যকারকে নাটক রচনা করার কথা ভাবতে হয়। এক্ষেত্রে কোন বিশেষ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও একটি দেশের 'নাটক'-শিল্পটির পরিবেশই নাট্যকারকে নাটক রচনায় প্রবুদ্ধ করে। এবং বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা অভিনীত হবার পরেও মূলতঃ নাটকটি চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ থিয়েটারে উন্নত হবার পর অভিন্ন থাকে। তবে একটি বিশেষ সংস্থার সাথে যুক্ত থাকাকালীন অবস্থায় সংস্থার সভ্যদের চেহারা, কণ্ঠস্বর, অভিনয়ভঙ্গি ইত্যাদি নাট্যকারকে কিছু সূক্ষ্ম সাহায্য করতে পারে। আমার বিশ্বাস প্রতিটি গুণী সংস্থাই জন্মপ্রকাল থেকে অভিনয় ধারার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ষ্টাইল বা রূপ লাভ করে। সংস্থার জন্য লিখিত নাটকে নাট্যকার এই নির্দিষ্ট অভিনয় ধারা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত থাকলে নাটকটি মঞ্চায়ন কালে সহজ হয়ে আসতে পারে। পরিশেষে বলি মঞ্চীকরণের দায়িত্ব বা সিংহভাগ দায়িত্ব অবশ্যম্ভাবিরূপেই পরিচালকের উপর বর্তায়। সুতরাং নাট্যকারের সচেতন হওয়া উচিৎ যে নাটক লেখার পরেই মূল দায়িত্ব শেষ হয় না। পরবর্তী সময়টাতে পরিচালকের প্রতি আস্থাবান হওয়া ও তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে নিজের দৃষ্টি ভঙ্গির সাযুজ্য ঘটানোতেও যত্নবান হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে নাট্যকারের আত্মাভিমান বর্জনীয়।

প্রঃ—নাট্য প্রযোজনায় নাট্যকারের ভূমিকা কি ?

উঃ—দ্বিতীয় প্রশ্নে মতদ্বৈধ আছে। একটি মতে নাট্য প্রযোজনায় নাট্যকারের এক বিশেষ ভূমিকা আছে, আর অন্যমতে নাট্য প্রযোজনায় নাট্যকারের আদৌ কোন ভূমিকা নেই। আমি যদিও এই মত দুটির বিশেষ কোন একটির দিকে সরে যাচ্ছিনা শুধু দুজনেরই যৌক্তিকতার দিকে লক্ষ্য রাখবো। Raymond Williams বলেন "The whole magic lies in the words"। সুতরাং একটি সফল নাটকের মূল কারণ তার texual purity. থিয়েটারের

প্রধান মেরুদণ্ড যখন এই texual purity তখন নাট্যকারের অবশ্যই এক ভূমিকা থাকে। অন্ততঃ আগেকার দিনের থিয়েটারগুলোর তাই দেখা যেত। কিন্তু সমকালীন সারা পৃথিবীর নাট্য প্রযোজনাগুলির দিকে চোখ ফেরালে আমরা অন্য জিনিষ লক্ষ্য করব। সেখানে ঐ texual purity-কে চূড়ান্ত মর্যাদা দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র সাংঘাতিক text থাকলেই তো আর থিয়েটার হয় না তাহলে তো নাট্য প্রযোজনা একটি একক শিল্প হ'ত। সেই জন্যই দেখা যায় কোন কোন সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়ে, আর শৈল্পিক দিকগুলো অনিবার্য্য ভাবে প্রবেশ করে এবং পূর্ণভাবে মূর্ত হয় ও সব মিলিয়ে শিল্প হয়। জুলিয়ান বেকের হ্যাপেনিং প্রভৃতি নাট্য প্রযোজনাগুলিতেও একটা খুব সাধারণ কাঠামোর রূপ রেখার মধ্যে দিয়েই শিল্পের অন্যান্য দিকগুলো ঢুকে পড়ে সব মিলিয়ে এক চূড়ান্ত শিল্প সৃষ্টি করেছে—থিয়েটার। texual purity বাদ দিয়ে নাটকের ইতিহাসে এক প্রধান নাম—ব্রেখট্। সুতরাং ইদানীং নাট্য প্রযোজনায় নাট্যকারের ভূমিকা বিতর্কমূলক। থিয়েটারে পর্যবসিত হবার পর success-টাই শেষ কথা।

প্রঃ—নাট্যকার নিজেই পরিচালক হলে সুবিধা বা অসুবিধা হয় কিনা?

উঃ—আমি নিজে পরিচালক না হওয়ায় এ প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে নাট্যকার নিজেই পরিচালক হ'লে নাটকের দোষত্রুটি সহজেই দূরীকরণ সম্ভব হতে পারে। যিনি নাট্যকার তিনি নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং চরিত্রগুলি সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল সচেতন হওয়ায় নাটকটি পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে সহজ সাধ্য হয়। তবে থিয়েটার-বোধই হল আসল। এই বোধের মাত্রানুযায়ী একটি নাটক সফল বা বিফল হ'তে পারে। নাট্যকার নাটক রচনার সময় অনেক কিছুই লিখতে পারেন যা মঞ্চের তিন দেওয়ালের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে তিনি পরিচালক হলে তাঁর অসুবিধা নিজেই ভালরকম উপলব্ধি করতে পারবেন এবং সাধ্যমত বিকল্প ব্যবস্থাও করতে পারবেন। সুতরাং বলব নাট্যকারের পরিচালক হওয়ার ব্যাপারে সুবিধা বা অসুবিধার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই।

প্রঃ—নাট্যকার যদি প্রযোজিত নাটকে কোন বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করেন তবে তাঁর নিজের সৃষ্ট চরিত্র বিশেষভাবে মূর্ত হয় কি?

উঃ—আমাদের সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার নাট্যকার ও পরিচালক উভয়ের কাছেই চরিত্রগুলি একই অবয়ব নিয়ে আসে। নাট্যকারের মত পরিচালকের

কাছেও চরিত্রগুলি একই ভাবে মূর্ত হয়, সমান প্রিয় হয়ে ওঠে। গুণী পরিচালক হলে স্বভাবতই অভিনয়কালে নাট্যকারই অভিনেতা কিনা প্রশ্নটি গৌণ হয়ে পড়ে। কারণ পরিচালকের চিন্তায় প্রথম থেকেই থিয়েটারের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দানা বেঁধে থাকে। মঞ্চে নাট্যকারের অভিনেতারূপে উপস্থিতি কোন কিছুই তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করে না। আলোচ্য বিষয়টাকে উল্টোভাবে দেখলে অন্য সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। পরিচালক অনুপযুক্ত হলে এবং নাট্যকার যদি সত্যকার ভাল অভিনেতা হন তাহলে নাট্যকার অভিনীত বিশেষ চরিত্রটি যথাযথভাবে রূপায়িত হতে পারে। সুতরাং এখানেও বিশেষ সুবিধা বা অসুবিধা নেই। সবকিছুই নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনয় প্রতিভার এবং এই সব কিছুর যথাযথ সমন্বয়ের উপরে নির্ভরশীল।

প্রঃ—বিদেশী নাটকের অনুবাদ রচনায় লক্ষণীয় কার্যক্রম কি?

উঃ—ইদানীং কালে এই প্রশ্নটি বহুবার উত্থাপিত হয়েছে। অনূদিত নাটকের অভিনয় সম্পর্কেই অভিযোগ উঠছে বহুবিধ। এই প্রসঙ্গে বিদেশী নাটকের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইঙ্গিতদান বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শিল্প—এক অন্তহীন আবিষ্কার। দেশ কালের ঊর্ধ্বে শিল্পের অবস্থান। 'এটা আন্তর্জাতিক সাহিত্যের কাল' (গ্যেটে)। তবুও আমাদের দেশে বিদেশী নাটকের মঞ্চীকরণ সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠছে তা তুলনা রহিত। এই বিদ্বেষের কারণ আমাদের খুঁজে বার করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে এমন অনেকে আছেন যাঁরা নাটক লেখার চেষ্টা করে থাকেন (বলাবাহুল্য চেষ্টা মাত্রই ফলপ্রসূ হয় না)। তাঁদের নাটক অখ্যাত ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ার সাথে সাথেই তাঁরা মঞ্চ সফল বিদেশী নাটকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন এবং নিজেদের মৌলিক নাটকের (!) স্বপক্ষে ওকালতি শুরু করেন। বিদেশী নাটকের বিরোধিতার দ্বিতীয় কারণ মূঢ় জাতীয়তাবোধের আবিলতা এবং তৃতীয় কারণ সাধারণ মৌলিক রসবোধের অভাব।—সেই শিল্পবোধ যার সাহায্যে সোফোক্লেস, সেক্সপীয়র, ইবসেন, পিরানদেলও, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাটকের মানুষগুলোর শাশ্বত মানবমনকে চেনা যায়। ঐতিহাসিক চেতনার অভাবের ফলেই এই কারণগুলি জন্ম নেয়।

যে কোন দেশের নাটকের ইতিহাস আলোচনা করলে বিদেশী নাটকের

প্রভাব ধরা পড়বে। ইংল্যাণ্ডে নাটকের দুই গৌরবময় যুগ ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের প্রথম ভাগ। এই সময়কার মহান নাট্যকার মার্লো, শেক্সপীয়র, ওয়েবস্টাম প্রভৃতির ওপর বিদেশী নাট্যকার প্লটাস, টেরেন্স ও সেনেকার প্রভাব প্রভূত। পরবর্তী সময়ের শ' গলস্ওয়ার্দী, বার্কার প্রভৃতি ইবসেনের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও বলি ইবসেন ও তাঁর নাটকের ভাগ্যে। 'উদ্ধত দাঁড়কাক', 'খোলা নর্দমা' ইত্যাদি অলংকার জুটেছিল কিন্তু লক্ষণীয় তাঁর নাটক বিদেশী, সুতরাং মঞ্চস্থ করা উচিত নয় একথা কখনো বলা হয়নি।

শুধু মাত্র শেক্সপীয়র আমাদের বাংলা নাটকের আদিযুগে প্রায় প্রত্যেক নাট্যকারের গঠনরীতির ওপর প্রভাব ফেলেছিলেন। বাংলা নাটকের গঠনশৈলী পুরোপুরী বিদেশী নাটকের ছাঁচে গড়া। একেবারে আধুনিকালে বিভিন্ন সংস্থা আয়োজিত বিদেশী নাটকের প্রযোজনা বাঙালী নাট্যমোদীদের রুচি ও বাংলা নাটকের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

অনুবাদ নাটকের স্বপক্ষে এই যে বহুবিধ যুক্তির উল্লেখ করলাম এর সবকটি মাথায় রেখে নাট্যকার বিদেশী নাটকের অনুবাদ করতে প্রয়াসী হন। তবে এক্ষেত্রে আরও কয়েকটি বিষয়ের ওপর নাট্যকারের সবিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। যা কিছু বিদেশী তাই অনুবাদ করা বা রূপান্তর করা শ্রেয় একথা আমি বলব না। বিদেশী কথাটাই বাংলামঞ্চে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পেতে পারে না। শিল্পের একটি মূল্যবান সর্ত স্রষ্টা ও শিল্পরসিক সমষ্টির মধ্যকার যোগসূত্র। বিদেশী নাটক অভিনয়কালেও এই কথা মনে রাখা বাঞ্ছনীয়। আরও বিশদভাবে বলবো, বিদেশী নাটকের সেই দেশে সার্থকতার প্রশ্ন মূল নয়। ঐ নাটকের সঙ্গে আমাদের দেশের কৃষ্টি ও সমাজ-মানসের আত্মীয়তার প্রশ্নটাই বিচারাধীন। বেকেটের 'এণ্ড-গেম', ইয়নেসকোর 'কিলার' পাশ্চাত্য পটভূমিকায় সফল সৃষ্টি, কিন্তু এগুলি যে কৃষ্টিগত ও সামাজিক ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি তার সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্ক ক্ষীণ। সুতরাং ঐ জাতীয় নাটকের প্রযোজনা দায়িত্বহীনতার পরিচয়। নাট্যকারকে বিচার করতে হবে যে নাটকটি তিনি নির্বাচন করছেন তা স্থানীয় দর্শকের কাছে স্বীয় আবেদন পৌঁছে দিতে পারে কিনা। সর্বস্তরে না হলেও অন্ততপক্ষে মোটামুটিভাবে তাৎপর্যস্তরে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

নাট্য পরিচালকের কার্য্যক্রম

প্রশ্ন : অরুণ রায়। উত্তর : উৎপল দত্ত

প্র :—নব গঠিত নাট্য সংস্থার নাট্য পরিচালকের প্রথম নাটক নির্ব্বাচনে মুখ্য কর্তব্য কি ?

উঃ—কোন নাট্য সংস্থা যদি সমাজ বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ না করেন, তবে সংস্থা গড়া অর্থহীন। তবে সমাজ গড়ার নানারকম দিক আছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। কোনও কোনও সংস্থা প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণী সংগ্রামকে সফল করতে সমাজের শোষক চরিত্রের উদ্‌ঘাটন করে এবং নাট্য প্রযোজনার মাধ্যমে জনমানসে তীব্র ঘৃণা সঞ্চারিত করে শাসক-শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। আবার কোনও কোনও সংস্থা সমাজ গঠনের অন্য দিক যথা নারীর অধিকার, শিক্ষার প্রসার, হিন্দু মুসলমান মৈত্রী, ইত্যাদি বক্তব্য সম্বলিত নাটক করে। এই দু'ধরণের সংস্থাই সমাজ বিপ্লবের সহায়ক। এখন পরিচালকের চিন্তানীয় তাঁদের দল গঠনের উদ্দেশ্য কি ? এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এমন বক্তব্য সম্বলিত নাটকই নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। তবে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে সাধারণ মানুষের বোধগম্য বিষয়ে এবং বেশী মানুষের আশা হতাশা সুখ দুঃখের প্রতিফলন নেই যে নাটকে তা নেহাৎই অর্থহীন। সুতরাং নাটক সংস্থার সমস্ত সভ্যদের কাছে প্রযোজনার যোগ্য বিবেচিত হলেই নাটক নির্ব্বাচিত হওয়া উচিৎ।

প্রঃ—একটি নাটক সকলের সবদিক দিয়ে পছন্দ হলেই কি তার প্রযোজনা সম্ভব ?

উঃ—অবশ্যই নয়, মনে রাখতে হবে যে সংস্থায় নাটক প্রযোজিত হবে—তার অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা আবশ্যক। যেমন ধরা যাক সংস্থার অভিনয় করার মত সভ্য সংখ্যা ১৫ জন কিন্তু নির্ব্বাচিত নাটকের চরিত্র সংখ্যা তিরিশ—সদস্যের সংখ্যা তিন জন কিন্তু স্ত্রী চরিত্র সংখ্যা পাঁচ কিংবা ৭ জন শিশুর একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়াও আছে অর্থকরী দিক। হয়তো নাটকের দৃশ্যসজ্জার অত্যন্ত বেশী অর্থ দরকার কিংবা মূল্যবান পোষাক প্রয়োজন যা আদৌ সংস্থার সাধ্যায়ত্ব নয়—তবে তৎক্ষণাৎ নাটক সাময়িক ভাবে বাতিল করে পরবর্তী প্রযোজনার জন্য রাখা যেতে পারে। সুতরাং সদস্যশক্তি, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নাট্য প্রযোজনা অত্যন্ত নির্ভরশীল তাই পছন্দসই নাটক প্রযোজনার লোভে সংস্থার বাইরে থেকে লোক সংগ্রহ করে চরিত্র বণ্টন অথবা

প্রচণ্ড ঋণের ভারে পর্যুদস্ত হওয়া অবশ্যই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়। তাই বক্তব্য অবিকৃত রেখে সংস্থার সমস্ত দিক চিন্তা করেই নির্ব্বাচিত নাটক প্রযোজিত হওয়া উচিৎ।

প্রঃ—যথোপযুক্ত নাটক নির্ব্বাচনের পর নাট্য পরিচালকের পর্য্যায়ক্রমে কার্য্যক্রম কি?

(১) প্রথমেই তিনি নাটকটিকে প্রযোজনার সুবিধার জন্য ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদনা করেন—এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ—কারণ প্রযোজনার পূর্ব্বে নাটক নিতান্তই সাহিত্যকর্ম—কিন্তু প্রযোজনার জন্য প্রয়োজন অনেকগুলি ব্যবহারীক দিক যেমন দর্শকবোধ্য হওয়ার জন্য বক্তব্যকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করা—সংলাপে ও ঘটনার মাধ্যমে। এছাড়াও মঞ্চ সজ্জা, আলোকসম্পাত, রূপসজ্জা সঙ্গীত ইত্যাদির সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে যথাবিধ চিন্তা করেই নাটক সম্পাদন করা পরিচালকের এক গুরুদায়িত্ব—তার এই সময়ই সহকারীর যোগ্যতাও নির্দ্ধারিত হয়ে যায়—কারণ সহকারী পরিচালকের কাজ প্রায় এই সময় থেকেই শুরু হয় তিনি মুখ্য পাণ্ডুলিপিতে পরিচালকের সম্পাদিত অংশ সাজিয়ে গুছিয়ে ক্রমাম্বয়তা বজায় রাখতে সহায়তা করেন।

(২) সম্পাদিত নাটক আরও একবার পরিচালক সভ্যদের সামনে পাঠ করে মতামত গ্রহণ করবেন—আর তার পরেই চরিত্র বণ্টন হবে। চরিত্র বণ্টনের ব্যাপারে পরিচালকের নির্দেশ অকাট্য—এখানে সহকারীর কোনও কাজ নেই—মতামতের নিষ্প্রয়োজন। চরিত্র বণ্টন হয়ে যাওয়ার পর অভিনেতারা নিজের নিজের পাঠ যথারীতি লিখে নিলেন—এবং পরিচালকের নির্দ্দেশিত উপায়ে পদ্ধতিতে পড়লেন—যখন দেখা গেল প্রতিটি অভিনেতাই নিজ নিজ চরিত্রাংশ নির্দ্দেশিত পদ্ধতিতে পড়তে পারছেন তখন মহলা সাময়িক বন্ধ রইল। অভিনেতারা আর একত্রিতভাবে পার্ট না পড়ে সময়ানুযায়ী পার্ট পড়তে থাকলেন মহলা কক্ষের বাইরে, নিজের বাড়ীতে বা অন্য কোথাও।

(৩) অভিনেতাকে তার পার্ট মুখস্থ করার অবকাশ দিয়ে পরিচালক নিয়োজিত হবেন থিয়েটারের অন্যান্য কাজে—যথা মঞ্চস্থাপত্য, আলোক সম্পাত, সঙ্গীত সংযোজন, পোষাক পরিচ্ছদ, রূপসজ্জা ইত্যাদি প্রভৃতি।

প্রঃ—থিয়েটারের কলাকুশলীরাও অবশ্যই নাটক পাঠ শুনেছেন এবং পরিচালকের সঙ্গে যথারীতি আলোচনা করে নিজস্ব ধারণা সৃষ্টি করেছেন?

উঃ—অবশ্যই—অন্যথায় নিজ নিজ বিভাগের কাজ সম্পাদন করবেন কি

করে! সুতরাং অভিনেতাদের মত তাঁরাও সমস্ত নাটক শুনে বিভাগীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছেন। আর তার পরই পরিচালকের নেতৃত্বে কাজ শুরু করেন।

প্রঃ—এরপরও পরিচালকের অধীনে না থেকে স্বাধীনভাবে বিভাগীয় কলাকুশলীরা নাটকের প্রয়োজনানুযায়ী কাজ করছেন না কেন?

উঃ—কারও নির্দেশ বা নেতৃত্ব স্বীকার করলেই স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় না। অভিনেতা যেমন শুধু অভিনয় সম্বন্ধেই মুখ্যত চিন্তা করেন সেরকম বিভাগীয় কলাকুশলীরা অন্য বিভাগের কাজে সাযুজ্য রেখে মুখ্যত নিজের বিভাগীয় কাজ সম্বন্ধেই চিন্তা করেন। কিন্তু পরিচালকই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সমস্ত বিভাগীয় কাজের সমন্বয় ঘটান আর তাতেই জন্ম নেয় এই সমন্বয়িত শিল্প—থিয়েটার।

প্রঃ—অভিনেতাকে তার চরিত্র সম্যক বুঝে নিতে সহায়তা করার পর মহলা বন্ধ রেখে পরিচালক পর্য্যায়ক্রমে কি কাজ শুরু করেন?

উঃ—(১) প্রথমেই তিনি মঞ্চ স্থপতির সঙ্গে আলোচনা করে নাটকের উপযোগী মঞ্চসজ্জার বিষয়ে অবগত হন। তারপর আলোচিত মঞ্চ স্থাপত্যের মডেল তৈরী করে পরিচালকের হাতে তুলে দেন।

(২) পরিচালক এবার অভিনেতাদের সমক্ষে আবার মহলা শুরু করেন যাকে টেবিল টপ বলা হয় [মডেল ষ্টেজে মঞ্চ সজ্জার আসবাবের মডেল রেখে অভিনেতাদের চলা ফেরার সম্বন্ধে সচেতন করেন।] অভিনেতারা তাদের "বিজনেস" নিজেদের পার্টের পাশে পাশে লিখে নিলেন—এবং বিজনেস উল্লেখ করে নিজেদের অভিনয়াংশ পাঠ করলেন। এই সময় সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব অপরিসীম—তিনি অরিজীনাল স্ক্রীপ্টে সবকিছু মার্ক করেন।

(৩) 'টেবিল টপ' এর পর অভিনেতারা দাঁড়িয়ে মহলা শুরু করবেন নিজেদের খাতায় লেখা 'বিজনেস' এর প্রতি নজর রেখে। মুখস্থ হয়ে গেলেও বিজনেস-এর ব্যাপারে সচেতন হওয়ার জন্য খাতা হাতে মহলার প্রয়োজন। এবং প্রম্পটার বা স্মারক নামক ব্যক্তির অনুপস্থিতি আবশ্যক। বহু সংস্থায় প্রম্পটার এক অপরিহার্য্য ব্যক্তি—কিন্তু কোনও নাট্য সংস্থার পক্ষে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

প্রঃ—মহলার সময়ে আদর্শ পরিচালকের কর্ত্তব্য কি?

উঃ—প্রথমতঃ পরিচালকের কর্ত্তব্য মহলায় শৃঙ্খলা সম্বন্ধে সভ্যদের সচেতন

করা। মহলার শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীকে কঠোরতম শাস্তি দিতে যদি কোন পরিচালক দ্বিধা করেন তবে সে সংস্থার পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই মহলার শৃঙ্খলা রক্ষার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হল—

(ক) মহলায় সবার উপস্থিতি। যার অভিনয়ে অংশ নেই তারও।

(খ) মহলার সময় অন্য বিষয় আলোচনা না করা।

(গ) কথা না বলে অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

(ঘ) ধূমপান বন্ধ রাখা।

(ঙ) অন্য বই পাঠ না করা।

এর একটা ব্যবহারিক সুফল আছে, যথা বিকল্প চরিত্রে অভিনয় করার জন্য যে কোন অভিনেতাই তৈরী হয়ে যান এবং অভিনেতার কাছে নাটকের সামগ্রিক চেহারা প্রতিভাত হয়ে নিজ চরিত্রের সাথে নাটকের সাযুজ্য উপলব্ধ হওয়ায় অভিনয় সার্থক হলে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়তঃ পরিচালককে অবশ্যই অত্যন্ত পরিশ্রমী হওয়া বাঞ্ছনীয় তবে সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হবে যদি পরিচালকের ব্যবহারে অভিনেতা আহত হন। সুতরাং অভিনেতার দৌর্বল্যে পরিচালকের ব্যঙ্গ বা ক্রোধ রূঢ় ব্যবহার অভিনেতার আনন্দ বিনষ্ট করে। পক্ষান্তরে উদ্দীপনাময় মহলা অভিনেতাকে আনন্দিত করে এবং চরিত্র পরিস্ফুটনে পরিচালকের যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে অভিনেতার দায়িত্ব কতখানি তা অনুধাবিত হলেই মহলা আনন্দকর হয়। আনন্দদায়ক মহলা অভিনেতাকে উজ্জীবিত করে তাতেই মূর্ত হয় অভিনয়। অভিনেতার সম্যকরূপে উৎসাহ সঞ্চারে অসমর্থ হলে পরিচালকের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

(৭) এবার আলোক সম্পাত। নাটক পড়ার পর থেকে চিন্তা শুরু হলেও ব্যবহারিক কাজ শুরু হয় মহলার একবারে শেষ পর্য্যায়ে অর্থাৎ অভিনয়, দৃশ্যসজ্জা, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে শেষ হওয়ার পর। যদিও আদর্শ নাট্যশালায় মঞ্চ স্থাপত্যের কাজের সঙ্গে দৃশ্যের রঙ ও ধরণ অনুযায়ী আলোক সম্পাতের কাজ শুরু হয় অভিনেতার অনুপস্থিতিতে। কিন্তু সংস্থার নিজস্ব নাট্যশালার অভাবে অভিনেতার উপস্থিতিতে সজ্জিত মঞ্চে শুরু হয় আলোক সম্পাতের কাজ। আলোক সম্পাতকারী নাটকের অলিখিত অন্তর্নিহিত ভাব নিয়ে আলোচনা করবেন পরিচালকের সাথে মঞ্চ স্থপতির উপস্থিতিতে মঞ্চের মডেল সামনে রেখে। মনে রাখতে হবে আলোকের উপস্থিতি ও

অনুপস্থিতি অর্থাৎ আলো ও অন্ধকার সম্যকরূপে ব্যবহৃত হলে আলোক সম্পাত সার্থক হয়। অন্যথায় পরিচালক ও মঞ্চস্থপতির মুখ্য. কাজ অন্ধকারে এবং অত্যন্ত গৌণ ব্যাপারে আলোকিত হয়ে নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য বিনষ্ট করতে পারে—তারও পরে আছে দৃশ্যের রঙ পোষাকের রঙ, সময় পরিবেশ, অভিনেতার মানসিক অবস্থা ইত্যাদির বিপরীত অর্থসূচীত হতে পারে ভুল আলোক সম্পাতের ফলে। অর্থাৎ নাটকের অন্তর্নিহিত আবেগের রঙ সম্বন্ধে সচেতনাই আলোক সম্পাতকারীর অন্যতম মুখ্য অস্ত্র।

(৫) আলোক সম্পাতের পরের পর্য্যায় সঙ্গীত—পরিচালকের চিন্তানুযায়ী সঙ্গীত পরিচালক নাটকের বিশেষ বিশেষ স্থানে সঙ্গীত সংযোজন করবেন। সঙ্গীত সংযোজনার দুটো দিক আছে—প্রথমতঃ নাটকের অন্তর্নিহিত বিমূর্ত ভাব দর্শক মনে সঞ্চারিত করা—দ্বিতীয়ত নাটকের বিশেষ মুহূর্ত সংলাপ-অভিনেতার সঞ্চরণ-নেপথ্য ঘটনা পরিচালকের ধারণানুযায়ী বিশেষ জোর দিয়ে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। যেমন ওথেলোর রুমাল কুড়ান শুধু সঙ্গীত সংযোজনের ফলেই দর্শক মনে এক বিশেষ আবেগের সৃষ্টি করে। অন্যথায় বিস্ময় দুঃখ আনন্দ ইত্যাদির ঝাঁঝের ক্র্যাশ বা সরোদের টুংটাং বেহালায় দুঃখের রাগ বাজান বড়ই গতানুগতিক এবং তাতে সঙ্গীত পরিচালকের দৌর্বল্যই পরিস্ফুট হয়।

প্রঃ—নাটকের পক্ষে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীতের মধ্যে কোনটি বেশী সহায়ক। দুটি ধরণই দুভাবে সহায়তা করে। ভারতীয় সঙ্গীত নাটকের অন্তর্নিহিত বিমূর্ত ভাবকে মূর্ত করার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। কারণ ভারতীয় রাগ রাগিনীর বিশেষ সময়, ভাব অবস্থা অনুযায়ী এক এক বিশেষ রূপ বর্ণ ও স্বাদ আছে অপর দিকে বাস্তবিক অবস্থা প্রকট করতে Vivid Music হওয়ার জন্য ইওরোপীয় সঙ্গীত অত্যন্ত সহায়ক। তাই দুটোই একে অন্যের পরিপূরক রূপে সংযোজিত হলেই সার্থক সঙ্গীত সৃষ্ট হতে পারে।

প্রঃ—প্রতিটি অভিনয়ে যন্ত্রীদের সৃষ্ট সঙ্গীত সংযোজন হবে না একবার রেকর্ডিং করে যান্ত্রিক উপায়ে সঙ্গীত সংযোজিত হবে? কোনটি উপযুক্ত ফলদায়ক?

উঃ—যন্ত্রীদের সৃষ্ট সঙ্গীত সংযোজনায় প্রতিটি অভিনয় সম্পাদিত হলে বিপত্তি আসা অবশ্যম্ভাবী—কারণ যন্ত্রীরা সজীব মানুষ আর তাই তাদের মানসিক অবস্থা সঙ্গীতে ছায়া ফেলতে পারে। তাছাড়া কোনও সঙ্গীতকারই প্রতিদিন

একই সঙ্গীত নানাভাবে পরিবেশনে সক্ষম হতে পারেন না। অপর পক্ষে পরিমিত সঙ্গীত নাটকের পক্ষে অপরিহার্য্য যা সম্ভব একমাত্র রেকর্ডিং করা সঙ্গীতের দ্বারা—তাই সঙ্গীত রেকর্ড করা অবশ্য পালনীয়।

সঙ্গীত সৃষ্টির পর সঙ্গীত সংযোজিত মহলার প্রয়োজন—এবং তারপরই থিয়েটারের সমস্ত বিভাগীয় কাজ সমন্বয়িত করে মহলা দেওয়া হবে।

প্রঃ—রূপসজ্জা ও পোষাক পরিচ্ছদের কাজ শুরু হয় কখন?

উঃ—আদর্শ নাট্যশালায় মঞ্চ স্থাপত্যের সাথে সাথেই পোষাক ও রূপসজ্জার পরিকল্পনা শুরু হয়—কিন্তু প্রযোজ্য হয়ে থাকে পরে—পরিচালকের ইচ্ছা ও সময়ানুযায়ী। পরিচালকের নির্দেশিত পথে চরিত্রানুযায়ী প্রাথমিক রূপসজ্জা রূপকার নিজেই করবেন এবং রূপসজ্জাকর পরিচালকের সাথে আলোচনা করে চরিত্রগত অর্থ উপলব্ধি করে চরিত্রানুগ রূপসজ্জায় অভিনেতাকে সাহায্য করবেন। পরিচ্ছদকারও একই ভাবে পরিচ্ছদ তৈরী করাবেন অভিনেতার মাপ অনুযায়ী—চরিত্রের গঠন অনুযায়ী।

প্রঃ—পরিচ্ছদ ও রূপসজ্জা থিয়েটারের পক্ষে কতখানি সহায়ক?

চরিত্রানুযায়ী রূপসজ্জা ও পরিচ্ছদ অভিনেতার অভিনয়ের পক্ষে অত্যন্ত বেশী সহায়ক। যেহেতু অভিনেতাই থিয়েটারের একমাত্র সজীব উপকরণ সুতরাং অভিনয়ের উপর থিয়েটার অনেকখানি নির্ভরশীল। রূপসজ্জা ও পরিচ্ছদ চরিত্রানুগ হয়েও যদি অভিনেতার অভিনয়ে বা অঙ্গ সঞ্চালনে অসুবিধা সৃষ্টি করে তবে থিয়েটারের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। অপরপক্ষে যথাযথ সুবিধানুগ রূপসজ্জা ও পরিচ্ছদের সাহায্যে অভিনেতার অভিনয় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে।

প্রঃ—মহলায় আসবাব ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপস্থিতি কতখানি ফলদায়ক?

উঃ—আসবাব ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ মহলা দিলে অভিনেতা অভ্যস্ত হয় এবং সেটা অভিনয়ের পক্ষে খুবই সহায়ক। অভিনয়ের দিন যে সমস্ত জিনিষ ব্যবহৃত হবে সে সবই যদি মহলায় ব্যবহার করা যায় তবে তার ফলশ্রুতি শুভদায়ক—কিন্তু নানা কারণে সেটা সম্ভব হয় না—কখনও ভ্রমবশতঃ কখনও আর্থিক অবস্থা বা অবজ্ঞাবশতঃ, কিন্তু তার ফল সব সময়েই পরিচালকের যন্ত্রণার কারণ হয়ে থাকে। তাই পরিচালকের কর্ত্তব্য অভিনেতার সাহায্যার্থে সমস্ত জিনিষের প্রতি বিশেষ নজর রাখা—অন্যথায় সর্বনাশ।

প্রঃ—বক্তব্যের ব্যতিক্রম থাকা সত্বেও অন্য নীতি সম্পন্ন সংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠানে কি কোনও সংস্থার নাটক মঞ্চস্থ করা উচিৎ ?

উঃ—অনুষ্ঠানে দর্শক বা শ্রোতা যাঁরা আসেন তাঁরা সবাইতো আর সেই বিশেষ সংস্থার আদর্শে বা নীতিতে উদ্বুদ্ধ নন, আর যদিই বা তাই হন তাহলেও তাঁদের একমাত্র পরিচয় তাঁরা জনসাধারণ। সুতরাং জনতার সমক্ষে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করার সুযোগ নষ্ট করা উচিৎ নয়। জনতার সঙ্গে সংযোগ রক্ষার্থেই নাটকের মূল বক্তব্য অবিকৃত রেখে অন্য নীতি সম্পন্ন সংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠানে নাট্য প্রবিবেশন অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য এমন আমন্ত্রণ বড় একটা আসেনা। পরিশেষে একটা কথাই মনে রাখতে হবে মানুষের জন্যই নাটক। তাই বেশী মানুষের সমস্যার বক্তব্য সম্বলিত নাটক প্রযোজনা যেমন সংস্থার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ সেরকম বেশী মানুষের সামনে নাটক অভিনীত হওয়ার ব্যবস্থা করাও সংস্থার অবশ্য পালনীয় কার্য্যক্রম।

প্রযোজিত নাটকে অভিনেতার ভূমিকা

শোভেন মজুমদার

প্রশ্নঃ—স্থিরীকৃত নাটক পাঠের দিন থেকে চরিত্র বণ্টনের পূর্ব পর্যন্ত অভিনেতার চিন্তনীয় কি ?

উত্তর :—স্থিরীকৃত নাটকটি সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল হ'তে হবে। অর্থাৎ, নাটকটি কি ? কেন ? এবং কিজন্য করা হচ্ছে এটা ভাল করে বুঝতে হবে। নাটকটি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত না থাকলে অভিনেতার পক্ষে ভাল অভিনয় করা বোধহয় সম্ভব নয়।

প্রশ্ন :—চরিত্র লাভের পর মহলায় অভিনেতার কার্য্যক্রম কি ?

উত্তর :—নাটকের মহলা, নাটকের একটি বিশাল থাম বিশেষ। নিয়মিত ব্যায়াম বা রেওয়াজের মতন মহলাও নিয়মিত দেওয়া দরকার। চরিত্রের Detail তৈরী করা, চরিত্রের Scantion—কেমন করে ফোটানো হবে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি মহলাতেই সম্ভব। সেখানে কোন ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ নেই। অভিনয় করতে করতে কোনও চরিত্রে অনেক গভীরভাবে প্রবেশ করা যায় সেটা অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু তার যথাযথ প্রস্তুতি মহলাতেই শুরু করতে হয়।

প্রশ্ন :—নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার দিন, নাটক শুরুর পূর্বক্ষণ হ'তে শেষ মুহূর্তে অভিনেতার কর্তব্য কি ?

উত্তর :—অভিনেতার সমস্ত দিকেই সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। নাটকেই শুধু অভিনয় করেই দায়মুক্ত হওয়া যায় কি ? মঞ্চস্থ নাটকটি ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, ঠিকমতো এগুচ্ছে কিনা, অপরাপর সভ্যরা ঠিকমতো নিজের কাজ করছেন কিনা—এ সব কিছুই দেখা দরকার। পুরো ব্যাপারটাই ধারন করা দরকার। কোন ভুল-ক্রটি হ'লে সেখানেই চেঁচামেচি করে নেপথ্যে আর একটি বাড়তি দৃশ্যের সংযোজন না করাই ভাল। নাটকাভিনয়ের পর সকলে মিলে ঠাণ্ডা মাথায় বসে ক্রটি বিচ্যুতির ব্যাপারগুলি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে যাতে সেইসব ভুলগুলো আর না হয় সে সম্পর্কে কি টোটকার ব্যবস্থা করা এবং উপায় উদ্ভাবন কর দরকার।

প্রশ্ন:—অভিনেতার অভিনয় প্রকাশে অন্য কোন শিল্প মাধ্যম সর্বাধিক সহায়ক ?

উত্তর:—নিশ্চয় সঙ্গীত। সুরজ্ঞান না থাকলে ভালো অভিনয় করা বোধহয় সম্ভব নয়। যাকে আমরা Reciprocal Acting বলি—সেটা ভালো হবে কি করে, যদি অভিনেতার একটু-আধটু সুরজ্ঞান না থাকে ? নৃত্যের ব্যাপারেও একটু আধটু তালিম নেওয়া দরকার। নৃত্যশিল্পী হতে বলছি না। কিন্তু অভিনেতার দেহ ছন্দ, মঞ্চের উপর অভিনেতার Movement সচলতা ইত্যাদি। নৃত্য সম্পর্কে একটু আধটু জানাটানা থাকলে বোধহয় সুবিধাই হয়। ছবি, রং ইত্যাদি বিষয়ে একটু-আধটু জানাটানা থাকলে ক্ষতি কি ? অভিনেতার এ সবই কাজে লাগে।

প্রশ্ন:—স্ব-রচিত কোন নাটকে মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করায় সুবিধা হয় কিনা ?

উত্তর:—যেহেতু নাট্যকার নই, সেইহেতু এর উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসুবিধাজনক।

প্রশ্ন:—অভিনেতার উপযুক্ততা অর্জনে শিক্ষাগত কার্যক্রম কি ?

উত্তর:—অভিনেতা লোকটির পড়াশুনা থাকা বা করা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। তার নিজের বিষয়ে তো বটেই (নাটকাদি), অন্যান্য সববিষয়েই। একটু হজম শক্তির দরকার। বদহজমের সম্ভাবনাতো থেকেই যায়। তাই বলছি Conventional Education থাকলেই যে ভালো অভিনেতা হওয়া যায় এমন কোন মানে নেই। এমন অনেক প্রচণ্ড ভালো অভিনেতা বা অভিনেত্রী দেখা

গেছে যাঁদের তথাকথিত শিক্ষা বলতে কিছুই ছিল না। তাঁরা নিজের বিষয়ে (নাটকাদি) অসাধারণ শিক্ষিত বলে বিবেচিত হতেন। এর মাপকাঠি ঠিক করা যায় কি?

প্রশ্নঃ—কোন বিপরীতধর্মী চরিত্রে অভিনয়ে অভিনেতার কর্তব্য কি?

উত্তরঃ—বিপরীতধর্মী চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে অভিনেতার খাটুনি একটু বাড়ে বৈকি। অভিনেতার Disqualification যেমন Qualification এ পরিণত হয় তেমনি ভাবেই বিপরীতধর্মী চরিত্রটিকে রপ্ত করতে হয়।

প্রশ্ন: নিজ প্রযোজিত কোন নাটকে অভিনয় করায় বিশেষ সুবিধা বা অসুবিধা কি?

উত্তর: যেহেতু প্রযোজক (এখনও পর্যন্ত) নই, সেই হেতু এই বিষয়ে সুবিধা বা অসুবিধ' আমার পক্ষে বলা মুস্কিল।

প্রশ্ন: এক অভিনেতার প্রতি অন্য অভিনেতার কর্তব্য কি?

উত্তর: ভালবাসা। ভ্রাতৃত্ব। Accomodate করা। শ্রদ্ধাশীল হওয়া। নাটক যেক্ষেত্রে যৌথ শিল্প সেক্ষেত্রে পরস্পরের understanding এর আদান-প্রদানই তো ভালো খেলা। এ ক্ষেত্রে পীর—বা—ওস্তাদ হবার চেষ্টা না করাই বোধহয় ভালো।

প্রশ্ন: অভিনেতার সমাজ সচেতনতা আবশ্যিক কি?

উত্তর: নিশ্চয়ই। অভিনেতাও তো মানুষ। মানুষ তো সামাজিক জীব। সমাজ সচেতন নিশ্চয়ই হ'তে হবে—তবে চোখ, কান খোলা রেখে।

সমাজ সচেতন, Progressive, Intelectual, 'উনি অনেক পড়াশুনা করেছেন', 'উনি একজন বিশেষজ্ঞ' এবং Anti Social ইত্যাদি—এইসব কথা, শব্দগুলো আজকাল খুব চালু হ'য়েছে। আমি পুলকিত বোধ করি, যখনই এগুলো শুনি। বেশ মজা পাই।

শৌভনিক থেকে এন. বি. এণ্টার প্রাইজ

১৯৬৯ সাল, বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের কয়েক হাজার দর্শকের মধ্যে, একটি বিরাট মঞ্চে মাত্র তিনটি চরিত্রের একটি নাটক অভিনয় হলো। বিশিষ্ট সাংবাদিকের নাটক 'অজাতক'। নাট্যকার জীবন ওনার এই নাটক দিয়েই শুরু বলা যায়। প্রযোজনায় ছিলেন এ. বি. এণ্টার প্রাইজ। এই দলও জন্ম

নিল এই নাটকেরই মাধ্যমে। নির্মু ভৌমিক যিনি এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা, তিনি প্রথমে ছিলেন গণনাট্য সঙ্ঘে, পরে শৌভনিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও ওঁর উৎসাহ কম ছিলনা।

বিবাহিত জীবনে বন্দী ; যারা পরস্পরকে ভালবাসতে চেয়েছিল—পারেনি ; পরস্পরের কাছে আসতে চেয়েছিল—পারেনি, অন্তত এখন আর পারে না ; একটি পাপের অদৃশ্য ভারে যারা দুজনেই আক্রান্ত—এমন দুই যুবক-যুবতীর নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া নিয়ে এই নাটক। সেই বোঝাপড়ায় কখনও পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়েছে, কখনও শ্লেষ-বিদ্রূপ, কখনও তা পর্যবসিত হয়েছে কলহে, কখনও যন্ত্রণা হতাশা আর ক্লান্তিতে। একের প্রতি অপরের দোষারোপ ক্রমে দুটি মৃতকল্প কিন্তু জাগ্রতবিবেক নরনারীর আত্ম-বিশ্লেষণ আর পাপের স্বীকারোক্তিতে, পরিশেষে মুক্তিতে পরিণত।

এই নাটক সম্পর্কে একটি মন্তব্য তুলে দিলাম।

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের 'অজ্ঞাতক' নাটকের অসামান্যতা তার সংলাপে, যে-সংলাপ মন ও মনন সহযোগে দর্শকদের গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ সংলাপ-প্রধান এই নাটকে ঘটনার ঘনঘটা সামান্যই। ভাবদ্যোতক স্বরভঙ্গি ও অর্থ-বোধের মধ্য দিয়ে এই সংলাপ যে শিল্পীরা বলতে পারবেন তাঁরাই যে 'অজ্ঞাতক' নাটকাভিনয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন, নাটকটি পড়বার সময় আমার তা মনে হয়েছিল। অবাক হয়েছি নির্মু ভৌমিক ও মমতা চট্টোপাধ্যায়ের সংলাপ উচ্চারণের ভঙ্গি দেখে, সংলাপের গভীর অর্থ অবলীলায় উদ্‌ঘাটন করে তাঁরা দর্শকদের অন্তরে তা স্বচ্ছন্দে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। এখানেই 'অজ্ঞাতক' অভিনয়ের অসাধারণ সাফল্য। সাগরময় ঘোষ, সহযোগী সম্পাদক, দেশ।

পরে এই নাটক কলামন্দির, বসুশ্রী, রবীন্দ্র সদন, এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস এ অভিনয় হয়। নির্দেশনায়—অশোক মিত্র, মঞ্চপরিকল্পনায়—সুরেশ দত্ত, ধ্বনি—অশোক প্রসাদ, আলো—স্বরূপ মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত—ভাস্কর মিত্র।

ইউথ থিয়েটার গ্রুপ

১৯৬৯ সাল—২০শে জুলাই একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম নেতাজী সুভাষ ইনসটিটিউটে যাবার জন্তে। একটা নাট্যানুষ্ঠান হবে। নাটক সৌরেন সেনের 'সূর্যহারা'। প্রযোজনা করছেন 'ইউথ থিয়েটার গ্রুপ'। গেলাম নাটক দেখতে। মনে মনে ভাবলাম জন্ম নিল আর এক নাট্যগোষ্ঠী। মধ্য কলকাতার বুকে সম্পূর্ণ যুবকদের নিয়ে তৈরী এই নাট্যগোষ্ঠী। অভিনয় দেখলাম, নাটকের বক্তব্যটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পীবৃন্দ।

এঁদের মুখে শুনলাম আগেও এঁরা কিছু অভিনয় করেছেন। ১৯৬৭ সালে এঁদের Organise করেন কাজল রায়। তারপর থেকে এঁরা একের পর এক ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছেন।

১৯৭০ সালে আবার প্রযোজনা করলেন 'সম্রাটের মৃত্যু'। এবারও এঁদের অভিনয় ভাল লাগল। একজন বললেন, আমাদের নানা সমস্যা, কারণ আমাদের Back করার মত কেউ নেই। অন্যান্য সমস্যা মোটামুটি কাটাতে পারলেও, আমাদের Main Problem একজন নাট্যকার, যিনি আমাদের নিয়মিত নাটক দিতে পারবেন।

শুনে খুব দুঃখ পেলাম। ভাবলাম আজকের এই সমস্যা জর্জরিত সমাজের মধ্যে থেকেও এঁরা যে চেষ্টা করে চলেছেন, তাকে সার্থক করে তুলতে কোন নাট্যকার কি এগিয়ে আসতে পারেন না?

আবার ১৯৭১ সালে প্রযোজনা করলেন বীরু মুখার্জীর 'রাহুমুক্ত'। বলতে বাধা নেই খবরটা শুনে মনে নানা দ্বন্দ্ব হলেও নাটকটি দেখে সে ভুল ভেঙ্গে গেল। এবারও এঁদের প্রশংসা না করে পারলাম না।

অঙ্গদ

১৯৬৯ সাল, প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে ২৮শে সেপ্টেম্বর মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজপাখী' নাটকটি অভিনয় করলেন। অঙ্গদ নাট্যগোষ্ঠী। এর আগে এরা ৬৯ সালে সুকুমার রায়ের বিখ্যাত হাসির নাটক 'চলচিত্ত চঞ্চরী' নিয়ে নাট্যাভিনয় শুরু করেন। এরপর সুবাস বসুর বহু প্রশংসিত হাসির নাটক 'মিছিল' অভিনয় করেন। ৭০ সালে শিশির কুমার দাসের 'সূর্যাস্তের পরে'

কলামন্দিরে ১৯শে সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ করেন। ২২শে সেপ্টেম্বর ৭১-এ রঙমহল মঞ্চে দুটি ছোট নাটক অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথ দাসের 'চঞ্চল ময়ূর', চিত্ত ঘোষালের 'ধীমান' অভিনয় করেন। ৭১-এ অমিতা রায়ের 'ছুটির খেলা' কলা-মন্দিরে অভিনয় করেন। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ উপলক্ষে এরা অভিনয় করতে চলেছেন, অমৃত লাল বসুর 'কালাপানি', জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিত জলযোগ'। এই সংস্থার নাট্য পরিচালক অগাধ বিশ্বাস। মঞ্চ পরিকল্পনা—সুজিত রায়, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলো—উজ্জ্বল তপাদার, সঙ্গীত—বিনয় কান্তি চক্রবর্তী।

অভিনয়ে আছেন: কল্যাণ মজুমদার, সুজিত রায়, স্বপন দাস, সুরো প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রণয় সরকার, প্রবীর ভাদুড়ী, রূপক লাহিড়ী, অঞ্জন ঘোষ, বরুণ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর দত্ত, অভিজিৎ সেন, বলানুজ মুখোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ সেন, প্রবাল বড়াল, প্রবীর সেন, অজয় নন্দী, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রততী মজুমদার, শুক্লা চক্রবর্তী, গোপা সেনগুপ্তা, দীপা সেনগুপ্তা।

আনন্দ সঙ্ঘ

১৯৬৯ সাল। বাংলায় ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৭, সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে সঙ্ঘ আয়োজিত 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' (নাট্যরূপ ও পরিচালনা হরিপদ চৌধুরী) সঙ্ঘের কিশোর কিশোরীরা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। গত ১৩ই মার্চ ১৯৭০, হরিপদ চৌধুরী পরিচালিত, শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'পাহাড়ী ফুল' নাটকখানি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। দলগত অভিনয়ে নাটকখানি দর্শকদের মুগ্ধ করে। গত ১৪ই মে, ১৯৭১ রঙমহল রঙ্গমঞ্চে গঙ্গাপদ বসুর 'সত্য মারা গেছে' নাটকখানি অভিনীত হয়। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন হরিপদ চৌধুরী, সুর ও আবহ সঙ্গীতে রবীন পাল ও সম্প্রদায়। মঞ্চ ও আলোক নির্দেশনায় হরিপদ চৌধুরী ও অরূপ সেন। বিভিন্ন সময়ে অভিনয়ে যারা অংশ গ্রহণ করেন: করুণাময় বসু, পরিচয় গুপ্ত, অরূপ সেন, অপূর্ব বিকাশ সেন, শঙ্কর চৌধুরী, ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য, জয়দেব সোম, বাসুদেব দেবনাথ, হারাধন চৌধুরী, সন্তোষ কুমার দে চৌধুরী, বৈদ্যনাথ দাস, রবীন্দ্রনাথ

দাস (ছোট), গগন চন্দ্র চন্দ্র, স্বপন দাস, কল্পনা বাগ শর্মিষ্ঠা ঘোষ, অজয় চৌধুরী, মদন দেবনাথ, মিণ্টু দেবনাথ, রবীন্দ্রনাথ দাস, অজয় চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ ভূইয়া, জ্যোতি চৌধুরী, জ্যোৎস্না দাস, লক্ষ্মী দাস, রাধারাণী দাস, আভারাণী দাস।

নয়ে সঙ্ঘ

১৯৭০ সালে মহাজাতি সদনে একটি সন্ধ্যায় একটি নাটক দেখলাম, বহু পরিচিত পুরস্কৃত নাটক, বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি'। অবশ্য পরিচালকের নাম দেখলাম পুরনো গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পী মণিলেস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। জ্ঞানেশ মুখার্জীর সংগে ইনি বহুরাত্রি অভিনয় করেছেন, বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসে যে সংক্রান্তি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন এটা বুঝলাম নাটক দেখার পর। সত্যি অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন কয়েকটি অল্প বয়সের ছেলেদের দিয়ে এই নাটক মঞ্চস্থ করিয়ে।

অবশ্য এই সম্প্রদায় ৬১ সালে অরুণ দের 'কার দোষ' প্রথম অভিনয় করে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে। এর পর ৭০ সালে মহাজাতি সদনে 'লবণাক্ত', ৭১ সালে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' অভিনয় করেন। শতবার্ষিকী উপলক্ষে সুনীল দত্তর বিদ্যাসাগর জীবনী অবলম্বনে 'বর্ণপরিচয়' শুরু করেছেন। এদের সব নাটকই পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন মনিলেস বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে আছেন সুশান্ত দাঁ, সমীর মুখার্জী, অলি সরকার, প্রদীপ দাশগুপ্ত, সর্বশেষ দাঁ, সমীর পাল অশোক রায়, তপন দত্ত ও পরিচালক নিজে।

নাটুকে দল থেকে / পিপ্‌লস আর্ট থিয়েটার

১৯৭০ সাল, চিত্তরঞ্জন বাসন্তী ইনষ্টিটিউট আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতি-যোগিতায় একটি নাটক শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ও শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে মর্যাদা লাভ করল। নাটকের নাম 'অগ্নিগর্ভ লেনা'। পরিচালক শ্যামাকান্ত দাস। গোষ্ঠী—পিপ্‌লস আর্ট থিয়েটার। শ্যামাকান্ত দাস আগে ছিলেন নাটুকে দলের পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে, যেখানে শুধুই হাসির নাটক অভিনয় হতো। সেদিন শতবার্ষিকীতে ওনার জীবনের মোড় ঘুরল, আর হাসি নয় রূঢ় বাস্তবে

যেতে হবে, মনের মত বিপ্লবী নাটক খুঁজতে গিয়ে নিজেই লিখে ফেললেন অগ্নিগর্ভ সেনা। তারপর একটার পর একটা অভিনয় করে গেলেন। অবশ্য এর আগেও উনি ঐ বছরেই একটা একাংক লিখেছেন 'আলো ছায়া আলো', সেটাও উত্তর কলকাতা নাট্যউৎসবে অভিনয় হয়েছে। এইটেই ওদের শুরু বলা যায়। ৭১-এ ওরা ঐ একই নাট্যকারের নাটক ও নির্দেশনায় মুক্তাঙ্গনে অভিনয় করলেন 'সামনে পাহাড়'। ঐ বছরে দীপক রায়চৌধুরীর 'ক্রীতদাস', এবং ৭২-এ ওরা শ্যামাকান্ত দাসের 'প্যারী কমিউন' অভিনয় করলেন।

এই সংস্থার সভাপতি অরুণাভ চক্রবর্তী এবং সম্পাদক নিতাই মুখার্জী। নাট্য পরিচালকরূপে আছেন শ্যামাকান্ত দাস। বিভিন্ন সময়ে যারা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন শ্যামাকান্ত দাস, শংকর পাল, মানিক চক্রবর্তী, নিতাই মুখার্জী, রঞ্জিত ওঝা, সুনীল দত্ত, তপন বিশ্বাস, তারক নাথ ব্যানার্জী, অরুণাংশু ব্যানার্জী, প্রভাস চক্রবর্তী সমীর দাস, গোপাল ভট্টাচার্য্য, জীতেন ধর, প্রকাশ রায়, অরুণাভ চক্রবর্তী, সোমনাথ ব্যানার্জী, শিশির মণ্ডল, সমর পাল এবং কৃষ্ণকান্ত দাস।

শিল্পী যাযাবর

১৯৭০ সাল, ৩০শে ডিসেম্বর রঙ্গনা মঞ্চে দুটি একাঙ্ক নাটক দেখলাম। প্রথমটি এ্যাবসার্ড নাটক বলা যায়। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রমত্ত প্রহসন', অপরটি কবিতা সিংহের 'সব হিসাবের বাইরে'। দুটি নাটক প্রযোজনা দেখে খুবই ভাল লেগেছিল। বিশেষ করে চরিত্রের পোষাক পরিচ্ছদ অভিনয় আলোর ব্যবহার কিছু নতুনত্বের দাবী রাখে। শিল্পী যাযাবর গোষ্ঠী সেদিনকার প্রযোজনার মধ্য দিয়ে নাটকের গভীরতায় পৌছতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয়েছে।

পরে জানা গেল এরা ১৯৬৪ সাল থেকে নাটক করছেন। প্রথম অভিনয় হয় মিনার্ভা থিয়েটারে বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের 'সরীসৃপ' ও রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমার্পণ' দুটি নাটক। এরপর এরা রমেন লাহিড়ীর 'রাজযোটক' ও ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' অভিনয় করেন। এই দলের নির্দেশক জগন্নাথ বসু বলেন আমি ঋত্বিক ঘটকের একটি কথাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি। ঋত্বিক বাবু বলেছেন, বাস্তবের শ্রেয় অংশের প্রতি আকুলভাবে ভালবাসা দেখানো আর সমাজের যা কিছু ক্লেদের প্রতি তীব্রভাবে ঘৃণা প্রদর্শন শিল্পীর পবিত্র দায়িত্ব।

এই গোষ্ঠীর নির্দেশক—জগন্নাথ বসু, মঞ্চালোক—হীরক মুখোপাধ্যায়, আলোক নিয়ন্ত্রণ—অজিত মিত্র, প্রধান অভিনেতৃবর্গ—গৌতম বসু, হীরক মুখোপাধ্যায়, দীপংকর চট্টোপাধ্যায়, গৌতম চক্রবর্তী, রাধাবল্লভ দাস, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত চক্রবর্তী, মুক্তি দাসগুপ্তা, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল চৌধুরী, উর্মিলা বসু ও জগন্নাথ বসু।

নাটকে ট্যাক্স আসে আর যায়, আবার এসেছে

১৯৭০ সাল, পৌর সংস্থা আবার নাটক অভিনয়ের উপর কর বাড়াল। এক টাকা থেকে আবার চল্লিশে উঠল। তার বিরুদ্ধে যে সব সভা সমিতি হয়েছে আনন্দ বাজার পত্রিকায় সেসব রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। আমি সেই দুটি রিপোর্ট ছেপে দিলুম।

নাট্য করের প্রতিবাদে সভা

কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান নাট্যাভিনয়ের উপর যে নতুন পৌরকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন তার প্রতিবাদে ২রা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় চতুর্মুখ সংস্থার গৃহে এক সভার আয়োজন করেন 'সারা বাংলা নাট্য-সংগ্রাম সমিতি।' পৌরোহিত্য করেন নাট্যকার মন্মথ রায়। শহর কলকাতার বহু নাট্যসংস্থার প্রতিনিধি সভায় যোগ দেন।

নাট্যকার সুনীল দত্ত তাঁর ভাষণে বলেন, পৌর প্রতিষ্ঠান-এর আগে যখন এই কর ধার্যের সিদ্ধান্ত করেন তখন বর্তমান মেয়র প্রশান্ত শূর, ডেপুটি মেয়র মণি সান্যাল, শচীন সেন প্রমুখ তার প্রতিবাদ করেন। আজ তাঁরাই পুনরায় কর বসাতে চাইছেন। এর চেয়ে চরম লজ্জার ব্যাপার আর কী হতে পারে? নাট্যকার রমেন লাহিড়ী বলেন, পৌর প্রতিষ্ঠানের টাকা নেই, তাই সব কিছু কিল চড় এসে পড়ছে তাঁদেরই উপর যারা দেশের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

নাট্যকার কিরণ মৈত্র বিক্ষোভের সুরে বলেন, এ হলো সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রতিরোধের চেষ্টা। চতুর্মুখ নাট্য দলের অভিনেতা পরিচালক অসীম চক্রবর্তী বলেন, আমরা এই অন্যায় কর কিছুতেই দেব না। স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই কর-প্রস্তাব রাজনৈতিক হীনমন্যতা পরিপূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক।

সবশেষে সভাপতি মন্মথ রায় তার ভাষণে বলেন, এই কর-প্রস্তাবকে ধিক্কার

জানাতে আমি এটিকে 'বর্বরতা' আখ্যা দিতে পারি। দিকে দিকে ঐক্যবদ্ধ-ভাবে এর প্রতিবাদ করতে হবে। প্রয়োজন হলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমি এর প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ ও অনশন করব।

এছাড়া ক্যালকাটা থিয়েটারের নিমাই সুর, কুমার রায় (বহুরূপী), দিলীপ মজুমদার, তরুণ ঘোষ, জগন্নাথ ভট্টাচার্য, অশ্রুজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য অনেকে করপ্রস্তাবের প্রতিবাদে ভাষণ দেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সারা বাংলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম 'সংযুক্ত নাট্য সংগ্রাম সমিতি' রাখা হয়। অনুশীলন, অনুভব, ক্লাস থিয়েটার, শিশির শ্রীনাট্যম, সুন্দরম, গন্ধর্ব, রাজা সাজা, বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা, নটতীর্থম, রঙ্গশ্রী, থিয়েটার ইউনিট, নান্দীকার, রূপস্রষ্টা, ক্যালকাটা থিয়েটার এবং বহুরূপী প্রভৃতি সংস্থার শতাধিক প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। এ-ছাড়া সভায় ওই কর-প্রস্তাবের নিন্দাসূচক প্রস্তাবও গৃহীত হয়। সভায় সর্ব-সম্মতিক্রমে আহ্বায়ক নিযুক্ত হন কিরণ মৈত্র, সুনীল দত্ত ও নিমাই সুর।

ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের প্রতিবাদ

ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের পঃ বঃ রাজ্য কমিটির সম্পাদক হাবুল দাস মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে অপেশাদার সংস্থায় নাটক অভিনয়ের উপর নাট্য কর স্থাপনের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা জানিয়েছেন। এ প্রস্তাব কার্যকর করা থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

কনভেনশন নয়, আগে ডেপুটেশন

কলকাতা পৌরসভা প্রস্তাবিত নাট্য-করের প্রতিবাদে সংযুক্ত নাট্য সংগ্রাম সমিতির গত রবিবারের সভাতেও (মুক্ত অঙ্গনে) বিতর্কের ঝড় উঠল। শুধু বিতর্কে ক্ষতি ছিল না, আড়াই ঘণ্টা জুড়ে কলকাতার বাহান্নটি নাট্যদলের উপস্থিত ছিয়াশী জন প্রতিনিধির উত্তপ্ত বিতর্কে মাঝে চরম হাওয়া বইতে থাকে। কনভেনশন আগে, না ডেপুটেশন ?

আগের দিনের সভার সূত্র ধরেই ঝড় উঠল। অন্যতম আহ্বায়ক নিমাই সুর পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলনের কর্ম-কৌশল সম্পর্কিত প্রশ্নটি তুললেন ভোলা দত্ত। ফলে তীব্র বিতর্কের সূচনা। শ্রীদত্ত বলেন, 'অতীতে যাঁরা নাট্যকর বৃদ্ধির প্রস্তাব এনেছিলেন, তাঁরা আমাদের আপনজন ছিলেন না। কিন্তু বর্তমান পৌরসভার অধিকসংখ্যক

প্রতিনিধিই আমাদের আপনজন। তাই প্রতিবাদের ভাষায় নমনীয়তা আনতে হবে। মনে রাখতে হবে নাট্যগোষ্ঠীর আচরণই এই করবৃদ্ধির জন্য দায়ী। এই মন্তব্য নিয়ে তীব্র বাকবিতণ্ডা, চিৎকার, হট্টগোল। বিশৃঙ্খল আবহাওয়ার মধ্যে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যকে আহতকণ্ঠে বলতে শোনা যায় 'ভাল ভাল কথা সাজিয়ে প্রস্তাব লিখে দাও।'

ভোলা দত্তের বক্তব্যের বিরোধিতা করলেন নিমাই সুর। তিনি বলেন, আমি মনে করি না সংযুক্ত সংগ্রাম সমিতির আন্দোলন কোন ভুলপথে চলছে। পৌরসভা কার-পারকিং এবং নাট্যাভিনয়ের ওপর কর একই সঙ্গে এনেছেন। আপনজন যখন আপনজনের স্বার্থপরিপন্থী কোন কাজ করে তখনও কি তাঁরা আপনজন থাকে? শ্রীসুরকে সমর্থন জানালেন সুনীল দত্ত, রমেন লাহিড়ী, সজল ঘটক, সত্যেন মুখার্জী, বসন্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি। নাট্যকার সুনীল দত্ত বললেন নাটক সংস্কৃতির স্বার্থে। কিন্তু প্রগতিবাদী সরকারের প্রতিনিধিরা এ কথা মানতে চান না। তিনি উচ্চকণ্ঠে দাবী করেন, আমরা কোন করই দেব না, তা পৌরকরই হোক বা প্রমোদকর। নাট্যকার রমেন লাহিড়ী বলেন, নাট্যশিল্প সমৃদ্ধির জন্য পৌরসভা কোন প্রস্তাবই কার্যকরী করেনি। এক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে কোন আপসই চলতে পারে না। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য বললেন, বত্রিশ দফা কর্মসূচী ফ্রন্ট সরকারের কণ্টকহার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাট্যশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং সাংস্কৃতিক আন্দোলন করার সময় এসেছে। এ ছাড়াও এ দিনের আলোচনায় যোগ দেন কৃষ্ণ কুণ্ডু (শৌভনিক), পার্থপ্রতিম চৌধুরী (সুন্দরম), সলিল ঘোষ (রূপকার), এল. এম. দাস (জাদুকর সংস্থা) প্রমুখ প্রতিনিধিরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সংযুক্ত নাট্য সংগ্রাম সমিতির আগের দুটি সভায় এর অন্যতম অহ্বায়ক নাট্যকার কিরণ মৈত্রের কণ্ঠে যে বিক্ষোভ ছিল এ সভায় তা পাওয়া যায়নি। জানা গেছে এঁদের পরবর্তী সভা ১ মার্চ সকালে মিনারভায়। সভাপতি উৎপল দত্ত।

গণনাট্য থেকে ভারতীয় গণসংস্কৃতি সঙ্ঘ

১৯৭০ সাল, জুলাই মাসে কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী মিলে একটি সম্মেলনের আয়োজন করলেন। সেই সম্মেলনে জন্ম নিল ভারতীয় গণ-সংস্কৃতি সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের নেতৃস্থানীয় বেশ কয়েকজনকে আমরা চিনতাম, কারণ তারা এক

সময়ে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে ছিলেন, সভাপতি দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ ধর, পানু পাল। এটুকু বলা যায়, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে রাজনৈতিক-গত ভাবে ভাগাভাগি হবার পরেই, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেও তার কিছু আলো এসে পড়ে। তাই পার্টির আদর্শে বিশ্বাসী কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী এই ভারতীয় গণ-সংস্কৃতি সঙ্ঘের জন্ম দেয়। এদের মূল আদর্শ গণ-মানুষের জীবন স্পর্শ করা জীবনধর্মী নাটক ও গানের মাধ্যমে। এরা প্রথম নাটক অভিনয় করলেন দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মেঘের আড়ালে সূর্য', তার পরই সঙ্ঘের সহসভাপতি পানু পালের 'বাংলাদেশের গণমুক্তি' আন্দোলনের পটভূমিকায় 'বিদ্রোহী বাংলা' নাটকটি পরিচালনা করলেন পানু পাল। ৭২ সালে দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক ও পরিচালনায় বিশ্বরূপায় অভিনয় হলো 'দুরন্ত পদ্মা'। যারা অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করে বুকের রক্ত ঢেলে অতুলনীয় শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়ে লাঞ্ছিতা বাংলা মায়ের শৃঙ্খলামোচন করছে, সেই জীবনের আলেখ্য এই 'দুরন্ত পদ্মা'। এই সংস্থায় অভিনয় করেন :—অনিল দত্তগুপ্ত, পঙ্কজ চ্যাটার্জী, পরমেশ সেনগুপ্ত, পানু পাল, দীপঙ্কর দত্তগুপ্ত, বীরেন্দ্র লাহিড়ী, নিখিল সেন, প্রদীপ সেনগুপ্ত, বিপ্রদাস মুখার্জী, তৃপ্তি বসু, প্রভাত কাশিলা, মধুসূদন মুখার্জী, সুধাংশু গোস্বামী, বরুণ বল, মোহিত আইচ, নিখিল গুহ, কমলেশ গুপ্ত, সন্তোষ দাস, মানস দাস, তাপস গুপ্ত, মাস্টার সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির গোস্বামী, আলপনা গুপ্ত, মীরা পাল, মঞ্জুশ্রী বসু, সুধা রায় চৌধুরী ও প্রদীপ সেনগুপ্ত।

লিট্‌ল থিয়েটার থেকে/এপিক

১৯৭১ সাল। আর একটি নতুন দলের জন্ম হল নাম 'এপিক'। ১৯শে সেপ্টেম্বর ম্যাক্স মুলার ভবনে মলিয়েরের-এর 'তার্ত্যুফ' বাংলা রূপ লোকনাথ ভট্টাচার্যের 'মহাত্মা' প্রথম অভিনয় হল। এরপর এরা রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে ৮ই অক্টোবর ঐ নাটক আবার অভিনয় করলেন, ১লা নবেম্বর থিয়েটার সেন্টারে অভিনয় করার পর এরা নাট্যদল হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্দেশক দেবেশ চক্রবর্তী। ইনি আগে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপে ছিলেন। এল. টি. জিতে উনি টাইপ চরিত্রে খুব দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতেন। এই দলে অভিনয় করছেন : মন্দিরা সেন, হিরণ্ময় সরকার, রোজী রায়, শম্ভু-

দাসগুপ্ত, মীরা কর্মকার, রুনু ব্যানার্জী, শিশির ধর, ধ্রুব দত্ত, তপন পাল, দেবেশ চক্রবর্তী, নীহারেন্দু চৌধুরী, শিবশংকর ধর, রবীন গুই, প্রদীপ দে।

আলো : পার্থ দাশ, মঞ্চ : শিবশংকর ধর, ধ্বনি : অমিতাভ মৈত্র, ব্যবস্থাপনা : অসীত দেওয়ানজী ও চন্দন নাহা। এই নাটক সম্বন্ধে ওদের স্যুভেনিরে একটি লেখা প্রকাশ হয়েছিল সেটা ছেপে দেওয়া হল।

মলিয়ের—তার্ত্যুফ—মহাত্মা

'মহাত্মা' নামান্তর মাত্র এবং চরিত্র ইত্যাদির নামে—বেশে—আচরণেও আমাদের দেশ ও সময়ের উপযোগী একটা রূপান্তরের চেষ্টা যদিও রয়েছে, নাটকটি মূলে হল সপ্তদশ শতাব্দীর স্বনামধন্য ফরাসী নাট্যকার মলিয়েব-এর প্রচণ্ড বিতর্কিত 'তার্ত্যুফ'।

মলিয়ের স্বয়ং একবার নাটকটি সম্বন্ধে লেখেন :—'এই নিয়ে চেঁচামেচি বহু হয়েছে, এবং অনেক নির্যাতনও একে সহ্য করতে হয়েছে। যে সব লোকদের এখানে চিত্রিত করা হয়েছে, তাঁরা দেখিয়েছেন যে ফ্রান্সে তাঁদের ক্ষমতা কত প্রচণ্ড—এত ক্ষমতা আমার সৃষ্ট কোনো চরিত্রই আজ পর্যন্ত পায়নি। আমি যাঁদের এতদিন চিত্রিত করে এসেছি—রাজকীয় পদবীধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বা অসতী স্ত্রীর স্বামী, বা ডাক্তার ইত্যাদি—তাঁরা এক ধরণের আমাদের সঙ্গেই মেনে নিয়েছেন আমার আঁকা তাঁদের ছবিগুলিকে ; কিন্তু ভণ্ডরা ঠাট্টা বড একটা পছন্দ করে না। তারা তাই শুধু ভয়ই পায়নি, আমার স্পর্ধা দেখে রীতিমতো আশ্চর্যও বোধ করেছে। কাদের মুখ ভ্যাংচানি ও যথার্থ রূপটি বাইরে প্রকাশ করে আমি যেন হাটে হাঁড়ি ভেঙেছি, কারণ ভণ্ডদের যে ব্যবসা, তাতে জড়িত অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও তথাকথিত সজ্জনও।

৭২ সালে এরা দেবেশ চক্রবর্তীর 'নয় পরোয়ানা' অভিনয় করলেন রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে।

লিট্‌ল থিয়েটার থেকে / পিপ্‌লস্ থিয়েটার

১৯৭১ সাল। একশো বছর পরে আমাদের বলতে ইচ্ছে করছে হে মহান অতীত কথা কও। তা যদি সম্ভব হতো তাহলে আমাদের পূর্ব পুরুষদের কতো মহান কীর্তি আমরা কতো সহজে দেখতে পেতাম। কতো কি শিখতে পারতাম, তা তো সম্ভব নয়, তাই উৎপল দত্ত সেই মহান অতীতকে তুলে ধরলেন একটি নাটকের মাধ্যমে। নাটকের নাম 'টিনের তলোয়ার'। অভিনয় করলেন ১২ই

আগস্ট পিপল্‌স্‌ লিটল থিয়েটার গ্রুপ রবীন্দ্র সদনে। নাটক দেখতে দেখতে ভাবছিলাম আমরা অনেক সত্যকে অনেক সময়ে বলতে ভয় পাই—কিন্তু আমাদের পূর্বসূরীরা? তাঁরা তো অতো ভয় পেতনা। যা সত্য, তা যার বিরুদ্ধেই যাক, যে কোন আঘাতই আসুক তাঁরা তার মুখোমুখি দাঁড়াতেন। এই সত্যটা আমরা দেখলুম 'টিনের তলোয়ারে'।

পিপল্‌স্‌ লিটল থিয়েটার গ্রুপের একটি স্যুভেনিরে 'টিনের তলোয়ার' প্রসঙ্গে একটি লেখা ছিল এখানে সেটা ছাপা হলো।

বাংলা সাধারণ রংগালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্চর্য মানুষ গুলিকে—যাঁহারা কুষ্ঠগ্রস্ত সমাজের কোনো নিয়ম মানেন নাই, সমাজও যাঁহাদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা। যাঁহারা মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকিয়াও ধনীর মুখোশ টানিয়া খুলিয়া দিতে ছাড়েন নাই। যাঁহারা ব্রিটিশ পশুশক্তির ব্যাদিত মুখগহ্বরের সম্মুখে 'টিনের তলোয়ার' নাড়িয়া পরাধীন জাতির হৃদয়-বেদনাকে দিয়াছিলেন বিদ্রোহী মূর্তি। যাঁহারা বহু পত্র-পত্রিকা, বহু বাচস্পতি-শিরোমণি, বহু রাজা-মহারাজার শত পদাঘাতে জর্জরিত, যাঁহারা অপাংক্তেয়, ছোটলোকের আশীর্বাদ ধন্য, যাঁহারা ভালবাসার বিশাল আলিংগন উন্মুক্ত করিয়া জনগণের গভীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, যাঁহারা সৃষ্টিছাড়া, বেপরোয়া, বাঁধন হারা, যাঁহারা মাতাল, উদ্দাম, সৃষ্টির নেশায় উন্মাদ, যাঁহাদের মন্ত্রসিক্ত অঙ্গুলিস্পর্শে ছিল বিশ্বকর্মার যাদু, যাঁহাদের উল্লসিত প্রতিভায় সৃষ্টি হইল বাঙালীর নাট্যশালা, জাতির দর্পণ, বিদ্রোহের মুখপাত্র, যাঁহারা আমাদের শৈলেন্দ্র-সদৃশ পূর্বসূরী।

উৎপল দত্ত যিনি এই গ্রুপের নাট্যকার পরিচালক, তিনি আগে লিটল থিয়েটার গ্রুপেরও পরিচালক ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক আজ ৭১এ এসে আর একটি সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়েছেন। দেখলুম তাঁর সঙ্গে শোভা সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল ঘোষকেও আমরা এই গ্রুপে।

'টিনের তলোয়ার' প্রসঙ্গে আর একটি লেখা এখানে উল্লেখ করছি—নাটকের পরিবেশটাকে বোঝানোর জন্য।

এ নাটকের স্থান ১৮৭৬-এর মোকাম কলিকাতা—চিৎপুর, বৌবাজার এবং শোভাবাজারস্থ নাট্যশালা। ১৮৭৬ সালই সাম্রাজ্যবাদের নিজমুখে মসীলেপনের কুখ্যাত বৎসর। ঐ বৎসর বাংলা নাট্যশালার টিনের তলোয়ার দেখিয়া ভীত-

আর ব্রিটিশ সরকার অডিন্যান্স জারী করিয়া নাট্য নিয়ন্ত্রণের নামে নাট্যশালার কণ্ঠরোধ করিবার ব্যবস্থা করে।

এই নাটক অভিনয় করতে গিয়েও কিছু ঝামেলা উপস্থিত হয়েছিল। কাগজে পত্রে দেখেছি রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষ ঐ নাটক পরে আর অভিনয়ের জন্যে হল দিতে চাননি। কেন কি বৃত্তান্ত সে প্রসঙ্গ থাক। অনেক বাক্ বিতণ্ডার ব্যাপার তাই ও প্রসঙ্গ নিয়ে আর এগোনো সম্ভব হলোনা। তবে এইটুকু বলা যায় এই নাটক ওঁরা যেখানে অভিনয় করেছেন সেইখানেই দর্শক ভেঙ্গে পড়েছে। টিকিট না পেয়ে ফিরে গেছে। অনেকের মুখে একই কথা আবার কবে হবে? কোথায় হবে?

আজ শতবর্ষের আলোয় দাঁড়িয়ে পিপল্‌স্ লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ও তার কর্ণধার উৎপল দত্ত যে বিপ্লবী অতীতকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আমরাও তাদেরই সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে জানাই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী। আর আন্তরিক অভিনন্দন জানাই উৎপল দত্ত ও অন্যান্য শিল্পীদের। বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেছেন: সমীর মজুমদার, ইন্দ্রাণী লাহিড়ী, মুকুল ঘোষ, শোভা সেন, নীলিমা দাস, ছন্দা চট্টোপাধ্যায়, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গোপাল মুখোপাধ্যায়, ভানু মল্লিক, শ্যামল ভট্টাচার্য, আশু সাহা, মৃণাল ঘোষ, কনক মৈত্র, চিত্ত দে, মণ্টু ব্রহ্ম, নন্দদুলাল দাস, সনৎ গাঙ্গুলী।

সুরসৃষ্টি ও পরিচালনায়—প্রশান্ত ভট্টাচার্য। গানের কথা—মাইকেল, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ, অমর দত্ত। আলো—তাপস সেন। মঞ্চ—মনু দত্ত। পি এল টি এছাড়া উৎপল দত্তর 'সূর্য শিকার', 'লোনরে মালিক', 'ঠিকানা' নাটক অভিনয় করেন। এই শতবার্ষিকীতে পুরনো নাটকও করছেন। যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্তর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা', রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন'।

সায়ন্তনী

তারিখটা ছিল বোধহয় ১৭ই জুন, ১৯৭১। সায়ন্তনীর কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে মুক্ত অঙ্গনে গেলাম নাটক দেখতে, সেদিন নাটক দেখতে যাওয়ার মূল আকর্ষণ 'সায়ন্তনী' নয় তাঁদের নাটক 'সাঁকো'। খুবই কঠিন সমস্যার নাটক। নাট্যকার ঋত্বিক ঘটক, কিন্তু নাটকটি দেখার পর সায়ন্তনীর আকর্ষণও আমার কাছে প্রবল হয়ে উঠল, সার্থক নাটকের সার্থক প্রযোজনা।

তবে এখানেই সায়ন্তনীর শুরু নয়, শুরু অনেক আগে, ১৯৬৬ সালে। মিহির চট্টোপাধ্যায়ের 'স্যানেটোরিয়াম' নাটক নিয়ে। একটি প্রতিযোগিতা সমেত মোট পাঁচটি অভিনয়ের পর রবীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'কালো মাটির কান্না' অভিনীত হয়। তারপরেই সায়ন্তনী মঞ্চস্থ করে সেই সাড়া জাগানো একাঙ্ক 'আদাব'। সমরেশ বসুর কাহিনীর নাট্যরূপ দেন মিহির সেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ও অন্যান্য জায়গায় অভিনীত হয় আঠারো রজনী। প্রায় প্রতিটি প্রতিযোগিতা থেকেই এঁরা অর্জ্জন করেন একাধিক শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার।

সায়ন্তনী এগিয়ে যায় আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের দিকে। মঞ্চস্থ করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্পের নাট্যরূপ 'বাগ্‌দী পাড়া দিয়ে'। নাট্যকার মিহির চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনাতেই এই নাটকটি অভিনীত হয় মোট উনিশ রজনী। তন্মধ্যে পাঁচটি প্রতিযোগিতায় মোট আটটি শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার অর্জ্জন করেন। মূলত এই দুটি একাংক সায়ন্তনীর পরিচয় এনে দেয় নাট্যরসিক মহলে।

৬৯-এ এসে যুক্ত হলো আন্তন চেখভের 'The Berr' অবলম্বনে মিহির চট্টোপাধ্যায় নাট্যরূপায়িত 'বিরহী'। এই তিনটি নাটক নিয়ে ৭ই নভেম্বর সায়ন্তনী হাজির হয় হাওড়ার শীশমহল মঞ্চে। এখান থেকে এঁদের যাত্রা নতুন গতি পায় এবং একাদিক্রমে অভিনয় করে চলে দক্ষিণ কলকাতার থিয়েটার সেন্টার এবং মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ে।

এরপর ১৯৭০ সালের ১৯শে নভেম্বর এঁরা মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ে নিয়ে আসে 'আদালত থেকে'। ব্রেটল্ট বেখটের 'দি ককেসিয়ান চক সার্কেল' অবলম্বনে এই নাটকটি রচনা করেছেন মিহির চট্টোপাধ্যায়। নাটকটি প্রথম অভিনয়ের সাথে সাথেই বিতর্কের ঝড় তুলেছিল।

এরপর সায়ন্তনী আরও তিনটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করে। মিহির চট্টোপাধ্যায়ের 'কালো থেকে আলোয়', বৈপায়ন চট্টরাজের 'অগ্নিগর্ভ দামোদর' এবং সুনীল চৌধুরীর 'কবর'।

সায়ন্তনীর বিভিন্ন নাটকের নির্দেশনাতে আছেন নাট্যকার মিহির চট্টোপাধ্যায়। একমাত্র 'কবর' নাটকটি পরিচালনা করেন সংস্থার নবীন পরিচালক অসিত চৌধুরী।

বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন মিহির চট্টোপাধ্যায়, অসিত চৌধুরী, অরুণ ঘোষ, শিবপ্রসাদ চৌধুরী, রঞ্জিনী প্রসাদ সরকার, শঙ্কর

চট্টোপাধ্যায়, চন্দন লাহিড়ী, সমর চট্টোপাধ্যায়, রনধীর সাহা, সোমনাথ চক্রবর্তী, মিহির বরণ চট্টোপাধ্যায়, মায়া সরকার, কল্যাণ বোস, শেলী মুখার্জী, দিলীপ বোস, মানস নন্দী, আরতী চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জীকনা বিশ্বাস, অনিন্দ্য বিশ্বাস, তাপস ভট্টাচার্য্য, অজয় সিনহা, ঊষা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস ব্যানার্জী, গোবিন্দধন পাল, ব্রজেন মুন্সি, অতুল সাহা, গৌতম গুপ্ত, অরূপ ভট্টাচার্য্য, পান্নালাল নাহা, গুরুপদ ভট্টাচার্য্য, মানিক ভট্টাচার্য্য, নির্মল দত্ত, অশোক গাঙ্গুলী ও জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য।

মঞ্চরথ

১৩৭১ সাল, ১২ ডিসেম্বর 'একটি গল্পের মৃত্যু হলো' নামে থিয়েটার সেন্টারে একটা গুরু গম্ভীর নাটক অভিনয় করলেন মঞ্চরথ গোষ্ঠী। নাট্যকার বিপুল গঙ্গোপাধ্যায়, পরিচালনায় ছিলেন নাট্যকার স্বয়ং। ৩০শে জুলাই মঞ্চরথের আর একটি নাটক দেখলাম থিয়েটার সেন্টারেই। এটার মধ্যে গুরু গম্ভীরতা নেই আছে শুধু হাসি। অনবদ্য একটি হাসির কাল্পনিক নাটক। বিপুল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ফুল শয্যার রাতে' নাটকটি ৭২ সালে জুলাই মাসে রেডিওতেও শুনেছি। মঞ্চরথ গোষ্ঠীর জন্ম অনেক আগেই ঘটেছে, ঠিক তারিখটা বলা যায়নি তবে বসন্ত ভট্টাচার্যের নাটক এরা অভিনয় করেছেন। এই মঞ্চরথের পুরোধা বলা যায় স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি অভিনেতা, পরিচালক ও নাট্যকার। ১০ জুলাই সাইকোলজিস্ট-এর ভূমিকায় ওর অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যি অসাধারণ ক্ষমতা এই শিল্পীর। অন্য শিল্পীদের মধ্যে ঐদিন দেখলাম, সুদর্শন ভট্টাচার্য্য, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা মুখোপাধ্যায়। এদের পরবর্তী প্রযোজনা—স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত 'মাননীয় নাট্যকারদের উদ্দেশ্যে'।

যেটুকু জানা গেছে দেওয়া হল, আর যা আমার অজান্তে ঘটেছে, তা আঁধারেই রয়ে গেল।

শতবর্ষের আলোয় পূর্বসূরীদের প্রতি-শ্রদ্ধাঞ্জলী

১৯৭১ সাল, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উদযাপনের আহ্বানে সাড়া দিলেন নাট্যকার, নাট্য শিল্পী, নাট্য গবেষক, সকলে এক-ই সঙ্গে। আমাদের যা কিছু মহান, তাকে স্মরণ করতে হবে। তাকে বুক দিয়ে রক্ষা করতে হবে। তা

থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই সব প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে শত শত নাট্য শিল্পী ও নাট্যানুরাগীরা এক হলেন। তারই একটি রিপোর্ট আমরা দেখলাম ১৫ই জুলাই ১৯৭১ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায়। 'সূত্রধার' (প্রবোধবন্ধু অধিকারী) লিখিত সেই রিপোর্টটি এখানে ছেপে দেওয়া হলো।

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ প্রসঙ্গে

গোপালনগর রোডের নাট্য পাঠাগার নাট্যযোদ্ধাদের নিশ্চয় নতুন করে চিনিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না। ওই পাঠাগারে রিডিং রুমে রঙ্গমঞ্চের শত-বার্ষিকী প্রসঙ্গিত এক সভা অনুষ্ঠিত হলো গত ৯ জুলাই সন্ধ্যায়। হ্যাঁ, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের। একশো বছর আগে গত ১৮৭২ সালের আপার চিৎপুর রোডের মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাড়িতে বাংলা নাট্যমঞ্চের প্রথম সূত্রপাত। তারিখ ছিল ৭ ডিসেম্বর। ওইদিন দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনীত হয়েছিল। ওই তারিখ এবং ওই সালকেই বাংলা নাট্য মঞ্চের সূত্রপাত বলে চিহ্নিত করেছেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং অন্যান্য পুরোধাগণ।

প্রায় তিরিশ ফুট লম্বা রিডিং টেবিলের একপ্রান্তে বসেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁর পাশে সরযূ দেবী, দেবনারায়ণ গুপ্ত, মন্মথ রায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং একালের জনাকয় বিশিষ্ট নাট্যাভিজ্ঞ। রিডিং টেবিলের দুপাশে সব চেনা মুখ—বাংলা নাটক ও নাট্যশালার অতি পরিচিত মুখের সারি। উপস্থিতির সংখ্যা মোট পঞ্চাশ। ছোট ওই ঘরটিতে যেন তিলধারণের স্থান ছিল না।

অহীন্দ্রবাবুর কয়েকটি কথায় ছোট ভূমিকা শেষ হলে তাঁরই নির্দেশে অমর গাঙ্গুলী বিস্তারিত পরিকল্পনা শোনালেন। অহীন্দ্রবাবু বললেন, বাংলা নাট্যমঞ্চের শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে। বাঙালী জাতির কাছে এ-খুব গৌরবের কথা। একশো বছরের কথা স্মরণ করে, বাংলা নাট্যমঞ্চের শতবার্ষিকী উৎসব পালন করা বোধ হয় সকল বাঙালীর উচিত। এই ধরনের একটি বৃহত্তর উৎসবের পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যেই তিনি সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে শতবার্ষিকী উৎসবের শুভ-সূচনা যেন মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাড়িতে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের মাধ্যমেই হয়।

শতবার্ষিকী অথবা শতবর্ষপূর্তি—এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য, দেবনারায়ণ গুপ্ত, মন্মথ রায় বলেন, শতবার্ষিকী হলে ১৯৭২ সালের

৭ ডিসেম্বর না হলে বর্ষব্যাপী উৎসবের প্রস্তুতিপর্ব শেষ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শেষোক্ত প্রস্তাবটিই গৃহীত হয়। নামকরণ হয় বাংলা নাট্যমঞ্চ শতবর্ষপূর্তি উৎসব।

নটসূর্য সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায় আরও যোগ দেন ডঃ অজিত ঘোষ, ডঃ সুনীল মুখার্জী, অভিনেতা গুরুদাস ব্যানার্জী, সরযূ দেবী, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সুধাময় গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, সুনীল দত্ত, কিরণ মৈত্র প্রভৃতি। প্রস্তাব গৃহীত হয়: মূল উৎসব কমিটি গঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত নয়জনের এক কমিটি আপাতত কাজ চালিয়ে যাবেন। অহীন্দ্র চৌধুরী থাকবেন সভাপতি। মন্মথ রায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিত ঘোষ, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সুনীল দত্ত, কিরণ মৈত্র, অমর গাঙ্গুলী প্রভৃতিদের নিয়ে এই প্রস্তুতি কমিটি গঠিত। এদিন এ সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই কমিটির অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

বর্ষব্যাপী উৎসবের আয় ব্যয় নিয়েও আলোচনা হয়। কেউ কেউ বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে বেশির ভাগ অর্থ দাবী করা হবে। এ উৎসবে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হবে বলে অনেকে মনে করেন। কিছু গঠনমূলক প্রস্তাবও এদিন গৃহীত হয়।

বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সমিতি

এই জাতীয় উৎসবের সভাপতি—নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। কার্য্যকরী পরিষদ সভাপতি—মন্মথ রায়। মন্ত্রণা পরিষদ—ডঃ সত্যেন বোস, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সত্যেন সেন, ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জী, ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, সত্যজিৎ রায়, উদয়শঙ্কর, মনোজ বসু, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, নলিন বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সমর চট্টোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। প্রথম সাধারণ সদস্য—ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। সহঃ সভাপতি—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, উৎপল দত্ত, দেবনারায়ণ গুপ্ত, তরুণ রায়, শিশির মল্লিক, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কালীশ মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, মহেন্দ্র গুপ্ত, সন্তোষ সিংহ, সোমেন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, মহেন্দ্র সরকার, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, অধ্যাপক সুশীল

মুখোপাধ্যায়, বাদল সরকার, কৃষ্ণ কুণ্ডু, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস ভট্টাচার্য, শিশির বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, রামচন্দ্র চৌধুরী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কানন দেবী, সরযূ দেবী, তৃপ্তি মিত্র। কোষাধ্যক্ষ রঞ্জিতমল কাংকারিয়া। সাধারণ সম্পাদক—অমর গাঙ্গুলী। সংযুক্ত সম্পাদক—মলিনা দেবী, অনুপকুমার দাস, রমেন লাহিড়ী। পরিষদের সদস্য—গণেশ মুখোপাধ্যায়, কিরণ মৈত্র, ইন্দ্রজিত সেন, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল দত্ত, অনিল দে, দীপ্তিকুমার শীল, সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়। বিভাগীয় পরিষদ—জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বোস, জহর রায়, হারীন্দ্র দত্ত, নন্দদুলাল চক্রবর্তী, ঠাকুরদাস মিত্র, মোহন দস্তিদার, বিমল রায়, মনোজ মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলী লাহিড়ী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ।

শুভম্

১৯৭১ সাল, জানুয়ারী মাসের ১৭ তারিখের সকালে শুভম্ নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত শচীন চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনার হরিণ' নাটকটি দেখলুম। শচীনবাবু এই নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে দু-চার কথায় যা বলেছেন তার কিছুটা অংশ এখানে ছাপা হলো।

একটি কল্পনা—পুরোপুরিই অলীক, একটি সুখী পরিবার—সত্যিকারেরই সুখী, একটি আদিম কামনা—মানুষ জাতির সৃষ্টিতে যার শুরু, একটি চক্রান্ত—নিষ্ঠুর, অমানুষিক, অবিশ্বাস্য কিন্তু বাস্তবের স্পর্শ রয়েছে, একটি আনন্দমুখর পরিসমাপ্তি—সবাই যার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল, একটি নাটক—কাল্পনিক নাটক যাকে বলা যায়। শুভম্ নাট্যগোষ্ঠী এরা জুলাই ৭১ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে 'স্ট্রীট-বেগার' অভিনয় করেন। এই নাটকের ভূমিকায় ডঃ অজিতকুমার ঘোষ যা বলেছেন তার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো।

বর্তমান জীবনে যে বেদনা ও বঞ্চনা দেখা দিয়েছে, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অপচক্র ও হৃদয়হীন অর্থনৈতিক শোষণের ফলে আজকের সমাজে যে সমস্যা ও সংকট দেখা দিয়েছে তা এখনকার অনেক নাটকের মধ্যে বাস্তবভাবে রূপায়িত হচ্ছে। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের সমস্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন এবং সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর আছে প্রকৃত শিল্পীজনোচিত দরদ ও সহানুভূতি। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

সঙ্গে মিলিত হয়েছে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি। সেজন্য সমস্যার কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ না ক'রে তিনি পারেন নি। কিন্তু তিনি জীবনকে ঠিক জীবনরূপেই দেখেছেন, কোন নির্দিষ্ট তত্ত্ব ও মতবাদের দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখেন নি। সেজন্য তাঁর নাটকের জীবন এত জীবন্ত। সমাজে বঞ্চিত ও ভাগ্যহত শ্রেণীর পরিচয় আমরা পেয়েছি তাঁর পূর্ব-লিখিত নাটক 'কেরানীর জীবন' ও 'চোর'-এর মধ্যে। আর একটি অতিশয় বিড়ম্বিত শ্রেণীর মানুষের পরিচয় পেলাম আলোচ্য নাটকে।

রাস্তায় যারা ঘুরে বেড়ায়, একটানা উপেক্ষা ও অবজ্ঞার বোঝা যারা অবিরাম ব'য়ে নিয়ে চলে, আকাশের আলো ও মাটির ধুলোই যাদের একমাত্র বন্ধু সেই সব হতভাগ্য ভিক্ষুকের অজানা জীবন রহস্য নিয়েই এই নাটকটি লেখা হয়েছে। এই সব নিষিদ্ধ মানুষদের মধ্যে অনেকেই পকেটমার, চোর, লম্পট ও খুনী। সমাজ এদের বিচার করে, শাস্তি দেয়। কিন্তু সমাজের কোন নিষ্ঠুর ব্যবস্থা ও হৃদয়হীন বঞ্চনা যে তাদের অনিবার্যভাবে এই পাপ ও দুঃখের পথে ঠেলে দেয় তা কেউ সন্ধান করে না। নাট্যকার তাই সন্ধান করতে চেয়েছেন এই নাটকে।

আধুনিক মঞ্চব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই নাট্যকার আলোচ্য নাটকটি রচনা করেছেন। মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চ-আঙ্গিকের বিস্তৃত নির্দেশ তিনি দিয়েছেন নাটকের মধ্যে। চরিত্রানুগ সংলাপ রচনা করতে এবং নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি করতেও তিনি বিশেষ সক্ষম হয়েছেন। নাটকের অধিকাংশ চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি প্রশংসনীয় বাস্তবচেতনা ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবে সবচেয়ে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে দুটি নারী চরিত্র—নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের অপ্রকৃতিস্থ মাতা সবিতা ও লালসার অনির্বাণ আগুনে দগ্ধ আসমানি। নারীর এই দুটি রূপই তো চিরকাল সত্য। সে কামিনী, সে জননী।

এছাড়া শুভম্ গোষ্ঠী একাংক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। বিভিন্ন সময়ে এদের নাটকে অভিনয় করেন :— তপন ধর, গৌতম চ্যাটার্জী, সুশীল দত্ত, সংঘর্ষ দাঁ, সুমিত দেব, কমলেশ ভট্টাচার্য, শশাঙ্ক পাণ্ডা, বাবুল দাস, মিস পলিন, অঞ্জন নাগ, রতন দাশগুপ্ত, হরিহর সাহু, লক্ষ্মণ শর্মা, মাঃ শিবু, শঙ্কর দে, অরিন্দম, শুক্লা দাঁ, শিবানী ভট্টাচার্য, অঞ্জলী চ্যাটার্জী। এদের নাটক পরিচালনা করেন কমলেশ ভট্টাচার্য।

আবার নাট্য কর / তীব্র প্রতিবাদ

১৯৭২ সাল, আবার নাট্য কর দিতে হবে, পৌর কর্তৃপক্ষ নয়া আদেশ জারি করলেন, তাতেও ক্ষান্ত নয়। জোর করে টাকা আদায় শুরু করলেন। আবার প্রতিবাদ। আনন্দবাজার পত্রিকার তিনটি নিউজ এখানে ছাপা হল।

বাড়তি নাট্য করের প্রতিবাদে

নাট্য সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে সুনীল দত্ত, নিমাই সুর ও সজল ঘটক জানিয়েছেন যে, কলকাতা করপোরেশন আবার থিয়েটারের ওপর বাড়তি কর আদায় না করে অভিনয়ের অনুমতি দিচ্ছেন না। সংগ্রাম সমিতি অন্যান্যবারের মতন এবারেও এই অন্যায় কর আদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। এ উপলক্ষে আগামী শনিবার নাট্যশিল্পী ও নাট্য-কর্মীদের এক সভার আয়োজন করেছেন। সভাস্থল—৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। সময়—সন্ধ্যা ৬টা।

পৌর নাট্যকর বৃদ্ধি, বহু অভিনয় বন্ধ

অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির ওপর আবার বাড়তি পৌর-করের বোঝা চেপেছে। গত পনেরো দিনে বহু নাট্যদল এই কর দিতে বাধ্য হয়েছেন। কিছু সংস্থা কর দিতে অসম্মতি জানালে কলকাতা করপোরেশনের থিয়েটার ইনসপেক্টর অভিনয়ের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। ফলে বহু অভিনয় অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং দলগুলি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গত শনিবার সন্ধ্যায় ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে এই বাড়তি করের প্রতিবাদে এক সভা ডাকেন নাট্য সংগ্রাম সমিতি। রবীন্দ্রভারতী অনুমোদিত কোনো দলের কাছ থেকে ২৫ টাকা, কোনো দলের কাছ থেকে ৪০ টাকা এবং আবার কোনো দলের কাছ থেকে ৫০ টাকা নিতে শুরু করেছেন।

করবৃদ্ধির প্রতিবাদে সভা

শনিবার নাট্য সংগ্রাম সমিতির ডাকে বহু নাট্যসংস্থার প্রতিনিধিরা করবৃদ্ধির প্রতিবাদ সভায় দলে দলে যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন কিরণ মৈত্র। নাট্যকার সুনীল দত্ত, অমর গাঙ্গুলী, দীপ্তি শীল, বসন্ত ভট্টাচার্য, সরোজ রায়, বিমল রায় প্রভৃতি এবং বিভিন্ন নাট্যদলের প্রতিনিধিদের মধ্যে সজল ঘটক, নিমাই সুর, স্মৃতিময় ব্যানার্জী, রাখাল ভট্টাচার্য, সুশীল সিংহ, সলিল ঘোষ

দেবেশ চক্রবর্তী, মণ্টু গাঙ্গুলী, বদরুদ্দিন আমেদ, অজিত ভট্টাচার্য, তরুণ ঘোষ, বসন্ত সাহা, অমরেশ দত্ত, পল্লব চ্যাটার্জী, কমল গাঙ্গুলী, দিলীপ ব্যানার্জী প্রভৃতি ভাষণ দেন। ভাষণে পৌর-প্রশাসনের আমলাতন্ত্রের উপর নিন্দাবাদ বর্ষিত হয়। সভায় স্থির হয় আগামী বুধবার নাট্য-সংগ্রাম সমিতির একটি প্রতিনিধি দল বেলা তিনটার সময় পৌর প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করতে যাবেন এবং এই কর প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাবেন।

বাড়তি নাট্য কর প্রত্যাহৃত

কলকাতা করপোরেশনের থিয়েটার বিভাগ আকস্মিকভাবে যে বাড়তি নাট্য কর আদায় করতে শুরু করেছিলেন গত সপ্তাহ থেকে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। ফলে সাংস্কৃতিক মহলে যে প্রবল বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল তা প্রশমিত। পেশাদার, অপেশাদার দলগুলির অভিনয় উদ্যোগ আবার স্বাভাবিক রীতিতেই চলছে। নাট্য সংগ্রাম সমিতি জানিয়েছেন করপোরেশনের অ্যাডমিনিসট্রেটরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আলোচনায় স্থির হয় পৌর নাট্য কর আগের মত ১ টাকাই বহাল থাকবে। যাই হোক এখন থেকে করপোরেশনের থিয়েটার বিভাগ আগের মতন ১ টাকা হারেই নাট্য কর নেবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।

সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হলে পৌর প্রশাসক আরো জানান যে, থিয়েটার ইনসপেকটর যে বাড়তি নাট্য কর বিভিন্ন দলের কাছ থেকে নিয়ে ছিলেন সেই সমস্ত দলকে টাকা ফেরত নিয়ে যাবার জন্য পত্র দেওয়া হবে শিগগীরই। এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা হঠাৎ না ঘটে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা হবে বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।

নাট্য সংগ্রাম সমিতি মনে করেন এই করবৃদ্ধির মূলে রয়েছে করপোরেশনের থিয়েটার বিভাগের কতিপয় কর্মী। কীভাবে এবং কেন এই কর বাড়ানো হয়েছিল সেই গোপন তথ্য আবিষ্কারের জন্য নাট্য সংগ্রাম সমিতি চেষ্টা করে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

ছন্নছাড়া নাট্যগোষ্ঠী

১৯৭২ সাল, কলকাতা থেকে একটু দূরে বাটানগর স্পোর্টস ক্লাব হলে ২০শে জানুয়ারী একটি নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। নাটকটি খুবই পরিচিত। বহুরূপী অভিনীত নীতিশ সেনের 'বর্ব্বর বাঁশী'। নাটকটি সম্পর্কে বহুরূপী যা বলেছেন তার উল্লেখ করছি—

'কোন কাহিনীই ইতিহাসবহির্ভূত নয়। সব কাহিনীরই একটা অতীত আছে। একটা অতীত কেন, বলা যায় অনেক দিনের অনেক অতীত মিলেই আজকের দিনের কাহিনী সৃষ্টি করেছে। 'বর্ব্বর বাঁশী' তেমনই একটি আধুনিক কাহিনী, যার মধ্যে লোভ, স্বার্থপরতা ও নৃশংসতার ছবির রেখায় রেখায় আমাদের সামাজিক ভাঁড়ামির ইতিহাস বিবৃত। তারই ফলে আজ জীবনের ঘূর্ণাচক্রে সামান্য সাধারণ মানুষগুলো অন্ধের মতো ঘুরছে,—বাঁচবে ব'লে আশা করতে করতে মরে যাচ্ছে। অথচ এরা সবাই বেচারী মানুষ। অবস্থার চাপে এরা তাড়িত, পর্য্যুদস্ত ও হীনমন। এই তরস্রোতের মধ্যে যদি কেউ মানবিক সম্মান নিয়ে বাঁচতেও চায় তো সে একা হয়ে যায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অথচ, আমরা কি সে সমাজ গড়তে পারবো যেখানে ভালো লোকগুলো ভালো করে বাঁচতে পারবে।'

বাটানগরের ছন্নছাড়া নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কোলকাতা থেকে এতো দূরে এসে এতো ভালো অভিনয় আমি আশা করতে পারিনি। পরে জানতে পারলাম এই নাটকই এদের প্রথম নয়। অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এসে তবে এই নাটক ধরেছেন। ১৯৬৯ সালে এরা বংশী মুখোপাধ্যায়ের 'জিজ্ঞাসা' অভিনয় করেন প্রথমে ১৬ই আগষ্ট। তারপর এরা বেহালা যুব সংগঠন পরিচালিত একাংক প্রতিযোগিতায় রতন কুমার ঘোষের 'সমুদ্র সন্ধানে' অভিনয় করেন। ১৯৭০ সালে বাটানগরে শম্ভু বাগের 'ঘুম ভাঙার গান' অভিনয় করেন। এ বছরেই আর. দেবনাথের 'একটি পয়সা দাও' অভিনয় করেন। ৭২ সালে রতন কুমার ঘোষের 'বিষুবরেখা' ১২ই ফেব্রুয়ারী মঞ্চস্থ করেন কৈলাস নগর বারাসতে গিয়ে। এদের সর্বশেষ নাটক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'গণদেবতা' রতনকুমার ঘোষের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন ২০শে জুন বাটা সিনেমা হলে।

বিভিন্ন সময়ে এদের সঙ্গে যারা অভিনয় করেছেন : মদন ভট্টাচার্য, অজিত দাস, জহর গুহরায়, অমিয় সেন, তপন ব্যানার্জী, সেখ ইব্রাহিম, রতন লাল চৌধুরী, উমেশ চন্দ্র দে, তুষার সেন, দিলীপ দাস, অনিল সামন্ত, কার্তিক দত্ত, সুশান্ত অধিকারী, মুকুল ব্যানার্জী, অজিত ভদ্র, যোগেশ মণ্ডল, হারাধন পাল, অর্পণা দত্ত, রমা গুহ, মিস বীনা সেন, কুমারী গোস্বামী, সবিতা ঘটক, সুদীপ দাসগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সুপ্রিয়া ঘোষ, মাঃ স্বপন ভদ্র, তপন ব্যানার্জী, গৌর ব্যানার্জী, সুনীল সামন্ত। বিভিন্ন নাটক পরিচালনা করেছেন বিভিন্ন সময়ে, অজিত কুমার দাস, মদন ভট্টাচার্য।

মঞ্চের দাবীতে নাট্য সংগ্রাম সমিতি

১৩৭২ সাল। আজ এই ফেলে আসা ৩০টা বছর হিসেব করলে দেখা যায় নাটক বেড়েছে—নাট্যদল বেড়েছে। কিন্তু মঞ্চ? বাড়াতো দূরের কথা বরঞ্চ কমার দিকে ঝোঁক। সেই মঞ্চর দাবীতে মাঝে মাঝেই কোন না কোন ভাবে আন্দোলন হয়। সেই মঞ্চের দাবীতে আনন্দবাজারের আনন্দলোকে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল ১৫ই জুলাই ৭২-এ। আমি সেই লেখাটি এখানে তুলে দিলাম।

টাকা আছে মঞ্চ নেই

যেখানে নাট্যমঞ্চের এত অভাব, সেই কলকাতায় আজ থেকে ১১ বছর আগে একটি মঞ্চগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর মহাসমারোহে স্থাপিত হওয়া সত্বেও এই দীর্ঘকালের মধ্যে তার কাজ কেন শুরু হলোনা, সেটাই আজকের প্রশ্ন। এবং ওই প্রশ্নটিই সোচ্চার হয়ে উঠেছে অসংখ্য নাট্যযোদ্ধীর মনে। কলকাতার কয়েকশত নাট্যসংস্থাও এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করছে।

১৯৬১ সালের ২০ মারচ ৩৪ নির্মলচন্দ্র স্ট্রীটের (হিন্দ প্রেক্ষাগৃহের উলটো দিকে) পৌর বিদ্যালয় ভবনে প্রস্তাবিত রবীন্দ্র ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। স্থাপন করেন মহা নাগরিক কেশবচন্দ্র বসু। কলকাতা পৌর সভার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষেই এই 'রবীন্দ্র ভবন' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। ভবনটি হবে ত্রিতল। নাট্যমঞ্চ ছাড়াও এতে থাকবে গ্রন্থাগার, চিত্রপ্রদর্শনীর গ্যালারি প্রভৃতি। এ-জন্য একটি নকসাও তৈরী হয়েছিল বলে জানি। তবু

ওই ভবন প্রতিষ্ঠার কাজে কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষকে কখনও আর উৎসাহিত হতে দেখা যায়নি।

কেন পৌরসভা প্রস্তাবিত রবীন্দ্র ভবন তৈরী হচ্ছে না—এই নিয়ে প্রথম আন্দোলন শুরু হয় গত ১৯৬৪ সালে। আন্দোলন করেন নাট্য সংগ্রাম সমিতি। পৌরসভার পক্ষ থেকে গোবিন্দচন্দ্র দে সংগ্রাম সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। ওই বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন ফিন্যান্স কমিটির সদস্য অনিল মৈত্র এবং অলডারম্যান অপরেশ ভট্টাচার্য। আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীদে জানান, প্রস্তাবিত রবীন্দ্র ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থও বরাদ্দ করা আছে। ওই সময়ে জানা যায়, রবীন্দ্র ভবন প্রতিষ্ঠার কাজ যতদূর সম্ভব ওঁরা ত্বরান্বিত করবেন। ১৯৬৬ সালেও যখন কাজ শুরু হলো না, তখন ওই সালের ২৫ বৈশাখ নাট্য সংগ্রাম সমিতি নীরব দাবী জানায় ওই বিদ্যালয় ভবনের সামনে, মুক্ত আকাশের নীচে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করে।

তারপর ১১ বছর অতিক্রান্ত। এর মধ্যে কলকাতা শহরের উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি-কোটি টাকা খরচ হয়েছে ও হচ্ছে। কেবল বোঝা যাচ্ছে না অনুমোদিত নকশা আর অর্থের বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও কলকাতা পৌরসভা কেন প্রস্তাবিত রবীন্দ্র ভবনের কাজে হাত দিতে এত কুণ্ঠিত!

সময়মঞ্চ

১৯৭২ সাল ফেব্রুয়ারীতে সময়মঞ্চের প্রথম পরিকল্পিত নাট্য প্রযোজনা 'শাপলা'—নাট্যকার—বীরেন চক্রবর্তী। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে 'শাপলা' নাটক এক অভিনব প্রথা প্রবর্তন করেছে ব'লে সংস্থা দাবী করেন। এই নাটকে প্রয়োজন হ'লে দু'য়ের অধিক অথবা মোট চরিত্র সংখ্যার সমসংখ্যক অভিনেতা অভিনেত্রীও অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই নাটকে মোট চরিত্র হচ্ছে নয়জন। এই নয়জনের চরিত্র ইচ্ছা করলে একজন নট ও একজন নটী দ্বারা অভিনীত হতে পারে আবার প্রয়োজনে দু'য়ের অধিক বা নয়জন নট ও নটী দ্বারা অভিনীত হতে পারে।

নাটকের মূল কথা ছদ্মবেশ: অর্থকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রায় প্রত্যেকটি ব্যক্তি নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে আপাতঃ স্বাভাবিক ছদ্মবেশ

গ্রহণ করে। সেই ছদ্মবেশ থেকে উত্তরণের স্বাধীনতার ইচ্ছার সঙ্গে ছদ্মবেশের দ্বন্দ্বই এই নাটকের মূল বিষয়।

পরিচালনার ভার নেন শেখর চক্রবর্তী। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করার ভার নেন শেখর চক্রবর্তী এবং মমতা নাগ চৌধুরী। মঞ্চব্যবস্থায় থাকেন রামচন্দ্র শেঙে। অভিনয়ের স্থান—প্যারিশ হল। সংগীত—শেখর চক্রবর্তী ও বীরেন চক্রবর্তী।

'সমন্বয়মঞ্চ'র দ্বিতীয় প্রযোজনা 'রক্তজবা'। নাটকটির রচয়িতা বীরেন চক্রবর্তী। এই নাটকে পৃথিবীর সমস্ত ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটরদের একই ধরণের উত্থান পতনের চরিত্রগত সাদৃশ্যকে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। প্রত্যেক দেশেরই ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটরদের উত্থান পতনের কাহিনী প্রায় একরকমের। সেই কাহিনী আধা রূপক ও আধা ইমেজধর্মী বৈশিষ্ট্য এই নাটকে প্রকাশিত হয়েছে।

'রক্তজবা' নাটক নির্দেশনা, সংগীত পরিচালনা এবং ডিক্টেটরের ভূমিকায় অভিনয় করার দায়িত্ব নেন শেখর চক্রবর্তী। অন্যান্য বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন মমতা নাগ চৌধুরী, বীরেন চক্রবর্তী, সরোজ গুপ্ত, জিয়াদ আলি প্রভৃতি। মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রামচন্দ্র শেঙে।

দরবেশ

১৯৭২, এপ্রিলে কয়লাঘাট মঞ্চে দরবেশ সংস্থা বিনয় লাহিড়ীর ব্যঙ্গাত্মক নাটক 'গিরগিটি' অভিনয় করেন। এই নাট্যানুষ্ঠানে ডঃ অজিত ঘোষ, নাট্যকার মন্মথ রায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, প্রমুখ উপস্থিত থেকে নাটক ও দলগত অভিনয়ের প্রশংসা করেন। পরে জানা গেল এই সংস্থা ১৯৬৪ সালে ২৯শে এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। বিনয় লাহিড়ীর (১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব আয়োজিত নাট্য রচনা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ নাটক রূপে পরিগণিত) 'চিঠি' নাটক মহাজাতি সদনে এই অনুষ্ঠানে অভিনীত হয়। এই নাটকের অভিনয় করেই দরবেশ ৬৫ সালে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে দ্বিতীয় পুরস্কার পান এবং বিনয়বাবু শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে সম্মানিত হন।

তারপর বিনয়বাবু রচিত ও পরিচালিত 'উদ্বাস্তু', 'ডিউটি' (রবীন্দ্রনাথের 'ডিটেকটিভ'—লেখকের নাট্যরূপ), 'ছন্দ নেই', 'মড়েল প্রভাত' প্রধানতঃ মৌলিক নাটকের অভিনয় করেই দরবেশ সংস্থা যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেন।

এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অভিনয় করেন মানিক সরকার, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারমণ রায়, মহঃ আশরফ, কানন মণ্ডল, ফকীর দাস কুমার, তৃষ্ণা চ্যাটার্জী, রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালক—বিনয় লাহিড়ী।

রূপ ও রঙ্গ

১৯৭২ সাল, হিন্দী হাইস্কুলে ৯ই মার্চ একটি নাটক দেখেছিলাম। বিগত ত্রিশ বছর যে সব নাটক অভিনয় হয়েছে এ নাটক তা থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র বলা যায়। আমরা শ্রমিক জীবন, কৃষক জীবন, মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে অনেক নাটক দেখেছি। কিন্তু অরণ্যের জীবন।সে আবার কি। হ্যাঁ, সেই নাটকই দেখলাম সেদিন। নেফার জঙ্গলের রহস্য, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সত্যি অপূর্ব সে এক জীবন। বৈচিত্র্যময় নাটকের নাম—'নেফা, রহস্যময়ী নেফা'। প্রযোজনা করলেন রূপ ও রঙ্গ গোষ্ঠী, নাট্যকারের নাম বাসুদেব বসু। সেদিনকার মঞ্চে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকটি নাম আমার মনে আছে, সেই কটা নামই এখানে রাখা হলো। শেখর চট্টোপাধ্যায়, নির্মল কুমার, কালীপদ চক্রবর্তী, নৃপতি চ্যাটার্জী, বাসবী নন্দী, মীনাক্ষী গোস্বামী, মীনা হালদার। পরিচালনায় ছিলেন প্রতাপ ঠাকুর। এই গোষ্ঠী আগে আরো অনেক নাটক করেছেন, আমার পক্ষে সব জানা সম্ভব হয়নি। তাই দিতে না পেরে আমি দুঃখিত। তবে এইটুকু জানি এই 'নেফা, রহস্যময়ী নেফা' পর পর ন'দিন অভিনয় করেছেন এঁরা। এছাড়া নাটকটি বেতারেও কয়েক রাত্রি অভিনয় হয়েছে। এই প্রথম নাটক যেখানে রাত ১০টার পর কেন জানিনা বার বার মনে হয়েছে গভীর জঙ্গলের কান্না যেন আমার কানে বাজছে।

৭২-এ আবার নাটকের কণ্ঠরোধ

১৯৭২ সাল ২৬শে জানুয়ারী, একশো বছর পরে আবার নতুন করে প্রশ্ন জাগল, আমরা কোথায় আছি? যাত্রিক আয়োজিত নাট্য সম্মেলনে নৈহাটিতে যাবার পথে, সত্যযুগ পত্রিকায় দেখতে পেলাম একটি পত্র। অবাক হয়ে ভাবলাম আমরা কোথায় চলেছি? কোথায় আছি? একশো বছর আগেও নীলদর্পণ নাটককে যেভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জোর করে কণ্ঠরোধ করেছে,

আজও ঠিক একই ভাবে নাটকের ওপর পৈশাচিক অত্যাচার চালাচ্ছে· সেই পুলিশ কর্তৃপক্ষই। শুধু কি রং পাল্টেছে! ছিল সাদা, এখন কালো। অত্যাচারের রূপটা তাহলে রইল একই? কি আশ্চর্য্য এই দেশ! ঐ সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সুধী প্রধান, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য (আগন্তুক), দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (অভিনয়) ও সুনীল দত্ত। প্রশ্ন একটাই এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কি ভাবে নাটককে বাঁচান যাবে? ঘটনাটি কি ঘটেছিল আমি পত্রিকার চিঠিটা দিয়ে দিলুম—এখন জনগণই বলে দেবেন কোন পথে যাওয়া উচিৎ।

নাটক অনুষ্ঠানে পুলিশীবাধা

মহাশয়, আসানসোল থানার ও, সি, আসানসোল তালপুকুরিয়া কাল-চারাল ইউনিট আয়োজিত ১৩ থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্য্যন্ত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান শেষ মুহূর্তে জোর করে যেভাবে বন্ধ করে দিল আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। ঐ প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে আমরা উপস্থিত হয়ে দেখলাম রাইফেল উঁচিয়ে পুলিশভ্যান ঘোরাঘুরি করছে। শুনলাম থানার ও, সি, গোড়ায় অনুমতি দিলেও কোন অজ্ঞাত মহলের চাপে শেষ মুহূর্তে প্রতিযোগি ১৮টি নাটকের পাণ্ডুলিপি চান। উদ্যোক্তারা জানান শেষ মুহূর্তে এটা সম্ভব নয়। অধিকাংশ নাটকই ছাপা আর পাণ্ডুলিপির বিচার পুলিশের এক্তিয়ারের বাইরে। ও,সি, হুমকি দেন—নাটক করতে দেবোনা এবং অনুমতি ছাড়া চেষ্টা করলে গ্রেপ্তার করা হবে। এর পরই অনুষ্ঠানের সময় পুলিশভ্যান উপস্থিত হয়। ফলে অনুষ্ঠান বাতিল হয়।

আমরা শিল্প-সংস্কৃতির ওপর এই ধরনের পুলিশী হামলার তীব্র নিন্দা করছি। এবং সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করছি পুলিশকে এই ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহারের অনুমতি কে দিয়েছে? আমরা আশা করবো দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকগণ স্বাধীনভাবে সংস্কৃতি-চর্চার ওপর এই ধরনের পুলিশী জুলুমের তীব্র প্রতিবাদ করবেন। বিনীত—দিলীপ ঘোষাল, সহ-সভাপতি, গণেশ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি।



প্রকাশ্য সম্মেলনে বক্তৃতারত প্রমোদ দাসগুপ্ত ও সম্পাদক শিশির সেন রিপোর্ট পেশ করছেন।

গণনাট্যের উপর হামলা

১৯৭২ সাল, ১৪ই মার্চ ও ১৮ই মার্চ গণশক্তি পত্রিকায় দুটি সংবাদ চোখে পড়ল, সেই সংবাদ দুটি এখানে হুবহু ছেপে দেওয়া হলো।

গণশক্তি ১৪ই মার্চ ১৯৭২

গণনাট্য সঙ্ঘ অফিসে কংগ্রেসের গুণ্ডা বাহিনীর আক্রমণ

'গত ১২ই মার্চ সকালে একদল কংগ্রেসী গুণ্ডা পুলিশের সাহায্যে ক্রীক লেনে গণনাট্য সঙ্ঘের অফিস আক্রমণ করে। তারা তালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে জিনিস পত্র তছনছ করে। আলমারি ভেঙ্গে ফাইলপত্র, প্রয়োজনীয় কাগজ, টাকা পয়সা ইত্যাদি লুট করে।'

গণনাট্য সঙ্ঘের জেলা অফিস তছনছ

'মেদিনীপুর ১৭ই মার্চ—গত ১৪ই মার্চ সন্ধ্যায় মেদিনীপুর কেন্দ্রের নির্ব্বাচনী বিজয় উপলক্ষে কংগ্রেস ও দক্ষিণ পন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির যুক্ত বিজয় মিছিল গোটা শহরে এক সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

প্রথমে মিছিলটি বিকট উল্লাসে নাচতে নাচতে মীরবাজারস্থিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) জেলা দপ্তরের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলে মল্লিক বাজারের দিকে, তারপর আবার ফিরে এসে সি পি এমের জেলা অফিসে প্রচণ্ড উৎসাহে আক্রমণ করে এবং সমস্ত অফিস তছনছ করে। তারপর তারা বীর বিক্রমে এগিয়ে চললো মল্লিক চকের দিকে—লক্ষ্য গণনাট্য সঙ্ঘের অফিস। দরজা জানলা ভেঙে সমস্ত অফিসটিকে তারা তছনছ করলো। টেবিলে রক্ষিত হারমোনিয়ম, দুটি পোশাকের বাক্স আছড়ে ভাঙলো। ফাইলপত্র, নাটকের পাণ্ডুলিপি সব সামনের পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তবলা ও বাঁয়াজোড়া নিয়ে গেছে। তারপর ঢুকলো মহলা কক্ষে। সেখানে ঢুকে তারা নাটকের একটি বাঁধানো ছবি ভেঙ্গে ফেলে ক্ষান্ত হলো না, তারা গোর্কী ও লেনিনের ছবি দেওয়াল থেকে টেনে নামিয়ে ভেঙ্গে ফেলে।'

গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিবাদ—

'গণনাট্য সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ও মেদিনীপুর জেলা কমিটি এই ঘৃণ্য আক্রমণের প্রতিবাদ করে এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীকে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়ে এক বিবৃতি দিয়েছেন।'

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘর প্রাদেশিক কার্যালয়ে শান্তি গুহর সংগে একটি সাক্ষাৎকারে উনি জানালেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘর বিভিন্ন শাখায় গত দশ বছরে, আমাদের শিল্পীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার হচ্ছে, তা সত্ত্বেও আমরা টিকে আছি এবং থাকবো। এমন অনেক নাটক শিল্পীরা অভিনয় করেছে যা ছাপার অক্ষরে বেরোয়নি, কিন্তু সে নাটকগুলো খুবই জনপ্রিয়। শান্তিবাবু বললেন এতো বাঁধা মঞ্চে অভিনয় হয়নি, হয়েছে মাঠে ময়দানে। যার রেকর্ড একমাত্র গণনাট্য সঙ্ঘর কার্যালয়েতেই আছে। আর আছে হাজার হাজার জনগণের মনের অন্তরে। তাই আমি ওদের বেশ কিছু নাটকের নাম এখানে দিয়ে দিলুম। যেমন—প্রান্তিকের শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্নপূর্ণার দেশে'. 'আত্মহত্যা আইনী কর', যাত্রিক ও দেশবন্ধুনগরের 'ইতিহাসের কাঠগড়ায়'. চারণ সাহিত্য চক্রর বারীন রায় রচিত 'চাঁদিনীরাত', রিষড়ার ভূপেন্দ্র ভৌমিক রচিত 'গুপ্তবিদ্যা', সাম্প্রতিকের 'শিবঠাকুরের দেশ', রূপদর্শীর 'যা তারা পারেনি', রূপকের 'আত্মহত্যা', রেনেসাঁর 'দৈনিক সন্দেশ', স্বস্তিকের 'ঢেউ ও বিচার', 'আমার মাটি' ও 'ঢেউ-এর পরে ঢেউ', ঢাকুরিয়ার শিব শর্মার 'অবরুদ্ধ ঝড়', যাত্রিকের ব্রজসুন্দর দাসের 'নবহট্টমালা', উৎপল দত্তর 'রাতের অতিথি'. বরাহনগর শাখার নবকুমার ভট্টাচার্যের 'ক্রান্তিকাল', 'স্ক্রুটিনি', বারুইপুরের হীরেন ভট্টাচার্যের 'বাস্তব শাস্ত্র', মিলন দের 'সংশপ্তক', 'ইতিহাসের পাতা', বহরমপুর শাখার 'শেষ সংবাদ', 'মুকুলের মা', 'সমাধান'. শিবপুর শাখার 'ভিয়েতনাম', খালদহ শাখার 'আত্মহত্যা আইনী কর', 'আবর্ত', ব্যারাকপুর শাখার 'মে-দিবস' প্রভৃতি নাটক। সাম্প্রতিকের 'দেশে দেশে', চারণ দলের 'রক্তের রং নীল যাত্রা', ব্যারাকপুরের 'মে দিবস'. সীমান্তিকের চিররঞ্জন দাস রচিত 'জুলিয়াস ফুচিক', কলকাতা জিলা কমিটির প্রযোজনায় জ্ঞানেশ মুখার্জীর 'লং মার্চ' নাটক অভিনীত হয়।

ক্লাস থিয়েটারের 'শৃঙ্খল', 'অন্তনাটক' শিল্পীচক্র শাখার 'ভিয়েতনামের চিঠি,' সাংকেতিক শাখার 'ইতিহাসের পাতায় পথিক', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারাণের নাতজামাই' (নাট্যরূপ শিশির সেন), শিবপুর শাখার 'বিপ্লব' উত্তর হাওড়া শাখার 'সীমানায় যাত্রা' সাম্প্রতিক শাখার, 'রক্তের রং নীল' নীল বিদ্রোহের পটভূমিকায় যাত্রা চারণ সাহিত্য চক্র, 'হংস-

বদনের রোগ মুক্তি' বেলেঘাটা শাখার, 'ব্যাধি' চুঁচুড়া শাখা, 'আহ্বান' ঋত্বিক শাখার, 'দুই তরঙ্গ' কৃষ্টি সংসদের, 'ভোর যে হয়ে এলো' নন্দন নগর শাখার। নৃত্যনাট্যের মধ্যে আছে—'অহল্যা' নৃত্যনাট্য। সেন্টাল স্কোয়ার্ড এক সময়ে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ঐটি করে। 'চাষীর জয়' শিল্পীগোষ্ঠী, পুরুলিয়া 'নতুন সূর্য উঠেছে', ঐক্যতান হাওড়া, বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বিশে জুন', শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সামান্য অসামান্য', প্রান্তিক অভিনয় করেছে। বাসুদেব বসুর গোর্কী অবলম্বনে 'বেইমানের মা'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'কংক্রীট' নাট্যরূপ দিয়েছেন অরুণেশ মুখার্জি শিবপুর শাখার, 'ভুলব না' বারুইপুর শাখার হীরেন ভট্টাচার্য, 'আগুন রাঙা ইস্পাত' দিলীপ ঘোষাল চুঁচুড়া শাখার, 'রক্ত গোলাপ' শ্রীজীব গোস্বামীর বরাহনগর শাখার, 'সোনার বাংলা' বাসুদেব বসুর কলাকারের, 'মানুষের ঝড়' বাসুদেব বসুর উত্তর বেলেঘাটার, 'রাজাধিরাজ দর্শন' শিবশর্মা—ঢাকুরিয়ার, 'বেসরকারী সূত্রে' শিশির নাথ প্রান্তিকের, 'গণতন্ত্রের গলায় কাঁটা' পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলাকারের, 'শান দেওয়া কাস্তে' শ্রীজীব গোস্বামীর সাম্প্রতিকের, 'আনন্দ সংবাদ' হীরেন ভট্টাচার্য বারুইপুর শাখার, 'আমরা কবরে যাব না' শুভঙ্কর চক্রবর্তীর, 'পাশা খেলা' (যাত্রা)—শুভঙ্কর চক্রবর্তী কলাকারের, 'রথের রশ্মি'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০শে মে ১৯৭২ গণনাট্য সঙ্ঘ কলিকাতা জেলা কমিটির প্রযোজনায়, 'শাস্তি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চারণ সাহিত্য চক্র শাখা।

নাট্য পত্রিকার কণ্ঠরোধ ও সাংস্কৃতিক জগতের উপর হামলা

১৯৭২ সাল। ৭১ সালে পুজোর ঠিক আগে একটি নাটকের পত্রিকাকে, কে বা কারা যেন বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল। প্রেস ভয় পেয়ে পুজো সংখ্যা আর প্রকাশ করতে পারেনি। তারপর ৭২ সালে পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশ করে। তা থেকে দুটি লেখা আমি উল্লেখ করছি।

নাট্য প্রসঙ্গের বিনতি

নাট্যের আততায়ীরা যখন নাট্য প্রসঙ্গের ওপর অতর্কিত আঘাত হানলে, কণ্ঠের তৎপরতায় ছিনিয়ে নিতে চাইলে তার উন্নত তরবারিকে, সহসা তখনি পুরুষ সাহস নিয়ে যাঁরা পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা হলেন অভিনয় পত্রিকা ও দিলীপ বন্দোপাধ্যায়, মিনার্ভা থিয়েটার ও ইন্দ্রজিৎ সেন, নাট্যকার মন্মথ রায়, দর্পণ, বাংলা দেশ পত্রিকা ও কতিপয় সুহৃদ।

বর্বরতা তা সে যত বলবানই হোক আজ হোক কাল হোক সভ্যতার শক্তির কাছেই সে যে পরাস্ত হবেই, এই বিশ্বাসের বাণীটিকে ওরা পুনর্বার এ মাটিতে মূর্ত করালেন বলে নাট্যপ্রসঙ্গ এই সব মাননীয়দের যোদ্ধার সজ্জায় সাজালেন, বরণ করলেন আগুনের তিলকে।

নাট্য প্রসঙ্গ দ্বিতীয় বর্ষ

সম্পাদন সম্পর্কিত

বলে যাই—নাট্যপ্রসঙ্গের ওপর অকস্মাৎ দুশমনদের কলুষ আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে। অনিবার্যভাবেই পত্রিকার শারদ প্রকাশ রুদ্ধ হয়েছিল এবং নির্দ্ধারিত প্রকাশগুলিকেও বিলম্বিত করেছে। আমরা দেখছি বহুতর নাট্য, অভিনয় ও নাট্যপত্রের ওপর শ্রেণী শত্রুর তামস শাসন বিস্তৃত হয়েছে! জনতার শিল্প-কর্মার অমল অধিকার পদদলিত হচ্ছে। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের সাংস্কৃতিক উৎসাকে শৃঙ্খলিত করা হচ্ছে। হনন, ত্রাস আর রক্তের কুৎসিত বীভৎসা নাট্যের বিপ্লবমত্ততাকে কাপুরুষ শিল্পের ভৃত্য বানাবার পরামর্শ করছে। তবুও জড়ত্বনাশা স্রষ্টার খরতর নাট্যবাসনা কখনই আক্রমণকারীর পায়ে কুর্ণিশ করবে না, সেলাম জানাবে না। যুদ্ধ আছে, যুদ্ধ হবে।

বলে যাই—মঞ্চের প্রকৃত নায়ক, অযুত নিযুত নির্যাতিত নরনারীকে আমরা দৃশ্যের দরবারে উপস্থিত করবই করব। বীর কৃষক, দুনিয়ার নির্ভীক শ্রমিক শ্রেণী, বুকের রক্ত ঢালা শত শত শহীদদের সাধনাগুলিকে আমরা নাট্যের মর্মে আহ্বান করবই করব।

বলে যাই—নাট্যের এ দুর্দিনে শ্রমিক কৃষকের একাধিপত্যকে যারা পাদ প্রদীপের আলোয় সত্য করে তোলবার একান্ত প্রয়াসে আজও যুদ্ধরত তাদের সঙ্গে নাট্য প্রসঙ্গ যথার্থ মর্মতা ঘোষণা করছে।

বলে যাই—বারে বারে মূঢ় দানবের এই লজ্জিত অপব্যয় সৃষ্টির উল্লাসে কখনোই শাশ্বত অবরোধ রচনা করতে পারে না।

সারা বিশ্বের সর্বহারা সংস্কৃতি বাঁচবে। ঘরে ঘরে সর্বহারার সংস্কৃতির মানবেরা পাশাপাশি দাঁড়াবে। বাংলার যোদ্ধা নাট্যকার, রূপকার একত্রিত হবে। বাংলা থিয়েটারের একক শতক যুদ্ধের সহস্র শতক হবে।

অভিনয়ের ওপর হামলা

১৯৭২ সাল, গণনাট্য ৮ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় একটি ছোট্ট সংবাদ ছাপা হয়েছিল, আমি সেই সংবাদটি উল্লেখ করলাম।

সংস্কৃতি পদ্মবনে

'গত ২২শে জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৮টায় পুলিশ অতর্কিতে 'অভিনয়' পত্রিকার দপ্তরে সাদা পোষাকে হানা দেয়। নকশালপন্থী কোন অতি বিপ্লবী সম্পাদকের সংগে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে, এই ভুয়া অজুহাতে অভিনয় পত্রিকার সম্পাদকের বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর, আলমারী তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হয়। আপত্তিকর কিছুই পাওয়া না গেলে সম্পাদককে সোমবার থানায় ডাকা হবে হুমকি দিয়ে তারা স্থান ত্যাগ করে। নাটক ও নাট্য জগত নিয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত কিছু তথাকথিত প্রগতিশীলের মুখোস খোলার জন্যে অভিনয় পত্রিকার ইদানীংকালের উদ্যোগগুলির সংগে এই হামলার যোগসূত্র আবিষ্কার করতে খুব বেশী কল্পনাশক্তির প্রয়োজন নেই। সরকার যে সত্য ভাষণ পছন্দ করেন না অভিনয় সম্পাদকের ওপর হামলায় তা আরও একবার প্রমাণিত হলো।'

৭২ সালে ভারতীয় ব্রেস্ট সোসাইটির পক্ষে শোভা সেন কর্তৃক প্রকাশিত ও উৎপল দত্তর সম্পাদনায় একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার নাম এপিক থিয়েটার। তার মে মাসের সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়। তাতে ঐ সময়কার সাংস্কৃতিক জগতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আমি সেই লেখাটি এখানে ছেপে দিলুম।

গৌরচন্দ্রিকা

'যে দিবসে বিশ্বের শিল্পী-নাট্যকার-লেখকদের সামনে নূতন ক'রে উদিত হয় সেই সনাতন প্রশ্ন : শ্রমিকের বিশ্বজয় অভিযানে আপনি কোথায়, কি কাজ করলেন, কতটুকু এগোলেন : সন্ত্রস্ত একদল লেখনীবিদের আয়াসসৃষ্ট এক মিথ্যা ছিল : শ্রমিক স্বভাবতই অরসিক, সে পদ্মবনে মত্তহস্তী, সে শিল্পসাহিত্যের ঐতিহ্যকে পদাঘাতে চূর্ণ করবে। কার্যতঃ পারি কমিউনের যুদ্ধবিক্ষুব্ধ কয়েক সপ্তাহ আয়ুকালেই দেখা গেল শ্রমিক-বিপ্লবীরা ফরাসী সাহিত্য সংরক্ষণ ও জনমধ্যে প্রচার সম্পর্কে ভাবছেন, নাট্যশালার স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা

করছেন। তারপর স্তালিনের সোভিয়েতে এসে দেখা গেল শেকস্‌পীয়ার থেকে শুরু করে তলস্তই পর্যন্ত সমগ্র অতীতকে অধ্যয়নের তপস্যা, দেখা গেল দিয়াঘিলেভ-পাভলোভার ঐতিহ্যকে আঁকড়ে রেখে বলশই ব্যালেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশালায় পরিণত করার সাধনা এবং চাইকভ্‌স্কি সংগীত বিদ্যালয়ে শোনা গেল বেঠোফেন-মোৎসার্টের বিশুদ্ধ সিমফনি। গোর্কি মায়াকভ্‌স্কির শ্রমকর্কশ প্রোলেতারীয় সাহিত্যের পাশাপাশি অতীতের পক্ষীকূজন সুর—কোন বিরোধ নেই। শ্রমিক সবই চায়, কেন না সে স্রষ্টা, সৃষ্টি তার কাছে পবিত্র। পিকিং অপেরার শুদ্ধতা রক্ষায় চীনের সরকারের উদ্যোগ, সে আঙ্গিকে নতুন বিষয়ের উত্থাপন, পিকিং-এর রাস্তার মোড়ে শ্রমিক-কৃষক সাহিত্যরসিকদের প্রবল উৎসাহভরে বেঠোফেন-শেকস্‌পীয়ার-রোলাঁ সম্পর্কে আলোচনা-সভা—কোথায় এর নজীর সারা "মুক্ত" দুনিয়ায়? ইংরেজ শ্রমিকের ক'জন পেয়েছেন তাঁদেরই জাতীয় কবির নাটক-পাঠের সুযোগ? ক'জন মার্কিন শ্রমিককে দেয়া হয়েছে ওয়াল্ট হুইটম্যান অধিকার? পরিবর্তে তো দেখি যুবক শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করার জন্য কুৎসিৎ যৌনবিকারের হাট বসেছে "মুক্ত দুনিয়ার" বই-এর বাজারে আর নাট্যশালায়। এমনো সব চিন্তাবিদ ছিলেন এই সেদিন পর্যন্ত যাঁরা এরেনবুর্গ আর চেন-চি-তুংকে বলতেন পার্টির হাতের পুতুল; খোদ ইওনেস্কো ব্রেশ্‌ট্‌কে "বয় স্কাউট" বলে উপহাস করেছিলেন। এঁরা অনেকেই এখন মুখ বুজে আছেন। বোধহয় "ওঃ ক্যালকাটা" বা "হেয়ার" নাটকে মঞ্চোপরি যৌনক্রীড়ার অতিশয় বাস্তব ও লোমহর্ষক অভিনয়ের তুলনায় ব্রেশ্‌ট্‌-এর নাটককে বা পিকিং অপেরার "লাল লণ্ঠন" পালাকে পার্টি-ইশতেহার বা অন্য কিছু বলে উড়িয়ে দিতে এঁদেরও চক্ষুলজ্জায় বাধছে।

"মুক্ত দুনিয়ার" "অরেঞ্জ" বোমার গ্যাসে ভিয়েৎনামী নারীদের জঠরস্থ জরায়ু জখম হয়েছে ব্যাপক হারে, এ নারীরা আর মা হতে পারবেন না কখনো। উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডে "মুক্ত দুনিয়ার" মেশিনগানে নারী-শিশু কেউই পার পাচ্ছে না। আংগোলায় জীবন্ত গেরিলার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বার করা নাকি "মুক্ত দুনিয়ার" সৈনিকদের একটা খেলা। চিলিতে রাষ্ট্রপতিকে হত্যার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকা নাকি মার্কিন "মুক্ত" বৈদেশিক নীতি। "মুক্ত দুনিয়া" তো দেখছি সভ্যই নয়, সে শিল্প-সংস্কৃতির কী বুঝবে? এই দুনিয়ার কাছে শিল্পী সংস্কৃতির ঐতিহ্য গচ্ছিত রাখা কোন কাজের কথা হতে পারে কি?

এই অসুরদের দানবীয় হানায় যখন এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার সভ্যতা পর্যন্ত বিপন্ন, তখন "শ্রমিক একনায়কত্বে সাহিত্য বিপন্ন" একথাটা নেহাৎ বোকাটে শোনায় বলেই বোধহয় প্রবক্তারা নাচার হয়ে নীরব হয়েছেন।

আর এদেশের—এ মোর দুর্ভাগা দেশের—কেউ কেউ যখন চীন রাশিয়ার শিল্পীর "দাসত্ব" সম্বন্ধে প্রবন্ধ ফাঁদতেন "শিল্পীর স্বাধীনতা" নামক রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজে, তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অনেক সময়েই হাসি সামলাতে পারতেন না। ক্ষুধিত, বিধ্বস্ত কলিকাতা শহরে উচ্ছিন্ন কঙ্কালসার কৃষকে পরিবৃত হয়ে তাঁরা চীনে কেন মানুষ শালগম খেয়ে জীবনধারণ করে এ বিষয়ে রূপকথা ফেঁদেছিলেন। তাঁরা তখন সুশৃঙ্খল সৈনিকের মতন সরকারী জয়ঢাকের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছেন, সরকারী ভ্রূকুটিতে ত্রস্ত হয়ে নিজেদেরই পূর্বে-লেখা গ্রন্থকে অস্বীকার, প্রত্যাহার ও নিন্দা করছেন, সরকারের হুকুমে ছুটছেন বেতারকেন্দ্রে এবং সেখানে নিজের বিদ্যা এমন কি বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ঘোষণা করছেন : চীনের ছ' হাজারের বৎসরের ইতিহাস, জলদস্যুতার ইতিহাস। সরকার-ভজনায় অধীর হয়ে তাঁরা "পীতজাতি" টেনে কথা কইলেন হিটলারের ঢঙে। এমন কি শিশুদের জন্য আঁকা রঙীন কার্টুনে বললেন "চীনারা শূকরের মতন বংশবৃদ্ধি করে"—তাও সরকারের আদেশে। আর একই সঙ্গে তাঁরা চীনা লেখকরা যে সরকারের আজ্ঞাবহ এজন্য যৎপরোনাস্তি উষ্মা প্রকাশ করলেন এবং এদেশে শিল্পী যে কি পরিমাণ স্বাধীন সে আনন্দে ডগমগ হলেন। এরকম মজাদার তামাসা দেখে হাসি পাবে এ আর বিচিত্র কি? ধড় থেকে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও যদি কবন্ধ জড়ির পাগড়ির বড়াই করে তবে সেটা উপভোগ্য পরিহাস।

আসলে এদেশে যাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমোত্থানে শঙ্কিত, তাঁরা বিকল্পের চেহারাটা গোপন ক'রে রাখেন, এদেশের ধনিকশ্রেণীর চরিত্র সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের ভান করে। মে-দিবসের এটা এক মূল শিক্ষা—হয় শ্রমিকের নেতৃত্ব, নয় বুর্জোয়ার নেতৃত্ব, বিকল্প নেই, তৃতীয় মার্গ নেই, মধ্য পথ নেই। ভারতীয় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার তাঁবে থেকে আমাদের শিল্পসংস্কৃতি বড়ই নিরাপদ, বড়ই স্বাধীন, এ কথাই কি বলতে চান "সরকারী" লেখকরা? এমন উদ্ভট কথা উজবুকেও কি গলাধঃকরণ করবে? ভারতীয় মুৎসুদ্দি গদিতে বসে কালো বাজারি করে, আয়কর ফাঁকি দেয়াটাকে একটা বিজ্ঞানে উন্নীত করার কৌশল করে, এজেন্সি এবং সুদে টাকার থলি ফাঁপায়। চুরি এবং জোচ্চুরি এর

মজ্জাগত। এ অর্ধশিক্ষিত, অর্থগৃধ্নু এক বদমায়েশমাত্র। ব্রিটিশ বা মার্কিন বুর্জোয়ার সঙ্গে এর প্রকৃতিগত কোনো মিলই নেই; শোষণের মাঝেও মার্কিন বুর্জোয়া তার বিপ্লবী অতীতের জের টানে, দেশকে গড়ে, কারখানা শিল্পকে প্রসারিত ও উন্নত করে, শিল্প সাহিত্যকে বিপুল অর্থ সাহায্য ক'রে লাইব্রেরী গড়ে, অর্কেস্ট্রা পোষে, নাট্যশালা গ'ড়ে দেয়, বৃত্তি দিয়ে লেখক পোষে, কার্নেগি হলের মতন সংগীত ভবন বানায়। সে এগুলোকে উন্নততর শোষণের অপরিহার্য অংগ মনে করে। সে শুধু কেড়ে নেয় না, ঘুষ দিয়ে খুসি রাখে।

কিন্তু এদেশের বুর্জোয়া তো শিল্পপতি নয় প্রধানত ফাটকাবাজ, চোর। খাদ্যে ভেজাল দেওয়াটাও এদের ব্যবসার স্বীকৃত অংগ। এ গড়ে না কিছুই, চুরি ক'রে পালিয়ে যায়। এ কারখানার ফাইল চুরি ক'রে কর ফাঁকি দেয়, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা "মেরে দেয়", কোথাও কোনো মুনাফার গন্ধ পেলে শকুনের মতন হামলে প'ড়ে, তারপর যতটুকু শুষে নেয়া যায় নিয়ে দ্রুত সরে আসে। এ ডাকাতমাত্র লুঠেরা, তস্কর। এদের কাছে শিল্পসাহিত্যের মূল্য কি? রবীন্দ্রনাথের ভাও কিত্‌না? এরা তো কার্নেগি হল বানায় না, বানায় হনুমানের মন্দির। এদের শিল্পবোধের চরম অভিব্যক্তি গোমাতার ক্ষুরচতুষ্টয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে। এই সেদিন দিল্লীতে এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করার দাবী তুলেছিলেন, কেননা তাঁরা হঠাৎ জ্ঞাত হয়েছিলেন যে বঙ্কিম নামে কে এক ছোকরা "কৃষ্ণচরিত্র" লিখে হিন্দুধর্মের অবমাননা করেছে। আর কলকাতা শহরে দীনবন্ধু মি'ত্তিরকে লালবাজারে ডেকে পাঠাবার চেষ্টা হয়েছিল কিছুদিন আগে। এদের একাংশ মুনাফার লোভে চলচ্চিত্রে ঢুকে কি ইতরামির স্রোত বইয়েছেন সেটা কি গোপন আছে?

আর নাটকের জগতে এঁদের নিরেট চেতনার দাপট বহুদিন সহ্য করেছি আমরা। ১৮৭৬-এর ব্রিটিশ-সৃষ্ট নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে কলকাতায় নাট্যকর্মীদের মিছিল পর্যন্ত করতে হয়েছিল, রবীন্দ্রসদনের দ্বারোদ্‌ঘাটনের দিন তাঁদের লাঠি ও বোমা খেতে হয়েছিল, "কল্লোল" নাটককে দমন করবার বহুবিধ আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়েছিল। এই রসজ্ঞানবর্জিত ফাটকাবাজ বুর্জোয়ার হাতে আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির দায়িত্ব দেয়া চলে, এই ভীষণ তত্ত্ব কি কেউ মেনে নেবে?

এদের ভীষণতা এখন আরো প্রত্যক্ষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখন সাংবাদিক-কবি সরোজ দত্তকে ওরা গুলি ক'রে ময়দানে ফেলে দিচ্ছে। হঠাৎ

বেলেঘাটায় উদ্যত পিস্তল হাতে "অশোক কোথায়—অশোক কোথায়" গর্জন ক'রে পুলিশ ঢোকে, তারপর এক বুড়ি মাতার চক্ষের সম্মুখে পাড়ার পাঁচটি ছেলেকে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। জেলে জেলে তারা স্রেফ লাঠি দিয়ে পিটিয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের হত্যা করে, পাড়া ঘিরে তারা নকশাল বা সি-পি-এম দমনের নামে ত্রাস সৃষ্টি ক'রে চিরতরে মানুষের কণ্ঠরোধ করতে চায়। আজ নাটুকে দলগুলি তাদের ইচ্ছামতন নাটক করতে পারছে না কেন? চার বছর আগেও যুক্তফ্রন্টের আমলে তাদের যে স্বাধীনতা ছিল, আজ তা নেই কেন? কোথায় গেল রঙ্গপ্রিয় কিছু লেখকের সেই "শিল্পীর স্বাধীনতার" আবহাওয়া? জিগ্যেস করুন দলগুলির কাছে; জবাব পাবেন—ত্রাস, ভয়, আতঙ্ক। শুনবেন—নাটকে এখন কিছু বলতে গেলে রাজনৈতিক নামাবলি-পরা একদল মাস্তান-কর্তৃক আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যে খবর আসছে—কোনো থিয়েটারে ঢুকে এই সশস্ত্র ঝটিকাবাহিনী শাসিয়ে এসেছে, নাটকে রাজনীতি থাকলে বোমা মারবো; পুস্তকবিক্রেতার দোকানে ঢুকে বলে এসেছে, অমুক বই বেচলে খুন করবো; ইত্যাকার বহুবিধ উপায়ে শ্বেতসন্ত্রাস ছড়ানো হচ্ছে। এ অবস্থায় যিনি শিল্পীর স্বাধীনতা আবিষ্কার করেন, হয় তিনি অন্ধ আর নয় সুচতুর মিথ্যাবাদী।

১৯৬২ সালে এ প্রক্রিয়ার শুরু। তখন অনেকেই অবহিত হননি। তারপর ক্রমশঃ "কিছু নকশালকে মারছে, আমাদের কি?" এই সন্তোষটুকু খুঁজে বার ক'রে অনেকেই ফেলেছেন স্বস্তির নিঃশ্বাস, কোলের কাছে টেনে নিয়েছেন আলবের কামুর উপন্যাস এবং ভেবেছেন আমার দিগ্বিজয়ী মনের অসীম বিচরণক্ষেত্রে পাঁচিল তোলার সাধ্য কার? শ্রমিক-হত্যা, ছাত্র-অধ্যাপক-হত্যা, বিচারপতি-হত্যা, হেমন্ত বসু-হত্যা—এইসবের মাঝে বসে অনেকেই সি-পি-এমকে নন্দ ঘোষ ভেবে মনুষ্যজীবনের নিরবলম্ব পবিত্রতার ব্যাখ্যায় বসেছেন, কলকাতা কত ইতর কত ভীষণ কত রক্তলোভী হয়ে গেছে এইসব কাহিনী লিখে দিল্লী-বোম্বাইয়ের ধনিক সংবাদপত্রের সেবা করেছেন। মানুষের প্রাণের জগৎবিচ্ছিন্ন মূল্য নিরূপণে এঁরা চাপা দিয়েছেন বাস্তবের চেহারা। বাস্তবে কে কার প্রাণ নিচ্ছে এবং কেন নিচ্ছে, এই সত্য চাপা পড়ে গেল কলকাতার আত্মিক-অবনতির দার্শনিক আলোচনায়। এই সময়েই প্রগতিশীল নাটুকে দলগুলি ভেঙ্গে চুরমার হোলো। "কলকাতার যুবক" নামক এক গিনি-পিগ আবির্ভূত হোলো মঞ্চে এবং তার বিচ্ছিন্নতা নিঃসংগতা হোলো

নাটকের উপজীব্য। প্রতি মুহূর্তে এইসব নাটক আসল সত্যকে চাপা দিয়ে রক্তোন্মাদ পুলিশ-ওয়ার্ডারদের হাত জোরদার করেছে। দায়িত্ব অখণ্ড। প্রতিক্রিয়ার ব্যাপক ও হিংস্র আক্রমণকে ধোঁয়াটে দর্শন দিয়ে আড়াল ক'রে দাঁড়ালে গণতন্ত্র-হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়। "কমিউনিস্টদের মারছে, আমাদের কী?" এই মূঢ় প্রশ্ন বহুবার ইতিহাসে শোনা গেছে এবং প্রতিবারই অচিরে শোনা গেছে আর্তস্বর: "গেল গেল সব গেল"। কমিউনিস্টরা মরলে যায় ইহুদীরা, তারপর সর্বপ্রকারের সমাজতন্ত্রী। তারপর গণতান্ত্রিক মানুষ মাত্রেই রওনা হয় কারাগারের দিকে। তখন বই-পোড়ানো উৎসবের মাঝে হতভম্ব ও শৃংখলিত হয়ে বসে থাকেন "স্বাধীন" লেখকের দল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "ছেলে গেছে বনে" এবং অন্যান্য কিছু কবিতা জলন্ত ভাষার সব আবিলতা ছিন্ন ক'রে তুলে ধরেছিল বাস্তবের চেহারা, কলকাতার যুবকের হাতে তিনি দেখেছিলেন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত আমারই পতাকা। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রশ্ন করি নাট্যকারদের কাছে: ত্রাস সংকুচিত হ'য়ে প্রাণ কি বাঁচবে? হাঁটু-গেড়ে প্রাণ ধারণ ক'রে আজ মে-দিবসে নিজের মনের কাছে কী জবাব দেব আমরা?

ওদিকে বোম্বাইয়ের বিজয় টেণ্ডুলকরের "গিধাড়ে" নাটক নিষিদ্ধ হবার পর তাঁর "সখারাম বাইণ্ডার" নাটকও নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। দুয়ের বিরুদ্ধেই অশ্লীলতার অভিযোগ এনে সরকার বাহাদুর সাম্রাজ্যবাদের পুরাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বত্র অশ্লীলতা দেখতে পায়। শ্লীলতা বলতে তারা বোঝে নিঃসর্ত আনুগত্য। বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রে মহারাষ্ট্র সরকার কোনো অশ্লীলতা দেখেন না, দেখেন টেণ্ডুলকরের নাটকে। ব্রিটিশও ১৮৭৬ সালে কলকাতার রঙ্গমঞ্চকে দমন করার জন্য অশ্লীলতার জিগির তুলেছিল। অবশ্য এই সেদিন স্তম্ভিত হয়ে দেখি বাংলাদেশে এখনো এমন চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী আছেন যিনি ১৮৭৬-এর ক্ষেত্রে ব্রিটিশের সমর্থক, ব্রিটিশের কথাই বিশ্বাস করেন। তিনি বাংলা থিয়েটারকে দমন করার জন্য ব্রিটিশের প্রশংসা করেন। উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

> "থিয়েটারি হাসির পালায় ব্যক্তিগত আক্রমণ ক্রমেই বেড়ে এতটা অসহনীয় হয়ে ওঠে যে অবশেষে গভর্ণমেণ্ট অভিনয় নিয়ন্ত্রণ-আইন জারি করতে বাধ্য হন। তার ফলে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালক উপেন দাস ও

অধ্যক্ষ অমৃতলাল বসুকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। তবু ঐ শ্রেণীর পালাকারদের চৈতন্যোদয় হয়নি ; কারণ তাঁরা তামাক খেতে ছাড়েন নি, তবে সে চেষ্টা করতেন নলচের আড়ালেই মুখ লুকিয়ে।"

চমৎকার!. উপেন দাসের নাটকে সাম্রাজ্যবাদকে নগ্ন ক'রে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল বলে সেটা "অশ্লীল", সেটা "ব্যক্তিগত আক্রমণ"। এ বই ১২৬০ সালে লেখা এবং এর লেখক একজন নামজাদা চিন্তাবিদ ও কলারসিক। অথচ তাঁর কণ্ঠে সাবেক ব্রিটিশ ভণ্ডামির প্রতিধ্বনি শুনে বোঝা যায় বাংলা শিল্পসাহিত্যের জগতে মীরজাফররা অনেকেই এখনো রয়েছেন। এঁরা খোলাখুলি সাম্রাজ্যবাদের দালাল। আমেরিকার সামরিক ভাগ্য-বিপর্যয়ে বিচলিত হয়ে এঁরা একটু নীরব হয়ে আছেন এই আর কি। সুযোগ পেলে এঁরা নাটক-নভেল সব নিষিদ্ধ করার স্টীমরোলার চালাবেন শীঘ্রই।

তাই আজ মে-দিবসে আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক : সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে আমাদের লেখনী তরবারির মতন চালিত করবো, কেননা শ্রমিকের রাজনৈতিক ক্ষমতাই শিল্পসাহিত্যের স্বাধীনতার একমাত্র গ্যারান্টি।'

নাট্য আন্দোলনে শহরতলী

গ্রাম বাঙালীর নাট্যচর্চার প্রসার ষাটের দশকে। আগে নাট্যচর্চা মূলতঃ ছিল শহর কেন্দ্রিক। কলকাতা শহরে তখন একাধিক পেশাদারী মঞ্চ, এছাড়াও এখানে-ওখানে পাড়ায় পাড়ায় বহু অপেশাদারী নাট্যদল। এসব দলের শিল্পী ও সদস্যরা কখনও পেশাদারী মঞ্চ ভাড়া নিয়ে কিংবা কখনও পাড়ায় অস্থায়ী কোন মঞ্চ তৈরী করে নাট্যচর্চায় ব্রতী হতেন। গ্রাম বাঙলার মানুষ তখন গ্রামে কিংবা শহরেও নাট্যচর্চার সম্মিলিত কোন উদ্যোগের স্বপ্ন দেখতেন বটে, কিন্তু তার বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের নাট্যচর্চার ইতিহাস বলে, কলকাতায় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের 'নবান্ন' নাটকের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার গ্রামাঞ্চলে নাট্যচর্চার সূচনা। তখন অবিভক্ত বাঙলা, পরাধীন ভারতবর্ষ। সম্মিলিত হওয়ার বিপদ প্রতি মুহূর্তে। দল তথা গোষ্ঠীর ওপর বিদেশী সরকারের রোষ এবং বিক্ষোভ প্রতি পদে। আশঙ্কা এবং বিপদের এত ঝুঁকি নিয়েও সেদিন উত্তর পাড়ায় একটি নাট্যদল গড়ে উঠেছিল নাম 'নাট্যমন্দির'। দল গঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন ওই অঞ্চলের কয়েকজন শিল্পী।

উত্তরপাড়ার 'নাট্যমন্দির'-এর কার্যকারীতা কিন্তু ওই অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইতিমধ্যে শহরে নাট্যচর্চা বহুদূর প্রসারিত হয়েছে। নাট্য মঞ্চে নতুন জোয়ার এসেছে শহরে। নাটক নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছেন বহু শিল্পী ও নাটকে নতুন এক বৈপ্লবিক কথাও চিন্তা করেছেন বহু নাট্যদল ও শিল্পগোষ্ঠী। সুতরাং নাটক বলতে সেদিন একটা কথাই মনে হয়েছে, তা কলকাতার, গ্রাম বা গঞ্জের সম্পদ নয়।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘকে ধন্যবাদ, এঁরাই গ্রাম গ্রামাঞ্চলে নিজেদের উদ্যোগে নাটক অভিনয় করে, গ্রাম বাঙলার মানুষের মনে নাট্যচর্চার বীজ বপন করে আসেন। এঁদের প্রযোজনাগুলির সফল রূপ শিক্ষিত গ্রামবাসীকে আকর্ষণ করে বিপুলভাবে। গ্রামের মানুষের মনেও যে প্রচণ্ড নাট্য পিপাসা, সেই তখনই সারা পশ্চিম বাঙলার মানুষ অবাক বিস্ময়ে অনুভব করতে থাকে।

আজ, এই সত্তর দশকে গ্রাম বাঙলায় সংগঠনের কোন সমস্যা নেই। তবু সমস্যা আছে মঞ্চের, প্রযোজনার।

উনিশ শ' একষট্টি সালে রবীন্দ্র জন্ম শত বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার

জেলা এবং মহকুমার সর্বত্র সাতাশটি রবীন্দ্র ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। আশা ছিল, ওই রবীন্দ্র ভবন মঞ্চগুলি গ্রামে নাট্য প্রযোজনার সমস্যা দূর করবে। গ্রাম গ্রামান্তরে আরো নতুন দল গড়ে উঠবে, নতুন প্রতিভার জন্ম নেবে।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হয়। এই উনিশ শ' বাহাত্তর সালের মধ্য সময়ে এসেও, সাতাশটি রবীন্দ্র ভবনের এগারটির নির্মাণ কার্য আদৌ শুরু হয় নি। ছ'টির নির্মাণ কার্য অর্ধেক হয়ে বন্ধ আছে। মোট দশটি রবীন্দ্র ভবনে এখন অভিনয় হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে এমন অনেক জেলা আছে, যেখানে দুটি রবীন্দ্র ভবন নির্মাণ হয়েছে। আবার কোন কোন জেলায় আদৌ নয়।

পশ্চিমবঙ্গে এখনও এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে বৈদ্যুতিক আলো গিয়ে পৌঁছয়নি। সফল নাট্য প্রযোজনায় আলো যে একটি প্রধান অঙ্গ, এইসব অন্ধকার গ্রামের নাট্যদলগুলি তা থেকে এখনও বঞ্চিত। ইচ্ছে এবং সাধ্য থাকলেও এঁরা এঁদের প্রযোজনাগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারছেন না।

প্রশ্ন উঠবে, এত সমস্যা, এত বাধা, তবে কী গ্রাম বাঙলায় নাট্যচর্চা ব্যাহত? বোধহয় নয়। তা যদি হত, তবে এই সত্তর দশকের প্রারম্ভে মফঃস্বল নাট্যগোষ্ঠীর সংখ্যা এমন বিরাট আকার নেবে কেন?

কিন্তু এঁরা অভিনয় করছেন কোথায়? কেমন করে? জেলা শহরে বা গ্রামাঞ্চলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় রবীন্দ্র ভবন তৈরী হয় নি, স্থায়ী কোন মঞ্চও সেখানে নেই। এইসঙ্গে আছে বৈদ্যুতিক আলোর অভাব।

গ্রামের প্রযোজনাগুলি দেখলে অবাক হতেই হবে। কোন সমস্যাকেই এঁরা সমস্যার পর্যায়ে ফেলছেন না। সকল সমস্যার সমাধানের পথ এঁদের করায়ত্ত। এঁরা পরাজিত হতে শেখেন নি। এঁরা পেছন-হাঁটতে জানেন না। সমস্যা-যুদ্ধে এঁরাই প্রকৃত বিজয়ী। মঞ্চ নেই, ক্ষতি কোথায়? আলোর অভাব, বাধা তাতেও না। নিরলস সাধনা এবং অচিন্তনীয় উত্তম এঁদের যাত্রাপথের পথে। অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে এঁরা মঞ্চের অভাব মিটিয়েছেন। আলোর অভাব দূর করেছেন ডায়নামোর সাহায্য নিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে ডায়নামো আনা সম্ভব হয়নি। সেখানে এঁদের প্রয়াস আরো চমকপ্রদ। হ্যাজাকের ডিমার তৈরী করে অভিনয় করেছেন এঁরা, যা কলকাতার যে কোন প্রথম শ্রেণী নাট্যদলের প্রযোজনার সমতুল্য।

নাট্যমন্দির (উত্তরপাড়া, হুগলী)

১৯৪২ সাল, যখন সারা ভারতব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক রক্ত-রাঙা অধ্যায়ের এক চলমান গতি। উদ্দেশ্য, সাধারণের মধ্যে সুস্থ নাট্যবোধের জাগরণ, উদ্যোক্তা ছিলেন শিল্প-উৎসাহী কিছু তরুণ। এঁরা সকলেই ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের। উৎসাহ যতটা ছিল, সেই অনুপাতে সাধ্য ছিল না। এছাড়াও ছিল তৎকালীন একাধিক যুবকের সংগঠিত হওয়ার বিপদ। বেশ বিস্ময়ের সঙ্গেই ভাবতে হয়, বিয়াল্লিশের সংগ্রামী যুগ যার জন্ম, সে বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে, ঝড় আর ঝঞ্ঝাকে মাথায় করে অনেক ভাঙা গড়ার মাঝে নাট্য সংস্কৃতির দীপশিখাকে হাতে নিয়ে এগিয়ে এসেছে, আজও সে শিখা অনির্বাণ। একটা দেশের পরিচয় তার শিক্ষা আর সংস্কৃতিতে, জাতির সংস্কৃতিতে নাট্যমন্দির-এর অবদান ক্ষুদ্র হলেও নগণ্য নয়।

'নাট্য মন্দির'-এর সদস্যরা পুরনো রীতিতে বিশ্বাসী। নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কাল থেকেই দলের নাট্য নির্দেশক শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়। এই দলের অভিনেতাদের মধ্যে আছেন দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিলোচন রায়, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ পাল, দেবনাথ দাস, সত্যেন চট্টো-পাধ্যায়, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন মান্না, সুব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

অরুণ আর্ট সেণ্টার (মুর্শিদাবাদ)

১৯৪৭ সাল, গণিতের হিসেবে পঁচিশ বছর, মুর্শিদাবাদে 'অরুণ আর্ট সেণ্টার' -এর জন্ম। মুর্শিদাবাদে 'অরুণ আর্ট সেণ্টার' নামের সঙ্গে আরো একটি নাম জড়িয়ে আছে, তা 'পারুল শেখর স্মৃতি মঞ্চ'। এই প্রতিষ্ঠানেরই পরিচালনা-ধীনে 'পারুল স্মৃতি মঞ্চ'-এর পত্তন ঊনিশ শ' ঊনষাট সালের সাতই জানুয়ারী। মঞ্চের উদ্বোধন করেন নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী। ওই দিন ওই মঞ্চে তিনি 'সাজাহান' অভিনয় করেন, চরিত্র : সাজাহান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নাট্যাচার্যের সঙ্গে আরো যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রেবা দেবী, অরুণ ঘোষ, দুর্গা সেন, মুকুলজ্যোতি, তারা পাল প্রভৃতি।

অরুণ আর্ট সেণ্টার তরুণ রায় পরিচালিত সারা বাঙলা নাট্য প্রতিযোগিতায়

মুর্শিদাবাদ জেলায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সংস্থা। এ পর্যন্ত পঞ্চাশটিরও বেশী নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এর মধ্যে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক যেমন আছে, তেমনি সামাজিক নাটকও আছে।

অরুণ ঘোষ সংস্থার স্থায়ী পরিচালক। এঁরই উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় সেই ১৯৪৭ সাল থেকে অরুণ আর্ট সেণ্টার-এর সদস্যরা নাট্যচর্চা করে আসছেন। নিজেদের মঞ্চ আছে ঠিকই, তবু একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে অনেক বাধার সম্মুখীন আজও এঁদের হতে হয়। তার প্রধান কারণ মফঃস্বলে অভিনেত্রীর সমস্যা।

দলের সংগঠনের কৃতিত্ব যাঁদের, তাঁদের মধ্যে আছেন ধরনী কুমার ঘোষ, রবীন্দ্র কুমার ঘোষ, অরুণ কুমার ঘোষ, গোপালচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র ব্যানার্জি, নিমাইচন্দ্র ঘোষ, জিতেন বিশ্বাস, বহুবল্লভ দাস, নিখিলচন্দ্র দাস, গোপেশচন্দ্র দাস, গোপাল ভট্টাচার্য, জ্যোতিষ চক্রবর্তী, শোভা দাস, ইরা দাস, লক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা দাস, বারীন নাগ, দুলাল মুখোপাধ্যায়, অসিত চৌধুরী, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্মীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত রায়, গৌর সরকার প্রভৃতি।

কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার (কাঁচড়াপাড়া)

১৯৬১ সাল। একদিন সংবাদপত্রে দেখতে পেলাম, সুদূর মফঃস্বল অঞ্চলে কাঁচড়াপাড়া স্পিন্ডিং মঞ্চে প্রতি শনিবার নিয়মিত অভিনয় হচ্ছে তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার'। অভিনয় করছেন কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার। যদিও নানান বাধা-বিপত্তির চাপে পড়ে সেদিনের সেই উদ্যোগ থেকে অনেক বারই এঁদের পেছিয়ে আসতে হয়েছে।

কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটারের জন্ম আরো দশ বছর আগে ১৯৫০ সালের ২২শে মার্চ। দল গড়ার ব্যাপারে সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা। প্রথম অবস্থায় এই দল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানুষের জীবনের আরো গভীরে পৌঁছবার বাসনা নিয়েই এঁরা আলাদা অস্তিত্ব গঠন করলেন, হাতিয়ার হিসেবে নিলেন নাট্য প্রযোজনা।

কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটারের সূচনা কালে যে সব নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, সেগুলি বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'চেউ' ও 'নাটক নয়', সলিল চৌধুরীর 'অরুণোদয়ের পথে', পানু পালের 'বিচার', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী লাহিড়ীর 'লক্ষীপ্রিয়ার সংসার', 'দুঃখীর ইমান', 'রক্তের মিলন', 'নায়ক', 'নাট্যকার' ও

'মনিকাঞ্চন', মন্মথ রায়ের 'আজব দেশ' ও 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল', দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা', 'মোকাবিলা' ও 'জীবনস্রোত'।

১৯৬৩ সালে কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর পরিচালনায় যে যাত্রা উৎসব হয়, কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটারের সদস্যরা সেখানে তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' যাত্রাআঙ্গিকে অভিনয় করেন। স্বীকার করতে অসুবিধে নেই, সেই প্রথম যাত্রার আসরে জীবনধর্মী নাটকের সূচনা। সেদিনের সে প্রযোজনা দেখে উপস্থিত দর্শকেরা একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন, এ কি দেখলাম! এ কেমন করে সম্ভব!

তুলসী লাহিড়ীর সুযোগ্য পুত্র হাবু লাহিড়ী এ দলেরই একজন সংগঠক। হাবু লাহিড়ীর এবং দলের অন্যান্য সদস্যের ঐকান্তিক ইচ্ছে কাঁচড়াপাড়ায় আবার নিয়মিত অভিনয় শুরু করা। কলকাতায় অনেক দল আছে, অনেক দর্শক আছে, কিন্তু মফঃস্বল শহরে নাট্যদর্শকের মান বাড়ানো দলের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় নাটক মঞ্চস্থ করেছেন।

এ দলের প্রযোজনা সম্পর্কে ১৯৬১ সালে মাসিক জলসা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি আলোচনা এখানে ছাপা হলো।

কাঁচড়াপাড়ায় তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার'

মফঃস্বলে নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করা যে কি নিদারুণ বিড়ম্বনা, তা যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরা জানেন। কিন্তু যতই বিপদ বাধা আসুক না কেন, বাংলার নবজাগ্রত পল্লী প্রান্তরের মানুষ সমস্ত দৈব দুর্বিপাককে শিরোধার্য করে নাটক মঞ্চস্থ করেছে এমন ইতিহাস প্রচুর আছে। কিন্তু এমনভাবে নিয়মিত মঞ্চ সাফল্যলাভ সকলের ললাটে জোটে না তাই নয়, এক আশ্চর্য রকম শহর পেশাদারী মঞ্চের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয়। কাঁচড়াপাড়া স্পিন্ডিং মঞ্চে আর্ট থিয়েটার তুলসীদাস লাহিড়ীর পেশাদার মঞ্চ নাট্য আন্দোলনের নাটক 'ছেঁড়াতার' অভিনয় করলেন। শেষ রজনীর দিনে দেখে এলাম। দীর্ঘ মাইল পথ পরিক্রমায় কাঁচড়াপাড়া থেকে এক নাট্যানুভূতি বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে ফিরে এসেছি। আর্ট থিয়েটার শিল্পী কলাকুশলীদের আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশিষ্ট চরিত্রে যাঁরা রূপদান করেন তাদের মধ্যে আছেন সুনীল মুখোপাধ্যায়,

সুবোধ সরখেল, ইন্দু মণ্ডল, শংকর রায়চৌধুরী, বিনয় চক্রবর্তী, কালী ভৌমিক, ননী দে, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত গুপ্ত, কুমুদ ঘোষ। এছাড়াও শিশু চরিত্রে মাঃ বাবলা এবং ফুলজান, স্ত্রী ভূমিকায় যূথিকা চট্টোপাধ্যায়, অতুলনীয় অভিনয় সারা মঞ্চে আশা বিশ্বাসের, জীবন জয়গানে ভরিয়ে তুলেছিল। সার্থক নাট্য পরিচালনায় ছিলেন কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোক সম্পাতে ছিলেন সতীন চক্রবর্তী। সহকারী অমল ভট্টাচার্য, মনোতোষ বসু, নিমাই গুপ্ত। সুরারোপ করেন কালী ভৌমিক। নেপথ্য সংগীতে ছিলেন অজিত কর।

নবীন সঙ্ঘ (ব্যাণ্ডেল, হুগলী)

১৯৫১ সাল, অনিলবরণ দত্তের 'স্বীকৃতি' নিয়ে নবীন সঙ্ঘের যাত্রা শুরু। প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নাট্য নির্দেশক। এর পর সংস্থার গতি অনেক বাধা-বিপত্তি সত্বেও স্তব্ধ করা যায়নি। দুর্বার গতিতে এগিয়ে গেছে। এঁরা অভিনয় করেছেন জয়শঙ্কর ঘোষের পরিচালনায় জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এরাও মানুষ'। প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'অশান্ত বিবর', রতন কুমার ঘোষের 'শেষ বিচার', জগমোহন মজুমদারের 'বিজ্ঞান', কিরণ মৈত্রের 'নাম নেই', সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ঠিক বৃষ্টির আগে', জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিসর্গ', গোবিন্দ নিয়োগীর পরিচালনায় শচীন ভট্টাচার্যের 'ভূমিকম্প', অজিত গুহরায়ের 'সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়' ও শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ভগবান গ্রেপ্তার'। পর পর দু'বছর সংস্থা দুটি একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন এবং তা সাফল্যের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নবীন সঙ্ঘের শিল্পীসদস্যরা 'ঠিক বৃষ্টির আগে' অভিনয় করে বহু একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছেন।

ব্যাণ্ডেল অঞ্চলে কোন স্থায়ী মঞ্চ নেই বললেই চলে। স্থানীয় রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের যে মঞ্চ আছে, সেখানে দর্শক আসনের কোন সুবন্দোবস্ত নেই। বহু আন্দোলন করেও কোন মঞ্চ বা প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের উৎসাহ সরকার দেখাননি। তাই খোলা ময়দানে চটের সামিয়ানার নিচেই নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছেন নবীন সঙ্ঘ নাট্যদলের সদস্যরা। এ ব্যবস্থায় সংস্থা বহু বাধা ও ব্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছেন প্রতিনিয়তই। তা সত্বেও কিন্তু এঁদের উৎসাহে কোন ভাঁটা

পড়েনি। ভবিষ্যতে এঁরা আরো নাটক মঞ্চস্থ করবেন, নাটক নিয়ে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন এ বাসনা এ দলের প্রতিটি শিল্পীর অন্তরে বিরাজ করছে।

দলের শিল্পী তালিকায় আছেন: গোবিন্দ নিয়োগী, বিকাশ চট্টোপাধ্যায়, সজিত গুহরায়, শ্যামল ঘোষ, অজিত পাওয়েল, দিলীপ দাস, প্রণব ধর, অমিয় মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ সরকার, প্রদীপ চক্রবর্তী, স্বপন বড়ুয়া, দুর্গাপ্রসাদ, শচীপ্রসাদ চৌধুরী, তপন চক্রবর্তী প্রভৃতি। দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক অজিত কুমার গুহ রায়। নাট্য সম্পাদকের নাম গোবিন্দ নিয়োগী।

জাগৃতি (আতপুর, ২৪ পরগণা)

১৯৫৩ সাল ১৮ই জুন জাগৃতির প্রতিষ্ঠা। বর্তমান সম্পাদক স্বরজিৎ ঘোষ। প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় নাটকই এঁরা অভিনয় করেছেন। সংস্থার অভিনীত নাটকের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। এঁরা অভিনয় করেছেন 'পরমারাধ্য' (উৎপলেন্দু সেন), 'পানিপথ' (নিশিকান্ত বসু রায়), 'পথের শেষে' (নিশিকান্ত বসু রায়), 'রানী ভবানী' (মহেন্দ্র গুপ্ত), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'আজকাল' (ভানু চট্টোপাধ্যায়), 'ক্ষুধা' (বিধায়ক ভট্টাচার্য), 'বানী থিয়েটার সোসাইটি' (অমলেন্দু চক্রবর্তী), 'ধৃতরাষ্ট্র' (ধনঞ্জয় বৈরাগী), 'রূপোলী চাঁদ' (ধনঞ্জয় বৈরাগী), 'গবাক্ষ' (অমলেন্দু চক্রবর্তী), 'বারোঘন্টা' (কিরণ মৈত্র), 'বারোভূতে' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়), 'বহুধা' (অমলেন্দু চক্রবর্তী), 'অচলায়তন' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'এমনও দিন আসতে পারে' (নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'আমার মাটি' (মনোরঞ্জন বিশ্বাস), 'আগন্তুক' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়), 'অন্তরীন' (জোছন দস্তিদার), 'শুধু ছায়া' (পরেশ ধর), 'সীমান্ত প্রহরী' (সুনীল দত্ত), 'মৃত্যুর গর্জন' (কিরণ মৈত্র), 'বিবেকানন্দ' (পরেশ ধর), 'ওয়েটিং ফর গোডো, (স্যামুয়েল বেখট, অনুবাদ অশোক), 'কালাপুরী' (পরেশ ধর), 'গরমিল' (অমলেন্দু চক্রবর্তী), 'চেনা মুখ অচেনা মানুষ' (অমর গঙ্গোপাধ্যায়), 'অভিনয়' (ধনঞ্জয় বৈরাগী), 'রাতের অতিথি' (উৎপল দত্ত), 'রক্তকরবী' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'সর্পিল' (পার্থপ্রতিম চৌধুরী), 'শিককাবাব' (বনফুল), 'সৈনিক' (ধনঞ্জয় বৈরাগী), 'হাল্কা মেঘ' (অমলেন্দু চক্রবর্তী), 'প্রজাপতি' (নেপাল

মুখোপাধ্যায়), 'রজনীগন্ধা' (ধনঞ্জয় বৈরাগী), 'দাম্পত্যে কলহে চৈব' (দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), 'রাজা অয়দিপাউস, (সফোক্লেস, অনুবাদ : শম্ভু মিত্র), 'অমৃতস্য পুত্রা' (রতনকুমার ঘোষ), 'কিউবা' (ভোলা দত্ত), 'শেষ থেকে শুরু' (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়), 'বাকি ইতিহাস' (বাদল সরকার), 'ফাঁস' (শৈলেশ গুহ নিয়োগী), 'শেষ বিচার' (রতনকুমার ঘোষ), 'প্রতিধ্বনি' (শেখর চট্টোপাধ্যায়), 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে' (রতনকুমার ঘোষ), 'শেষ প্রহরী' (রতন কুমার ঘোষ) 'এ আগুন জ্বালিয়ে দাও' (অমলেন্দু চক্রবর্তী), 'মূককণ্ঠ' (রবীন্দ্র ভট্টাচার্য) এবং 'মুক্তির সন্ধানে' (বিশ্বনাথ ঘোষ)। দলের নাট্য নির্দেশকের তালিকায় আছেন অমলেন্দু চক্রবর্তী, ভবতোষ কর, রথীন রায় এবং বিশ্বনাথ ঘোষ।

সংস্থা তিন বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। সংস্থা প্রযোজিত রতনকুমার ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে', 'শেষ বিচার' ও 'শেষ প্রহরী' বহু প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার গৌরব অর্জন করেছে।

গণনাট্যের আদর্শে / সংগঠনী (বেলঘরিয়া)

১৯৫৪ সাল, চব্বিশ পরগণা জেলার বেলঘরিয়া রেল স্টেশন থেকে পুব দিকে মাইল খানেকের মধ্যে উদয়পুর গ্রাম। এই গ্রামেরই কয়েকজন অধিবাসী উৎসাহী কয়েকটি তরুণদের নিয়ে গড়ে তুললেন একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা, নাম সংগঠনী। ১৯৫৫ সালের ৮ই অক্টোবর ২৪ পরগণা জেলার গণনাট্য সম্মেলনে এঁরা পরিবেশন করেন 'জীয়ন কাঠি'। সংস্থারই সদস্য সরোজ চক্রবর্তীর রচনা এটি। শিল্পীতালিকায় সেদিন ছিলেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, পরেশ ঘোষ, অহীন্দ্র ভৌমিক, সত্যেন সাহা, জ্যোতি চক্রবর্তী, সাধনহরি দে, অসীম চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণেশ সাহা, কল্যাণী দাশগুপ্ত, সবিতা বিশ্বাস, কল্পনা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। বস্তুতপক্ষে এই 'জীয়ন কাঠি' নাটকই সংগঠনীকে কলকাতা শহর ও শহরতলীতে পরিচয় করিয়ে দেয়। নাটকটি মোট অভিনীত হয়েছে বত্রিশটি স্থানে। সর্বত্রই দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পায়। ১৯৫৮ সালে হাওড়া টাউন হল আয়োজিত একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় এই নাটকটিই একাঙ্ক আকারে অভিনীত হয় এবং বিশেষভাবে পুরস্কৃত হয়। নাটকটির পরিচালক ছিলেন অহীন্দ্র ভৌমিক।

১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ এই দু' বছরে সংগঠনী 'জীয়ন কাঠি' ছাড়াও পরপর অনেকগুলি নাটক মঞ্চস্থ করেন। তার মধ্যে 'কালিন্দী', 'কেরানীর জীবন', 'শহীদ স্মৃতি' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ সালে এঁরা আরও কয়েকখানা নাটক মঞ্চস্থ করেন। তার মধ্যে সুপ্রযোজিত 'প্রত্যাবর্তন', 'সাহিত্যিক', 'মন্দার ও মালঞ্চ' (কাব্যনাট্য)। শিল্পীরা ছিলেন: হৃষিকেশ নন্দী, অজিত চক্রবর্তী, শান্তি মুখোপাধ্যায়, সত্যেন সাহা, পরেশ ঘোষ, প্রাণেশ সাহা, সাধনহরি দে, অসীম চক্রবর্তী, মানিক রায়, ধীরেন বিশ্বাস, অহীন্দ্র ভৌমিক, অনিল বিশ্বাস, কল্পনা মুখোপাধ্যায় ও সবিতা বিশ্বাস। নাট্য পরিচালক ছিলেন অহীন্দ্র ভৌমিক। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালে সংস্থা প্রযোজনা করেন যথাক্রমে 'অহেতুক' (নীহারকান্তি গুপ্ত) ও 'দুই মহল' (জোছন দস্তিদার)। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে সংগঠনীর স্মরণীয় অবদান 'ক্ষুধিত পাষাণ'। নিজস্ব মঞ্চ ছাড়াও এটি কলকাতার মহাজাতি সদন, মহারাষ্ট্র নিবাস হল, প্রতাপ মেমোরিয়াল হল এবং হাওড়া টাউন হলে অভিনীত হয়। এছাড়া এ বছরেই সংস্থা প্রযোজনা করেন 'বিসর্জন' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশী' কবিতা অবলম্বনে 'কিনু গোয়ালার গলি' (নাট্যরূপ নীহার গুপ্ত)। দলের শিশুশিল্পীরাও এই বছরে অভিনয় করে 'মুকুট' নাটিকা।

১৯৫৬ সালে সংগঠনী নিজস্ব জমিতে একটি পাকা মঞ্চ স্থাপনের পরিকল্পনা করে। কয়েকজন নাট্যোৎসাহী সভ্যের কঠোর পরিশ্রমে গড়ে ওঠে একটি স্থায়ী নাট্য মঞ্চ। পল্লী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম মঞ্চটিতে নিয়মিত অভিনয় হয়েছে এবং আজও এখানে চব্বিশ পরগণা একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ১৯৬২ সালে সংগঠনী মঞ্চে নিয়মিত পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। সুদূর পল্লী অঞ্চলে প্রতি শনি ও রবিবার নিয়মিত অভিনয় সম্ভবত এই প্রথম। নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'মহাপ্রেম' নাটক নিয়ে সংগঠনীর নিয়মিত অভিনয়ের যাত্রা শুরু। পঞ্চাশটিরও বেশি রজনী অভিনীত হয় এই নাটক। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই নাটক প্রযোজনার জন্য কিঞ্চিত অর্থ সাহায্যও পাওয়া গিয়েছিল।

পশ্চিম বাঙলার মফঃস্বলে সর্বপ্রথম একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন সংগঠনী, চব্বিশ পরগণা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। এর আগে কলকাতায় থিয়েটার সেণ্টার হলে নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছিল। পশ্চিম বাঙলায় নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতার শুরু ওইখানে হলেও

বলতে দ্বিধা নেই থিয়েটার সেন্টারের সে প্রতিযোগিতা ছিল শহর কেন্দ্রীক। মফঃস্বল বাংলার নাট্য প্রতিযোগিতার সর্বপ্রথম প্রয়াসের স্বীকৃতি যদি দিতে হয়, তা সংগঠনী সাংস্কৃতিক সংস্থারই প্রাপ্য।

১৯৬৪ সালে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তরের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় সংগঠনীর এক প্রতিনিধিদল অন্ধ্রপ্রদেশ ভ্রমণে যান নাট্য প্রযোজনা ও কলা-কৌশলের আরও চর্চা করতে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বোম্মানা বিশ্বনাথন, সরোজ চক্রবর্তী, সত্যেন সাহা, বাদল ভট্টাচার্য ও অহীন্দ্র ভৌমিক।

কৃষ্টি সংসদ (দক্ষিণ জগদ্দল, ২৪ পরগণা)

১৯৫৯ সাল, শিল্প সাধনার উদ্দেশ্য নিয়ে কৃষ্টি সংসদ গঠিত। প্রতিষ্ঠাতা ও সংস্থার সভাপতি ডঃ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত।

বহু নাটক এঁরা অভিনয় করেছেন। একটি নৃত্যনাট্যও পরিবেশন করেছেন। অভিনীত নাটকগুলি : 'ডাকঘর', 'গুরুবাক্য', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'ছুটি', 'বারোঘণ্টা', 'নাটক নয়'., 'পারমিট', 'বিষণ্ণ সন্ধ্যা', 'ঘূর্ণিপাক', 'দাস', 'নাগরিক', 'দিনান্তে', 'অসবর্ণা', 'অশান্ত বিবর'। নৃত্যনাট্য : 'অভিসার'। 'অভিজিৎ' ছদ্মনামে এক অসাধারণ প্রতিভাময় শিল্পী এ দলের নাট্য নির্দেশক।

শিল্পীদের নাম : জীবন ভট্টাচার্য, দুলাল মুখার্জী, শঙ্কর মুখার্জী, বিমান চক্রবর্তী, সুধীর সেন, ব্রজেন দেবনাথ, সত্যেন সেন, গৌর ঘোষ, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

সংস্কৃতি (আমতা, হাওড়া)

১৯৫৯ সাল, নাট্যাভিনয় তো আছেই, সঙ্গে শিল্পচর্চা ও প্রসারের বহুবিধ কর্মসূচী এঁরা গ্রহণ করেছেন। বৎসরে বিশ্ব রঙ্গদিবস উদযাপন, নাটক ও রঙ্গ-মঞ্চ সংক্রান্ত সেমিনার, নাটক ও মঞ্চ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া এবং একাঙ্ক নাটক (রচনা) প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।

সংস্থা প্রযোজিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির নাম : 'অক্টোপাশ' (নিমাই মান্না), 'কর্মখালি' (মনোরঞ্জন বিশ্বাস), 'বারোঘণ্টা' (কিরণ মৈত্র), 'স্বপ্নকোষ' (বীরু মুখোপাধ্যায়), 'ঋণশোধ' (রবীন্দ্রনাথ), 'অচলায়তন' (রবীন্দ্রনাথ),

'বিসর্জন' (রবীন্দ্রনাথ), 'ক্যাম্প থ্রি' (শৈলেশ গুহ নিয়োগী), 'উত্তাল তরঙ্গ' (শৈলেশ গুহ নিয়োগী), 'প্রতিনিধি' (জগদীশ ভট্টাচার্য), 'শেষ থেকে শুরু' (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়), 'ভিয়েৎনাম' (চিররঞ্জন দাস), 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রাল' (টি এস এলিয়ট), 'কষ্টিপাথর' (মন্মথ রায়), 'অনুপ্রবেশ' (মন্মথ রায়), 'অন্তচ্ছায়া' (কিরণ মৈত্র) এবং 'সকালের জন্ত' (রতনকুমার ঘোষ)।

যাত্রিক (নৈহাটী,

সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের গতি প্রকৃতির সঙ্গে যাঁদের প্রতিদিনের আন্তর যোগাযোগ রয়েছে তাঁরা জানেন যে আজকের নাট্য-আন্দোলন শুধু কলকাতার জটিল জীবন সীমাতেই আবদ্ধ হয়ে নেই, শহর থেকে দূরে মফঃস্বলের শান্ত পরিবেশেও এ আন্দোলন আলোড়ন তুলেছে। আলোড়ন তুলেছে নৈহাটির যাত্রিক সম্প্রদায়। আলোড়নের অংশীদার আরও জানা-অজানা ছোট বড় অসংখ্য নাট্য গোষ্ঠী।

১৯৬০ সালে কয়েকটা বিক্ষিপ্ত যুব মানসকে নিয়ে এই যাত্রিক গড়ে উঠলেও সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এঁদের দ্বারা নাট্য-মঞ্চায়ন সম্ভব হয় নি। ১৯৬২ সালে সেপ্টেম্বরে এঁরা প্রথম নাটক মঞ্চায়নে উদ্যোগী হলেন রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'জীবনাস্ত' আর বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'এতটুকু বাসা' নিয়ে, কী প্রচণ্ড উৎসাহ তখন এঁদের! কিন্তু সেই প্রচণ্ড উৎসাহ—উচ্ছ্বাসের বুকে বাজ হানলো তুফান। খোলা মাঠে মাচা বেঁধে সবাই সেজে বসে আছেন—বসে আছেন নাট্য পরিচালক শ্রদ্ধেয় নিখিল ভট্টাচার্য—বসে আছেন অন্যান্য ভূমিকাভিনেতা রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য, সুনীল ভট্টাচার্য, স্বপন ভট্টাচার্য, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, অমল ভট্টাচার্য, কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীকান্ত দাস, বন্দীপ ভট্টাচার্য, মঞ্জু ভট্টাচার্য (বর্তমানে কলকাতার নান্দীকার নাট্য সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত), পুতুল বন্দ্যোপাধ্যায়—সবাই। কিন্তু প্রকৃতির অকাল বৃষ্টির উচ্ছ্বাসের কাছে ওদের ব্যক্তি-মানস উচ্ছ্বাস পিছু হঠতে বাধ্য হলো। পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে ঐ নাটক দুটিই একই ভূমিকাভিনেতাদের নিয়ে অভিনীত হলো এবং তা সুখ-শ্রাব্য এবং সুখ-দৃশ্যও হলো।

প্রথমে নৈসর্গিক বাধা পড়ে দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধন্য হলো বিক্ষিপ্ত জীবনগুলি। ওঁরা ঠিক করলেন মফঃস্বলের নাট্য-আন্দোলনকে যদি বাঁচাতেই

হয় তাহলে যে সামান্য ক'টি প্রতিযোগিতা হয়, সেই প্রতিযোগিতাগুলিতে যোগদান ত' করতেই হবে, সেই সঙ্গে একটা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতারও আয়োজন করতে হবে। ১৯৬৩ সালটা ওঁরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ঘুরলেন, নিজেদের আয়োজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাসমণির ছেলে' (নাট্যরূপ রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের) আর অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চেনা মুখ অচেনা মানুষ' মঞ্চস্থ করলেন, কিন্তু প্রতিযোগিতার আয়োজন নিজেরা করতে পারলেন না। হয়ত সঙ্কোচ, হয়ত দ্বিধা সংশয় তাঁদের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, নিখিল ভট্টাচার্য আর মহীতোষ চক্রবর্তীর নাট্য নির্দেশনায় পরবর্তী নাটকগুলিরও সুষ্ঠু রূপ পাওয়াতে সমস্ত দ্বিধা-সংশয় কাটিয়ে উঠে ১৯৬৭ সালে ওঁরা আয়োজন করলেন প্রথম বার্ষিক সারা বাংলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা। কিন্তু আবার বৃষ্টি! একে ত' আর্থিক অস্বচ্ছলতা, তার ওপর যা হোক করে নিজেরা আর্থিক ভার বহন করে কাঁচা মাচা টাঙালেন, তার ওপর এ রকম বৃষ্টি কার ভাল লাগে? এপ্রিল মাস সবে পড়েছে—কিন্তু বৃষ্টির কমতি নেই, তবু তারা প্রতিযোগী সংস্থাগুলির ঐকান্তিক সৌহার্দ্যে এবং প্রধান বিচারক নাট্যরসিক অধ্যক্ষ গোপালদাস রায়ের অদম্য উৎসাহে কোন রকমে সে বছরটি অতিক্রম করলেন। সেই থেকে আন্তরিক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা তাঁরা মনে মনে পোষণ করছেন মফঃস্বল নৈহাটীতে তাঁরা একটা স্থায়ী সুষ্ঠু রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলবেনই—কিন্তু এখনও নবম বার্ষিক একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার প্রান্তে এসেও তাঁরা তা সমাধা করতে পারেননি। অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা তা পারবেন আশা রাখি। আশা রাখি এই কারণে স্থানীয় নাট্য-রসিক সুধী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আগ্রহী হয়ে তাঁর নিজের জমিতে এই ধরণের একটা মঞ্চ গড়ে দেবার আশ্বাস দিয়েছেন।

কৃষ্ণ সাধন মজুমদারের ঐকান্তিকতায় ১৯৬৪ সাল থেকে তাঁরা একের পর এক প্রযোজনা করেছেন গিরিশবাবুর 'ধ্যায়সা-কা-ত্যায়সা' নির্দেশনা—মহীতোষ চক্রবর্তী, নিখিল ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য। রমেন লাহিড়ীর 'ঢেউ' নির্দেশনা—নিখিল ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'খুনী', 'ছেঁড়া তমসুক' (কাহিনী—সমরেশ বসু), 'বেলাভূমির ঢেউ', 'পাঞ্চজন্য', 'কালের মৈনাক', 'অমর শহীদ গদাই', 'দধীচি মন,' 'সওদাগরের দেশে', 'নকল রাজার ওঝা'। শেষের প্রতিটি নাটকেরই নাট্য-নির্দেশক নিখিল ভট্টাচার্য। আর? আর শুধু সংস্থা সভাপতি সু-সাহিত্যিক, সমালোচক অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতেই নয়, স্বপন ভট্টাচার্য, সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য, হরিমোহন ঘোষ, দেবী ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র

ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত সাণ্যাল, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল রক্ষিত, দেবতোষ ঘোষ, হরিপ্রসাদ বিশ্বাস, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘটক, আশীষ বসু, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দাস, অমল ভট্টাচার্য, জগন্নাথ মিত্র, কবিতা বিশ্বাস, যুথিকা বসু, সুষমা চক্রবর্তী যাঁরা এতাবৎ ঐ সমস্ত নাটকগুলিতে অভিনয় করে চলেছেন তাঁদের সকলের মতে এখনও পর্যন্ত তাঁদের মঞ্চ সফল এবং সুফল নাটকগুলি হলো 'কালোমাটির কান্না', 'এক যে ছিল রাজা', 'আমায় বাঁচতে দাও', 'রক্তে বোয়া ধান'। নেপথ্য শিল্পী সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, অনুপ দাস প্রভৃতির আলোক সম্পাত এবং অরুণ ভট্টাচার্য (কালদা), ও রন্দীপ ভট্টাচার্যের আবহ সঙ্গীত পরিবেশনা যে সমস্ত নাটকগুলির রসোত্তীর্ণ হওয়ার মূল কারণ, একথা একবাক্যে সংস্থার সকলেই স্বীকার করেন।

স্টুডেণ্টস থিয়েটার (হালিসহর)

১৯৬২ সাল, ১৩ই এপ্রিল। হালিসহর স্টুডেণ্টস থিয়েটার গ্রুপের কথা বলছি, হালিসহর উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠরত গোটা কয়েক কিশোর ছাত্রের মনে হঠাৎ নাটক অভিনয় করার যে বাসনা জেগে উঠেছিল, সেটা নিছক চোর-পুলিশ খেলার মত নয়। কারণ পূর্ববর্তী 'হালিসহর রামপ্রসাদ নাট্য সমাজের' নাট্য সাধনা এবং তাঁদের ঐতিহ্যের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে নি বলেই আজ তারা নাট্য আন্দোলনকে স্বাগত জানাতে পেরেছে।

১৯৭০ সাল চলে গেল, এল ১৯৭৫। এর মধ্যে কত নাট্যকারদের নাটক অভিনয় করে, নানা স্থানে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে সংস্থা এগিয়ে চলল। আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করি, ১৯৭৬ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী এই সংস্থা হালিসহরের বুকে প্রথম একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজনে সক্ষম হলো।

কত দূরের মানুষ কাছে এলেন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। নবীন এবং নির্ভীক নাট্যকার সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য উপযুক্ত সময়ে বলিষ্ঠ পাণ্ডুলিপি দিয়ে সংস্থার মান উন্নত করতে প্রয়াসী হলেন তাঁর বিরচিত নাটক 'কোথায় আলো', 'স্বর্ণসোহাগ', 'বসন্ত সমাগমে', 'ঠিক বৃষ্টির আগে' এবং 'নবান্ন' নানা-স্থানে আয়োজিত প্রতিযোগিতা এবং আমন্ত্রিত নাট্য উৎসবে অভিনয় করে।

সংস্থা এ পর্যন্ত মোট ছাব্বিশটি নাটক অভিনয় করেছেন। প্রত্যেকটি যুগোপযোগী এবং সু-অভিনীত। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক-

গুলির নাম : কিরণ মৈত্রের 'যা তারা পারেনি', 'অন্ধকারার ও 'তেলেজলে' (প্রথম দুটির নাট্য নির্দেশক ছিলেন প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, শেষেরটির কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়), বিমল রায়ের 'অসমাপ্ত' (নির্দেশনা—প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়) এবং সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'সূর্যসোহাগ' ও 'ঠিক বৃষ্টির আগে' (দুটিরই নাট্য নির্দেশক ছিলেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য)।

শিল্পী ও সদস্যদের মধ্যে আছেন শ্যামাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, সরোজ ভট্টাচার্য, সুনীল বসু, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল ভৌমিক, মিহির গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ চক্রবর্তী, সাধন বসু, ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন গুপ্ত, স্বদেশ চট্টোপাধ্যায়, আশীষ বসু, তারাশঙ্কর দাস, অসীমরঞ্জন ব্রহ্মা, দেবপ্রসাদ চৌধুরী, অমরনাথ ভট্টাচার্য, প্রণবকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল মুখোপাধ্যায়, স্বপন লাহিড়ী, শিবপ্রসাদ দত্ত ও স্বপন মুখোপাধ্যায়।

মঞ্চদীপ (আন্দুল-মৌড়ি)

১৯৬১ সাল, হাওড়া জেলার আন্দুল-মৌড়ি অঞ্চলের কৃতী নাট্যসংস্থা মঞ্চদীপ নিষ্ঠা সহকারে অভিনয়ের ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। এঁদের প্রথম নাটক সৌমেন চট্টোপাধ্যায়ের 'জবান বন্দী' অভিনীত হয় ১৯৬১ সালের ৬ঠা জানুয়ারী। নাট্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ভানু চট্টোপাধ্যায়। দলের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রয়াস নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আগন্তুক'। পরিচালনার দায়িত্ব নেন সৌমেন চট্টোপাধ্যায়। ১৯৬৪ সালে শিশির ভাদুড়ী স্মরণোৎসব উপলক্ষে এঁরা মঞ্চস্থ করেন 'জীবনরঙ্গ'। সৌমেন চট্টোপাধ্যায়ের 'কাঁচঘর' এঁরা অভিনয় করেন এই বছরেই। রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুর্দা' এবং সৌমেন চট্টোপাধ্যায়ের 'সরাইখানার পাঁচালী' এদের প্রযোজিত একাঙ্কিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শিল্পীদের মধ্যে আছেন, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, নিমাই দাস, রূপেন মিত্র, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর চট্টোপাধ্যায়, শচীন ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

সমকালীন (ইছাপুর)

সংস্থার নাম 'সমকালীন'। অবশ্য আগে নবতরুণ সঙ্ঘ নামে পরিচিত ছিল এই দল। যুগের সঙ্গে তাল রেখে এ বছরই সংস্থার নাম পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল ৬২ সালের এক শুভ সন্ধিক্ষণে। সংস্থার সম্পাদকের নাম কমল রায়। এ পর্যন্ত এ দল অল্প কয়েকটি নাটকই মঞ্চস্থ করেছে, যার মধ্যে আছে অরুণ কুমার দের 'কার দোষ' এবং 'আগন্তুক', অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবন যৌবন,' বিমল রায়ের 'অভিনয়', শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ' জগমোহন মজুমদারের 'ওরা কাজ করে' এবং সত্যেন ভদ্রর 'রক্তাক্ত শপথ'। যে সব সদস্যশিল্পী এ পর্যন্ত নাটকে অংশ গ্রহণ করে সংস্থার সাফল্য এনে দিতে সাহায্য করেছেন তাঁরা হচ্ছেন নৃসিংহ ভট্টাচার্য, অসীম ত্রিবেদী, উৎপল ত্রিবেদী, অরুণ শর্মা, স্বপন চ্যাটার্জী, অমর গাঙ্গুলী, বিপ্রদাস মুখার্জী, মনোজ কোলে ইত্যাদি। ১৯৬২ সালে জন্মগ্রহণ করার পর সংস্থা অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছে। নাটক করতে গিয়ে রিহার্সাল-এর জায়গা নেই। কোন স্থায়ী মঞ্চ নেই, যা আছে তা বেশ খরচ না করলে পাওয়া যাবে না। তাই জাতীয় নাট্যশালার দাবী ওঁদের কণ্ঠেও।

ফোকাস্ (বর্ধমান)

মফঃস্বল নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে কটি দল বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে, তাদের মধ্যে এটি অন্যতম। এর জন্ম ১৯৬৩ সালে। তখন এর কর্ণধার হিসেবে কাজ করেছেন রামমোহন বরাট। পরে সক্রিয়ভাবে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন পাঁচুগোপাল বসু, অশোক মুখার্জী, দিলীপ বণিক, রমেশ ভট্টাচার্য এবং সরোজ রায়। প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে এই সংস্থা নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছে। প্রতিটি সদস্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন। এদের সার্থক প্রযোজনা হলো : 'ঘূর্ণী', 'শেষ থেকে শুরু', 'হৃদবদলের মেলায়', 'সমুদ্র সন্ধানে', 'গেটম্যান', 'বৌদির বিয়ে' এবং সদস্য-নাট্য পরিচালক সরোজ রায়ের লেখা 'ঘেরাও', 'বিচিত্রানুষ্ঠান', 'ঔরঙ্গজীবের সরাব খতম': সুপ্তোত্থিত রক্তের সানাই', 'গোরুর গাড়ির হেডলাইট'। এই সংস্থার সাহায্যেই সরোজ রায় বিশে প্রথম এ্যাকাড (A C A D—

Autometic Character-isation through Autometic Dialogues} পদ্ধতির প্রবর্তক হিসেবে স্বীকৃতি পান। এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ২৪ মে ৭০ চন্দননগরেরর নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির মঞ্চে।

বর্তমানের প্রচেষ্টা যদি আগামী কালের জয়যাত্রা হয় তাহলে 'ফোকাস্' একদিন-না-একদিন সেই মিছিলে সামনে থাকবার চেষ্টা করবে।

গুড্‌লাক্ ড্রামাটিক ক্লাব (তমলুক)

১৯৬৩ সালের ২৩শে মে একটি শখের পূর্ণাঙ্গ নাটক নিয়ে এঁদের যাত্রা শুরু। নাট্য. জগতের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো অবস্থা ফেলে নতুন নাট্য আন্দোলনের সামিল হবার প্রচেষ্টায় এঁরাও এগিয়ে এলেন। এই প্রচেষ্টায় কর্ণধার বর্তমান সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তী।

শুরু হয়েছিল শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'কলেজ হোস্টেল' দিয়ে, তারপর ওঁরই নাটক 'ক্যাম্প থ্রি' এবং মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিবর্ণ'। এরপর একাঙ্ক নিয়ে পরীক্ষা শুরু। ১৯৬৮ সালে শুরু হলো এঁদেরই পরিচালনায় তমলুকে প্রথম একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'অয়নান্ত', 'অশান্ত বিবর', অনুপম দত্তের 'নায়কের সন্ধানে' এবং বর্তমানে সংস্থার সদস্য রক্তকমল দাশগুপ্তের 'সূর্যহারা অরণ্যের থেকে'।

১৯৭১ ও ৭২ সালে মহিষাদলে অনুষ্ঠিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠদল হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন এঁরা। নাটক পরিচালনা করেন সংস্থার শিল্পী পরিমল দাশগুপ্ত।

মফঃস্বলে নাট্য চর্চার প্রধান বাধা মঞ্চ, মহিলা শিল্পী ও অর্থ। যথারীতি এঁরাও তার শিকার। এছাড়া বর্তমান নাট্য আন্দোলনের উপযোগী দর্শকেরও অভাব। কাজেই মফঃস্বলের নাট্য আন্দোলনের দায়িত্ব শুধু মাত্র স্থানীয় দলের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সকল প্রতিষ্ঠালব্ধ দল নাট্যকার ও নাট্যমোদী মফঃস্বলের নাট্য আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার কথা ওঁরা ভাবেন।

অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ হলেন পরিমল দাশগুপ্ত, মৃগেন ভুঞ্যা, সুব্রত ভুঞ্যা, স্বপন চক্রবর্তী, মলয় চক্রবর্তী, অলোক সামন্ত, সেক্ সুশোভন, কালিপদ পাল, অমরেশ ব্যানার্জী, মৃত্যুঞ্জয় দাস, রবীন্দ্র দাস, বিকাশ পাল, রানেশ্বর চক্রবর্তী, দেবব্রত ঘোষ, নিলাদ্রি বেরা, ছায়া ভৌমিক, প্রভোৎ ভৌমিক,

মন্মথ অধিকারী, মণ্টু মালাকার, তুষার চক্রবর্তী, অমর সেন, রক্তকমল দাশগুপ্ত, ও শিশির মাইতি।

প্রতিরূপ (পলতা)

১৯৬৪ সাল পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে প্রায় এক দশক অনেকেই জড়িত। তাঁদেরই একজন সজল ঘটক। উত্তর ২৪ পরগণার পলতা অঞ্চলে প্রতিরূপ নাট্য সংস্থার ইনিই সাধারণ সম্পাদক। কি নাট্য আন্দোলন, কি দল সংগঠন, কি নাট্য প্রযোজনা সর্বক্ষেত্রেই অসাধারণ উৎসাহে প্রতিরূপ নাট্য দলের প্রতিষ্ঠা। প্রথম নাটক শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'কলেজ হোস্টেল'। গ্রামে ফাঁকা মাঠে নিজেরাই অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে সেদিন এ নাটক অভিনয় করেছিলেন প্রতিরূপের সদস্যরা। পলতা অঞ্চলে একটি নাটক প্রযোজনায় বাধা অনেক, তবুও এদের উৎসাহের অন্ত নেই।

প্রতিষ্ঠার এক বছর বাদে সংস্থা একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন এই পলতা অঞ্চলেই। সেই থেকে প্রতি বছরেই এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বন্ধ থেকেছে কেবল একবার ১৯৬১ সালে। তাও এঁদের জন্যে নয় তখন সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতা, সুতরাং প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রতিরূপের সদস্যরা। প্রতিরূপের এই নাট্য প্রতিযোগিতা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা বলে বিবেচিত।

নিজেদের প্রতিযোগিতা ছাড়াও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় প্রতিরূপের শিল্পী সদস্যরা নাটক নিয়ে হাজির হয়েছিলেন একাধিকবার। জিয়াগঞ্জ, বরাহনগর, কলকাতায় বঙ্গ সংস্কৃতির আসর, নৈহাটী, ব্যারাকপুর প্রভৃতি স্থানে নাট্য প্রতিযোগিতায় এরা পুরস্কৃতও হয়েছেন।

সংস্থা এ পর্যন্ত অভিনয় করেছেন বহু নাটক। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দাম্পত্যে কলহ চৈব', শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ক্যাম্প থ্রি', জ্যোতির্ময় বসু রায়ের 'একাকী', বিমল রায়ের 'অভিনয়' ও 'বর্ষণ শেষ', সুনীল ভদ্রের 'আবর্জনা' ও 'ফার্স্ট প্রাইজ', সুনীল দত্তের 'চোদ্দ পাকে বাধা' এবং জ্ঞানরঞ্জন ঘটকের দুটি নাটক 'কালরাত্রি' ও 'মায়ামৃগ'। এছাড়াও এরা

একটি যাত্রা আসরের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে অভিনয় করেছিলেন ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র লেখা 'বাগদত্তা'।

ব্যারাকপুর অঞ্চলে একটি রবীন্দ্রভবন নির্মাণে প্রতিরূপ সংস্থা বিশেষ আগ্রহী। এ দাবী নিয়ে এরা অগ্রসর হয়েছিলেন বহুদূর, আন্দোলনও করেছিলেন অনেক। কিন্তু বিশেষ কোন ফল এখনও পর্যন্ত পাননি। তবে এরা আশা রাখেন ব্যারাকপুরে, রবীন্দ্র ভবন এরা একদিন না একদিন নির্মাণ করতে পারবেনই।

সংস্থার স্থায়ী সভাপতি নাট্য সমালোচক ও সাহিত্যিক প্রবোধবন্ধু অধিকারী। উপদেষ্টামণ্ডলীতে আছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ কুণ্ডু, অসীমকুমার ঘোষ, ব্রজেন্দ্রকুমার দে, সুনীল ভঞ্জ এবং রমেন ঘোষ।

প্রতিরূপ দলের কার্যকরী সমিতির ওপরতলার সদস্যরা হলেন রাধারঞ্জন হালদার, নীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, অশোক ঘটক, কেশব মজুমদার, চিত্তরঞ্জন দেব রায়, সজলকুমার ঘটক, মাণিক দাশগুপ্ত, মানিক চক্রবর্তী, হিমাংশুকুমার ভট্টাচার্য ও সুধাংশুকান্ত ভট্টাচার্য।

শৈলুষিক (রহড়া)

শৈলুষিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ১৯৬৩ সালের গোড়ার দিকে। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের রহড়া শাখার কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে এসে এই নাট্যদল তৈরী করেন। কলকাতার এ্যাকাডেমি মঞ্চে এঁদের প্রথম নাটক দুলেন্দ্র ভৌমিকের 'অথঃ কিম্'। তারপর এঁরা কয়েকটি সফল অভিনয় ও নৃত্যনাট্য করার পর দূর দূরান্তের গ্রামে নিজেদের খরচে অভিনয় পরিবেশন করার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। প্রায় ২০টি গ্রামে তিরিশ রাত্রি এঁরা অভিনয় করেছেন দুলেন্দ্র ভৌমিকের 'ফসল'। এঁদের অভিনীত নাটক, 'অথঃকিম্', 'ফসল', 'গুপ্তবিদ্যা', 'শাস্তি'। শেষোক্তটি ছাড়া সবকটি দুলেন্দ্র ভৌমিকের রচনা। নির্দেশনা শ্রী ভৌমিক ও বরুণ মুখার্জীর। বর্তমান সম্পাদক দিলীপ ভট্টাচার্য। দলের নিয়মিত শিল্পীদের মধ্যে আছেন স্বর্ণা ব্যানার্জী, অঞ্জু দাস, নবেন্দু ঘটক, বারিদ বরণ বসু প্রভৃতি।

শিল্পায়ণ (ইছাপুর, ২৪ পরগণা)

১৯৬৫ সাল, ১৭ই অক্টোবর শিল্পায়ণ নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা। বর্তমান সম্পাদকের নাম নির্মল চক্রবর্তী। ইছাপুর এলাকায় নাটকের মান উন্নত করতে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে এ দলের।

শিল্পায়ণ এ পর্যন্ত অভিনয় করেছেন : 'কালভার্ট' (সত্যেন ভদ্র), 'শাস্তি' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'নেতা' (মোহিত চট্টোপাধ্যায়), 'নানা রঙের দিন' (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'যবনিকা কম্পমান, (সত্যেন ভদ্র), 'কেয়াকুঞ্জ' (বিভূতি মুখোপাধ্যায়), 'টেকনিক' (অজিত চক্রবর্তী), 'স্বর্গের সন্ধান' (সত্যেন ভদ্র), 'রাগ ললিত' (সত্যেন ভদ্র), 'তীর বেঁধা পাখি' (নেপাল মুখোপাধ্যায়), 'সূর্যমুখী' (প্রশান্ত চৌধুরী), 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' (মোহিত চট্টোপাধ্যায়), 'নিষাদ' (মোহিত চট্টোপাধ্যায়) এবং 'লৌহ প্রাচীর' (অনিলবরণ দত্ত)।

সংস্থার স্থায়ী নাট্য পরিচালক ভিনু বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে কল্যাণ ভট্টাচার্য, বিজয় রায় ও নির্মল চক্রবর্তীর ওপরও নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। নাটকে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের নাম : ভিনু বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনি মুখোপাধ্যায়, শান্তি মণ্ডল, গোষ্ঠ বসাক, নরেন দাস, বিজয় রায়, সত্যেন ভদ্র, সমর মিত্র, অজিত চক্রবর্তী, রবীন চক্রবর্তী, আশু চক্রবর্তী, প্রফুল্ল দত্ত, রবি চক্রবর্তী, নির্মল চক্রবর্তী, মানিক মজুমদার, পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ দে, কল্যাণ ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন দাস ও তপন রায়।

তিয়াস (ঘাটেশ্বর, ২৪ পরগণা)

গ্রাম বাঙলার বেশ কয়েকজন যুবকের নাট্য পিপাসার বাস্তব রূপায়ণ 'তিয়াস'। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঘাটেশ্বর গ্রামে এর প্রতিষ্ঠা ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি। বাংলা নাট্য চর্চার পীঠস্থান কলকাতা শহর থেকে সুদূর চল্লিশ মাইল দক্ষিণে বিস্তীর্ণ পল্লী অঞ্চলে নাট্যরসের ধারা প্রবহমানে তিয়াসই ভগীরথ। কয়েকজন যুবককে নিয়ে সুধাংশু কয়ালের সম্পাদনায় ও সত্যেন মুখার্জীর নির্দেশনায় মাত্র সাত বছরে এই নাট্যসংস্থা সর্বভারতীয় নাটকের ক্ষেত্রে তার স্থান কায়েম করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

নাট্যকার মন্মথ রায় আহূত অধুনালুপ্ত সংযুক্ত সংস্কৃতি সংসদের এঁরা সদস্য ছিলেন। বর্তমানে এঁরা নাট্যসংগ্রাম সমিতি ও বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতির সক্রিয় সদস্য।

নাট্যচর্চা ছাড়াও গ্রন্থাগার পরিচালনা ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে এঁদের সক্রিয় অংশ আছে। এই সংস্থা বাংলা দেশে তথা বাংলার বাইরে বিভিন্ন স্থানে নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে ও শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছে। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দৃষ্টি' নাটক নিয়ে শুরু করে তিয়াস পরপর 'তিমির অভি-সার', (শ্রীপলাশ), 'টীপু সুলতান' (মহেন্দ্র গুপ্ত), 'বধূবরণ' (জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়), 'কার দোষ' (অরুণ দে), 'ধূলো বালির মাটি' (বসন্ত ভট্টাচার্য), 'অন্ত ছায়া' 'যা তারা পারেনি' (কিরণ মৈত্র), 'ওরা বলুক' (শচীন হালদার), 'লৌহ কপাট' (জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়), 'চোর' (ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়), 'মেঘে ঢাকা তারা', (শক্তিপদ রাজগুরু), 'কেদার রায়' (রমেশ গোস্বামী), 'দুটি প্রাণ একটি মন' (জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়), 'ছেঁড়া তমসুক', (রবীন্দ্র ভট্টাচার্য), 'দুই মহল' (জোছন দস্তিদার), 'কোথায় গেল' (কিরণ মৈত্র), 'কালোমাটির কান্না' (রবীন্দ্র ভট্টাচার্য), 'বাঁচতে চাই' (মণ্টু গঙ্গোপাধ্যায়), 'পণ্ডিত বিদায়' (শিবরাম চক্রবর্তী), 'সংক্রান্তি' (বীরু মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করেন। গত সাত বছরে তিয়াস ২২টি নাটক নিয়ে মোট ৫০টি অভিনয় করেছে।

শুরু থেকে অদ্যাবধি এই দলে অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন নীচের শিল্পীবৃন্দ :— সত্যেন মুখার্জী, হৃদয় রঞ্জন রায়, সনৎ চৌধুরী, সমীরণ চক্রবর্তী, শৈলেন বসু, শীতল বসু, শুভেন্দু গায়েন, সঞ্জীব গায়েন, সুধাংশু কয়াল, অর্জুন গায়েন, দুলাল পুরকাইত, তপন চ্যাটার্জি, প্রণবেন্দ্র চক্রবর্তী, দিলীপ দাস, দিলীপ হালদার, ধীরেন সরকার, অজিত কয়াল, শৈলেন চৌধুরী, অসিত মণ্ডল, গোপাল পুততুণ্ড, চিদানন্দ হালদার, টীকেন্দ্রজিৎ হালদার, শচীন হালদার, গৌর প্রামাণিক, শ্রীপলাশ, নন্দদুলাল বিশ্বাস, পঙ্কজ চক্রবর্তী, অনিল মিত্র, সতীশ বৈদ্য, জয়দেব মজুমদার।

গ্রামে নাটক মঞ্চস্থ করতে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তার প্রধান কারণ মঞ্চ এবং আলো। ঘাটেশ্বর পশ্চিম বাঙলার এমন একটি গ্রাম যেখানে এখনও পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আলো পৌঁছতে পারেনি। মঞ্চের অভাব দূর করতে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করতে হয় ফাঁকা মাঠে। আর আলোর প্রয়োজনীয়তা মেটাতে

হয় ডায়নামো ভাড়া করে। আর্থিক অসঙ্গতিতে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো ডায়নামো ভাড়া করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে 'ভিয়াস' এর প্রয়াস পেছিয়ে থাকে না। হ্যাজাকের ডিমার এঁরা নিজেরাই তৈরী করে নেন। 'ভিয়াস'-এর শিল্পীসদস্যরা বেশ গর্বের সঙ্গে স্বীকার করেন, হ্যাজাকের ডিমার নিয়ে এঁরা যে প্রযোজনা করেছেন, তা যে কোন প্রথম শ্রেণীর নাট্যদলের প্রযোজনার সমতুল্য।

'সপ্তস্বরা' (চিত্তরঞ্জন বর্ধমান)

চিত্তরঞ্জনের কয়েকজন তরুণ নাট্যমোদী ১৯৬৫ সালে 'সপ্তস্বরা' নাট্য সংস্থাটি গড়ে তোলেন। স্বপন সেনগুপ্তের 'কবে বসন্ত আসবে' নাটকটির বেশ কয়েকটি অভিনয় করে সাড়া তোলেন চিত্তরঞ্জন টাউনসিপে। এঁরাই প্রথম শ্রমিক আন্দোলনের নাটক অভিনয় করে দর্শক মনে স্থায়ী আসন পেতে নেন। ধর্মঘট হবার পর তার কি প্রতিক্রিয়া শুরু হয় শ্রমিকদের ভেতর, তার পরিবারের ভেতর, তারই জীবন কাহিনী এ নাটকের প্রতিটি পাতায়। উক্ত নাটকটি নিয়ে বাংলার বাইরে সেই লক্ষ্ণৌতে গিয়ে অভিনয় করে পুরস্কারের জয়মাল্য অর্জন করেন। এ বাদে বহু প্রতিযোগিতায় এঁরা অংশ গ্রহণ করে পুরস্কার অর্জন করেন। সেদিনের শিল্পীদের ভেতর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন—বিজয় দত্ত, প্রাণেশ নিয়োগী, সঞ্চিত ভট্টাচার্য, অনিতা ব্যানার্জী, লিলিমা চক্রবর্তী, শ্যামল সান্যাল, রতন চক্রবর্তী, বিপ্লব দত্ত, বিমল পাত্র প্রভৃতি শিল্পীরা। এঁরা বহু নাটক অভিনয় করেছেন। তার ভেতর, 'ছায়া ছায়া রাত', 'রক্তাক্ত 'রোডেশিয়া' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিশির শ্রীনাট্যম (বরানগর)

নাট্যাচার্য শিশির কুমারের স্মৃতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে ১৯৬৮ সালে যে নাট্য সংস্থাটি গড়ে উঠেছিল তার নাম—'শিশির শ্রীরঙ্গম'। বেশ কয়েক বছর চলবার পর বিভেদের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠাতে এদের ভেতর কিছু তরুণ বেড়িয়ে এসে যে সংস্থাটি গড়ে তুললেন তার নাম 'শিশির শ্রীনাট্যম'। অভয় ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় এরা প্রথম অভিনয় করলেন স্বপন সেনগুপ্তের 'কবে বসন্ত আসবে'। যে সব নাটক এরা ইতিমধ্যে অভিনয় করেছেন তার ভেতর—'আজকাল', 'শেকল ছেঁড়ার গান', 'পরপার', 'কালো মাটির কান্না' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রূপান্তর (নৈহাটি, ২৪ পরগণা)

১৫ই আগষ্ট ১৯৬৬ সাল, জাতির বিংশতম স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য লগ্নের সঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠা দিবসের ক্ষণটিকে একাত্ম করে নিয়ে নাট্য সংস্থা 'রূপান্তর নাট্য সম্প্রদায়' নাম নিয়ে দীর্ঘ যাত্রা আরম্ভ করে। যাঁদের অপরিমিত সাহায্য এবং সহানুভূতির ফলে আজও সম্প্রদায় তাঁর যাত্রা-ধারাকে অব্যাহত রেখেছে তাঁদের মধ্যে দীপক কুশারী, দেবকান্ত ভট্টাচার্য, মহাদেব ভট্টাচার্য, প্রভাস মুখার্জী, প্রভাস ভট্টাচার্য, বিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য ও রোহিনী কুশারী অন্যতম। এ পর্যন্ত যে সকল সদস্য সম্প্রদায়ের নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে দেবকান্ত ভট্টাচার্য, দীপক কুশারী, মহাদেব ভট্টাচার্য, বাসুদেব ভট্টাচার্য, রবীন কুশারী, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, প্রণব কবিরাজ, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, নারায়ণ ভট্টাচার্য, কানাইলাল ভদ্র রায় অন্যতম।

এরা বসন্ত ভট্টাচার্যের 'সারি সারি পাঁচিল', শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'রি-এ্যাকশান', বাসুদেব ভট্টাচার্যের 'আলোর সন্ধানে', শচীন ভট্টাচার্যের 'জেলখানা' ও 'ভূমিকম্প', দীপক কুশারীর 'চলচ্চিত্রের অপমৃত্যু' প্রভৃতি বহু নাটক মঞ্চস্থ করেন। বিভিন্ন সময়ে নাটক পরিচালনার ভার নেন দেবকান্ত ভট্টাচার্য, রবীন কুশারী, সুনীল মুখার্জী, বাসুদেব ভট্টাচার্য, দ্বিজেন ভট্টাচার্য।

একটি নাটক সুষ্ঠভাবে মঞ্চস্থ করতে হলে যে পরিমাণ আলো, সঙ্গীত, মঞ্চ-সজ্জার প্রয়োজন এবং তা করতে হলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সেই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে এতো ছোট ছোট নাট্য সংস্থাগুলি সমর্থ হয় না। সুতরাং সারা বছর এক বিরাট আর্থিক বোঝার ভার বহন করতে হয়।

এঁদের নাট্যপ্রয়াস একান্তভাবেই একাঙ্ক নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ মনে হয়, বর্তমানে একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং যার মাধ্যমে এতো ছোট ছোট নাট্য সংস্থা, যারা সর্বদাই অর্থনৈতিক চাপে বিব্রত থাকে। তারা অতি অল্প খরচেই বছরে একাধিকবার নাটক মঞ্চস্থ করতে সক্ষম হয়।

অনামী (রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ)

১৯৬৭ সাল, ১৭ই নভেম্বর। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের কয়েকজন উৎসাহী তরুণ মিলে নাট্যদল তৈরি করল, নাম ঠিক হল অনামী। প্রথম নাটক

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শেষ থেকে শুরু' দিয়ে অনামীর যাত্রা শুরু। শুরুর মুহূর্তটিতে সত্যিই এঁরা অনামী ছিলেন। আজ আর তা নেই। শুধু মুর্শিদাবাদ কেন, গোটা পশ্চিমবঙ্গের নাট্যজগতে এ দলের প্রয়াস ও কর্মদক্ষতা সুবিদিত।

এর পর থেকেই শুরু হলো একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করার পালা। কিরণ মৈত্রের 'নাম নেই', অগ্নিদূতের 'ঝিঁঝি পোকার কান্না', পরিমল দত্তের 'ব্যাণ্ড মাস্টার', সাধনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের 'আমি থামবো না', ঋত্বিক ঘটকের 'সাঁকো', সুধাংশু দাশগুপ্তের 'আমি এ চাই নি', বাবলু দাশগুপ্তের 'কেন এই অবক্ষয়' প্রভৃতি প্রায় কুড়িটি নাটক এঁরা মঞ্চস্থ করেন এ জেলারই এ গ্রামে সে গ্রামে। নাটকগুলি পরিচালনা করেন শৈলপতি ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দু মণ্ডল এবং পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়। নাটকে অংশগ্রহণকারী সদস্যশিল্পীদের নাম: ভীষ্মদেব হালদার, পূর্ণেন্দু মণ্ডল, সুবল মণ্ডল, গিরিজা সিংহ, জগৎ দে, পূর্ণেন্দু সরকার, সরোজ পাল, হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তুষার দাশগুপ্ত, স্বদেশ আচার্য, স্বরজিৎ পাল, পার্থ মুখোপাধ্যায়, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপাল মুখোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, বিজয় সিংহরায়, বিমান হাজরা, চন্দন রায়, কুবের ঘোষ, বিনয় মিত্র, অরুণ লালা, দেবশ্রী দত্ত, ভবানী মণ্ডল, কুনাল দে, যতীন পাল, সমরেশ দত্ত, মুক্তি চক্রবর্তী, প্রশান্ত সরকার, অলোক সাহা, তপন দত্ত, অনিল সরকার, কাশীনাথ ঘোষ, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত শ্যামল বসু, রতন দে, পঞ্চানন দাস, নিমাই সেনগুপ্ত, নরেন দাস, ভীম চন্দ্র, রবি দাস, মনীন্দ্রনাথ দাস, শৈলপতি ভট্টাচার্য, মৌসুমী ব্রহ্ম, স্বপ্না মুখোপাধ্যায়, মনীষা দাস, শোভা পাল, মায়া সরকার, অনিতা মণ্ডল, কবিতা মণ্ডল এবং ছবি ভট্টাচার্য।

সংস্থার সাফল্য: ১৯৬৮ সালে রঘুনাথগঞ্জ, পরেশনাথ গ্রন্থাগার আয়োজিত মুর্শিদাবাদ জেলা একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় অনামী নাট্যদল 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ' অভিনয় করে প্রযোজনা, পরিচালনা (শৈলপতি ভট্টাচার্য-কৃত) এবং শিশুশিল্পী (মৌসুমী ব্রহ্ম) বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করেন। পরের বছর এ দল জিয়াগঞ্জের নীলকণ্ঠ সংস্থা আয়োজিত সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় 'ব্যাণ্ড মাস্টার' নাটকের জন্য সামগ্রিক প্রযোজনায় দ্বিতীয় পুরস্কার এবং শৈলপতি ভট্টাচার্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও অভিনেতা বিভাগের দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। ১৯৭০ সালে নৈহাটির যাত্রিক

পরিচালিত সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার ছিনিয়ে আনেন শৈলপতি ভট্টাচার্য এবং নিমাই সেনগুপ্ত পান আবহ সঙ্গীত রচনায় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। ১৯৭২ সালে কান্দির আনন্দলোক আয়োজিত মুর্শিদাবাদ জেলা একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় অনামী নাট্যদল 'বাদক' অভিনয় করে সামগ্রিক প্রযোজনার তৃতীয় সম্মান পান।

বলাকা (হাওড়া)

বলাকা একটি নাট্যদলের নাম। হাওড়া জেলার রামচন্দ্রপুর অঞ্চলে এ দলের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারী। দলের বর্তমান সম্পাদকের নাম শ্যামল ঘোষ। বলাকা ইতিমধ্যে দশটি নাটক প্রযোজনা করেছেন, প্রতিটি প্রযোজনাতেই এঁরা যথেষ্ট খ্যাতি কুড়িয়েছেন। এঁদের অভিনীত নাটক : শচীন ভট্টাচার্যের 'সম্রাটের মৃত্যু', বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নশেষ', জগমোহন মজুমদারের 'পাখির বাসা', রতন কুমার ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে', পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'নাসকাটা ঘর', ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি পয়সা', ম্যাক্সিম গোর্কির 'দানব' (সুনীল দত্ত অনূদিত), ব্রেখটের 'সমাধান' (উৎপল দত্ত অনূদিত), সুধাংশু দাশগুপ্তের 'আমি এ চাই নি' এবং রাজেন দাসের 'চরিত্রের বিদ্রোহ'। প্রথম দুটি নাটকে নাট্য নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন তিনকড়ি পাল, পরেরগুলিতে রাজেন দাস।

১৯৬৯ সাল থেকেই বলাকা নাট্যগোষ্ঠী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতে থাকে। এই বছরেই তমলুক ব্রাইট ফিউচার আয়োজিত একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় রতন ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে' নাটকে এ দলের রাজেন দাস পুরস্কৃত হন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মানে। দলের শিল্পী শ্যামসুন্দর দাস এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। ১৯৭১ সালে ভারতীয় গণ সংস্কৃতি সঙ্ঘের মেদিনীপুর নিশান শাখার একাঙ্ক অভিনয় প্রতিযোগিতায় এঁরা অভিনয় করেন 'চরিত্রের বিদ্রোহ'। দল এখানে একাধিক পুরস্কার পান, শ্রেষ্ঠ সামগ্রিক প্রযোজনা, শ্রেষ্ঠ দলগত অভিনয়, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (প্রশান্ত দাস), শ্রেষ্ঠ পরিচালক (রাজেন দাস)। এই বছরেই 'চরিত্রের বিদ্রোহ' নাটকের নাট্যকার রাজেন দাস পুরস্কৃত হন তিনটি প্রতিযোগিতায়।

নাটকে অংশগ্রহণকারী সদস্যশিল্পীদের নাম: রাজেন দাস, শ্যামসুন্দর দাস, প্রশান্ত দাস, ভোলানাথ ঘোষ, সুহাস মিত্র, শ্যামল ঘোষ, পঞ্চানন ঘোষ, সোমনাথ নাথ, দুলাল বাগ, বীরেন নাথ, সুকুমার চক্রবর্তী, নিকুঞ্জ দাস, শঙ্কর ঘোষ, রবীন ঘোষ, নিতাই ধর, সুশীল দাস, প্রহ্লাদ দাস, শ্রবণ ঘোষ, অজিত মুখোপাধ্যায়, ভগীরথ হালদার, বিজন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ চক্রবর্তী ও বিমলকৃষ্ণ ঘোষ।

হাওড়া শাঁখরাইল থানা এলাকায় কোন স্থায়ী মঞ্চ নেই। স্থানীয় কোন পেশাদারী ও শৌখিন অভিনেত্রী না থাকায় কলকাতা এবং হাওড়া শহর ও শহরতলীর অভিনেত্রী আনতে হয়। এ ব্যাপারে ব্যয় সংকোচনের জন্য মহড়ার সংখ্যা কমাতে হয় এবং নিয়মিত অভিনয়ের ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

বড়িষা সংস্কৃতি পরিষদ

১৯৬৭ সাল থেকে এই সংস্থা গণনাট্যের ধ্বজাকে দৃঢ় হাতে তুলে ধরে এগিয়ে চলেছে এই বিশ্বাস নিয়ে, যে উন্নততর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা এবং সততার সংগে অগ্রসর হলে সাধারণ মানুষের সমর্থনে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

গত ছ'বছরে যে সব নাটক নিয়ে বড়িষা সংস্কৃতি পরিষদ পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছে সেগুলি হলো :—

অমর গাঙ্গুলীর 'জীবন যৌবন' ও 'দ্বান্দ্বিক', ভোলা দত্তের 'কিউবা', বীরু মুখার্জীর '২০শে জুন', কালীপ্রসাদ ঘোষের 'ইঙ্গিত', শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ', 'বিদিশা', নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এমনও দিন আসতে পারে', রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'কালো মাটির কান্না', 'অশান্ত বিবর' ও 'রক্তে রোয়া ধান', মনোজ মিত্রের 'নীল কণ্ঠের বিষ', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আগন্তুক' ও 'ভাড়াটে চাই', Lady gregory-র rising of the moon-এর ছায়াবলম্বনে সুনীল চৌধুরী বিরচিত 'সূর্য স্নান', রতনকুমার ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে', 'ফেরা', 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ও 'শেষ বিচার', গোর্কীর The Enamies-এর ছায়া অবলম্বনে সুনীল দত্ত বিরচিত 'দানব', ভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যালারামের স্বদেশিকতা, (নাটকটি ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে), শৈলেন্দ্র

নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত, রবীন্দ্রনাথের 'তোতা কাহিনীর' নাট্যরূপ, বসন্ত ভট্টাচার্যের 'পরাজিত পৃথিবী'। প্রভৃতির পথে—শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' ও 'রমা'।

বলাকা শিল্পী গোষ্ঠী

১৯৬৭ তে হাওড়া শাঁখরাইলের রামচন্দ্রপুরে প্রতিষ্ঠা হলো 'বলাকা শিল্পী গোষ্ঠী।'

জন্মলগ্নেই শচীন ভট্টাচার্যের 'সম্রাটের মৃত্যু' বেশ সাফল্য আনলো। পরের বার অভিনীত হলো বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্ন শেষ' ও জগমোহন মজুমদারের 'পাখীর বাসা'। ত্রিমাত্রিক মঞ্চে নিরবচ্ছিন্ন অভিনয়ের মাধ্যমে 'পাখীর বাসা' দর্শকদের মুগ্ধ করলো।

এর পরই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য এঁরা বেরিয়ে পড়লেন রতনকুমার ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দেশ্য' নিয়ে। নিজস্ব উদ্যোগে ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অভিনীত হতে লাগলো 'সমাধান', 'আমি এ চাইনি', 'একটি পয়সা', 'চরিত্রের বিদ্রোহ', 'রাইফেল', 'নাসকাটা ঘর' প্রভৃতি।

সদস্যদের অনবরত উৎসাহে গোষ্ঠীতে নিজস্ব নাট্যকারের জন্ম হলো। গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য রাজেন দাস রচিত 'চরিত্রের বিদ্রোহ' এ পর্যন্ত সর্বাধিক সাফল্যের অধিকারী। অকুণ্ঠ প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার সৌভাগ্য হলো গোষ্ঠীর।

'চরিত্রের বিদ্রোহ' এ পর্যন্ত ৫টি প্রতিযোগিতায় সামগ্রিক অভিনয়ে ১ম ও ২য়, শ্রেষ্ঠ দলগত অভিনয়, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার (৩টি) ও ৮টি পুরস্কার প্রাপ্তিতে সমর্থ হয়েছে ১৯৭১-৭২ সালে।

নাট্য অভিনয় ছাড়াও 'বলাকা শিল্পী গোষ্ঠী'র একটি নাট্য বিষয়ক গ্রন্থাগার আছে। 'বলাকা' নামের একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

এই সংস্থার অধিকাংশ সদস্য শ্রমিক। মাত্র ৬ বছরের যাত্রাপথেই তাঁদের মধ্য থেকে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় মঞ্চ, আলোক, রূপসজ্জা প্রভৃতি কলাকুশলীর জন্ম হয়েছে। এ সংবাদ নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক।

শিল্পীলোক (ভাটপাড়া)

২৪ পরগণা জেলার ভাটপাড়া অঞ্চলে শিল্পীলোক নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা ১৯৬৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল। দলের বর্তমান সম্পাদক অশোক

মুখোপাধ্যায়। শিল্পীলোক বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত মোট পাঁচটি নাটক ৪৯ বার অভিনয় করেছেন। নাটকগুলি বনফুলের 'কবয়ঃ', রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বিচার', 'বিরাশি সিক্কা', 'ফাঁসি মকুব হলো' এবং 'শ্মশানে রক্তের স্বাদ'। দলের পরিচালক একজনই, নাম সৌমেন ঘোষ।

সংস্থা এ পর্যন্ত একাধিক নাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছেন। নৈহাটির যাত্রিক, আদি মৈত্রী সঙ্ঘ ও রূপালোক, আতপুরের জাগৃতি, হালতুর সৌখিন, কাঁচড়াপাড়ার হাইল্যান্ডমার্স, বেল ইন্সটিটিউট ও ক্ষুদিরাম বোস ইন্সটিটিউট, মেদিনীপুরের নিশান, কলকাতার তপবানী, হুগলীর তাঁতিপাড়া, হালিশহরের স্টুডেন্টস থিয়েটার, ভাটপাড়ার যুবগোষ্ঠী, ব্যারাকপুরের অগ্রনী এবং চন্দননগরের চেনা-অচেনা সংস্থা আয়োজিত নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় শিল্পীলোক বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করেছেন।

নাটকে অংশগ্রহণকারী সদস্য শিল্পীদের নাম: প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শৈলেন ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীকান্ত ঘোষাল, প্রদীপ ঘোষ, লক্ষ্মীনারায়ণ পাল, শিশির ভট্টাচার্য, মৃণাল দত্ত, শক্তি মুখোপাধ্যায়, নীরদ হালদার, অমিত হাজরা, দিলীপ ঘোষ, তপন ঘোষ ও সঞ্জীব বসু।

শিল্পীলোক সংস্থার নাটক মঞ্চায়ণের সর্বাগ্রে যা অসুবিধা, তা অর্থনৈতিক; অল্প সংখ্যক সভ্যের মাসিক চাঁদার ওপর বেশির ভাগ সময় নির্ভর করতে হয়; এর পরেও আছে স্থায়ী মঞ্চের সমস্যা।

রানার গ্রুপ (দুর্গাপুর)

ইস্পাত নগরীর 'রানার গ্রুপ' জন্ম লাভ করে ১৯৬৯ সনে। নাট্যকার স্বপন সেনগুপ্তের সক্রিয় সহযোগিতায় ওখানকার স্থানীয় কিছু নাট্যানুরাগী যুবক অক্লান্ত পরিশ্রমে উক্ত সংস্থাটি গড়ে তোলেন। 'যাত্রাবদল' ও 'কবে বসন্ত আসবে' নাটক দিয়ে এঁদের যাত্রা শুরু হলেও স্বপনবাবুর 'অশুভ আঁতাত' ও 'শপথ' নাটক দু'খানি এঁদের জনপ্রিয়তার শিখরে আসন করে দেয়। 'অশুভ আঁতাত' নাটকখানি বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতির উপর লেখা। 'বিশ্বজয়ের শপথ' সর্বহারার সংগ্রামের ভেতর দিয়ে শোষণের অবসানের জেহাদ ঘোষণা করা হয়। মূলতঃ এটা শ্রমিক কৃষকের যৌথ সংগ্রামের ওপর লেখা। এঁরা বর্তমানে উপস্থিত করেছেন, উক্ত নাট্যকারের

ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের নিয়ে লেখা—'আমরা জিতবই', পরিচালনায় নাট্যকার স্বয়ং থাকছেন। এঁদের সংস্থার শিল্পীদের নাম করতে গেলেই প্রথম নাম করতে হয়—বিপ্লব দত্ত, অনিল দত্ত, কিশোর চক্রবর্তী, বাদল সেনগুপ্ত, পুরবী রায়, সন্ধ্যা রায়, বুলা মিত্র, সমর দে, অশোক ঘোষ, মিষ্টার রাও, রণেন সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত, প্রাণেশ অধিকারী প্রভৃতি শক্তিমান অভিনেতার। নিহালের আলোক সম্পাত মনে করিয়ে দেয় প্রতিভাময় আলোক শিল্পীর কথা।

বর্ধমান নটরাজ ইউনিট (বর্ধমান)

তিন বছর আগে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাসে বর্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হল একটি নাট্যদল। নাম : বর্ধমান নটরাজ ইউনিট। তিন বছরের দল, অনায়াসেই একে শিশু সংস্থা বলতে কেউ দ্বিধা করবেন না। বয়সে শিশু হলেও, অস্বীকার করার উপায় নেই এ দল যে কোন প্রতিষ্ঠিত এবং প্রথম শ্রেণী দলের সমতুল্য। মোট এগারটি নাটক এঁরা প্রযোজনা করেছেন তিন বছরে। কিন্তু অভিনয়ের সংখ্যা চিন্তা করলে অবাক না হয়েও পারা যায় না। সর্বমোট ৬১টি। এঁরা অভিনয় করেছেন অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দ্বান্দ্বিক', রতনকুমার ঘোষের 'মহাকাব্য', কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘণ্টা' ও 'যা তারা পারেনি', বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'কেয়াকুঞ্জ', সন্তোষ সিংহের 'এরাও মানুষ', রবীন মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল', অগ্নিদূতের 'কিন্তু নাটক নয়', রমেন লাহিড়ীর 'রাজ যোটক', সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের 'সাদা কালো' এবং সলিল চৌধুরীর 'অরুণোদয়ের পথে'।

কলকাতা এবং মফঃস্বলের বিভিন্ন নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতায় নটরাজ ইউনিট যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে এবং প্রায় প্রতি প্রতিযোগিতায়ই এঁরা যোগ্য পুরস্কারের সম্মান পান। 'দ্বান্দ্বিক' অভিনয় করে এঁরা বেহালার সারা বাঙলা একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায়, কলকাতার ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট আয়োজিত একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায়, চিত্তরঞ্জন, ভদ্রেশ্বর, কোন্নগর ও কলকাতার কালীঘাটে আয়োজিত নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়। বর্ধমান জেলা একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতি-যোগিতা এবং কোন্নগরে আয়োজিত একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় এ দলের 'মহাকাব্য' একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়।

দলের শিল্পীদের মধ্যে আছেন নিয়তি সরকার, অজিত ঘোষ, আরতি ঘোষ,

দুলাল দাস, দুর্গাশঙ্কর ব্যানার্জী, তাপস পাল, শঙ্করী চ্যাটার্জী, অশোক সরকার, বনোয়ারীলাল সরকার, ইন্দিরা সরকার, বিমল ব্যানার্জী, সুকুমার দত্ত, শিবপ্রসাদ বসু, কোহিনূর দত্ত, শেখর মজুমদার, মুক্তি চক্রবর্তী প্রভৃতি। দলের নাট্য পরিচালক অজিত ঘোষ।

এনাগো (দমদম)

১৯৭০ এর জুন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়া যখন চরমে, তখন দমদমের চারটে ছেলের মাথাও তথৈবচ। তফাৎটা এরা নাটক করার জন্য পাগল! এই পাগলামী প্রচেষ্টাই রূপ দিল—'এ'-'না'-'গো', অর্থাৎ একটি নাট্য গোষ্ঠী, ৭০-এর ১২ই জুন সন্ধ্যায় জন্ম নিল। ইচ্ছে নিজেরাই নাটক লিখবে আর অভিনয় করবে। সেই অলক্ষনই রূপ নিল ২৪শে সেপ্টেম্বর 'পরাজিত মানুষ' হিসেবে।

যদিও বর্তমানে দমদমের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় প্রগতিশীল নাটক প্রকাশ্য মঞ্চস্থ করতে এনাগোকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তবুও সে নাট্য আন্দোলনের ধ্বজা বহন করে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছে।

প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভের সাফল্যের নিরীখে এনাগোর সাফল্য বলতে গেলে কিছুই নেই, তবুও সে প্রতি স্থানে দর্শক মনে তার নিজস্ব আসন সুদৃঢ় করে চলেছে। এখন পর্যন্ত এনাগো দেবতোষ সেনগুপ্তের 'পরাজিত মানুষ', 'নাটক হয়ে গেছে', 'এক যে রাজার দেশে' ও সেনদীপের 'আমরা শপথ নিলাম' অভিনয় করেছে। প্রতিটি নাটক নির্দেশনায় ছিলেন সংস্থারই সংগঠক দেবতোষ সেনগুপ্ত। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন—দেবতোষ সেনগুপ্ত, প্রদীপ সেনগুপ্ত (বর্তমান সম্পাদক), মৃণাল কান্তি মৈত্র, দিলীপ ভৌমিক, অমিত গোস্বামী, কৃষ্ণেন্দু কুণ্ডু, পরেশ দাস, ইন্দ্রজিৎ সুর, মনোজিৎ পাল, তাপস মৈত্র, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, রামদাস মণ্ডল, প্রণব বৈদ্য, অখিল সেনগুপ্ত, সুনিল চক্রবর্তী, বিকাশ কুমার দাঁ ও অরবিন্দ চক্রবর্তী। মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেছেন—কল্পনা ভট্টাচার্য (সেনগুপ্ত) ও অনিতা সেনগুপ্ত।

বর্তমানে সংস্থারই সদস্যের লিখিত 'পরিস্থিতি বিপরীত', 'সূর্য যাবে অস্তাচলে' ও 'লুনাটিক এ্যাসাইলাম' (পূর্ণাঙ্গ) প্রভৃতির পথে।

বীক্ষণ (বজবজ)

চব্বিশ পরগণা জেলার বজবজ অঞ্চলে বীক্ষণ একটি নাট্যদল। দলের ক্ষমতা অত্যল্প, হয়তো আর পাঁচটির মত নয়। তবে দলের শিল্পীদের প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার দিকে তাকালে অবাক না হয়ে পারা যায় না। স্বীকার করতেই হয়, এ দল অতি অল্প দিনেই খ্যাতিশীর্ষে পৌছতে পারবে।

বীক্ষণ এ পর্যন্ত যে সমস্ত নাটক প্রযোজনা করেছেন : রতন ঘোষের 'সিঁড়ি' এবং 'শেষ বিচার', অশেষ রায়ের 'যদিও অমৃত', 'জীবন নিয়ে' এবং 'অপরিচিত কুশীলব'। দলের শিল্পীদের মধ্যে আছেন প্রীতিরঞ্জন ঘোষ, অমিয় সেন, সনৎ মুন্সী, তিমির ঘোষ, সুবীর সেনগুপ্ত, অশেষ রায়, সুধীর দাস, শরদিন্দু ঘোষ, বিকাশ মিত্র, বারীন দে, মিলন দাস, সুব্রত দত্ত, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, কাশীনাথ দত্ত, বিনয় মুন্সী, তড়িৎ চৌধুরী, অমিত চক্রবর্তী, শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়, শাশ্বত মুখোপাধ্যায়, অশোক মল্লিক, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ গুপ্ত, অরুণ সেন, প্রণয় দাস ও গোপা ভট্টাচার্য।

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী হল ছাড়া কলকাতার রঙ্গনা হলে এরা নাটক মঞ্চস্থ করেছেন।

দিশাহারা

বর্ধমান জেলার ছোট গ্রাম ফকিরপুর। শহর এবং এ গ্রামের মাঝে ভয়াল ভয়ঙ্কর দামোদর। প্রতি বছরেই বর্ষায় দামোদরের প্রলয় রূপ। এ রূপের মহাগ্রাস থেকে ফকিরপুর বাদ থাকে না। বন্যা তাদের প্রতি বছরের সঙ্গী। এত সমস্যা, তবু ছোট এই গ্রামে নাট্যচর্চার বিরাম নেই।

দলের বর্তমান সম্পাদক বিমলকুমার বসু জানালেন, 'নাটকের আমরা অনেক কিছুই জানি না। জানি না ভাল অভিনয় করতে, জানি না সুষ্ঠু পরিচালনা করতে, তথাপি আমার শেষ কথা, প্রথম শ্রেণীর নাট্য আন্দোলনকারীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ধ্বনি তুলব : জাতীয় নাট্যমঞ্চ চাই, চাই অভিনয় করতে। চাই নিজেদের সুষ্ঠু বিকাশ করতে আর চাই জনগণের হৃদয়ে নবজীবনের আলো জ্বালাতে।

সংস্থা এ পর্যন্ত অভিনয় করেছেন ১৩টি নাটক। নাটকগুলি : 'বিদিশা' (শৈলেশ গুহ নিয়োগী), 'ফেরিওয়ালা' (রাজদূত), 'আগন্তুক' (অরুণ কুমার

দে), 'পাত্রী চাই' (রবি দাস রায়), 'বিবাহ বিভ্রাট' (মনোরঞ্জন মিত্র)- 'অভিযান', 'এখানে পিঞ্জর', 'আবার মীরজাফর', 'হুঁজুর আমি খুন করিনি' (বিমলকুমার বসু). 'অভিনয়' (বিমল রায়), 'ঠিক বৃষ্টির আগে' (সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য), 'রক্তাক্ত রোডেশিয়া' (শ্যামলতনু দাসগুপ্ত) এবং 'রক্তে রোয়া ধান' (রবীন্দ্র ভট্টাচার্য)। সদস্তশিল্পীদের নাম: গুরুদাস নন্দী, মনোরঞ্জন মিত্র, স্বপন চক্রবর্তী, পান্নালাল বক্সী, মধুসূদন বক্সী, তড়িৎকান্তি দে, শান্তি সরকার, বিমলকুমার বসু, অজিত বসু, সত্যরঞ্জন মিত্র, নিখিল মিত্র, সলিল মিত্র, সুকুমার ঘোষ, অমল মিত্র, নির্মল মিত্র, অনিলকুমার মিত্র, মনোহর দাস, লক্ষ্মীকান্ত সাঁতরা, দুর্গাপদ রায়, হরিদাস নন্দী, অমল জানা, পরমানন্দ ভট্টাচার্য, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ শর্মা, শঙ্কর ঘোষ, শান্তিসুধা সামন্ত, নারায়ণ চন্দ্র বক্সী, কৃষ্ণদাস মিত্র, তপন চক্রবর্তী, জহরলাল বক্সী, সুনীল ঘোষ, কার্তিক সিংহ, স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামলানন্দ রায় প্রভৃতি।

নাট্যচর্চায় প্রতি পদে বাধা পাচ্ছেন দিশাহারা দলের সদস্যরা। বৈদ্যুতিক আলো আজও এ অঞ্চলে আসে নি। উপযুক্ত মঞ্চ নেই, দর্শকের অভাব। এই সব সমস্যার সঙ্গে এঁদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

কল্লোল (চুঁচুড়া, হুগলী)

মফঃস্বল বাংলায় যে ক'টি নাট্যসংস্থা পুরনো বলে খ্যাতিলাভ করেছে তাদের মধ্যে "কল্লোল" (চুঁচুড়া)-কে শীর্ষ তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। এই নাট্য সংস্থাটি ১৯৫৩ সালে অর্থাৎ আজ থেকে উনিশ বছর আগে গুটি কয়েক প্রগতিশীল যুবকের প্রাণপণ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৬৪ সালে সমরেশ বসুর 'আদাব'-এর অভিনয় দেখে (নাট্যরূপ শুকদেব চট্টোপাধ্যায় ও বিমল গুহ) পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার মানুষ কল্লোলের নাট্য কর্মীদের অভিনন্দন জানালেন। সেদিন এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন অচিন মুখোপাধ্যায় এবং সুবল ঘোষ। আলো এবং সংগীতে যথাক্রমে ধনঞ্জয় নন্দী এবং দেব চট্টোপাধ্যায়। সেই বছরেই পশ্চিম বাংলার অন্যতম নাট্য প্রতিষ্ঠান যাত্রিকের আয়োজনে একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় এরা প্রথম পুরস্কার পায়।

'দ্বান্দ্বিক' (অমর গঙ্গোপাধ্যায়) কল্লোলের আর এক অধ্যায়। তখন ১৯৬৬ সাল। পর বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে উৎপল দত্তের 'ইতিহাসের কাঠগড়ায়' কল্লোলের অন্যতম প্রযোজনা। এবারেও পশ্চিম বাংলার মানুষ নাটকটিকে সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং এরপরেই স্বরূপ ব্রহ্ম রচিত 'মাটী' নাটককে আর একবার আশীর্বাদ করলেন সচেতন দর্শক। অনুজ বিভাগও পিছিয়ে রইল না। তারাও একই উদ্যমে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অভিযান', অচিন মুখোপাধ্যায়ের 'আগুন যখন এল' ইত্যাদি অভিনয় করে চলল। ষাট দশকেই অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে কল্লোলের আয়োজনে একাংক নাটক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এইভাবে দীর্ঘ একটানা উনিশ বছর ধরে কল্লোল মোট পূর্ণাঙ্গ ২৭টি এবং একাংক মোট ৩৯টি (২১. ৭. ৭২. পর্যন্ত) এবং অনুজ গোষ্ঠী মোট ১৭টি নাটক (২১, ৭, ৭২, পর্যন্ত) মঞ্চস্থ করেছেন। তারই মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা হলো রবীন্দ্র নাথের 'কালের যাত্রা', 'ঠগ' (উমানাথ ভট্টাচার্য), 'শেষ সংবাদ' (উমানাথ ভট্টাচার্য), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একতলা' (নাট্য-রূপ শুকদেব চট্টোপাধ্যায়) ইত্যাদি। এবং একাংক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আদাব', 'দ্বান্দ্বিক', 'ঘুম নেই', 'ইতিহাসের কাঠগড়ায়', 'মাটী' এবং 'সূচনা'। কল্লোলের সুদীর্ঘ প্রযোজনায় প্রত্যেকটি নাটকই সুধীর চন্দ্র নন্দী পরিচালনা করেন। আলো, মঞ্চশিল্প, রূপসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে সংস্থার নিজস্ব শিল্পীরাই নিয়োজিত।

এইভাবে নাটকের বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সংস্থাটি এগিয়ে চলেছে। এদের নাট্য জীবনের পাথেয় সহধর্মী নাট্য সংস্থা এবং কর্মীর সম্প্রীতি এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতা এবং শুভেচ্ছা।

ব্যতিক্রম (বেহালা)

১৯৭১ সাল, ২৬শে জানুয়ারী মুক্তাঙ্গনে একটি নাটক দেখলাম, 'চলছে চলবে'। এতোদিন যাকে জানতাম শুধুই একটা শ্লোগান। আর এই শ্লোগানটির জন্মদাতা বলা যায় তাপস-সেন। কল্লোল চলছে চলবে এই শ্লোগানটি ওনারই সৃষ্টি, আজ তা নাটকের নামে পরিণত হয়েছে। সুধাংশু দাসগুপ্তর 'চলছে চলবে'তে যা দেখলাম তা হচ্ছে, দেশের এই বেকার সমস্যার মধ্যে যুবসমাজ

হতাশাগ্রস্ত হয়ে যে পথে যাচ্ছে সে পথ বিভ্রান্তির পথ। কে যেন ঠেলে দিচ্ছে এই নোংরা পথে। সেই পথ থেকে যুবসমাজকে কেমন করে রক্ষা করা যায় এই আভাসই দিয়েছেন সুধাংশু বাবু।

এই দিন জানা গেল ৬৯ সালে এই ব্যতিক্রম সুধাংশু বাবুর 'আমি এ চাইনি' দিয়ে যাত্রা শুরু করেন। এরপর এরা গৌতম মুখোপাধ্যায়ের 'নেপথ্য দর্শন' একাংক অভিনয় করে বহু জায়গায় পুরস্কার লাভ করেন। এরা রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' সুধাংশু দাসগুপ্তর নাট্যরূপ অভিনয় করেছেন। এদের নির্দেশনায় আছেন অরুণ দাসচৌধুরী। অভিনয়ে সুখেন্দু মুখার্জী, দীনেশ চক্রবর্তী, কান্তীময় ঘোষ, সীমা গুহঠাকুরতা ও উদীয়মান শিল্পী হিসাবে যথেষ্ট বন্ধা দাসগুপ্তা খ্যাতি লাভ করেছেন।

উদ্যোগী (হুগলী)

১৯৬৮ সালেই প্রথম অভিনয় 'রক্তে রোয়া ধান' (রবীন্দ্র ভট্টাচার্য) নাটক। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নাটকটি দর্শকদের এবং বিচারকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করল। এই নাটকটিতে তপন ঘোষ একাধারে শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং সহ অভিনেতার পুরস্কার লাভ করলেন। অবশ্য এই পুরস্কারই শেষ কথা নয় কারণ দলগত অভিনয়ে রাধিকা রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ মুখোপাধ্যায় অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করলেন। এরপর ১৯৬৮, '৭০, '৭১-এ পরপর 'অশান্ত বিবর' (রবীন্দ্র ভট্টাচার্য), 'ভিয়েতনাম' (চিররঞ্জন দাশ), 'কিউবা' (ভোলা দত্ত), 'একমাত্র অস্ত্র' (মনোরঞ্জন বিশ্বাস), 'হঠাৎ নেতা' (জোছন দস্তিদার), 'শতাব্দীর পারে' (অমল চক্রবর্তী) প্রভৃতি নাটকগুলি বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মঞ্চে এবং আমন্ত্রিত মঞ্চে দর্শক সাধারণের অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করল। ঠিক এরই পরে ১৯৭১-৭২ সালে 'মেঠোঝড়' (স্বরূপ ব্রহ্ম) নাটকখানি বিভিন্ন মঞ্চের দর্শকের এবং বিচারকের মনে গভীর রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে। এই নাটকটিতে দলগত অভিনয়ে দিলীপ সোম, বাদল পাল, দুলাল হালদার, প্রদীপ সোম, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, তপন ঘোষ, স্বপন মুখোপাধ্যায় অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করলেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মঞ্চে পুরস্কার লাভ করলেন।

পূর্ণাঙ্গ নাটকের ক্ষেত্রে এঁরা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন। তার একমাত্র

কারণ প্রতিকূল আর্থিক অবস্থা এবং চরিত্রপোযোগী মহিলা শিল্পীর প্রাপ্যতা। 'ষড়যন্ত্র' (স্বরূপ ব্রহ্ম) পূর্ণাঙ্গ নাটকখানি মঞ্চস্থ করে এরা প্রমাণ করেছে এরা একাংক নাটকেরই মতো পারদর্শী।

উদ্যোগী নাটকের মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, আলোক, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে সংস্থার শিল্পীদেরই ব্যবহার করেন।

ক্যারেকটারস্ (হাওড়া)

আলোচ্য নাট্য সংস্থার আগের নাম ছিল 'মঞ্চশ্রী'। বিশেষ অসুবিধের মধ্যে নাম বদল করতে বাধ্য হতে হয়। নাট্য সংস্থাটির জন্ম হয়েছে মাত্র দু' বছর। অথচ এই অল্প দিনের মধ্যেই প্রভূত সুনাম কুড়োবার কারণ সার্থক টীম্ ওয়ার্ক ও অকুতোনিয়ম নিষ্ঠা। এঁরা প্রযোজনা করেন সরোজ রায়ের 'ল্যাকডিভোরিয়াস্' এবং হাসির নাটক 'গোরুর গাড়ীর হেড লাইট'। মাত্র এই একটি নাটকেই তাঁরা আলোচনার পাত্র হয়ে উঠেছেন—এটা কম কৃতিত্বর কথা নয়। এঁদের উদ্দেশ্য এক্সপেরিমেণ্টাল হাসির নাটক প্রোডিউস্ করা। তাতে তাঁরা প্রাথমিকভাবে সফল হ'য়ে ওঠার পর, আবার অধিকতর শক্ত একটি নাটকে হাত দিয়েছে, সেটিও সরোজ রায়ের লেখা—'কাম্ অন্ ডার্লিং'। পরিচালনা করেন সত্য চট্টোপাধ্যায়। শুধু হাসির নাটকের প্রযোজক সংস্থা হিসেবে এর অভিনবত্ব কতখানি তা যাঁরা দেখেননি তাঁরা দেখলেও বলবেন, এর দরকার ছিল।

নাট্য সংস্থা (বেহালা)

১৯৬৩ সাল, একটি নতুন দলের জন্ম হলো নতুন ধরণের নাটক দিয়ে। একই সঙ্গে নাচ, গান আর হাসি হুল্লোরের মধ্যে দিয়ে শুরু করলেন এঁরা শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ঝুমুর' নাটক। প্রথমেই এঁরা হাওড়ার বিভার্থী সমাজের প্রতিযোগিতায় এই নাটক মঞ্চস্থ করলেন এবং দলগত অভিনয়ে প্রথম স্থান দখল করলেন। পরিচালক হিসাবে কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার করলেন। পর পর এই গোষ্ঠী আরো চারটি প্রতিযোগিতায় এই নাটক নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলেন।

আর হাসি নয় রূঢ় বাস্তবের পথে এগিয়ে গেলেন এরা ৭২ সালে। প্রযোজনা

শিল্পী প্রশান্ত ভৌমিকের পরিচালনায় জোছন দস্তিদারের 'পঙ্গপাল' নিয়ে এলেন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চের প্রতিযোগিতায়। সেখানেও দলগত অভিনয়ে প্রথম স্থান দখল করলেন। পরিচালক দ্বিতীয় স্থান পেলেন, এই নাটকও কয়েকটা প্রতিযোগিতায় অভিনয় করার পর এঁরা একটার পর একটা নাটক মঞ্চস্থ করে গেলেন। সুনীল দত্তর 'চোদ্দ পাকে বাঁধা', কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘণ্টা', শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'বৌদির বিয়ে', স্বদেশ ঘোষের 'ধানের রঙ সোনা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টাকার রং কালো'।

শুধু হাসিতেই এঁদের মন ভরল না তাই ৭২-এ লেনিন শত বার্ষিকীতে এঁরা উৎপল দত্তর 'কল্লোর কারাগারে' অভিনয় করলেন। মঞ্চ সজ্জা ও পরিচালনায় ছিলেন প্রশান্ত ভৌমিক। বিভিন্ন সময়ে অভিনয়ে ছিলেন দীপক চৌধুরী, প্রশান্ত ভৌমিক, শ্যামাপদ মুখার্জী, দিলীপ বসু, তেজেন ঘোষ, সুবল রায়, অমরেন্দ্র রায় চৌধুরী, সমরেশ চ্যাটার্জী, সুকেশ ঘোষ, শঙ্কর অধিকারী, রণজিৎ বসু, সুনীল বসু, সমরেন্দ্রনাথ সাহা, গোবিন্দ চক্রবর্তী, মমতা পাল, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন মজুমদার, দিলীপ দাস, অসীম মজুমদার, বিশ্বনাথ পাল, শিবু রায় চৌধুরী, দেবু পাড়ুই, কার্তিক অধিকারী, জয়দেব পাড়ুই, তমাল দেওয়ানজী, সমীর ব্যানার্জী, দয়ানন্দ ব্যানার্জী, মোহন মল্লিক, চণ্ডীদাস বসু, শঙ্কর বাগ, সুনীল দত্ত, সমীরণ বসু, গৌতম চক্রবর্তী, গৌতম বসু, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মুখার্জী, দিলীপ মুখার্জী, মিহির হালদার, অজয় কর্মকার, গোবিন্দ সাহা, গুরুদাস বারিক, বরুণ দাশগুপ্ত, সুজাতা গাঙ্গুলী, গীতা সেন, শিখা মুখার্জী, বাসন্তী দে, সীমা গুহ ঠাকুরতা, মায়া বসু। দিলীপ ধাড়া ও অরুণ ব্যানার্জী এই দুজনের অকালমৃত্যুতে সংস্থা খুবই মর্মাহত। সঙ্গীতে মিহির হালদার, বৈদ্যনাথ মুখার্জী, সুবোধ চৌধুরী, কার্তিক দাস, বরুণ দাশগুপ্ত ও রাম দেও রাজভর।

চেনামুখ (টালিগঞ্জ)

১৯৬৮ সাল ২৭শে ডিসেম্বর অনিল মুখোপাধ্যায়ের 'বিয়ে মাইনাস বৌ' নামে একটি হাসির নাটক দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন চেনামুখের শিল্পীরা। ৬৯ সালে শচীন ভট্টাচার্যর 'পাথরের চোখ' অভিনয় হবার পরই নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এমনও দিন আসতে পারে' মঞ্চস্থ হলো। তারপর তারু চট্টোপাধ্যায়ের 'জীবন মৃত্যু', ৭০ সালে রবীন্দ্র ভট্টাচার্যর 'রূপ বদলের মেলায়', ৭১-এ সুনীল

শঙ্কর 'হঠাৎ রাজা' এই দুটি নাটকই হাসির। এরপর কিরণ মৈত্রের 'অন্তছায়া' ৭২-এ অভিনয় হলো। নাট্য শত বার্ষিকী উপলক্ষে এঁরা 'জীবন মৃত্যু' অভিনয় করছেন।

এঁদের দলের পরিচালক শঙ্কর পালুই ও বৈদ্যনাথ ঘোষ। শিল্পীদের মধ্যে রূপকার—দিলীপ ঘোষ, বৈদ্যনাথ ঘোষ, শঙ্কর পালুই, চন্দ্রশেখর গুহ, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল ভট্টাচার্য, চিত্ত ঘোষ, জয়ন্ত ঘোষ, অরুণ সাহা, সমীর পালুই, স্বপন চক্রবর্তী, দ্বিজেন আইচ্, কমলেন্দু ব্যানার্জী, কাবুল ঘোষ, দেবেন রায়।

অর্পণ (হাওড়া, সালকিয়া)

১৯৬৮ সাল ২রা জুন রবিদাস সাহা রায়ের 'শিল্পী চাই' নিয়ে শুরু করে এঁরা। এরপর নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এমনও দিন আসতে পারে', ৬৯-এ এঁরা প্রণবেশ চক্রবর্তীর 'তদন্ত', ৭০-এ সুনীল দত্তর 'চোদ্দ পাকে বাঁধা', ৭১-এ বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সুতরাং', ৭২-এ কিরণ মৈত্রের 'এদের রাখবো কোথায়' অভিনয় করেন।

নির্দেশক—উদীয়মান শিল্পী শঙ্কর পালুই, রূপকার—শঙ্কর পালুই, স্বপন চক্রবর্তী, সমীর পালুই, সমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত পালুই, গৌতম মুখোপাধ্যায়, মদন মাঝি, আনন্দময় দে, স্বপন মুখোপাধ্যায়, অমিয় মাঝি, গোপেশ্বর নন্দী, স্বপন চট্টোপাধ্যায়, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ দে, বৈদ্যনাথ ঘোষ, শিশির রুদ্র, অরুণ মিত্র, অসিত দলুই।

কার্ণিক (শিলিগুড়ি)

১৯৬৮ সাল। এই দল শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ক্যাম্প থ্রী' নাটক দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। ১৪ই মার্চ রেলওয়ে ইন্সটিটিউট হলে এই নাটক অভিনয় হয়। এরপর এরা একটার পর একটা নাটক অভিনয় করেন। রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'কালো মাটির কান্না', 'স্বপবদলের মেলা', শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ফাঁস', রতন ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে' করেন, এরপর ৭২-এ করেন ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা'। উত্তর বঙ্গ ও আসামে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পাঁচটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। এঁরা এখন অভিনয় করছেন বারিণ দাসের 'সময় শুধু ঠিকানা', রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র'।

এঁদের সঙ্গে রয়েছেন নান্দীকারের অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্দেশনায় স্বপন চক্রবর্তী (রেডিও), অলোক চক্রবর্তী ইনি আগে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপে অভিনয় করতেন। অভিনয়ে অলোক চক্রবর্তী, রূপক চৌধুরী, দিলীপ ভট্টাচার্য, রবী বোস, প্রবীর চক্রবর্তী, পৃথ্বীরাজ রায়, ভারতী ঘোষ, আরতি সরকার, নন্দিতা মজুমদার, সম্পা ঘোষ, ধীরেন ভট্টাচার্য ও চামুন্দা।

নাট্য আন্দোলনে/কুলটীর কয়েকটি নাট্য সম্প্রদায়

বর্ধমান জেলায় কুলটী শহরের নাট্য চর্চা আজ আর অপরিচিত নেই। এখানে দুটি স্থায়ী মঞ্চ আছে। বিশেষ করে কুলটী সম্মিলনী অত্যন্ত জনপ্রিয়। ওঁদেরই প্রচেষ্টায় বহুরূপী, লিট্‌ল থিয়েটার, নান্দীকার, চতুরঙ্গ, চতুর্মুখ, শৌভনিক, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ সবাই অভিনয় করে এসেছেন, এদের প্রচেষ্টায় একাংক প্রতিযোগিতায় প্রতিবছরই স্থানীয় জনসাধারণ নতুন নতুন নাটক দেখতে পান। এখানকার নাট্য প্রতিযোগিতা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শুধু ৭১ সালে হয়নি নানান কারণে। এখানকার নাট্য প্রতিযোগিতা প্রথম শুরু হয় ৬০ সালে। বাংলা দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ওখানে বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করেছেন। যেমন ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, অজিত কুমার ঘোষ, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, সুনীল দত্ত, জ্ঞানেশ মুখার্জী, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ মৈত্র ইত্যাদি। কুলটী সম্মেলনের নিজস্ব নাট্য বিভাগই সব থেকে পুরোনো। এঁরা আগে পুরোনো নাটক অভিনয় করতেন। বিভিন্ন সময়ে এঁদের নাট্য পরিচালক যাদব চক্রবর্তী। নৃসিংহ ভট্টাচার্য, নানু মৈত্র, শিবব্রত গোস্বামী, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য এই শিল্পীরাই অভিনয় করেন। এছাড়া অভিনেতা কৃষ্ণমোহন চট্টোপাধ্যায়, তাপস মোহন চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত গুপ্ত, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, তপন গাঙ্গুলী, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, তাপস চট্টোপাধ্যায়, শিবু চট্টরাজ, কানাই মিত্র, তপন মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিষ চক্রবর্তী, প্রতাপ নারায়ণ বাগচী, পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়, পি দত্ত। এই শিল্পীদের মধ্যেই কেউ কেউ অন্যান্য সংগঠন গড়েছেন। যেমন ইস্কো শিক্ষানবীশ সঙ্ঘ, যুব সঙ্ঘ, ছদ্মবেশী, শিল্পী চক্র, কল্যানী ঘোষালের প্রচেষ্টায় এই সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে। স্বপন চক্রবর্তীর পরিচালনায় অন্তঃ-সর্বাধিকারীর 'বক্ষ' নাটক প্রযোজনা করে নাটকে ভিন্নধারের সংগে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

আর একটি সংস্থা ধ্রুবক, এঁরা পদাতিকের 'অগ্নিকোণ,' 'নিঃসংগ নায়ক', রতন ঘোষের 'ফেরা', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্যাপ্টেন হুররা' প্রযোজনা করে।

লিটল প্রগেসিভ গ্রুপ—কয়েকটি মঞ্চ সফল প্রযোজনার মাধ্যমে এঁরা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রযোজনাগুলি 'নীলকণ্ঠের বিষ', 'কর্ণখালি', 'রক্তাক্ত রোডেশিয়া', 'কঙ্গোর কারাগারে', 'শুধু ছায়া', 'ছেঁড়া তমসুক'। অধিকাংশ নাটক পরিচালনা করেছেন স্বপন কুমার চক্রবর্তী। এঁদের অভিনেতাদের মধ্যে আছেন সমীর সরকার, টুলু মুখোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু চট্টরাজ, অলোক চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময়, তপন চক্রবর্তী, স্বপন কুমার চক্রবর্তী, শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত কর্মকার প্রভৃতি।

মিতালী—নাট্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পেয়েছিল মিতালী। সম্প্রতি প্রযোজনা সামান্য ব্যাহত। এই গোষ্ঠীর পরিচালক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় 'মৃত ভূমিকা', 'রেডিও', 'চেয়েছিলাম', প্রভৃতি কয়েকটি সার্থক একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। নাট্যকার হিসাবে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং অভিনেতা হিসাবে জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

আরও একটি নাট্য সম্প্রদায় খাপছাড়া কয়েকটি সুন্দর নাটক প্রযোজনা করেছেন। 'কঙ্গোর কারাগারে', 'ফাঁস', 'জীবন্ত স্ট্যাচু', 'প্রস্তাবনা' প্রভৃতি। নূতন অভিনেতাদের মধ্যে পাওয়া যায়—অমিতাভ দত্ত গুপ্ত, অরুণ গোস্বামী, গণেশ মণ্ডল, মিন্টন, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ইয়ংমেন্‌স্‌ কালচারাল এসোসিয়েশন (নৈহাটি)

১৯৭২ সাল, কয়েকমাস আগে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে শুভম্‌ নাট্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে সারা বাংলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা হয়। আমি আর নাট্যকার অমর গঙ্গোপাধ্যায় সেখানে বিচারকের আসনে বসে কয়েকটি নাটক দেখেছিলাম। তার মধ্যে এমন অনেক নাটক দেখতে হয়েছে যা দেখে আমাদের বেশ কষ্ট হয়েছে। এককথায় বলা যায় যখন প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক সেই সময়ে একটি নাটক দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তার টিমওয়ার্ক এতো সুন্দর যে আমাদের চমক লাগিয়ে দিল। যেন মুহূর্তের মধ্যে কতো কিনা ঘটে গেল একটা যন্ত্রের মতন। সেই নাটকটির নাম 'জাদুকর'। নাট্যকার শ্যামলতনু দাসগুপ্ত। নির্দেশনায় ছিলেন নারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং

সমীর চক্রবর্তী। প্রযোজনায় ইয়ংমেন্‌স্‌ কালচারাল এসোসিয়েশন (নৈহাটি)। সুদূর নৈহাটিতে বসে এতো সুন্দর ভাবে নাটক প্রযোজনা করা যায় আমার ধারণা ছিল না। নাটকটা একটু নতুন ধরণের রূপক, বোধহয় নাট্যকার বলতে চেয়েছেন এই কথা অনেক লোভ মোহর পথ পরিত্যাগ করে অনেক বিপদ আপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করে সোজা পথে এগিয়ে যেতে পারলে তবেই একসঙ্গে কিছু করা যায়, লড়া যায়, কিছু পাওয়া যায়। এই প্রতিযোগিতায় এঁরা দলগত অভিনয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। শুধু এখানে নয়, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এঁরা ইতিমধ্যে প্রায় ৩৪টি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার আদায় করেছেন, এই জাদুকর নাটকের দলগত অভিনয়ে দেখিয়ে। সত্যি অসাধারণ ক্ষমতা এঁদের। এর আগে এঁরা শ্যামলতনু দাসগুপ্তর 'বাদক' নাটক অভিনয় করেছিল, তাতেও প্রচুর পুরস্কার পেয়েছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের মূল্য ক্রমশঃ কমে যায়। অভাবের তাড়নায় মানুষ নিজেকে অতি অল্প মূল্যে বিকিয়ে দেয়। আজ এই দেশের বিভিন্ন ব্যবহার্য পণ্যের মধ্যে মানুষও পণ্য-সামগ্রী হয়ে গেছে। এমন সমাজ গড়তে হবে যে সমাজে মানুষ পণ্য হবে না, সেই সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন নাট্যকার বাদকে। আরও অনেক নাটকই এঁরা করেছেন। এর মধ্যে এই দুটি নাটক খুবই উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা বলে আমি মনে করি। অবশ্য এঁরা ঐ নাট্যকারের 'পিশাচ', 'বন্ধ দরজা', 'শীতের আগুন' প্রভৃতি নাটকও অভিনয় করেছেন। এঁদের যাত্রা শুরু '৬৮ সালে কিরণ মৈত্রের 'নাম নেই' দিয়ে। এরপর এঁরা শ্যামলতনু দাসগুপ্তর 'রক্তাক্ত রোডেশিয়া' অভিনয় করে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। এঁদের শিল্পীদের মধ্যে আছেন, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অসিত দাস, সুবিমল বাগচী, দীপক চক্রবর্তী, বিমল সিনহা, দেবকুমার অধিকারী, অনিল ঘোষ, অজয় দাস, সমীর চক্রবর্তী, সোমনাথ মুখার্জী, শ্যামল ভট্টাচার্য, নিশীথ চক্রবর্তী, শ্যামলতনু দাসগুপ্ত।

শব্দক্ষেপণে—নিশীথ চক্রবর্তী। দৃশ্যসজ্জা—প্রবীর রায় ও বলাই ব্যানার্জী। আলোক সম্পাতে—মাখন রঞ্জন দাস, মানবেন্দ্র হোম, বিশ্বনাথ পালিত, রাঃ অজিত। নেপথ্য সঙ্গীতে—সুপ্রিয় চক্রবর্তী, মলয় দত্ত। পরিচালনায়—নারায়ণ মুখার্জী।

নাট্য আন্দোলনে ইসক্রা নতুন সংযোজন

১৯৭২ সাল ২রা সেপ্টেম্বর মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে একটি সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর নাটক দেখলাম। সুনীল দত্তর 'শেকল ছেঁড়ার গান'। নির্দেশনায় তরুণ পরিচালক দিলীপ সরকার, প্রযোজনায় ইসক্রা নাট্য গোষ্ঠী। অভিনয়ে দীপক সাহা, সুবল ভৌমিক, নবীন ঘোষ, দিলীপ সরকার, হরিপদ বসু, মণ্টু কর, মনোজ দত্ত, কল্যাণ সরকার, মেঘলাল দাস, রঙ্গলাল চৌধুরী, অনিল সাহা, অনিল চৌধুরী, অসীম সেন, হারাধন সাহা, প্রবীর কর, সন্তোষ সাহা, টুক সরকার। আলোয় বিপ্লব চৌধুরী। রূপসজ্জায় প্রখ্যাত মেকআপম্যান শান্তনু দাস। এই দলের এই দিনই প্রথম হাতে খড়ি বলা যায়। নাটকের মূল সুরটা যা, বোঝা গেল তা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে রাষ্ট্র ক্ষমতা যার হাতেই থাক না কেন ঐ সিংহাসনের আসল চাবি কাঠি-টা থাকে কিন্তু কারখানার মালিক, বড় বড় ব্যবসাদার আর গ্রামের জমির মালিকেরই হাতে। তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হলে যে কোন অছিলায় সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়, আর যারা তাদের স্বার্থপুষ্ট করে চলে তাদের আদর করে ছানা খাইয়ে রেখে দেয়। কিন্তু যারা এই ঘুনে ধরা কাঠামোকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে চায়, মুক্তি চায়, মুক্তির জন্যে লড়ে ও মরে, মরেও তারাই আগামী কালের পথদ্রষ্টা।

তরুণ শিল্পীরা সেদিন এই নাটক যে পদ্ধতিতে অভিনয় করলেন তাতে এই কথাই বার বার মনে হয়েছিল, এই সব আসছে কালের শিল্পীরা—যাদের আছে নিষ্ঠা, আছে সত্যকে স্পষ্ট করে বলতে পারার ক্ষমতা, কেন এবং কারজন্যে নাটক করছি এটুকু বোঝার দৃষ্টিভঙ্গী যাদের আছে, তারাই একমাত্র এই শতবর্ষের আলোয় দাঁড়িয়ে নতুন মশাল জ্বেলে পথ দেখাবে, সেই পথই হবে আগামী কালের নতুন নাট্য আন্দোলনের প্রকৃত পথ। আমরা পথ চেয়ে অপেক্ষা করে থাকবো সেই মশাল কবে জ্বলবে। ঘন অন্ধকার ভেদ করে কবে দেখবো সেই আশার আলো।
